রদীয় **পরিচয়** ১৪০৯

আসানসোল মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশন

আসানসোল

আবেদন

১। বাড়ীর বা রাস্তার কল যেখানেই দেখবেন পরিশ্রুত জল পড়ে পড়ে নষ্ট হচ্ছে তৎক্ষণাৎ সেটির কল (Bib-Cock) বন্ধ করে দিয়ে জলের অপচয় রোধ করুন।

২। কল অথবা Main Pipe থেকে Pump লাগিয়ে জল টেনে নেওয়া প্রতিরোধ করুন। পৌর নিগমে খবর দিন।

৩। বে-আইনীভাবে কেউ বাড়ীতে জলের সংযোগ নিয়ে থাকলে এই অফিসে খবর দিন।

৪। যে সব স্থানে ট্রাকের সাহায্যে জল পাঠানো হয় সেখানেও জল ভরার সময় যেন জল অপচয় না হয় সেই দিকে দৃষ্টি রাখুন।

৫। পৌর কর নিয়মিত জমা দিন।

৬। শহরকে সুন্দর রাখতে পৌর নিগমের সাথে সহযোগিতা করুন।

শ্যামলকুমার মুখার্জী
মেয়র

The Encyclopaedia of Indian Literature	3000.00
A set of six volumes	
Who's Who of Indian Writers	1000.00
A set of two volumes	
Sahitya Akademi Awards :	160.00
Books and Writers (1955-1978)	
Who's Who of Sanskrit Scholars in India	300.00
Ed. K. C. Dutt	
Modern Indian Literature An Anthology	
Vol. I Survey & Poems	500.00
Vol. II Fiction	600.00
Vol. III Plays & Prose	350.00
Medieval Indian Literature	
Vol. I	450.00
Vol. II	500.00
Vol. III	500.00
Vol. IV	500.00
Chief Editor : *K. Ayyappa Paniker*	
Ancient Indian Literature	
Vol. I	450.00
Vol. II	450.00
Vol. III	450.00
Chief Editor : *T R S Sharma*	
Bankimchandra Chatterjee : Essays in Perspective	700.00
Edited by *Bhabatosh Chatterjee*	
Rabindranath Tagore : A Centenary Volume (1861-1961)	450.00

(Valuable study on the many aspects of Tagore's personality and genius contributed by eminent writers and scholars from many parts of the world)

Edited by : *S. Radhakrishnan*

৯৮

Panihati Municipality

Panihati, North 24 Parganas.

WORKS AHEAD

1. To complete total repairs and renovation of Electric Crematorium with K. M. D. A. financing.
2. To mordernise the Trenching Ground (Bhagar) as per Project prepared by S & D Sector K.M.D.A.
3. To take up the constructions of 35 parks in 35 wards and a Central Park in Ward No.-10.
4. To construct a Rest House (সাগরিকা) by the side of the river Ganga in Ward No.-3.
5. To take up A.C. of the Lokasanskriti Bhavan.
6. To renovate the "Penety Bhawan" at Digha.
7. To complete the roofing of the 2nd Floor of the Office.
8. To convert "Matrisadan" into a Mini Hospital for Health Services.
9. To open few evening Health Service Centres in different wards.
10. To erect a statue of Netaji Subhas Ch. Bose at Lokasanskriti Bhavan Compound.
11. To find out land for water reservoir and construct it with K.M.D.A./Govt. financing at Thakur Corner.
12. To meet Heritage Buildings liabilities and complete them.
13. To construct the regional office of the Municipality at Trikon Park, Agarpara.
14. To move before the appropriate authority for the Sports Stadium/Complex at Amarabati Math.

Ranjit Dutta
Vice-Chairman

Monoranjan Sarker
Chairman

পশ্চিমবঙ্গ নাট্য আকাদেমি

তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগ পশ্চিমবঙ্গ সরকার

প্রকাশিত বই

জীবনমূলক ঃ নট নাট্যকার যোগেশচন্দ্র চৌধুরী। কুমার রায়। ৩.০০ টাকা। ঋষি নট মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য। কুমার রায়। ২.০০ টাকা। নটসূর্য অহীন্দ্র চৌধুরী। গণেশ মুখোপাধ্যায়। ৯.০০ টাকা। গেরাসিম লিয়েবেদেফ। ডঃ হায়াৎ মামুদ। ১৮.০০ টাকা। নাট্যচার্য শিশিরকুমার। শংকর ভট্টাচার্য। ৪০.০০ টাকা। শচীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত। ডঃ অজিতকুমার ঘোষ। ১৫.০০ টাকা। বাংলার নটনটী (৪র্থ খণ্ড)। দেবনারায়ণ গুপ্ত। ৩৫.০০ টাকা। নট-নাট্যকার-নির্দেশক বিজন ভট্টাচার্য। লেখা : সজল রায়চৌধুরী। সম্পাদনা : নৃপেন্দ্র সাহা। ৮০.০০ টাকা। বের্টোল্ট ব্রেখট ও আধুনিক থিয়েটার। সত্য বন্দ্যোপাধ্যায়। ৩০.০০ টাকা।

নাট্য ইতিহাসধর্মী ঃ কলকাতা নাট্যচর্চা। রথীন চক্রবর্তী। ১০০.০০ টাকা। স্টার থিয়েটারের কথা। দেবনারায়ণ গুপ্ত। ৮.০০ টাকা। বঙ্গীয় নাট্যশালার ইতিহাস। কিরণচন্দ্র দত্ত। সম্পাদনা : প্রভাতকুমার দাশ ৮০.০০ টাকা। বাংলো রঙ্গালয়ের ইতিহাসের উপাদান (১৯০১-১৯০৯)। শংকর ভট্টাচার্য। ৬০.০০ টাকা। বাংলা রঙ্গালয়ের ইতিহাসের উপাদান (১৯১০-১৯১৯)। শংকর ভট্টাচার্য। সম্পাদনা : অভিজিৎ ভট্টাচার্য। ৮০.০০ টাকা। বঙ্গীয় নাট্যশালা। ধনঞ্জয় মুখোপাধ্যায়। সম্পাদনা : ডঃ বিষ্ণু বসু। ৫০.০০ টাকা।

প্রবন্ধ ও বক্তৃতামালা ঃ আশার ছলনে ভুলি (২য় সংস্করণ)। উৎপল দত্ত। ৪৫.০০ টাকা। বাংলা নাটকে নজরুল ও তাঁর গান। ডঃ ব্রহ্মমোহন ঠাকুর। ৩৫.০০ টাকা। নাট্য আকাদেমি বক্তৃতামালা ১. শ্রব্য ও দৃশ্য, মঞ্চে ও নাটকে। ডঃ অজিতকুমার ঘোষ। ১০.০০ টাকা। নাট্য আকাদেমি বক্তৃতামালা ২. পথ নাটক : সীমাবদ্ধতা ও সম্ভাবনা। শিশির সেন, জোছন দস্তিদার, অরুণ মুখোপাধ্যায, মালিনী ভট্টাচার্য। ১০.০০ টাকা। নাট্য আকাদেমি বক্তৃতামালা ৩. থিয়েটারে কবিতা। কুমার রায়। ১০.০০ টাকা।

নাটক ঃ সফদর হাসমি নাট্য সংগ্রহ (নতুন সংস্করণ)। সম্পাদনা : নৃপেন্দ্র সাহা। ৭৫.০০ টাকা। শরৎ-সরোজিনী ও সুরেন্দ্র বিনোদিনী। উপেন্দ্রনাথ দাস। সম্পাদনা : ডঃ মহাদেবপ্রসাদ সাহা। ৪০.০০ টাকা। নীলদর্পণ (ইংরাজি)। সম্পাদনা : সুধী প্রধান। ৭০.০০ টাকা।

পত্রিকা ঃ নাট্য আকাদেমি পত্রিকা ৩। ২০.০০ টাকা। নাট্য আকাদেমি পত্রিকা ৫। ৫০.০০ টাকা। নাট্য আকাদেমি পত্রিকা ৬। ৬০.০০ টাকা। নাট্য আকাদেমি পত্রিকা ৭। (বিশেষ ব্রেখট সংখ্যা)। ৬০.০০ টাকা।

প্রাপ্তিস্থান ঃ বইঘর, কফি হাউস, কলেজ স্ট্রিট, রবীন্দ্রসদন চত্বর।
বাংলা আকাদেমি ভাণ্ডার, ১১৮ হেমচন্দ্র নস্কর রোড, কলকাতা-৭০০ ০১০
তথ্য ও সংস্কৃতি, পশ্চিমবঙ্গ সরকার

ICA/4628/2002

খেলব নাকো
আগুন নিয়ে
ভাইয়ের রক্তে
হাত রাঙিয়ে

ছোট্ট তিতাস। যাদের সঙ্গে ও স্কুলে যায় সেই আলি, রহমান, জেমস্ কিম্বা সুখবিন্দার ওর প্রাণের বন্ধু। ওর ভাই-এর মতো। মৌলবাদের বিষবাষ্পে বিষিয়ে যায়নি ওদের ফুলের মতো নিষ্পাপ মনগুলো। কারণ পশ্চিমবঙ্গের শুভবুদ্ধিসম্পন্ন মানুষ গত দুই দশকের বেশি সময় ধরে বারে বারে রুখে দাঁড়িয়েছেন মৌলবাদী শক্তির বিরুদ্ধে। সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির ক্ষেত্রে এ রাজ্যের ঐতিহ্য আজ দেশের কাছে উদাহরণ। আমরা প্রতিজ্ঞাবদ্ধ তিতাস, আলি, সুখবিন্দার, জেমস্‌দের হাতে থাকবে কলম, খাতা আর ফুল। রক্তের দাগ নয়।

পশ্চিমবঙ্গ সরকার

ICA/4628/2002

আমরা আর
গরীব নই গো

"পাঁচিশ বছর আগের কথা। শিবুর বাপ মরল। আমি শিবুর হাত ধরে গাছের তলায়। ঠাঁই নেই। চলে গেল একফালি ধানিজমিও, এভাবে চলল ক'বছর। তারপর এলো পঞ্চায়েতের লোকেরা, বলল, সরকার ধানিজমি দিচ্ছে। আমার শিবু তখন তেরো-চোদ্দয় পা দিয়েছে। ধানিজমি ফিরে পেয়ে মা বেটায় খুশিতে ডগমগ। শিবু লোন পেলো। কাজ পেলো। শিবুর বে হল। আমার নাতি এখন ইস্কুল যায়। এ বি সি ডি পড়ে। আমরা আর গরীব নই গো। সরকারের লোকেরা আমাদের বড্ড উপকার করেছে।...আহা, শিবুর বাপ যদি আজ বেঁচে থাকতো..."

পঞ্চমী দাসী

রাজচন্দ্রপুর, হাওড়া

মানুষের স্বার্থে,

মানুষের সঙ্গে।

পশ্চিমবঙ্গ সরকার

ICA/4628/2002

পরিচয়

আগস্ট-অক্টোবর ২০০২
শ্রাবণ-আশ্বিন ১৪০৯
১-৩ সংখ্যা ৭২ বর্ষ

স্মৃতি আলেখ্য

প্রবন্ধ

বিশেষ নিবন্ধ

রম্যরচনা

গল্প

অনুবাদ গল্প

কাব্যনাট্য

প্রচ্ছদে : রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

সম্পাদক
অমিতাভ দাশগুপ্ত

যুগ্ম সম্পাদক
বাসব সরকার বিশ্ববন্ধু ভট্টাচার্য

কর্মাধ্যক্ষ
পার্থপ্রতিম কুণ্ডু

সম্পাদকমণ্ডলী
ধনঞ্জয় দাশ কার্তিক লাহিড়ী
শুভ বসু অমিয় ধর

উপদেশকমণ্ডলী
হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়
মঙ্গলাচরণ চট্টোপাধ্যায় রাম বসু

সম্পাদনা দপ্তর : ৮৯ মহাত্মা গান্ধী রোড, কলকাতা-৭

পার্থপ্রতিম কুণ্ডু কর্তৃক ঘোষ প্রিন্টিং ওয়ার্কস, ১৯/এইচ/এইচ, গোয়াবাগান স্ট্রিট, কলকাতা-৬ থেকে মুদ্রিত ও ব্যবস্থাপনা দপ্তর ৩০/৬, ঝাউতলা রোড, কলকাতা-১৭ থেকে প্রকাশিত।

P11279

স্মৃতি আলেখ্য

সেকালের কথা

রবীন্দ্রকুমার দাশগুপ্ত

কলিকাতা শহরের পল্লী-জীবন

পরিচয় পত্রিকায় গত শারদীয় সংখ্যায় শ্রীবাসব সরকারের নির্দেশে একটি প্রবন্ধ লিখিয়াছিলাম। সেই প্রবন্ধের বিষয় ছিল 'সেকালের কথা'। সেই কথা আমি আমার বাল্য কথার মধ্য দিয়া উপস্থিত করিয়াছিলাম। সেই প্রবন্ধটি যে বাসব সরকারকে বা কাহাকেও আকৃষ্ট করিবে তাহা ভাবি নাই। এখন বাসব সরকারের ইচ্ছা যে আমি সেকালের কথায় আমার জীবনের সকল কথা উপস্থিত করি। কিন্তু আমার জীবনে এমন কিছু ঘটে নাই এবং এমন কিছু করি নাই যাহা লইয়া পড়িবার মত একটি কাহিনী সৃষ্টি করা যায়। যাহা হউক, আমি আমার কালের কথা এই প্রবন্ধে লিপিবদ্ধ করিতে পারি। আমার বিশ্বাস এই প্রবন্ধে বিধৃত সেকালের কথা আরও অনেকের সেকালের কথা।

কিন্তু এখানে একটি সমস্যার কথা বলি। সেই সমস্যা এই যে আমার স্মৃতির সেকাল সেইকালের নির্ভরযোগ্য কাহিনী হইবে কিনা। আমি লক্ষ্য করিয়াছি যে অতীতের স্মৃতি আমার কাছে অতীতের পূজা। আমার দিনগুলি নানা রঙের দিন ছিল এমন কথা বলিতে পারি না। কিন্তু যখনই অতীতের দিনগুলি স্মরণ করি তখনই মনে হয় সেই দিনগুলি বড় সুন্দর, বড় উজ্জ্বল, বড় সরল ছিল। ইহার কারণ বোধহয় এই যে অতীত বলিতে আমি আমার আপনজন, আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু-বান্ধব প্রতিবেশীকেই বুঝি। এমনও হইতে পারে যে তাঁহারা নাই বলিয়াই আজ এত আকর্ষণীয় হইয়া উঠিয়াছে। যাহা সজল নয়নে স্মরণ করি তাহা বড় অনন্য বলিয়া মনে হয়। ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থ তাঁহার একটি কবিতায় লিখিয়াছেন—'Things are not now what once they were'। এই কথাটির সত্যতা জীবনের শেষ প্রান্তে বেশ বুঝিতেছি। সেদিন সকলে ছিল আজ কেহই নাই। অতীতের মাহাত্ম্য এইখানেই। কিন্তু অতীতের কাহিনীকে দুঃখের কাহিনী বলিব না। উক্ত ইংরাজ কবি তাঁহার ঐ কবিতাটিতেই বলিয়াছেন—To me alone came a thought of grief/A timely utterance gave that thought relief'। আমার সেকালের কথা এই 'timely utterance'। ইহা বলিয়া আমি শান্তি পাইব।

প্রথমে আমি সেকালের কলিকাতার পল্লীজীবনের কথাই বলি। একালে কলিকাতায় পল্লীজীবন একেবারে নাই এমন কথা বলিতে পারি না। কিন্তু এই শহরের পল্লীজীবনে আমি সেকালের সেই নিবিড়তা দেখি না। আমার জন্ম কলিকাতার যে পল্লীতে সে পল্লীর কথা আমার তেমন মনে নাই। ৪/১ বেচু চ্যাটার্জী স্ট্রিটে (এখন সুবল মিত্র লেন) ১৯১৫ সালের ১১ই জুলাই আমি জন্মগ্রহণ করি। মায়ের কাছে শুনিয়াছি ধাত্রীর নাম ছিল লক্ষ্মীমণি এবং

তাঁহার পারিশ্রমিক ছিল চারি আনা। প্রায় বিনা খরচেই ভূমিষ্ঠ হইয়াছি। বেচু চ্যাটার্জি স্ট্রিটের এই বাড়িতে জীবনের চারি বৎসর কাটিয়াছে। তাহার পর বিভিন্ন পল্লীতে প্রায় ছয় বছর বাস করিয়া ১৯২৫ সালে দশ বৎসর বয়সে উত্তর কলিকাতার গৌরীবাড়ী পল্লিতে আসিলাম। পল্লীর নাম গৌরীবাড়ী হইলেও আমাদের রাস্তার নাম ছিল বদ্রীদাস টেম্পল স্ট্রিট। আমাদের বাসস্থান ছিল পরেশনাথ মন্দিরের ঠিক পাশে একটি দ্বিতল বাড়ি। এই পল্লীতে আমরা প্রায় চল্লিশ বছর কাটাইয়াছি। চল্লিশ টাকা মাসিক ভাড়ায় এই গৃহে আমাদের যৌথ পরিবারে প্রায় আঠারজনের স্থান হইয়াও অতিথি-অভ্যাগতদের জন্য জায়গা ছিল। বাড়ির সামনের রাস্তা প্রশস্ত এবং পরিচ্ছন্ন। প্রত্যহ সকালে কর্পোরেশনের ঝাড়ুদার রাস্তায় ঝাড়ু দিত। তাহার পর কর্পোরেশনের ২/৩ জন লোক পাইপ দিয়া রাস্তা ধোয়াইত। কোথাও কোন স্তূপীকৃত জঞ্জাল দেখি নাই। বাড়ির সামনে চারটি জৈন মন্দির। প্রতি সন্ধ্যায় ঐ মন্দিরের আরতির বাদ্য শুনিতাম। রাস্তার গ্যাসবাতি প্রতিদিন নির্দিষ্ট সময়ে কর্পোরেশনের লোক জ্বালাইয়া দিতেন। আবার প্রতিদিন প্রত্যুষে ঐ বাতি নিভান হইত। কর্পোরেশনের কর্মিরা নীরবে এই কাজ করিতেন।

আমাদের এই পল্লীকে সদ্‌গোপ পল্লী বলিতে পারি। সকল পল্লীবাসীরই নিজের বাড়ি ছিল—একতলা বা দুইতলা। তিনতলার বাড়ি মাত্র একটিই দেখিয়াছি। প্রত্যেক বাড়ির সামনে রোয়াকে প্রতি সন্ধ্যায় আসর বসিত। কোন কোন রোয়াকে পাশা খেলা বা দাবা খেলা হইত। সেকালের গল্পগুজবেও যেন একটা নীরবতার ভাব ছিল। কেহই যেন চেঁচাইত না। একালের কলিকাতায় সকলেই যেন বড় মুখর। আর রাজনীতির সুবাদে চারিদিকে কেবল চিৎকার।

আমাদের এই পল্লীর চরিত্র সম্বন্ধে কিছু বলিতে ইচ্ছা করি। আমরা ছিলাম এই ঘটি সমাজে বাঙ্গাল এবং আমরা ভাড়াবাড়িতে বাস করি। কিন্তু আমাদের কেহই তুচ্ছ করিত না, কেহ কেহ আমাদের বাংলা ভাষা লইয়া একটু রঙ্গ-ব্যঙ্গ করিত, কিন্তু তাহার মধ্যে কোন বিদ্বেষ ছিল না। পল্লীর অধিকাংশ মানুষই হয় দোকান চালাইত, না হয় দোকানের কর্মচারী ছিল। খুব বড় চাকুরি কেহই বড় করিতেন না। তবে বদ্রীদাস টেম্পল স্ট্রিটের একজন বাসিন্দা কলিকাতার মেয়র হইয়াছিলেন। তাহার নাম ছিল সুধীর রায়চৌধুরী। এই সুধীর রায়চৌধুরীকে দেখিয়াছি পল্লীর বেকার যুবকদের সঙ্গে গল্প করিতেছেন। পাড়ায় বার্ষিক থিয়েটারে ধনী-দরিদ্র, শিক্ষিত-অশিক্ষিত একাকার হইয়া যাইত। রোয়াকে যাহারা গল্প করিতেন তাহাদের মধ্যে কেহ বিত্তশালী আবার কেহ বিত্তহীন। অবশ্য কাহারও মোটরগাড়ি ছিল না। সেকালের সামাজিক democracy যেন একালে দেখি না। আমার পিতাকে পল্লীর মাতব্বরেরা বিশেষ ভক্তিশ্রদ্ধা করিতেন। সরস্বতী পূজার সময় অনেকে তাঁহাদের ছেলে মেয়েদের আমাদের পূজায় অঞ্জলি দিতে পাঠাইয়া দিতেন। ঈর্ষা, অহঙ্কার কাহারও মধ্যে দেখি নাই। কে বড় কে ছোট ইহা লইয়া কোন তর্ক শুনি নাই। পাড়ার কোন ছেলে যদি কোন অন্যায় করিত তাহা হইলে সে তিরস্কৃত হইত। একটি উদাহরণ দিতে পারি।

আমাদের পল্লীর বিজন দে নামে একটি ছেলে তাহার এক সহপাঠীর সঙ্গে আমাদের রাস্তায় বেশ হাসাহাসি করিতেছিল। কাছেই একটি রোয়াকে উপবিষ্ট বৃদ্ধ রামলালবাবু তাহাদের

ডাকিয়া বলিলেন রাস্তায় ওরকম হাসাহাসি করিবে না। ইহা এক প্রকারের অসভ্যতা। ছেলে দুইটি নতমস্তকে নীরবে স্থানত্যাগ করিল। একালের ছেলে হইলে বলিত 'এই রাস্তা আপনার রাস্তা নহে। আমি এখানে হাসিব কি কাঁদিব সেটা আমার ইচ্ছা।'

তবে একথা বলিতে পারি যে সেকালের প্রাচীনেরাও ছোটদের স্নেহ করিতেন। আমি বাল্যকালে এই প্রাচীনদের সঙ্গে বিশেষ মেলামেশা করিয়াছি। ইঁহাদের মধ্যে ছিলেন ২৩ নম্বর বাড়ির কেদারনাথ বিশ্বাস। তিনি আমাকে সেকালের কলিকাতার অনেক কথা বলিতেন। আমি তন্ময় হইয়া শুনিতাম। বিশেষ করিয়া সেকালের ঘোড়ার ট্রামের বর্ণনা আমাকে আকৃষ্ট করিত। ভদ্রলোক মাঝে মাঝে ইংরাজি কবিতার লাইন শুনাইতেন। একদিন বলিলেন ইংরাজ এখন 'Deep in ruin as in guilt'। তখন Simon Commission Report লইয়া দেশে একটা ইংরাজ-বিদ্বেষের সৃষ্টি হইয়াছে। কেদারবাবুর মুখে এই ইংরাজি কথাটি শুনিয়া আমার মনে হইল তিনি যেন আমাদের ইংরাজ সরকার সম্বন্ধে শেষ কথাটি বলিলেন। আমি কেদারবাবুকে জিজ্ঞাসা করিলাম এই লাইনটি কোন কবিতায় তিনি পাইয়াছেন। তিনি বলিলেন Lord Tennyson-এর 'Godiva' কবিতার লাইনটি দেখিতে পাই তখন Tennyson-এর কোন কবিতার বই আমাদের বাড়িতে ছিল না। আমি তখন Upper Primary School-এর শেষ ক্লাশে পড়ি। ইস্কুলে কোন শিক্ষককে Tennyson-এর কবিতার এই লাইনটি আমাকে দেখাইতে বলিবার সাহস হইল না। ইহার ছয় বছর পর কলেজে প্রবেশ করিয়া Godiva কবিতাটি পড়িলাম, তখন অবশ্য কেদারবাবু আর ইহলোকে নাই। কেদারবাবুর কাছে অনেক কিছু শিখিয়াছি। তাঁহার মধ্যে বোধহয় বিশেষ উল্লেখযোগ্য সর্ববিষয়ে একটা seriousness। উনি যে কথা বলিতেন তাহার মধ্যেও একটা বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করিয়াছি। প্রতিটি শব্দ এবং প্রতিটি বাক্য তিনি বড় সুন্দরভাবে উচ্চারণ করিতেন। কলিকাতার চলিত ভাষা আমি তাঁহার কাছেই শিখিয়াছিলাম। কেদারবাবু সম্বন্ধে আর দুইটি কথা বলিব। প্রথম কথাটি এই যে কেদারবাবু যখন অফিস হইতে বাড়ি ফিরিতেন তখন তিনি গৃহে প্রবেশ করিবার সময় করজোড়ে সেই গৃহটিকে নমস্কার করিতেন এবং খুব ধীরে ধীরে গৃহের অভ্যন্তরে যাইতেন। ইহা আমি অনেকদিন সন্ধ্যার সময় দেখিয়াছি। মনে হইত তিনি তাঁহার গৃহকে যেন মন্দির বলিয়া গণ্য করিতেন। তিনি এই পরিবারের প্রধান ছিলেন, তাঁহার পুত্রগণকে আমি দাদা বলিয়া সম্বোধন করিতাম। প্রত্যেকেই বড় শান্তশিষ্ট মানুষ ছিলেন। কাহাকেও কোনদিন কাহারও সঙ্গে কলহে প্রবৃত্ত হইতে দেখি নাই। সকলকেই বাড়ির যত্ন করিতে দেখিয়াছি। কেহ রোয়াক ধোয়াইতেছেন, কেহ সাইকেল পরিষ্কার করিতেছেন, আবার কেহ রোয়াকে উপবিষ্ট প্রতিবেশীদের চা দিয়া আপ্যায়ন করিতেছেন।

এখন কেদারবাবু সম্বন্ধে দ্বিতীয় কথাটি বলি—কেদারবাবুর কনিষ্ঠ পুত্র প্রবোধ তাহার মামা বাড়িতে একটি পুকুরে স্নান করিতে যাইয়া জলে ডুবিয়া যায়। ট্যাংরা হইতে এই ছেলেটির মৃতদেহ যখন কেদারবাবুর বাড়িতে আনিত হয় তখন আমরা সকলেই বাড়ির সামনে উপস্থিত হইয়াছি। লক্ষ্য করিলাম কেদারবাবু স্থির হইয়া নীরবে রোয়াকে বসিয়া আছেন। তাঁহার চক্ষু সজল হইয়াছে কিনা দেখিবার সুযোগ পাই নাই। আমি এই দৃশ্য দেখিয়া অভিভূত হইয়াছিলাম।

এই আত্মসংযম যে কোন কালেই বিরল। আমরা বহুকাল উত্তর কলিকাতার এই পল্লী ছাড়িয়া দক্ষিণ কলিকাতায় বাস করিতেছি। ১৯৭০ সালে আমার কন্যার বিবাহে কেদারবাবুর পুত্রদের নিমন্ত্রণ করিতে বদ্রীদাস টেম্পল স্ট্রিটে গিয়াছিলাম। তখন কেদারবাবুর মাত্র একটি পুত্র জীবিত। তিনি নিমন্ত্রণ রক্ষা করিয়াছিলেন। এই পল্লীর আরও কয়েকজনের সঙ্গে আমার নিবিড় সম্পর্ক গড়িয়া উঠিয়াছিল, তাঁহাদের প্রসঙ্গ আর করিলাম না।

আমার পাঠশালা

পূর্বেই বলিয়াছি আমি দশ বছর বয়সে প্রথম স্কুলে ভর্তি হই। যে স্কুলে ভর্তি হইলাম তাহা আমাদের পাড়ার মধ্যে, বাসস্থান হইতে মাত্র পাঁচ মিনিটের পথ। আমি এবং আমার মেজো ভাই এই স্কুলের পঞ্চম ক্লাশে, অর্থাৎ উর্দ্ধতম ক্লাশে ভর্তি হই। ইস্কুলের নাম Calcutta Municipal Corporation Upper Primary School। আমরা দুই ভাই বেশ ভয়ে ভয়ে ইস্কুল প্রাঙ্গণে প্রবেশ করিলাম। ইস্কুলের এক কর্মচারী আমাদের বলিলেন আমাদের ক্লাশঘর দুতলায় এবং সেখানে এখন ইস্কুলের হেডমাস্টার মহাশয় ক্লাশ লইতেছেন। আমরা দুই ভাই প্রায় কাঁপিতে কাঁপিতে ঐ ক্লাশ ঘরের সামনে উপস্থিত হইলাম। হেডমাস্টার মহাশয় আমাদের দেখিয়া সব বুঝিলেন এবং আমাদের ঐ ঘরে প্রবেশ করিয়া বসিতে বলিলেন। দেখিলাম ক্লাশে মাত্র দুটি ছাত্র এবং একটি ছাত্রী বসিয়া আছে। পরে জানিলাম উহার মধ্যে একটি ছাত্রের নাম শৈলেন দে, আমাদের পল্লীর এক Sign painter-এর পুত্র। অন্য ছাত্রটির নাম কার্তিক দাস, এক চর্মকার পরিবারের ছেলে। ছাত্রীটির নাম অঞ্জলি সেন, হেডমাস্টার মশায়ের কনিষ্ঠা ভগিনী।

হেডমাস্টার মশায় ইংরাজি পড়াইতেছিলেন। আমার হাতে বই ছিল না বলিয়া তাঁহার সব কথা ভাল বুঝিতে পারি নাই। তবে তাঁহার কথাগুলি যে বড় সুন্দর তাহা বুঝিয়াছি। দেখিতেও তিনি বড় সুন্দর ছিলেন, উজ্জ্বল গৌরবর্ণ, চোখ দুটিও আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করিল। তবে তাঁহাকে একজন কড়া শিক্ষক বলিয়াই মনে হইল। ক্রমে বুঝিলাম তিনি কড়া হইলেও হৃদয়হীন নন। বাড়িতে আমাদের জ্যাঠামশায় আমাদের ইংরাজি পড়াইতেন। কয়েকদিন ক্লাশ করিয়া বুঝিলাম ইংরাজিতে আমরা বড় পিছাইয়া নাই। তবে ইংরাজি ব্যাকরণ সম্বন্ধে হেডমাস্টার মশায় আমাদের যেন অনেক নূতন কথা শিখাইলেন।

ক্লাশে একটি ছাত্রী আছে জানিয়া আমাদের দিদি ঊষারাণী (জ্যাঠামশায়ের কন্যা) ওই ইস্কুলে ভর্তি হইলেন। ক্রমে ক্লাশে চারজন ছাত্র এবং দুইজন ছাত্রীর মধ্যে এক নিবিড় সম্পর্ক স্থাপিত হইল। হেডমাস্টার মশায় ইংরাজি পড়াইতেন। তখন অবশ্য ইংরাজি অন্য কোন বিষয় পড়াইবার সার্থক রীতি সম্বন্ধে কোন ধারণা ছিল না। এখন হেডমাস্টার মশায়ের ইংরাজি ক্লাশে পড়াইবার পদ্ধতি মনে করিয়া বলিতে পারি যে তাঁহার প্রধান উদ্দেশ্য ছিল ইংরাজি ভাষার ব্যাকরণ আমাদের বুঝাইয়া দেওয়া। কিন্তু তিনি কখনও ব্যাকরণের কোন শব্দ যথা—verb, noun, adjective, adverb প্রভৃতির অর্থ আমাদের বুঝাইবার চেষ্টা করেন নাই। আমাদের পাঠ্যপুস্তকের বাক্যগুলি বিশ্লেষণ করিয়া আমাদের বুঝাইতেন ক্রিয়াপদের বিভিন্ন

প্রয়োগ বিশেষণ বা ক্রিয়াবিশেষণে কখন কিভাবে ব্যবহৃত হয়। কখন has done হয়, কখন had done হয়, কখন has had done হয়। I am reading, I will be reading, I had been reading, I was reading, I would have read, I might have read প্রভৃতি পদের অর্থ তিনি বুঝাইয়া দিতেন। এখন বুঝিতে পারি যে ইংরাজি ভাষার নিয়ম-কানুন হেডমাস্টার মশায় আমাদের বড় সুন্দর বুঝাইয়াছেন। হাইস্কুলে এবিষয়ে আমাদের নূতন করিয়া কিছু শিখিতে হয় নাই। নূতন নূতন শব্দ শিখিয়াছি, কিন্তু শব্দগুলির ব্যবহারে যে ব্যাকরণের স্থান প্রয়োজন সে ব্যাকরণ হেডমাস্টার মশায় আমাদের শিখাইয়া দিয়াছিলেন। ক্লাশে তিনি আমাদের বলিতেন should have gone ব্যবহার করিয়া একটি পূর্ণ বাক্য উচ্চারণ কর। হেডমাস্টার মশায় ব্যাকরণের নিয়মগুলি এমন সুষ্ঠুভাবে বুঝাইতেন যে আমরা যেন কখনই তাঁহার পড়ানোকে নীরস বলিতে পারিতাম না। ইহার কারণ বোধহয় এই যে আমরা ভাবিতাম একটি বিদেশী ভাষার স্বরূপ আমরা আবিষ্কার করিলাম। এক বছরের মধ্যে হেডমাস্টার মশায় আমাদের ইংরাজি শিখাইয়া দিলেন।

আমাদের একখানি পাত্‌লা ইংরাজি বই পাঠ্য ছিল। কোন ব্যাকরণের বই কিনিতে হয় নাই। যখন আমাদের পাঠ্যপুস্তকগুলি লইয়া ইস্কুলে আসিতাম তখন কোন বোঝা বহন করিতে হয় নাই। দুই-তিনখানি বইয়ের ভার অর্ধসেরও হইবে না। এখন দেখি ছাত্র-ছাত্রীরা পিঠে এক ভারী বোঝা লইয়া ইস্কুলে যাইতেছে। পিঠের ঐ বিদ্যা কিভাবে মস্তিষ্কে প্রবেশ করে তাহা বলিতে পারি না। ছাত্র-ছাত্রীদের সঙ্গে কথা বলিয়া অনেক সময় মনে হইয়াছে যে এখন পড়িতে হয় অনেক শিখিতে হয় কম। আমাদের হেডমাস্টার মশায় কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের Ancient Indian History and Culture-এর M.A. ছিলেন। ইহা অনেক পরে জানিয়াছি।

এখন আমাদের অঙ্কের মাস্টারমশায়ের কথা বলি। তিনি আবার আমাদের drill-এরও শিক্ষক ছিলেন। প্রত্যেক দিন ক্লাশে প্রবেশ করিয়া তিনি আমাদের হাত পরীক্ষা করিয়া দেখিতেন যে আমরা নখ কাটিয়াছি কিনা। তাহার পর জিজ্ঞাসা করিতেন গতকাল কাহারও কোন উপকার করিয়াছি কিনা। তাহার পর জিজ্ঞাসা করিতেন মিথ্যা কথা বলিয়াছি কিনা। আমাকে একদিন জিজ্ঞাসা করিলেন কাল কটা মিথ্যা কথা বলিয়াছিস্। কি উত্তর করিব না বুঝিয়া বলিলাম স্যার, গুণি নাই। মাস্টারমশায় বলিলেন তাহা হইলে বুঝিলাম তুই অনেক মিথ্যাকথা বলিস। আমার মনে হইল আমার মুখ দেখিয়া তিনি ভাবিয়াছেন ঐ মুখ হইতে মিথ্যা ছাড়া সত্য বাহির হয় না। আমি ক্লাশে এত আড়ষ্ট থাকিতাম যে মাস্টারমশায়কে বুঝাইয়া বলিতে পারিলাম না যে আমাদের জীবনে মিথ্যাকথা বলিবার সুযোগ বড় হয় না। অঙ্কের মাস্টারমশায় আমাদের drill শিখাইতেন। Drill আমার ভাল হইত না। তবে আমি জানিতাম যে about turn আদেশ হইলে ঘুরিয়া যেইদিকে মুখ ছিল সেই দিকেই তাকাইতে হইবে। আমি তাহাই করিলাম। কিন্তু মাস্টারমশায় আমাকে ধমকাইলেন, বলিলেন, আমি দুইবার ঘুরিয়াছি। তবে অঙ্কের মাস্টারমশায় আমাদের সকলকেই খুব স্নেহ করিতেন।

১৯২৬ সালে আমাদের দেশে স্বাদেশিকতার ভাব খুব প্রবল ছিল। আমাদের অনেক

শিক্ষক খদ্দর পরিতেন। তাঁহারা স্বাদেশিকতা সম্বন্ধে আমাদের বিশেষ কিছু বলিতেন না। তবে আমাদের আচরণের ভব্যতা সম্বন্ধে তাঁহাদের দৃষ্টি ছিল। একটা আদর্শবাদের পরিবেশ আমরা লক্ষ্য করিতাম। পঞ্চম শ্রেণীর ছাত্র হইলেও আমাদের চতুর্থ শ্রেণীর ক্লাশের ছেলেমেয়েদের সঙ্গে পরিচয় ছিল। ঐ ক্লাশের রাধারমণ নামে একটি ছেলে হেডমাস্টার মশায়ের কাছে এক ঘন্টার জন্য বাড়ি যাইবার অনুমতি চাহিল। ইহার কারণ জিজ্ঞাসা করিতে সে হেডমাস্টার মশায়কে বলিল—'আজ আমার জন্মদিন'। হেডমাস্টার মশায় জানিতেন রাধারমণের পরিবার Scheduled caste-এর পরিবার এবং সে ইস্কুলের খুব নিকটেই একটি খোলার ঘরে বাস করে। হেডমাস্টার মশায় রাধারমণকে বলিলেন তুই বাড়ি যা, রবি তোর সঙ্গে যাইবে। আমাকে বলিলেন রাধারমণের সঙ্গে তুইও যা এবং রাধারমণের মাকে পায়ে হাত দিয়া প্রণাম করবি। আমি রাধারমণের মাকে প্রণাম করিলাম এবং পায়েস খাইলাম। ইহাতে রাধারমণ যে কত খুশী হইয়াছে তাহাও বুঝিতে পারিলাম। আমাদের হেডমাস্টার মশায় জাতীয়তাবাদী ছিলেন এবং ইহা তাঁহার আচার আচরণে আমরা বুঝিতে পারিতাম। তিনি কখনও গান্ধী বা নেহেরুর কথা আমাদের বলিতেন না, বক্তৃতা করিতেন না। কিন্তু তাঁহার সুগভীর জাতীয়তাবাদের একটি প্রমাণ একদিন পাইলাম। ইস্কুলে সরস্বতী পূজায় আমরা সকলে ইস্কুল-প্রাঙ্গণে একত্রিত হইয়াছি। সারা ইস্কুলে মাত্র একটি মুসলমান ছাত্র ছিল। চতুর্থ ক্লাশে পড়িত। তাহার নাম ছিল ইয়াকুব। মুসলমান বলিয়া সে হিন্দু পূজায় যোগ দেয় নাই। কিন্তু কাছেই ঘোরাফেরা করিতেছিল। হেডমাস্টার মশায় তাহার হাত ধরিয়া আমাদের মধ্যে লইয়া আসিলেন এবং তাহাকে বলিলেন তুই মুসলমান, হিন্দুদেবী সরস্বতী মূর্তির দিকে তাকাইতে আমি তোকে বারণ করি। কিন্তু ইস্কুলের ছেলেরা একত্র হইয়া যখন খিচুড়ী খাইবে তখন তুই তাহাদের সঙ্গে বসিয়া খিচুড়ী খাইবি। এই খিচুড়ী পূজার প্রসাদ নহে। হাসিমুখে ইয়াকুব আমাদের সঙ্গে বসিয়া খিচুড়ী খাইল। সেই হাসিমুখ আমার হৃদয়ে অঙ্কিত হইয়া আছে।

এখন এই ইস্কুল সম্বন্ধে আমি সাধারণভাবে কয়েকটি কথা বলিতে চাহিতেছি। আমরা লক্ষ্য করিতাম যে ইস্কুলের সকল শিক্ষক এবং তিনজন দিদিমণি হেডমাস্টার মশায়কে বিশেষ শ্রদ্ধা করিতেন। সকলে মিলিয়া ইস্কুলের মর্যাদা রক্ষা করিতেন। ইস্কুলের সুনাম সম্বন্ধে সকলেই সমভাবে সজাগ। ইহারও একটি সুন্দর দৃষ্টান্ত দিতে পারি। হেডমাস্টার মশায় একটি বার্ষিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করিলেন। বাংলার শিক্ষক নিবারণবাবুকে এই অনুষ্ঠানের দায়িত্ব দিলেন। নিবারণবাবু যে কি নিষ্ঠা ও উৎসাহের সহিত এই অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা করিলেন তাহা দেখিয়াছি। তিনি আমাদের কয়েকজন ছাত্র-ছাত্রীকে এই অনুষ্ঠানে আবৃত্তি এবং গানের জন্য নির্বাচিত করিলেন। প্রত্যহ ইস্কুলের পর সন্ধ্যা পর্যন্ত rehearsal হইত। নিবারণবাবুই ছিলেন আমাদের শিক্ষক কিন্তু অন্যান্য শিক্ষকেরাও এই rehearsal-এর সময় উপস্থিত থাকিতেন। নিবারণবাবুর উৎসাহ তাঁহাদের মধ্যেও সঞ্চারিত হইত। আজ যখন এই পরিবেশের কথা মনে করি, তখন ভাবি যে সেকালে leadership লইয়া শিক্ষকদের মধ্যে কোন প্রতিযোগিতা ছিল না। এই অনুষ্ঠানের ব্যাপারে সকলেই নিবারণবাবুর প্রাধান্য মানিয়া লইতেন। নিবারণবাবু এই

rehearsal সম্বন্ধে কিরকম কড়া ছিলেন, তাহার একটি দৃষ্টান্ত দিতে পারি। আবৃত্তির জন্য নির্বাচিত একটি কবিতায় ছিল 'আমি কহিলাম আরে রাম রাম নিবারণ যাইবে সাথে'। যে ছাত্রটি এই কবিতার আবৃত্তি করিবে সে নিবারণবাবুর সামনে এই লাইনটি কিছুতেই উচ্চারণ করিবে না। শ্রদ্ধেয় মাস্টারমশায়ের নাম সে এইভাবে মুখে আনিবে না। নিবারণবাবু যতই বলেন 'বল, নিবারণ যাবে সাথে' সে ততই আড়ষ্ট হইয়া চুপ করিয়া থাকে। নিবারণবাবু তখন তাহার কান মলিয়া জোরে বলিলেন 'বল, নিবারণ যাবে সাথে'। ছেলেটি মৃদুস্বরে নিবারণ শব্দটি উচ্চারণ করিল। এই অনুষ্ঠানে যে গানগুলি গীত হইয়াছিল এবং যে কবিতাগুলি আবৃত্তি করা হইয়াছিল তাহা আজও যেন আমার কানে বাজিতেছে। এখন মনে করি নিবারণবাবু আমাদের সামনে রবীন্দ্র প্রতিভার শ্রেষ্ঠ ফসল উপস্থিত করিয়াছিলেন। এই অনুষ্ঠান আমরা উপভোগ করিয়াছিলাম এবং আজ মনে হইতেছে যে আমরা সুশিক্ষা লাভ করিয়াছিলাম। আমি যে গান করিতে পারিব না তাহা নিবারণবাবু বুঝিয়াছিলেন। তিনি আমাকে একটি মজার কবিতা—নামটি আমার গদাধর সবাই ডাকে গদা—আবৃত্তি করিতে শিখাইলেন। এই আবৃত্তির জন্য আমি একটি রৌপ্যপদক লাভ করিয়াছিলাম। তবে এই পদকে ইস্কুলের নাম ছিল না। আমার অভিভাবকেরা অনুমান করিলেন যে কোন দর্শক একটি পদক সঙ্গে লইয়া আসিয়াছিলেন এবং তাঁহার বিচার অনুসারেই এই পদকটি আমি পাইয়াছিলাম। ইস্কুলের বিচারকমণ্ডলী তাঁহার ইচ্ছা পূর্ণ করিয়াছিলেন। সেকালে নিয়মকানুন লইয়া কেহ তর্ক করিত না।

এই অনুষ্ঠানটির কথা আমি আজও ভুলি নাই। এখন ভাবি এই অনুষ্ঠানের সরসতা ইস্কুলের শিক্ষক, শিক্ষিকা, ছাত্র-ছাত্রী সকলে মিলিয়া সম্ভব করিয়াছে। কখনও মনে হয় নাই যে ইস্কুলের কোন একটি বিশেষ দল এই অনুষ্ঠানের আয়োজক। একালের ছবি অন্যরূপ। দিল্লি বিশ্ববিদ্যালয়ের একটি কলেজে বাঙ্গালী ছাত্র-ছাত্রী আয়োজিত একটি অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলাম। দেখিলাম একদল ছাত্র হঠাৎ এক ভীষণ গণ্ডগোল বাধাইয়া অনুষ্ঠানটি পণ্ড করিয়া দিল। নিবারণবাবুর মত একজন শিক্ষকও যেন একালে দেখি না। কত মাহিনা পাইতেন জানি না। তবে শুনিয়াছিলাম প্রধান শিক্ষকের মাহিনা একশত টাকা। নিবারণবাবু বোধহয় ৭০ কি ৮০ টাকা প্রতি মাসে পাইতেন। কিন্তু তাঁহাকে কোনদিন একজন দরিদ্র শিক্ষক বলিয়া মনে হয় নাই। ইস্কুলে কোন শিক্ষক-শিক্ষিকা Private tutionই করিতেন না। নিবারণবাবু একমাস সন্ধ্যা পর্যন্ত এই অনুষ্ঠানের জন্য পরিশ্রম করিতেন। এই নিষ্ঠা এবং আগ্রহ এখন বিরল হইয়া উঠিতেছে।

এখন এই ইস্কুলের পরীক্ষার কথা বলি। অর্ধবার্ষিক পরীক্ষার প্রথা ছিল না। তবে প্রত্যেক শিক্ষকই ক্লাশে আমাদের পড়া লইতেন এবং হাতের লেখা দেখিতেন। পঞ্চম শ্রেণীর শেষে অবশ্যই একটি পরীক্ষা হইল। এই পরীক্ষার পর আমরা Upper primary certificate পাইলাম। আমরা ছয়জন ছাত্র-ছাত্রীই পাশ করিয়াছিলাম। সেকালে ভাল ছাত্রদের কেহ মাথায় করিয়া রাখিত না এবং অপেক্ষাকৃত মন্দ ছাত্রদেরও কেহ তুচ্ছ করিত না। এখন মনে হয় সেকালের মধ্যবিত্ত বাঙ্গালী সমাজে এক ধরণের democracy ছিল। ইহার একটি উদাহরণ

এই যে আমাদের বার্ষিক অনুষ্ঠানের পর সকল ছাত্র-ছাত্রীই পুরস্কার পাইয়াছে। সমাজে যেন কোন প্রতিদ্বন্দ্বিতা ছিল না। ইস্কুলে তিন-চারজন দারোয়ান ছিল। কেহ ঘণ্টা বাজাইত, কেহ ঘর ঝাড় দিত—এইরকম। কিন্তু এই চারজন ইস্কুলের শিক্ষক-শিক্ষিকা, ছাত্র-ছাত্রীদের সঙ্গে যেন একত্র হইয়া থাকিত। একালে যে কয়েকটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে আমার পরিচয় আছে সেখানে দেখি teachers' union, একটি ছাত্র ইউনিয়ন এবং একটি কর্মচারী ইউনিয়ন। কোন কোন প্রতিষ্ঠানে ছাত্রদের মধ্যে একাধিক ইউনিয়ন, অন্যদের মধ্যেও একাধিক ইউনিয়ন। বোধহয় কোন সমাজই এইভাবে বিভক্ত না হইলে সমাজের উন্নতি হয় না।

আমাদের কোন কোন শিক্ষক আমাদের মধ্যে একটা সমাজবোধ সৃষ্টি করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন। এই ব্যাপারে প্রধান ছিলেন আমাদের হৃষীকেশবাবু। তিনি আমাদের পল্লীতে মুষ্টিভিক্ষার আয়োজন করিলেন। প্রত্যেক গৃহে, প্রত্যেক দিন এক মুষ্টি চাল একটি পাত্রে রাখিতে হইবে। প্রতি মাসে প্রত্যেক গৃহ হইতে এই চাল সংগ্রহ করিয়া দরিদ্রদের মধ্যে বিতরণ করা হইত। ইহাতে অবশ্য আমাদের পল্লীতে দারিদ্র্য দূর হয় নাই। কিন্তু আমরা বোধহয় বুঝিয়াছিলাম যে সমাজের প্রতি আমাদের দায়িত্ব আছে। তবে একথাও বলিতে পারি যে আমাদের কালে আমাদের পল্লীতে দরিদ্র পরিবার বড় বেশী ছিল না। সমাজের আর্থিক অবস্থার কোন statistics অবশ্য দিতে পারিব না। কিন্তু মনে হইত পল্লীর কেহই অনশনে বা অর্ধাশনে জীবন কাটাইতেছে না। দারিদ্র্যের কোন দৃশ্য তখন বড় দেখি নাই, এখন কিন্তু দেখি।

আমাদের ইস্কুলের কোন খ্যাতি ছিল না। তবে ইহার মাহাত্ম্য প্রতিদিন লক্ষ্য করিয়াছি। একালে দেখি কোন ছেলে Don Bosco ইস্কুলে পড়ে আবার কোন ছেলে তাহার পল্লীর কোন একটি ক্ষুদ্র ইস্কুলের ছাত্র। এই অবস্থায় একটা Class বোধের সৃষ্টি হইবেই। এই Class বোধ আমাদের ছিল না। ইহাতে লাভ হইয়াছে এই যে এই নতুন যুগেও আমার কোন Class বোধ নাই। এই বোধের অভাবেই বোধহয় আমি একালের Politics-এর অনেক তত্ত্ব ঠিক বুঝিতে পারি না।

পাঠশালার বছর অর্থাৎ ১৯২৬ সালে এমন কোন ঘটনা ঘটে নাই যাহা এখানে উল্লেখ করিতে পারি। শুধু এই কথাটি বলিবার ইচ্ছা হয় যে তখন পারিবারিক জীবনে এবং পল্লীজীবনে এমন একটা শান্তি ও শৃঙ্খলা ছিল যাহা একালে বড় দেখি না। পিতামহীর আদেশ অনুসারে আমরা সন্ধ্যার পর বাড়ির বাহির হইতাম না। বিকালে আমরা পরেশনাথ মন্দিরে খেলিতাম। এই মন্দির ছিল একটি বিরাট উদ্যান। এই উদ্যানের এক পাশে একটি মাঠ ছিল। আমরা সেই মাঠে হাডুডু খেলিতাম। সন্ধ্যা হইলেই মন্দিরে আরতির বাজনা শুরু হইত। আমরা ঘরে ফিরিতাম। একালে সকল বয়সের ছাত্র-ছাত্রীরা চেয়ারে বসিয়া, টেবিলে বইখাতা রাখিয়া লেখাপড়া করে। আমরা মাদুরে বসিয়া লেখাপড়া করিতাম। কখনও কখনও আমাদের হারিকেনটি কোন গুরুজন কিছুক্ষণের জন্য লইয়া যাইতেন। ইহাতে আমরা বিরক্ত হইতাম না। কারণ ঐ সময় পড়া বন্ধ থাকিত। আমাদের লেখাপড়ার একটা আওয়াজ ছিল। সেই আওয়াজে যেন সমগ্র গৃহটি মুখরিত হইত। একালে কোন বাড়িতেই বড় লেখাপড়ার আওয়াজ শুনি না। একালের ছেলেমেয়েরা নীরবে বিদ্যালাভ করে। আমরা অনেক সময় বেশ জোরে

জোরে পড়িতাম। ইহার কারণ বোধহয় এই যে আমাদের ইংরাজি, বাংলা কবিতা মুখস্থ করিতে হইত। এই মুখস্থ করা সেকালের শিক্ষার একটি বিশেষ অঙ্গ ছিল। আমাদের শিক্ষকেরা এবং অভিভাবকেরা ভাবিতেন যে যে কবিতা আমরা মুখস্থ বলিতে পারি না সেই কবিতা আমরা শিখি নাই। একালে মুখস্থবিদ্যার যেন কোন মূল্য নাই। গদ্য আমরা মুখস্থ করিতাম না, কিন্তু উচ্চস্বরে বারে বারে পড়িতাম। আবৃত্তি সর্বশাস্ত্রানাং বোধাদপি গরীয়সী। ইহাই ছিল সেকালের শিক্ষার মন্ত্র। ইহাকে সার্থক শিক্ষা বলিতে পারি না। চিন্তার অভ্যাস, মানোন্নয়নের অভ্যাস, বাল্যকালেই বোধহয় আরম্ভ করা শ্রেয়। যে কবিতার অর্থ অতি সরল সে কবিতারও ব্যাখ্যার প্রয়োজন। 'হের ঐ ধনীর দুয়ারে দাঁড়াইয়া কাঙ্গালিনী মেয়ে' এই কথাটির অর্থ আমরা অবশ্যই বুঝিতাম, কিন্তু সেই অর্থ নিজের ভাষায় বুঝাইয়া বলার প্রয়োজন থাকিয়াই যায়। ছাত্রটি যখন ইহার অর্থ বুঝাইয়া বলিবে, তখন সে এই লাইনটির যে অনুভূতির প্রকাশ তাহা নিজ ভাষায় বুঝাইয়া দিবে। অর্থাৎ স্মরণশক্তির সঙ্গে ছাত্রটি তাহার অনুভবশক্তি এবং প্রকাশশক্তির পরিচয় দিবে। আমার এখন মনে হয় যে বাল্যকালে স্মরণশক্তির যে চর্চা হইয়াছে, মননশক্তির সে চর্চা হয় নাই। ইহার ফল হইয়াছে এই যে আমরা যত জানি তত চিন্তাশীল নহি। এই কথাটি বলিতেছি এইজন্য যে একালে আমি আমাদের দেশে একটা চিন্তার দারিদ্র্য লক্ষ্য করি। আমরা অনেক কথা বলি, কোন নূতন কথা বলি না। পরীক্ষায় প্রথম হই, কিন্তু অনুভূতির জগতে, ভাবের জগতে পিছাইয়া থাকি। আমাদের সমাজজীবনে কোন সরসতা নাই, কোন ঔজ্জ্বল্য নাই; তাহার কারণ বোধহয় এই যে আমরা কোন নূতন চিন্তা বা নূতন ভাব সৃষ্টি করিতে পারি না।

তবে বাল্যকালে মানুষের এমন অনেক গুণ দেখিয়াছি যাহা এখন বিরল। এবং এই বিরলতা আমাদের সমাজকে দুর্বল করিয়াছে। প্রথমে বলি আমাদের নম্রতার কথা এবং এই নম্রতাকেই ভব্যতা বলিতে হয়। আমরা শান্ত ছিলাম, শিষ্ট ছিলাম, শ্রদ্ধাশীল ছিলাম। যদি বল এই শ্রদ্ধাশীলতা সবসময় মঙ্গলকর নাও হইতে পারে, যাহা অশ্রদ্ধেয় তাহাকে শ্রদ্ধা করিয়া আমরা সমাজকে বিপন্ন করিতে পারি, তাহা হইলে বলিব যে এই শ্রদ্ধার ভাব চিত্তের একটি সৎ ভাব। ইহা সর্বৈব মঙ্গলকর। একালে আমরা অন্যের নিন্দায় সোচ্চার হই, আমাদের মধ্যে নিন্দনীয় কিছু আছে কিনা তাহা ভাবিয়া দেখি না। অশ্রদ্ধার সুর কলহের সুর কলহের পথকে অগ্রসরের পথ বলিতে পারি না।

বাল্যকালে আমাদের আরেকটি গুণ ছিল এই যে আমাদের মধ্যে প্রতিদ্বন্দ্বিতার ভাব বড় ছিল না। বড়লোকের ছেলের ভাল জামাকাপড় দেখিয়া আমরা ঈর্ষান্বিত হইতাম না। আবার বড়লোকের ছেলেটিও ভাল জামাকাপড়ের গর্ব করিত না। মেধাবী ছাত্র মেধাহীন ছাত্রদের তুচ্ছ করিত না, মেধার গর্ব করিত না। সেকালের এই ছবির মধ্যে কোন মিথ্যা নাই বলিয়াই মনে করি। আমাদের পল্লীতে কিছু পরিবার ধনী পরিবার ছিল। কিন্তু ধনী পরিবারের ছেলেমেয়েরা বিত্তহীন পরিবারের ছেলেমেয়েদের সঙ্গে সহজভাবে মিশিত। ইহা প্রত্যক্ষ করিয়াছি বলিয়াই কথাটি বলিলাম। সেকালে আমরা চিৎকার করিয়া কোন কথা বলিতাম না। চিৎকার করাকে অভব্যতা বলিয়া জানিতাম। একালে যেন চিৎকার একটু বেশী

শুনি।

আমাদের আরেকটি গুণের কথা বলি। বাল্যকালে ইহাকে গুণ বলিয়া জানিতাম না। আমরা কখনও কোন কারণে কাহাকেও আঘাত করিতাম না। এই বিষয়ে একটি উদাহরণ দিতে পারি। আমাদের বাড়ির সামনে একটি চোর ধরা পড়িল। এই চোরটিকে যিনি ধরিয়াছেন, উনি তাহাকে প্রহার করিতে লাগিলেন। আমরা যাহারা চারপাশে ছিলাম তাহারা কেহই তাহাকে আঘাত করি নাই। কিছুক্ষণের মধ্যেই আমার বাবা আমাকে ডাকিলেন এবং ডাকিয়া বলিলেন 'চোর ধরিতে পার তাহাকে মারিতে পার না।' এখন দেখি একটি চোর ধরা পড়িলে তাহাকে বড়ই নির্যাতন করা হয়।

একালে চারিদিকে বড় হৃদয়হীনতার পরিচয় পাই। কোন গাড়িতে কেহ চাপা পড়িলে সেই গাড়ির চালককে প্রচণ্ড প্রহার করা হয়। গণতন্ত্রের যুগে গণপ্রহার বলিয়া একটি বস্তুর সৃষ্টি হইয়াছে। কখনও কখনও শুধু গাড়ির চালককে প্রহার করা হয় না, গাড়িটিও জ্বালাইয়া দেওয়া হয় এবং পরে পথ অবরোধ করা হয়। আমাদের সময়েও লোকে গাড়ি চাপা পড়িত। যিনি চাপা পড়িয়াছেন তিনি ছাড়া আর কাহারও দৈহিক কষ্ট হইত না। আমার প্রশ্ন হইল এই যে আমরা এইভাবে একটি সভ্য সমাজ গড়িয়া তুলিতে পারিব কিনা। আমি বলি আমরা সেকালে একটি সভ্য সমাজে ছিলাম। ছাত্রজীবনে এই শহরে কোন গণপ্রহারের কথা শুনি নাই। সমাজবিরোধী বলিয়া কোন দলের কথাও শুনি নাই। আমার প্রশ্ন হইল এই যে একালে সমাজ কোথায় যে সমাজবিরোধীদের আবির্ভাব হইবে। সেকালে যে একটি সমাজ ছিল সে বিষয়ে আমার কোন সন্দেহ নাই। সমাজতত্ত্ব সম্বন্ধে আমার কোন জ্ঞান নাই। তবে ইহা বুঝি যে বেকারের সংখ্যা বাড়িয়াছে বলিয়াই দেশে এমন অরাজকতার সৃষ্টি হইয়াছে। আমাদের সময়ে যে বেকারত্ব একেবারে ছিল না এমন কথা বলিতে পারি না। প্রত্যেক পরিবারেই দেখিয়াছি কিছু লোক কাজ করে আর কিছু লোক কাজ করে না। যাহারা বেকার তাহারা যৌথ পরিবারে পালিত হইতেন। তাহাদের মধ্যে আমি কখনও কোন গ্লানিবোধ লক্ষ্য করি নাই এবং পরিবারেও তাহারা তাহাদের মর্যাদা রক্ষা করিয়া চলিতেন। আমাদের পল্লীর যে বিশ্বাস বাড়ির কথা উল্লেখ করিয়াছি সেই বাড়ির প্রধান কেদার বিশ্বাসের পাঁচটি সন্তান ছিল। একটি সন্তানের অকালমৃত্যুর কথা বলিয়াছি। বাকি চারটির মধ্যে ভোলাদা এবং ভুলুদা চাকুরী করিতেন। নালুদা ও সুবেদা বেকার ছিলেন। কিন্তু তাঁহাদের বেকার বলিয়া মনে হইত না। হাসিমুখে পরিবারের নানা কার্য্য সম্পাদন করিতেন। আমি সুবেদার ভক্ত ছিলাম। তিনি ম্যাট্রিক পর্য্যন্ত পড়িয়াছিলেন। আমি যখন বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক নিযুক্ত হইলাম তখন সুবেদার সঙ্গে দেখা করিয়া তাঁহাকে প্রণাম করিলাম। তিনি আমাকে জড়াইয়া ধরিয়া আশীর্বাদ করিলেন। আমি একটি পরিবারের কথাই বলিলাম। আমাদের পল্লীর অনেক পরিবারেই কিছু লোক কাজ করিতেন, কিছু লোক কাজ করিতেন না। যাহারা কাজ করিতেন না তাহাদের আমরা বেকার বলিতাম না। আসল কথা এই সমাজে কাহার কত টাকা, কে বিত্তশালী, কে বিত্তহীন এইসব প্রশ্ন আমরা কখনও তুলিতাম না। এখন দেখি কার মাসিক বেতন কত, বেতন বৃদ্ধির হার কি, অবসরের সময় কত টাকা পাইবেন ইহা লইয়া অনেক কথা হয়।

একালে আমরা টাকার মূল্য বুঝি এবং কে কত আয় করে সেই খবর রাখি। ১৯৪৩ সালে আমার বিবাহ হয়। আমাকে যদি কেহ জিজ্ঞাসা করিতেন তোমার বেতন কত, তাহা হইলে বলিতে হইত মাসিক বেতন একশত টাকা। যদি কেহ জিজ্ঞাসা করিত আমার চাকুরী স্থায়ী চাকুরী কিনা তাহা হইলে বলিতে হইত যে আমার চাকুরী অস্থায়ী এবং সেই জন্য বৎসরান্তে আমার কোন বেতন বৃদ্ধি হইত না। ইহাতে আমার কোন লজ্জা ছিল না। এবং এইজন্য সমাজেও কখনও অশ্রদ্ধেয় হই নাই। আজকাল সমাজে ধনী লোক মর্যাদা লাভ করে এবং সেইজন্য আমরা অর্থশালী হইবার জন্য ব্যস্ত হই।

পোষাকের ব্যাপারেও সেকালে মানুষ যেন উদাসীন ছিলেন। সাধারণ মানুষের অতি সাধারণ পোষাক। হাটে-বাজারে অনেকের গায়ে জামা দেখিতাম না। রাস্তায় নগ্নপদে অনেককে হাঁটিতে দেখিয়াছি। ইহাকে Plain living and high thinking বলিতে পারি কিনা জানি না, তবে ইহার মধ্যে যে সেকালের মানুষের একটা সরলতা ছিল তাহা এখন বুঝিতে পারি। আমাদের বয়সের মানুষ, আমার এখন সাতাশী চলিতেছে, অতীতকে সাধারণতঃ এক সুন্দর পবিত্র যুগ বলিয়া উপস্থিত করিয়া থাকে। ইহার মধ্যে অবশ্যই অতিরঞ্জন আসিয়া পড়ে। কিন্তু তবু বলি সেকালে আমাদের যে চরিত্র ছিল একালে আমরা তাহা হারাইয়াছি। যদি বল, ইহাই ইতিহাসের নিয়ম তাহা হইলে অবশ্য নীরব থাকিব।

পাঠশালা জীবনের এই এক বছরের কাহিনী একজনের কথা বলিয়া শেষ করিতে চাহিতেছি। তিনি আমাদের সেকালের শ্রেষ্ঠ পুরুষ ছিলেন এমন কথা বলি না, তবে তিনি বড় মজার মানুষ ছিলেন। প্রাইমারী ইস্কুলে ইনি আমাদের বাংলা পড়াইতেন। তবে তিনি আমাদের পল্লীতেই বাস করিতেন বলিয়া তাঁহার সান্নিধ্য বিশেষভাবে লাভ করিয়াছি। তিনি ক্লাশে আমাদের বাংলা ভাষা শিখাইতেন। ক্লাশের বাহিরে তিনি আমাদের অনেক কিছু শিখাইতেন। একদিন বলিলেন মা এখন কোথায় জানিস? আমি জিজ্ঞাসা করিলাম কাহার মা? তিনি বলিলেন জগতের মা, এরং সেই মা এখন মার্কিন দেশে। তাহার পর আমাকে বুঝাইলেন যে মার্কিন দেশ, বিদ্যায়, বাণিজ্যে, বিজ্ঞানে এখন পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ দেশ। তখন স্বদেশী যুগ চলিতেছে। দেশহিতৈষিতার ভাবই তখন আমাদের একমাত্র ভাব। আমরা জানিতাম আমাদের দেশের মত কোন দেশ কোথাও খুঁজিয়া পাওয়া যাইবে না। কিন্তু চন্দ্রবাবু আমাদের বুঝাইলেন পৃথিবীর সেরা দেশ মার্কিন দেশ। আমরা তখন বিদেশ বলিতে ইংরাজের দেশই বুঝিতাম। সেই দেশ আমাদের শাসন করে। কিন্তু চন্দ্রবাবু ইংরাজের কথা বলিতেন না। তিনি মার্কিন দেশের সভ্যতার কথা বলিতেন। এই বিষয়ে তিনি অনেক কথা আমাদের শুনাইয়াছেন। সকল কথা আজ অবশ্য মনে নাই। যে কথাটি এখনও মনে আছে তাহা হইল এই যে মার্কিন দেশের মানুষ খুব পরিশ্রম করে এবং ইহা বলিয়া তিনি আমাদের সর্ব ব্যাপারে খুব পরিশ্রম করিতে বলিতেন। কথাটির অর্থ আমরা বুঝিতাম। কিন্তু তাহা বুঝিয়া যে পরিশ্রমশীল হইয়া উঠিতাম তাহা বলিতে পারি না। চন্দ্রবাবু সব কথাই একটু বক্তৃতার সুরে বলিতেন। একদিন বলিলেন তিনি সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাগ্মিতায় মুগ্ধ হইয়া তাঁহার মত বাগ্মী হইবার চেষ্টা করিতেন। একদিন বলিলেন তাঁহার সেই চেষ্টা সার্থক হইয়াছে, আমি

বাগ্মী হইয়াছি। চন্দ্রবাবু সুরেন্দ্রনাথের ন্যায় বক্তা ছিলেন এমন কথা বলিতে পারি না। আর সুরেন্দ্রনাথের বক্তৃতাও আমি কোনদিন শুনি নাই। কিন্তু চন্দ্রবাবু শুদ্ধ বাংলায় অনর্গল কথা বলিতে পারিতেন। আমরা মুগ্ধ হইয়া তাঁহার কথা শুনিতাম।

একদিন আমি বাবাকে বলিলাম চন্দ্রবাবুকে বাড়ি লইয়া আসিব এবং ফুলচন্দন দিয়া তাঁহার অর্চনা করিব। বাবা এই প্রস্তাবে সম্মত হইলেন। আমাদের গুরুভক্তির অমর্যাদা করিলেন না। চন্দ্রবাবু আসিলেন, আমরা তাঁহাকে একটি rocking chair-এ বসাইয়া গলায় মালা দিয়া কপালে চন্দনের ফোঁটা দিলাম। এই ব্যক্তিপূজায় আমাদের অভিভাবকদের কোন আপত্তি দেখিলাম না। চন্দ্রবাবু ফল, মিষ্টি গ্রহণ করিলেন এবং বক্তৃতার সুরে বলিলেন তোমরা আমেরিকার মানুষের মত পরিশ্রমী হও। চন্দ্রবাবুর শিক্ষার মূলকথা ছিল পরিশ্রম কর। সেই উপদেশ সারাজীবন পালন করিয়াছি কিনা বলিতে পারি না, কিন্তু পরিশ্রম যে জীবনের অপরিহার্য্য তাহা বুঝিতে পারি। চন্দ্রবাবুর মুখে যখন তাঁহার উপদেশ শুনিতাম তখন তাঁহার মূল্য বোধহয় উপলব্ধি করিতাম না, কিন্তু আজ তাঁহার উপদেশের মূল্য বিশেষভাবে উপলব্ধি করি। বাঙ্গালী আজ জীবনের নানা ক্ষেত্রে অপদার্থ হইয়া উঠিয়াছে তাহার কারণ বোধহয় তাহার আলস্য।

হাইস্কুল

১৯২৭ সালের জানুয়ারী মাসে আমাদের দুই ভাইয়ের হাইস্কুলে প্রবেশ করিবার প্রশ্ন উঠিল। তখন উত্তর কলিকাতায় ভাল ইস্কুলের অভাব ছিল না। সরস্বতী ইন্‌স্টিটিউশান, শ্যামবাজার এ. ভি. স্কুল, টাউন স্কুল, সেন্ট্রাল স্কুল এবং স্কটিশ চার্চ কলেজিয়েট স্কুলের বেশ নাম ছিল। কিন্তু আমার বাবা এই সকল স্কুলের ভাল-মন্দ বিচার করিতে বসিলেন না। তিনি আমাদের ভর্তির ভার দিলেন গোপালদার উপর। গোপালদা বরিশালের মানুষ। তাঁহার গ্রাম গৈলার এক বিশিষ্ট শিশু সাহিত্যিক কার্তিকচন্দ্র দাশগুপ্ত বদ্রিদাস টেম্পল স্ট্রিটে বাস করিতেন। কার্তিকবাবুর আত্মীয় হিসাবে গোপালদা, কেশব সেন আমাদের পল্লীতে প্রায় নিত্যই আসিতেন। আমাদের বাড়িতে আসিয়া অনেক গল্প করিতেন। কেশব সেন রচিত নাটক তখন কলিকাতার নানা ইস্কুলে অভিনীত হইত। বাবা তাঁহাকে ডাকিয়া একদিন বলিলেন গোপাল, তুমি এই দুটিকে, আমাকে ও আমার ভাইকে, ইস্কুলে ভর্ত্তি করিয়া দাও। কোন ইস্কুলে ভর্ত্তি করিবে তাহা তুমিই ঠিক করিবে। এই বিষয়ে আমার কিছু বলিবার নাই। গোপালদা আমাদের New Indian School-এ লইয়া গেলেন। এই ইস্কুলের নিচের ক্লাশগুলি বসিত কর্ণওয়ালিশ স্ট্রিটে একটি বৃহৎ অট্টালিকার একতলায়। এই বাড়িটি দত্তবাড়ি বলিয়া পরিচিত ছিল। সেই দত্তবাড়ি ভাঙ্গিয়া তাহার জমিতে রূপবাণী সিনেমা ভবন নির্মিত হইয়াছিল। রূপবাণী নামটি দিয়াছিলেন রবীন্দ্রনাথ। তবে গোপালদা আমাদের দুইজনকে ইস্কুলের main building-এ লইয়া গেলেন। ওই বাড়িটি ছিল কর্ণওয়ালিশ স্ট্রিটের উপরে স্কটিশ চার্চ কলিজিয়েট স্কুলের বিপরীত দিকে। কিছুক্ষণের মধ্যেই ইস্কুলের হেডমাস্টার মশায় আমাদের তাঁহার ঘরে ডাকিলেন। আমরা দুইজনে হেডমাস্টার মশায়ের ঘরে প্রবেশ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিলাম।

হেডমাস্টার মশায়, নরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য আমাদের বসিতে বলিলেন এবং আমাদের ইংরাজি, বাংলা এবং অঙ্কের বইগুলি দেখিতে চাহিলেন। বইগুলি হাতে লইয়া হেডমাস্টার মশায় আমাদের ইংরাজি এবং বাংলা বই হইতে দুইটি অনুচ্ছেদ বাছিয়া আমাদের পড়িতে দিলেন। ইহার পর ইংরাজি এবং বাংলার কতগুলি শব্দের অর্থ এবং বানান জিজ্ঞাসা করিলেন। হঠাৎ তিনি ইংরাজিতে কথা বলিতে আরম্ভ করিলেন এবং প্রত্যেকটি প্রশ্নের জবাব ইংরাজিতে দিতে বলিলেন। সব শেষে বলিলেন তোরা Class V পাশ করিয়া আসিয়াছিস Class VI-এ অর্থাৎ আমাদের ইস্কুলের fifth class-এ তোদের ভর্ত্তি হওয়া উচিত। আমি তোদের fourth class-এ ভর্ত্তি করিলাম। তাহার পর হেডমাস্টার মশায় আমাদের ভর্ত্তির form fill-up করিতে বলিলেন। এখন বলি আমাদের হেডমাস্টার মশায় ভর্ত্তির দিনই আমাদের প্রসঙ্গত একটু ইংরাজি শিখাইলেন। Form-এ religion-এর ঘরে আমরা লিখিয়াছিলাম Hindu। হেডমাস্টার মশায় বলিলেন তোরা Hindu তোদের ধর্ম Hinduism। আমরা Hindu শব্দটি কাটিয়া Hinduism শব্দটি বসাইয়া দিলাম।

আমরা যখন ভর্ত্তি হই তখন হেডমাস্টার মশায় চল্লিশ বছর এই ইস্কুলে পড়াইতেছেন। তিনি B.A পাশ ছিলেন। এখন হিসেব করিয়া বলি তখন তাঁর বয়স ছিল ষাট। তিনি দেখিতে বড় সুন্দর ছিলেন, উজ্জ্বল গৌরবর্ণ, কাঁচা-পাকা দাড়ি, দীর্ঘদেহী। সাদা চাপকান পরিয়া তিনি চেয়ারে বসিয়া আছেন। এখন ভাবি হেডমাস্টার মশায়-এর চেহারায় যেন একটা রাজকীয় ভাব ছিল। Fourth Class-এ তিনি আমাদের পড়াইতেন না। আমরা তখন দত্তবাড়িতে ক্লাশ করিতাম। Third Class-এ Promotion পাইয়া আমরা দুই ভাই main building-এ Class করিতে আরম্ভ করিলাম। হেডমাস্টার মশায় ইংরাজি পড়াইতেন। তিনি শেষ ঘণ্টায় Class নিতেন। চল্লিশ মিনিটের Class তিনটা পঁয়তাল্লিশে শেষ হইবার কথা, কিন্তু তাঁহার Class চারটা পনর পর্য্যন্ত চলিত। তিনি চল্লিশ মিনিট পড়াইতেন এবং আধঘণ্টা পূর্ব দিনের পড়া লইতেন। আমরা চল্লিশজন ছাত্র একে একে দাঁড়াইয়া তাঁহার প্রশ্নের উত্তর দিতাম। মনে হয় এক মিনিটের কম সময়ে আমাদের পরীক্ষা হইয়া যাইত। হেডমাস্টার মশায়ের প্রশ্নগুলি ক্ষুদ্র, আমাদের উত্তরও কয়েক সেকেন্ডেই দিতে হইত। কখনও ইংরাজি শব্দের অর্থ জিজ্ঞাসা করিতেন, কখনও বানান জিজ্ঞাসা করিতেন এবং কখনও একটি ইংরাজি শব্দ ব্যবহার করিয়া একটি বাক্য গঠন করিতে বলিতেন। প্রত্যেকদিন আমাদের নম্বর দেওয়া হইত কুড়ির মধ্যে। ঠিক উত্তর দিতে পারিলে কুড়ি পাইতাম, না পারিলে শূন্য পাইতাম।

এখন হেডমাস্টার মশায়ের ইংরাজি পড়াইবার ধরণ সম্বন্ধে কয়েকটি কথা বলিতে পারি। আমাদের ইংরাজি পাঠ্যপুস্তকে একটি গল্প ছিল Washington Irving-এর 'The Widow and Her Son'। এই গল্পে একটি Sentence ছিল—There is something in sickness that breaks down the wide of manhood, softness the heart and brings it back to the fellings of infancy। একটি সুন্দর Sentence হেডমাস্টার মশায় একাধিকবার পড়িতেন। মনে হয় একটি সুগঠিত বাক্যের rythm বুঝাইবার জন্যই তিনি ইহা করিতেন। হেডমাস্টার মশায় কিন্তু আমাদের ইংরাজি গদ্যও মুখস্থ করিতে বলিতেন। বলিতেন you

Soften

must repeat the words so that the language may enter into your blood-stream। কথাটি আমার এখনও মনে আছে। তাহার পর তিনি এই বাক্যের এক একটি শব্দ লইয়া অনেক কথা বলিতেন। প্রথমেই বলিলেন sickness শব্দটি লেখক কেন ব্যবহার করিলেন, ilness শব্দটি ব্যবহার করিলেন না কেন। তিনি বলিলেন illness শব্দটি বুঝায় যে কোন অসুখ, আর sickness শব্দটি সেই অসুখের জন্য যে অসুস্থতা বা অস্বস্তির সৃষ্টি হয় তাহা বুঝায়। break down phraseটি বুঝাইতে হেডমাস্টার মশায় break up, break into প্রভৃতি phraseগুলির ব্যবহার বুঝাইয়া দিলেন। তাহার পর manhood শব্দটির সম্বন্ধে আলোচনা শুরু হইল। man না লিখিয়া manhood শব্দটি কেন ব্যবহার করিলেন তাহা বুঝাইলেন। ইহার পর manly, manliness, unmanly, unmanliness প্রভৃতি শব্দের ব্যবহার বুঝাইয়া আমাদের জিজ্ঞাসা করিলেন man শব্দের অর্থ কি। আমরা সমস্বরে বলিলাম 'মানুষ'। হেডমাস্টার মশায় বলিলেন হাঁ, man শব্দের অর্থ মানুষ তাহা ঠিক। কিন্তু man শব্দের অন্য অর্থও আছে। কোন মহিলা তাহার স্বামীকে দেখাইয়া বলিতে পারেন He is my man। man শব্দের বহুবচন men এবং এই শব্দটির দুটি অর্থ Welllington's men বলিতে বুঝায় Wellington's soldiers, আর কোন factoryর কর্মীদেরও ঐ factoryর men বলা হয়। ইহার পর man শব্দটির ক্রিয়াপদের ব্যবহার বুঝাইলেন, This ship is well manned ইহার অর্থ এই জাহাজে কর্মীর সংখ্যা যথেষ্ট। কিন্তু এইখানেই শেষ হইল না। unmanned শব্দটিও একটি ক্রিয়াপদ I am unmanned এই বাক্যের অর্থ আমি ভয় পাইয়াছি। তাহার পর বলিলেন, man বলিতে মানুষ বুঝায়, আবার man বলিতে আদর্শ পুরুষও বুঝায়। Be a man কথাটির অর্থ এই যথার্থ মানুষ হও। মনুষ্যত্বের পরিচয় দাও। আমরা কথাগুলি খাতায় note করিতাম। আমরা ভাবিলাম Be a man বোধহয় আজ হেডমাস্টার মশায়ের শেষ কথা। তখনও ৩.৪৫ হয় নাই। হেডমাস্টার মশায় বলিলেন এবার man শব্দের Latin adjectiveটি বুঝিয়া লও। প্রথম Latin adjective বলিতে কি বুঝায় সেই বিষয়ে কিছু বলিলেন। Latin ভাষায় man-এর প্রতিশব্দ homo এবং এই homo হইতেই man শব্দের Latin adjective human হইয়াছে। এই human শব্দের আবার অনেক রূপ। human বলিতে বুঝায় হৃদয়বান। humanity বলতে বুঝায় মনুষ্যত্ব এবং মনুষ্যসমাজ। humanities বলিতে বুঝায় Greek, Latin প্রভৃতি প্রাচীন ভাষা। এইভাবে হেডমাস্টার মশায় আমাদের humanise, humanization, dehumenisation, humanitarian প্রভৃতি শব্দের অর্থ এবং প্রয়োগ বুঝাইলেন। তখন ৩.৪৫ হইয়াছে। আমাদের দৈনিক মৌখিক পরীক্ষা শুরু হইল।

আমি প্রায় পঞ্চাশ বছর ইংরাজি ও বাংলার অধ্যাপনা করিয়াছি, কলেজে এবং বিশ্ববিদ্যালয়ে। হেডমাস্টার মশায়ের পড়ানোর রীতি ও পদ্ধতি এখনও মুগ্ধ হইয়া স্মরণ করি এবং এই রীতি ও পদ্ধতির উৎকর্ষ মনে করিয়া নিজেকে কখনই একজন সার্থক অধ্যাপক বলিয়া মনে করিতে পারি নাই।

ইস্কুলের চার বছরে মাত্র একদিন হেডমাস্টার মশায়ের সঙ্গে রাস্তায় দেখা হইয়াছিল; সে ১৯২৯ সাল। আমি তখন ইস্কুলে Second Class-এ পড়ি। তখন কলিকাতায় কলেরার

মহামারী চলিতেছে। রাস্তায় হরিধ্বনি, ক্রন্দনধ্বনি শুনিতে পাইতেছি। কর্পোরেশনের vaccintorরা ছুটাছুটি করিতেছে। এই সময়ে দেখিলাম হেডমাস্টার মশায় আসিতেছেন, তাঁহাকে দেখিয়া কেন যেন ঐ বিভীষিকার মধ্যে একটু শান্তি পাইলাম। তিনি কাছে আসিয়া আমার হাতখানি ধরিলেন এবং জিজ্ঞাসা করিলেন শহরে কলেরার এই দারুণ আবির্ভাবকে তুই কি ভাবে ইংরাজি বর্ণনা করবি। আমি একটু ভয় পাইলাম এবং মৃদুস্বরে বলিলাম যে আপনি class-এ শিখাইয়াছিলেন যে epidemic break out করে। আমি বলিব Cholera has broken out in Calcutta। হেডমাস্টার মশায় বলিলেন, হ্যাঁ, আমি ইহাই তোদের শিখাইয়াছিলাম। কিন্তু নিদারুণ মহামারীর কথা ওইভাবে প্রকাশ করিলে It would be a cold phrase। এখন বলিতে হইবে Cholera is raging in Calcutta। আমি মাথা নাড়াইতে উনি আমাকে raging শব্দের বানান জিজ্ঞাসা করিলেন। rage শব্দের শেষ অক্ষর e, ঐ অক্ষরটি raging শব্দে থাকিবে কিনা। ঈশ্বরের কৃপায় আমি raging শব্দের বানানে ভুল করিলাম না। হেডমাস্টার মশায় আমার হাতখানি ছাড়িয়া দিয়া বলিলেন এই ইংরাজি কথাটি যেন আমি আমার ভাইকে শিখাইয়া দেই।

আমি যখন Oxford-এর ছাত্র ছিলাম তখন আমার অধ্যাপক J. B. Leishman আমাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন আমি কোথায় ইংরাজি ভাষা শিখিয়াছি। আরও বলিলেন তাঁহার ইংরাজ ছাত্ররাও আমার মত শুদ্ধ ইংরাজি বলিতে পারে না। আমি বলিলাম, স্যার, ইহাতে আমার কোন গৌরব নাই। মাতৃভাষার ব্যবহারে আমিও বোধহয় শুদ্ধতা রক্ষা করিতে পারি না। ইংরাজি ভাষা ব্যবহারে আমি grammar, idiom সম্বন্ধে সাবধান হই। ইংরাজ ছেলেরা শুদ্ধ ইংরাজি বলে না, কিন্তু তাহারা যাহা বলে তাহা যথার্থই ইংরাজি। আমার শুদ্ধ ইংরাজি শুদ্ধ হইলেও হয়ত যথার্থ ইংরাজি হয় না। Leishman সাহেব একজন প্রাচীনপন্থী সাহেব। আমার কথা শুনিয়া তিনি বলিয়া উঠিলেন There is no English now in England either at Fleet street or at Westminister। অর্থাৎ England-এর পত্র-পত্রিকায় ইংরাজি এবং ঐ দেশের সরকারী ইংরাজি দুষ্ট ইংরাজি। যাহা হউক, উনি আমাকে কলিকাতার ইস্কুলে কিভাবে ইংরাজি ভাষা শিখান হয় জিজ্ঞাসা করিলেন। আমি আমাদের হেডমাস্টার মশায়েরা কিভাবে আমাদের ইংরাজি শিখাইতেন তাহা বলিলাম। হেডমাস্টার মশায়ের পড়ানো সম্বন্ধে যাহা এই নিবন্ধে লিখিয়াছি তাহাই Leishmanকে বলিলাম। তিনি আমার হাতখানি ধরিয়া বলিলেন such headmasters are rare in England today। কথাটি শুনিয়া আমার চোখে জল আসিল।

ধূলির আখর

সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায়

সে এক গ্রাম। জেলা বর্ধমান। মহকুমা কালনা। নাম বাঘনাপাড়া। আমার যা কিছু শৈশব-স্মৃতি তা এই গ্রামটিকে ঘিরে আজও মনের মধ্যে ঘুরপাক খায়। অথচ বেশি দিন সেখানে আমি থাকিনি। উনিশশো ছাব্বিশে আমার জন্ম ওই গ্রামে। বত্রিশ সালে বাবার চাকুরির কারণে প্রথমে চলে যাই এখনকার বাংলাদেশের সৈয়দপুরে, রেলকর্মচারীদের ভাষায় সৈদপুর। আমার কেবল মনে আছে মা রান্নাঘরে অফিসের ভাত রাঁধছেন—আমার সামনে খোলা বিদ্যাসাগরের বর্ণপরিচয়ের ই-ঈ-র পাতা। সামনে একটা কলাই করা থালায় একখানি রুটি আর একটু গুড়। বালভোগটি সেরে নিয়ে প্রথম কাজ হল মাকে না দেখিয়ে প্যান্টে হাতটি মুছে ফেলা। তারপর মাকে দেখিয়ে মলাটের পরের পাতায় বিদ্যাসাগরের ছবিটিকে মাথায় ঠেকানো। 'ইট-ঈশ'-র পাতাটি মুখস্ত করে দিয়ে পঁচিশ পর্যন্ত গুণে দিতে পারলেই ছুটি। সামনের কোয়ার্টার্সে থাকতেন ড্যানিয়েল সাহেব দেশীয় খৃষ্টান—এ পাশের বাড়িতে থাকতেন ইসাক সাহেব—তখনকার ভাষায় যুক্তপ্রদেশের বা ইউপির খানদানী মুসলমান। সকল পরিবারেই ছিল আমার অবাধ বিহার—অবাধ আহার। আমি আগেও বলেছি আবারও বলছি ভারতীয়দের ধর্মনিরপেক্ষ সহাবস্থান শিক্ষাদানের প্রকৃষ্ট পন্থা হচ্ছে সবাইকে রেলকলোনির অধিবাসী করে দেওয়া। যে কোনো প্রকার শ্রেণীসীমান্ত এখানে যথাসম্ভব শিথিল। আর্থসামাজিক বেড়াও দুর্লঙ্ঘ্য নয়। আজ যিনি চার্জম্যান পরশু তিনি ফোরম্যান—আজ যিনি আটপৌরে করণিক—তাঁর অফিস সুপারিনটেন্ড হতে বাধা নেই। ইসাক সাহেবের ওপাশের বাড়িতে থাকতেন মি. ভট্‌চাজ্। তাঁর বাড়িতে সত্যনারায়ণের একটা মোকাম অবশ্যই ইসাক সাহেবের বাসায় আসত। মনে আছে এক রবিবার সকালবেলা গিয়েছিলাম মিসেস ড্যানিয়েলের সঙ্গে গীর্জায়—বিকেলবেলায় গিয়েছিলাম ইসাক সাহেবের সঙ্গে মহরমের তাজিয়া দেখতে। বিকেলবেলার বর্ণাঢ্য মহরমের মিছিল ছিল বালকের মনে বীররসের উদ্দীপক।

আমার সৈদপুর স্মৃতি প্রায় আবছা—তখন আমার মা বাবা আর আমি এই তিনজন নিয়ে আমাদের সংসার। মা ছিল অসম্ভব ফর্সা। ব্রত উপবাসের দিনে মায়ের কাছে কাছে থাকতাম। মা সোমবার করলে—দুপুরবেলায় মায়ের শিবপূজা শেষ হলে প্রথামতো আমাকে জিজ্ঞাসা করতে হ'ত—মা তোমার সোমবার করা হল? তিনবার উচ্চারিত এই প্রশ্নের জবাবে তিনবার মা বলতো, হল। আমার বাবা তখন বত্রিশ টাকা মাইনের কনিষ্ঠ রেলওয়ে ক্লার্ক। রেলে বিদ্যুৎ বিভাগে তাঁর চাকরি। ধুতির মধ্যে শার্ট গোঁজা, পায়ে মোজা এবং ফিতে বাঁধা জুতো—ওপন ব্রেস্টকোট। ইংরাজিতে তুখোড়। চলনে বলনে তৎপর। সৈদপুর স্মৃতির মধ্যে

একটা দিনের কথা একটু আলাদা করে মনে আছে। মায়ের কী একটা মানসিক আকাঙ্ক্ষায় মা চেয়েছিলেন দিলালপুরের সুপ্রাচীন কালীবাড়িতে পূজা দিতে যাবেন। বাবা ছিলেন সুন্দরী পত্নীর বিশেষ আজ্ঞাবহ। বাবা একখানি গাড়ি যোগাড় করলেন। আমরা এবং আরেকটি পরিবার সদলবলে দিলালপুরে কালীবাড়ি গেলাম। মনে আছে ঘোর জঙ্গলের মধ্যে নির্জন কালীবাড়ি। রক্তাম্বর পুরোহিত। বিশাল খাঁড়া দিয়ে হাড়িকাঠ উপেক্ষা করে ডাব কাটার মতো অনায়াসে ছাগবলি, পেঁয়াজ বিরহিত মহাপ্রসাদী মাংসভাত—কিন্তু সব কিছুকে ছাড়িয়ে গেল এক অদ্ভুত দৃশ্য—শিবাভোগ। ছাগলের রক্তাক্ত ছিন্নমুণ্ডটি নিয়ে পুরোহিত মন্দির চত্বরে জঙ্গলের শৃগালদের আহ্বান করলেন। শৃগালরা দলবেঁধে এল। তাদের প্রাপ্য ভোগ সম্পন্ন করে তারা চলে গেল। এ দৃশ্য পরে কোথাও আমি দেখিনি। বালক মুখে আঙুল পুরে স্তব্ধ হয়ে গিয়েছিল।

মা কী মানসিক করেছিলেন জানি না। কিন্তু কয়েকদিনের মধ্যে বাসার আবহাওয়ায় একটা খুশির ঝলক দেখা গেল। বাবার একটা পদোন্নতি হয়েছে। এবং বাবা বদলি হয়েছেন কাঁচড়াপাড়া রেলওয়ে ওয়ার্কশপে, বিদ্যুৎ বিভাগে। আমার পক্ষে বড়ো কথা আপাতত আমরা চলেছি আমার মাতামহের বাড়ি—বাঘনাপাড়া। বাঘনাপাড়া আমার জননী জননী। আমার শৈশবধাত্রী, আমার সুখস্মৃতির উৎসভূমি। শীতের এক পরিণত প্রভাতে রোদে ভেসে যাওয়া মাঠের মাঝখানে রেলগাড়ি উত্তরের দিকে চলে যেতেই আমার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল হাজার পাখির গুলতুনি। অবস্থাটা আমি অনেক পরে আমার একটা কবিতায় ব্যবহার করেছিলাম। কবিতাটির নাম 'বাঘনাপাড়া'—ছাপা হয়েছিল বুদ্ধদেব বসুর 'কবিতা'-য়। রেলগাড়ি চলে যেতে দেখলাম নেমেছি মোটে আমরা তিনজন। মাঠের মাঝখানে ইস্টিশন। মাস্টারবাবু তাঁর বাসা থেকে হেঁকে বললেন—রেলিঙের ওপর টিকিট রেখে চলে যান। শৈলেশ্বরবাবুর বাড়ি যাবেন তো—ঘোড়গাড়ি দাঁড়িয়ে আছে। তাকিয়ে দেখি জীর্ণ দুটি ঘোড়া, জীর্ণতর গাড়ি আর জীর্ণতম গাড়ির গাড়োয়ান, নাম বেহারী। গাড়িতে বসার আগে বেহারীর সঙ্গে মায়ের কুশল বিনিময় হল। আমি তখন হাঁ হয়ে গেছি। বর্ধমানের বিখ্যাত ধানীমাঠ—মাঠের পরে মাঠ, মাঠের শেষে মাঠ—সোনালি মাঠে তখন মা লক্ষ্মীর নূপুর বাজছে—পরে wide space এবং অবাধ প্রান্তর শব্দবন্ধ শুনেছি। সে সব কথা তো তখন শিখিনি। বেহারী জ্যাঠা এতো সবই মাঠ। লোক নেই? বেহারী জ্যাঠা বলল আছে, ওই দেখ নি নি করছে একখানি গেরাম, লোক মাঠামাঠি পার হয়ে যাচ্ছে। শুরু হল আমার বর্ধমানের শব্দ পরিচয়। নি নি করছে মানে আছে কি নেই—অস্পষ্ট। মাঠামাঠি মানে আড়াআড়ি মাঠ পার হওয়া। পরে পুরীর সমুদ্র প্রথম দেখে আমার যে অনুভূতি হয়েছিল, আমার আজও বলতে কোনো দ্বিধা নেই, বর্ধমানের মাঠের দৈগন্তিক বিস্তারের মাঝখানে দাঁড়িয়ে আমার সে অনুভূতির প্রথম আভাস-প্রাপ্তি।

জীর্ণ ঘোড়া, জীর্ণতর গাড়ি, জীর্ণতম গাড়োয়ান মন্থরতম গতিতে গ্রামের দিকে চলল। মান্ধাতার আমলের অশথ গাছ—দুপাশে মাঠ— জেলা বোর্ডের খোয়া বাঁধানো পথ। রেলওয়ে

ইস্টিশন থেকে গ্রাম বাঘনাপাড়া অনেকটা দূর। আকন্দডাঙায় গা ছমছমে অন্ধকার। তার পরেই দূর থেকে দেখা যায় পশ্চিমদিকে মন্দিরের সিংদরজার মাথার উপরে দাঁড়ানো দ্বাররক্ষীর মূর্তি। একটু পরেই পৌঁছে গেলাম শানঘাটে। বকুলতলা দিয়ে গ্রামের মাইনর ইংলিশ স্কুলকে বাঁদিকে ফেলে গাড়ি এগিয়ে গিয়ে, ডানদিকে ডাকঘর পেরিয়ে বাঁদিকে ঢুকে ঠাকুর বাড়ির দোলমঞ্চকে ডান পাশে রেখে একেবারে মন্দিরের সিংহদ্বারে। দাদামশাই অপেক্ষমান। মা ঘোমটা টেনে মৃদু কণ্ঠে বললেন, এসে গেছি। আমার সমগ্র মন প্রাণ যেন চেঁচিয়ে উঠল— এসে গেছি, আমি পেয়ে গেছি। খালি পায়ে মা আগে মন্দিরে ঢুকলেন। গোপেশ্বর তলায় সাষ্টাঙ্গ প্রণাম করে মা গ্রাম প্রবেশ সম্পন্ন করল। আমার মাতামহ ভবন ছিল মন্দির সংলগ্ন। মা প্রণাম সেরে মন্দিরের নাছ দুয়ার দিয়ে নিজ বাড়ির উঠোনে নিজের মায়ের কাছে চলে গেলেন—মেনকা উমার মিলন দৃশ্য আমার দেখা হল না। আমাদের পায়ে জুতো ছিল, আমরা মন্দিরে ঢুকবো না—একটু ঘুরপথে বাড়ি গেলাম। যেতে যেতে ঠাকুরবাড়ির পাকশালা থেকে ভেসে এসে নাকে এল তিনশো বছরের ঐতিহ্যবাহী বলাইচাঁদের ভোগের সুক্তোর ক্ষুধাজাগানিয়া ঘ্রাণ।

আমার দেখা আমার ছেলেবেলার বাঘনাপাড়া ছিল বলাইচাঁদের মন্দির-কেন্দ্রিক গ্রাম। কিন্তু আমি এখানে ওই মন্দিরের ইতিহাস পেড়ে বসবো না। বাঘনাপাড়ার গোস্বামীবংশের এক কৃতবিদ্য সন্তান সে কাজ অসামান্য যোগ্যতায় নিষ্পন্ন করেছেন। আমি কিছু বলতে গেলে তা ঋণোক্তি হবে মাত্র। তা ছাড়া এ লেখা বাঘনাপাড়ার ইতিহাস নয়—এ ন্যূনার্থে আমার হয়ে ওঠার লেখচিত্র। আরো একটা কথা বলে রাখি। যে বাঘনাপাড়ার কথা আমি বলছি সে বাঘনাপাড়া শুধু আমার মনেই আছে। বাস্তবে সে কোথাও নেই। আমি ইচ্ছে করলে সেখানে ফিরে যেতে পারি না। হলদে পাখির পালকের ঝগড়ু বলেছিল—দুমকা যাবার আমার দরকারটাই বা কি বল। আমার মনের মধ্যে আমি দুমকাকে নিয়ে ঘুরে বেড়াই। আমার বাঘনাপাড়াও হারায়নি। বলাইচাঁদের মূর্তি আমার কাছে শ্বেতপাথরের মূর্তি—প্রতীয়মান হওয়াটাই আসল কথা। সে কথায় আমি যাব না। আমি যাকে ফেলে এসেছি সে-ই আমার চিরকালের অপরিবর্তনীয় বাঘনাপাড়া। সে শুধু মনের মধ্যেই আছে। আমি সেখানে শুনতে পাই বেলা দেড়টা দুটোর সময় ঠাকুরবাড়িতে আড়াই কাঁসর বাজছে—দুটো বড়ো আওয়াজ, একটা তার চেয়ে একটু মৃদু আওয়াজ। এই আড়াই কাঁসর জানিয়ে দিত বলাইচাঁদের ভোগ ও ভোগারতি সম্পন্ন—এবার প্রসাদার্থীরা পাকশালার কোলে সুপ্রশস্ত দালানে সমবেত হবেন। যাঁদের যেদিন সেবাধিকার তাঁরা সপরিবারে আত্মীয় বন্ধু প্রতিবেশী সমেত প্রসাদ গ্রহণে আহূত হতেন। পরিবেশিত হত তিনশ বছরের ঐতিহ্যবাহিত আদা মৌরি বাটা দেওয়া বিউলি কলাইয়ের ডাল—বাঘনাপাড়ার ঠাকুরবাড়ি ছাড়া সে ডালের স্বাদ আর কোথাও আমি পাইনি। মোচার ঘণ্ট, ডুমুরের ডালনা, ফুলবড়ি ভাজা, আমড়ার টক—পরিশেষে পরমান্ন এবং পিষ্টক—একেবারে চৈতন্যচরিতামৃত অনুমোদিত মহাপ্রভুসম্মত সুভোজ্য। সন্ধ্যায় আরতির কাঁসর ঘণ্টা বাজলেই ছুটে যেতাম ঠাকুরবাড়ি। বলাইচাঁদের সায়মাশে বর্ষাকালে নিবেদিত

হত একটা বিচিত্র খাদ্য—তালের লুচি। আমার দিদিমা এর প্রস্তুতি প্রক্রিয়া জানতেন—তিনি শিখিয়েছিলেন তাঁর কন্যাকে—কন্যা শিখিয়ে দিয়ে গেছেন তাঁর বধূমাতাকে। ভাজা লুচিটিকে রসে ফেলা হয়। আজ এই সাতাত্তর বছরেও এই তালের লুচির জন্য আমার আগ্রহ অম্লান রয়েছে। আমার সেই মনের বাঘনাপাড়ায় আমি ঘুরে বেড়াই শানঘাটে—সেই বকুলতলায় যাতে একদিন অনেককাল আগে আম ফলেছিল বারোশো নেড়া তেরশো নেড়িকে খাওয়ানোর জন্য, ঘুরে বেড়াই যমুনার ধারে, যাতে ইলিশমাছ ধরা পড়েছিল ওই রাতে। ঘুরে বেড়াই মোচ্ছবতলায়, গাজনবেলায় গোপেশ্বরতলায় দেখি সন্ন্যাসীদের কাঁটা গড়াগড়ি। সারা রাত ধরে দেখি পয়লা বৈশাখের তুবড়ি উৎসবে মুন্‌কে খোল, আধমনি খোল, দশসেরা খোল—বিশাল বিশাল সেই আগুনের ঝরণা বা প্রপাত যেন আকাশ থেকে নেমে আসত। লেখক কিন্নর রায়কে বাঘনাপাড়ার তুবড়ির বিচিত্র সমারোহের গল্প একবার বলেছিলাম। সে তার একটি লেখায় সেই কৌতূহল উদ্দীপক কাহিনী বর্ণনা করেছিল বেশ জমিয়ে। মনে মনে আজও চলে যাই বাঘনাপাড়ার জ্যৈষ্ঠ নিশীথের ফুলদোলের মেলায়। ঠাকুরবাড়িরই উৎসব। কিন্তু সারা গ্রামের মেয়েরা অত রাত্রেও আসতেন রাধাকৃষ্ণের রেবতী বলরামের ফুলদোল দেখতে।

সরস্বতী পূজার দিন সকালবেলায় আমার দাদামশাই ওরিয়েন্টাল সেমিনারির শিক্ষক হরিপদ মুখোপাধ্যায় সরস্বতী প্রতিমার সামনে আমার হাতে খড়ি দিলেন। মা একটা বড় কাগজে সরস্বতী বন্দনা স্তোত্রটি মুখস্থ করিয়ে নিতে গিয়ে এক ঝামেলায় পড়লেন। 'স্তনযুগ শোভিত মুক্তাহারে'—বালকের জিজ্ঞাসা 'স্তনযুগ' মানে কী। বিড়ম্বিত মা যথাসম্ভব বুঝিয়ে দিলেন। আমি একবার মা সরস্বতীর দিকে তাকিয়ে, একবার মায়ের দিকে তাকিয়ে সদ্যলব্ধ শব্দপ্রয়োগে ঘোষণা করলাম তোমার স্তনযুগ মা সরস্বতীর থেকে ভাল। মা একটু হতবুদ্ধি হয়ে আমাকে এইটুকু বলে নিরস্ত করলেন—ও রকম বলতে নেই, মা সরস্বতী রাগ করবেন, তা হলে তোমার লেখাপড়া কিচ্ছু হবে না। মা সরস্বতীকে ফুল মার্কস দিইনি বলে তিনি নিশ্চয় রাগ করেছিলেন। লেখাপড়া আমার কিচ্ছু হয়নি। তবে আমি এখনো বলছি আমার সেই প্রথম নান্দনিক মূল্যায়নে কোনো ভুল হয়নি।

এসব কিছুকে ছাড়িয়ে, কিম্বা এসব কিছুকে নিয়েই বাঘনাপাড়া আমার হাতে ধরিয়ে দিল আমার সারা জীবনের দুটি হদিস। আমাদের বাড়ির মেয়েরাও লেখাপড়ার চর্চা করতেন। দিদিমার কণ্ঠস্থ ছিল মেঘনাদ বধ কাব্যের তৃতীয় সর্গ। মায়ের পড়া ছিল বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাস। বাবা তাঁর তরুণী বধূর মনোরঞ্জনের জন্য এনে দিতেন হিতবাদী সংস্করণ রবীন্দ্র রচনা সংগ্রহ। সোমড়া-বাঁকিপুর গ্রামে আমার পিসিমা ছিলেন মায়ের সঙ্গে মিশে রীতিমতো গ্রন্থাসক্ত। মা ও দিদিমার হাত ধরে আমি একদিন ঢুকে পড়লাম রামের সুমতির জগতে এবং কৃত্তিবাসী রামায়ণের জগতে। খুলে গেল এক দৌলতখানা। রামায়ণ কী করে পড়তে হয় সুর করে পড়ে মা শিখিয়ে দিলেন। দ্বিতীয় ঘটনাটি ঘটল একদিন সকালবেলা। উনিশশো বত্রিশ সাল। ভারতবর্ষ এসে কড়া নাড়ল বাঘনাপাড়ার দরজায়। আমি ইংরাজি এ. বি. লিখতে লিখতে শুনলাম ঠাকুরবাড়ির ওদিকে বাজারের দিক থেকে একটা সমবেত ধ্বনি ভেসে আসছে—

বন্দেমাতরম। ছুটে বাইরে বেরিয়ে গেলাম। দেখি আমার মামা আর তাঁর বন্ধুরা দোকান বাজার বন্ধ করিয়ে দিচ্ছেন। নতুন একটা শব্দ শিখলাম—হরতাল। আইন অমান্য আন্দোলনে সারা ভারতে যে ঢেউ উঠেছে এ গ্রামেও তার দোলা। আমি কিছু বুঝলাম না—'বুঝিলাম নাহি বুঝিলাম জয় তব জয়'। কয়েকদিন ধরে দেখলাম আবগারি দোকানে পিকেটিং। ধ্বজা উড়ছে সর্বত্র—এমন কি নারকেল গাছের মাথাতেও। গ্রামের কুখ্যাত ডানপিটে ছেলে পতাকা হাতে নিয়ে গুরুজনদের প্রণাম করে মন্দিরের গায়ে মাথা ঠেকিয়ে জেলে চলে গেল। দলে দলে মানুষ আইন অমান্যে ঝাঁপিয়ে পড়ছে। দিনের পর দিন দেখতে লাগলাম একটিমাত্র লাল পাগড়ি কনেস্টবল পিছু পিছু চলেছে—এগিয়ে চলেছে সত্যাগ্রহীর দল—গান গাইতে গাইতে তারা কারাবরণ করতে চলেছে। আমি দেখেছিলাম এক বাবা ছোট মেয়েকে নিয়ে চণি ময়রার মিষ্টির দোকানে এসেছে মেয়ের জন্য জিলিপি কিনতে। জেলযাত্রী সত্যাগ্রহীদের দেখে তার কেমন মাতন লেগে গেল। মেয়ের হাতে জিলিপির ঠোঙা ধরিয়ে দিয়ে বাবা তাকে বলল, তুই বাড়ি যা—আমি একটু জেল ঘুরে আসি। দাদামশাই এবং বাবার সতর্ক নিষেধ অমান্য করে মা খদ্দর পরতে শুরু করলেন। মায়ের কাছে থেকে আমি ঘোর স্বদেশী হয়ে উঠলাম। মায়ের গলায় স্বদেশী গান শুনে আমারও মাতন লেগে যেত—সাধ হত আমিও জেলে যাবো। পরে হলেও এই সাধটি আমার অপূর্ণ থাকেনি—তবে সে অনেক পরের কথা।

এমন ভাবে দিন কাটতে কাটতে হঠাৎ একদিন শুনলাম—আর বাঘনাপাড়ায় নয় এবার আমাদের নৈহাটি চলে আসতে হবে। কাঁচড়াপাড়া বাবার চাকুরিস্থল, তার দু স্টেশন ডাউনে নৈহাটি শহর। মেসে থেকে পাইস হোটেলে খেয়ে বাবার শরীর খারাপ হয়ে যাচ্ছে। বলা বাহুল্য আমার মোটেই ভাল লাগল না। যাত্রার দিন সবই সান্ত্বনা দিচ্ছে—এই তো দেখতে দেখতে বড়ো হয়ে যাবি তখন একা একাই চলে আসতে পারবি। কিন্তু ছোট ছেলের মন ঠিকই বুঝতে পারল—সুতো একবার ছিঁড়লে গিঁট বাঁধা যায় হয়তো, জোড়া লাগানো যায় না। একথায় ভুল নেই চৌদ্দ বছর বয়স পর্যন্ত বছরে একবার করে দিন পনেরো বাঘনাপাড়ায় যেতাম। কিন্তু সে তো বাইরে থেকে যাওয়া। বেশ বুঝতে পারতাম আমি এখানকার নই। কত ছোটবেলায় স্বপ্ন দেখতাম বাঘনাপাড়ায় খড়ের চালার মাটির দোতলা বাড়ি করে থাকব। বাঘনাপাড়ার মোচ্ছবের এক একটা দিনে এক এক ভাগ গৃহস্থের পালা পড়ে। তিনের মোচ্ছবে থাকত আমাদের পালা। সেই তিনের মোচ্ছবে আমি ভূমিষ্ঠ হয়ে শুভাশৌচ ঘটিয়ে আমাদের অংশগ্রহণ পণ্ড করে দিয়েছিলাম। মাতুল পরিহাস করে ডাকনাম দিয়েছিলেন ভণ্ডুল। সারা গাঁয়ে আমার পরিচয় ছিল ভণ্ডুলমামা। আমার সকল পরিকল্পনাই বিভূতিভূষণের ভণ্ডুল মামার বাড়ি গল্পের মতো চিরদিন অপূর্ণ থেকে যায়। বাঘনাপাড়ার মাটকোঠার স্বপ্নও কবে বিস্মৃতির ওপারে চলে গেছে। ভুলে গেছি, ভুলে যে গেছি তাও ভুলে গেছি।

বলা দরকার বাঘনাপাড়া আর নৈহাটির মাঝে দিনকতকের জন্য আমাদের থাকতে হল সোমড়া-বাঁকিপুরে। সেটাই আমার পিতামহের গ্রাম। এখানে আমার প্রথম স্কুল জীবন। ঠাকুর্দা খুব পড়াশুনা ভালবাসতেন। আমার মা শিক্ষককন্যা বলে মাকে তিনি শ্রদ্ধাই করতেন। কিন্তু ঠাকুমার সঙ্গে মায়ের বনল না। আমার জন্যই মা সোমড়া-বাঁকিপুরের পাট উঠিয়ে নৈহাটি

চলে এলেন। এই গ্রামজীবন সম্বন্ধে আমার কোনো মুখস্মৃতি নেই।

অতঃপর নৈহাটি।

এ কোথায় এলাম! লালচে ধুলোর বর্ধমানের গ্রাম থেকে ধোঁয়াটে, পাটের ফেঁসো ওড়ানো চটকল শহরে। অর্ধেক লোকের কথা বুঝি না। শ্রমিকেরা সবাই অবাঙালি। শহরের উত্তরে দক্ষিণে দুটো বড় বড় চটকল। মাঝে মাঝে ভেসে আসে কাগজকলের পচা গন্ধ। না— এ শহরের সঙ্গে প্রথম দর্শনে প্রেম আমার হয়নি।

তারাশঙ্কর আমাকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন—সরোজ তুমি নৈহাটির মানুষ বটে, কিন্তু নৈহাটির ছেলে নও।

আমি উত্তর দিয়েছিলাম—আপনি ঠিকই ধরেছেন আমি নৈহাটির মানুষ বটে, কিন্তু বাঘনাপাড়ার ছেলে।

তারাশঙ্কর বলেছিলেন—সেই জন্য তুমি আমায় সহজে বুঝতে পেরেছ।

সে যাই হোক এ শহর প্রথম সম্ভাষণে আমায় বুকে টানতে পারেনি। তবু এই শহরেই আমার নিয়তির সঙ্গে আমার করমর্দন হল। কিন্তু সে তো অনেক পরে। প্রথম দর্শনে সে হাত বাড়িয়ে দেয়নি—হাত তো বাড়িয়ে দেয়ইনি। বরং মুখ ফিরিয়ে নিয়েছিল। পতিতাপল্লী শহরের মাঝখানে—কী অসম্ভব খারাপ খারাপ কথা। দেশি সরাবের দোকান স্টেশনের ধার ঘেঁসে। স্টেশনের ঘোড়ার গাড়ির গাড়োয়ানদের গাড়োয়ানি ইয়ার্কি—সারি সারি মাংসের দোকান—পীড়িত হত আমার বৈষ্ণবতা নিষিক্ত বাঘনাপাড়াই মন। সেখানে মাছ নিয়ে বসত দুজন জেলে, মাংসের দোকান ছিলই না। আরো বড়ো কথা এখানে আমরা গৃহীত হলাম না— আমাদের পরিচয় আমরা ভাড়াটে। আমি এখানকার মাটির কেউ নয়, আমি ভাড়াটেদের ছেলে। তবু আস্তে আস্তে শহরটা আমার কাছে ধরা দিতে লাগল। দেখলাম এরও একটা চেহারা আছে। তখনো এ শহরে পিচের রাস্তা হয়নি। বিদ্যুৎ বাতি জ্বলত না পথে। রাস্তায় জ্বলত তেলের আলো। সন্ধের পর শহরটা নিঝুম হয়ে যেত। দূরের গ্রামের শিয়াল ডাক এখানেও শোনা যেত। বাঘনাপাড়ার জন্য মন কেমন করে ঘুম ভেঙ্গে গেলে শুনতাম—খোয়া বাঁধানো রাস্তায় বিটের পুলিশ হেঁটে চলেছে—তাদের জুতোর শব্দ বাজছে খট্‌খট্‌খট্। একটু একটু করে আমি শহরটাকে জানছি। বিকেলবেলায় ছাদে ওঠে মেয়েরা, আলসে ধরে এবাড়ি ওবাড়ি আলাপ চলে। রেললাইনের ওপারে রেলমাঠ—ই. বি. আর গ্রাউণ্ড। প্রমাণ সাইজের ফুটবল খেলার মাঠ। নানা দিক থেকে নানা টিম আসতো—শিল্‌ড্ খেলা হত। কাঁটালপাড়ায় আর শাস্ত্রীপাড়ায় থিয়েটার হত। লক্ষ্মীপূজার সময় ধানকলে তর্জা হত, যাত্রা হ'ত। মিত্রপাড়ায় দেখাতে গিয়েছিলাম মায়ের সঙ্গে নিমাই সন্ন্যাস অপেরা। শীতকালে বৈঁটুর গান বেরুত। মহরমের মিছিল, গণেশ পুজার মিছিল শহর জুড়ে সাড়া ফেলত। দুটো মিছিলেই লাঠি খেলা, তরোয়াল খেলা, আগুনের চাকার খেলায় সবাই যোগ দিত—হিন্দু মুসলমান ভেদ ছিল না। পতিতা পল্লীর মেয়েরা কার্তিক পূজা আর সরস্বতী পূজা করতেন খুব ঘটা করে। তাঁদের সরস্বতী তাঁরাই কাঁধে করে নিয়ে যেতেন বিসর্জন দিতে। দেখলাম ধর্মঘট কাকে বলে। চটকল

শ্রমিকদের সে বিশাল আন্দোলনে গোটা জুটবেল্ট আগ্নেয়গিরির মতো ফুঁসে উঠল।

এই সময়ে আগুপিছু করে আমার জীবনে তিনটি ঘটনা ঘটল। প্রথম ঘটনাটি হল আমি টের পেলাম আমি মিল দিয়ে পদ্য লিখতে পারি। এখানে নৈহাটির টোপোগ্রাফি একটু বলা দরকার। বাঘনাপাড়ায় কোনো নদী ছিল না—নৈহাটি প্রাকৃতিক দিক থেকে যত বিমলিন হোক তার একটা নদী আছে—জোয়ার ভাঁটা খেলে, অমাবস্যায় পূর্ণিমায় ভরা কোটালে বান ডাকে। অন্তত সেদিন ডাকত। ভরা বর্ষায় গঙ্গার বুকে অগুনতি ইলিশের নৌকা। অন্তত সেদিন ভাসত। আমার প্রথম মিল দেওয়ার চেষ্টায় এই টোপোগ্রাফির ছায়া। এক বর্ষার দুপুরে লিখে ফেললাম :

গেরুয়া জলে রুপোর ইলিশ ঝিলিক দিয়ে সারা,
গরবিনী গঙ্গা বুঝি তাতেই আত্মহারা।

আরো আট পংক্তি ছিল—গঙ্গার জলে তা ভেসে গেছে। মিল দিতে পারি এতেই আমি মুগ্ধ। তবু এ মিল আমার খুব মনঃপুত হল না। সেটা হল দ্বিতীয় প্রয়াসে। কনকচাঁপা নামে আমাদের পাড়ায় আমার সমবয়সী এক মেয়ে ছিল। কালোকোলো হৃষ্টপুষ্ট সেই মেয়েটির এক জোড়া সুন্দর চোখ ছিল। আমি আমার মিলবন্ধনের প্রয়াসে সেই চোখদুটিকে নিলাম :

কনক তোমার যুগল ভুরুর কার্মুকে
তির জুড়েছ, বিঁধবে তুমি কার বুকে?

ধার করা কিনা জানি না, আমার তো মনে হল আমারই স্বোপার্জিত মিল। আমি খুসি হলাম। কনকচাঁপার সেই শ্রাবণেই বিয়ে হয়ে গেল। তার সঙ্গে আমার আর দেখা হয়নি। শুধু মনে আছে সে আমায় দুটি মিলের উপাদান দিয়েছিল। বলা বাহুল্য এটা প্রেমের গল্প নয়—এটা আমার পদ্য লেখার গল্প।

দ্বিতীয় ঘটনাটি আমার জীবনের পবিত্রতম ঘটনা। ঘটনাটি নৈহাটির ঘটনা নয়। সে বছর অঘ্রাণের শেষে আমরা সবাই তিনমাসের জন্য চলে গিয়েছিলাম সাঁওতাল পরগণার কারমাটাড়ে—এখন স্টেশনটার নাম বিদ্যাসাগর। আমার তখন নবম শ্রেণীর গোড়ার দিক। এক জানুয়ারির বিকেলে খবরের কাগজে দেখলাম পরের দিন মধুপুরে দেশগৌরব সুভাষচন্দ্র বসু যাবেন ভাষণ দিতে। আমার মনে একটা বিদ্যুৎ চমকে উঠল—তাহলে তো উনি কারমাটাড়ের ওপর দিয়েই যাবেন। কারমাটাড়ের স্থানীয় অধিবাসী এবং চেঞ্জাররা সকলেই একভাবে চমকিত হয়েছেন। পথের মোড়ে একটা তোরণ গড়া হল। কিছু টাকা তোলা হল সুভাষচন্দ্রের কর্মকাণ্ডে কারমাটাড়বাসীর শ্রদ্ধার্ঘ্য হিসাবে তাঁর হাতে তুলে দেওয়া হবে বলে। আর কারমাটাড় তো তখন ছিল ফুলবাগানের জন্য বিখ্যাত। পরের দিন বেলা দেড়টা নাগাদ বেশ একটা সুদৃশ্য ব্যাপার দাঁড় করানো হল। কিন্তু কথা হল কারমাটাড়ে মোটরগাড়ি থেকে অবতরণ ও ভাষণদান তো সুভাষচন্দ্রের কর্মসূচীর মধ্যে নেই। তাঁর গাড়ি আটকালে তিনি বিরক্ত হতেই পারেন। সকলে ঠিক করলেন সে ঝুঁকি নিতেই হবে। যথাকালের অনেক পরে তাঁর গাড়ি দেখা দিল। সকলে মিলে তাঁর নামে জয়ধ্বনি দিতে দিতে বন্দেমাতরম ধ্বনির মধ্যে তাঁকে সনির্বন্ধ অনুরোধ করে দশমিনিটের জন্য নামানো হল। একটি চমৎকার মানপত্র

পড়া হল। আমি মাকে সঙ্গে নিয়ে যেখানে দাঁড়িয়ে আছি তার হাত চারেকের মধ্যে সুভাষচন্দ্র। গায়ে ফিকে গেরুয়া রঙের পাঞ্জাবি, নীলপাড় খদ্দরের ধুতি পরণে, পায়ে কাবুলি জুতো। আমার কিশোর কল্পনায় মনে হল আমার সামনে এক জ্যোতির্ময় পুরুষ। তিনি কী বলেছিলেন সেই গাছতলায় দাঁড়িয়ে তা আজ আর আমার সব মনে নেই। মোদ্দা কথাটা মনে আছে—ভারতবর্ষের মানুষের দুঃখ দুর্দশার মূলে রয়েছে ইংরেজ শাসন। মহাযুদ্ধ এনে দিয়েছে সুবর্ণ সুযোগ—ইংরেজ শাসনের অবসান ঘটাবার জন্য তিনি ডাক দিলেন। সেই আমি প্রথম ডেমোক্রেসি বা গণতন্ত্র, সোস্যালিজম্ বা সমাজতন্ত্রের কথা শুনলাম। আমি আর থাকতে পারলাম না। দু পা এগিয়ে গিয়ে একেবারে তাঁর পায়ে মাথা ঠেকিয়ে প্রণাম করলাম। তিনি আমার মাথায় হাত রাখলেন। আমি বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হলাম। বাসায় ফিরে এসে স্থির করলাম আমার এই স্মরণীয় দিনটিকে আমার জীবনে চিরচিহ্নিত করে রাখার মতো একটা কিছু করা দরকার। আমি সেই দিন থেকে ধুতি পাঞ্জাবি পরা শুরু করলাম। এই দিনটির পর থেকে আমাকে কেউ সার্ট প্যান্ট পরা দেখেনি। একটা কথা বলা দরকার ওই সভায় সকল চেঞ্জার্স যাননি। যাঁরা সরকারী চাকুরে তাঁরা বাসাতেই বসেছিলেন। আমার বাবা যাননি, কাকাবাবু যাননি। কিন্তু মেয়েরা সবাই গিয়েছিলেন, ছেলেরা সবাই।

কারমাটাড় থেকে নৈহাটি ফিরলাম খদ্দরের ধুতি পাঞ্জাবি পরে। বুকপকেটে একটা সুভাষচন্দ্রের ছবি। তখন 'ইনকিলাব' শব্দের মানে শিখেছি। 'বিপ্লব' শব্দটার মধ্যে একটা বিস্ফোরক বারুদে গন্ধ পেয়ে রোমাঞ্চিত হচ্ছি। আমার কবিতার খাতায় প্রেমের কবিতা আর গরম গরম বিপ্লবী কবিতা দুই পদ্যবন্ধে ঠাঁই পাচ্ছে। সহপাঠীরা এবং বাংলার স্যার নজরুলসখা খগেন্দ্রনাথ ঘোষ আমার কাছ থেকেই খবর পেয়েছেন আমি কবিযশোপ্রার্থী। এই সময়ে তৃতীয় ঘটনাটি ঘটল। একটি নবাগত ছেলে আমার সঙ্গে যেচে আলাপ করল। ঢাকা থেকে এসেছে। আমার বাবার মতো তার দাদাও রেলওয়ে চাকুরে। ছেলেটির নাম সুরথ বসু। তার সঙ্গে আমার তারামৈত্রী ঘটে গেল—লাভ অ্যাট ফার্স্ট সাইট। সে আমার থেকে অনেক গুণী। ছবি আঁকতে পারে, বাঁশি বাজাতে পারে, অভিনয় করতে পারে। কিন্তু আমি কেবল অঙ্ক পারি না, সে কিছু পারে কি না পারে কিছু বোঝাই গেল না। কেননা বার্ষিক পরীক্ষা হল কি হল না সে চলে গেল তার প্রেমিকাকে নিয়ে—অনিশ্চয় তার ভবিষ্যৎ কিন্তু সুনিশ্চয় তার সংকল্প। সে আমাকে এই মাত্র তার কার্যকলাপের আভাস দিয়েছিল সে এমন একটা কাণ্ড করবে যাতে আমি তাকে খারাপ ছেলে বলতে বাধ্য হবো। বলিনি—কোনোদিন বলিনি।

যুদ্ধ ঘন হয়ে উঠছে। আমি সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধবিরোধী ইস্তাহার স্কুলের দেওয়ালে সাঁটতে গিয়ে প্রধান শিক্ষকের কাছে ধরা পড়লাম। তিনি বাবাকে ডেকে পাঠালেন। বাবা ভীত এবং ক্রুদ্ধ দুইই। তারপর ঘটনাচক্রে সেদিনই আমার বুক শেল্‌ফ থেকে বেরিয়ে পড়ল—তৃতীয় আন্তর্জাতিকের শাখা ভারতবর্ষের কম্যুনিস্ট পার্টির মুখপত্র। প্রথম পাতাতেই খবর ব্যাডমিন্টনের নেট আর র‍্যাকেট দিয়ে দড়ির মই বানিয়ে পাঁচিল টপকে কানপুর জেল থেকে পালিয়ে এসেছেন শুক্ল আর দীক্ষিত নামে দুই কম্যুনিস্ট শ্রমিক নেতা। বাবা মাথায় হাত দিয়ে মন্তব্য করলেন—এর হাতে দড়ি পড়বে, আমার চাকরিটা চলে যাবে। মঙ্গলাচরণের একটি কবিতার

দুপংক্তি মনে পড়ে যায়—ব্যাপার বুঝেছ হে মিত্রজা/আমারো দুই গরু ভিড়ে গেছে/বুঝি বা চাকরির খসে বোঝা। মা কাঁদ কাঁদ—কিন্তু গম্ভীর।

দিন এগিয়ে চলেছে। রবীন্দ্রনাথ প্রয়াত হলেন। তার আগে সোভিয়েট রাশিয়ায় নাৎসী. বাহিনী ঢুকে পড়েছে। যুদ্ধের চরিত্র বদলে গেল। সুভাষচন্দ্রের অন্তর্ধান ঘটল। দেশে মনুষ্যসৃষ্ট মন্বন্তর এল। বিয়াল্লিশের ভারত ছাড়ো আন্দোলনে সারা দেশ অগ্নিগর্ভ হয়ে উঠল। এই সবের মধ্য দিয়ে আমি কলকাতায় রিপণ কলেজে ভর্তি হলাম। আমার আকর্ষণ বুদ্ধদেব বসু, বিষ্ণু দে, প্রমথনাথ বিশী হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়—এবং আরো কেউ কেউ। বাঘনাপাড়ার কথা আর মনে পড়ে না। পড়লেও মন তেমন করে কেমন করে না।

একটা ছোট কিন্তু তাৎপর্যপূর্ণ স্মৃতির উল্লেখ করি। যুদ্ধের চরিত্র বদলের পর সেই চরিত্র অধ্যয়নের জন্য পার্টি স্টাডি সার্কেলের ব্যবস্থা করল। নৈহাটিতে একটি ক্ষুদ্র পাঠচক্রে ক্লাস করেছিলাম। ক্লাস নিয়েছিলেন বিলাত থেকে সবে ফিরে আসা এক তরুণ ব্যারিস্টার। ইনি জ্যোতি বসু। শ্রীযুক্ত বসুকে আরো পরে আমাদের বাড়িতে আরো কাছ থেকে দেখার সুযোগ হয়েছিল। দুবারের অভিজ্ঞতাই এক কথা বলে—ঋজু সংযত ব্যক্তিত্বের অধিকারী মানুষ।

কলকাতাকে আমি ভালবেসে ফেলিনি। কলকাতাও আমাকে ভালবাসেনি। সে আমার প্রেম নয়—আমার প্রয়োজন। তখনো একথা বুঝিনি প্রেম আর প্রয়োজন অবিভাজ্য। কলকাতা এসেছি—স্টলে, কমনরুমে কত পত্রপত্রিকা—কোথাও আমার একটু জায়গা হবে না? অখ্যাত কাগজে পাঠাব না। কবিতা ছাপাতে যদি হয়ই তাহলে অভিজাত পত্রপত্রিকায়। আমার লক্ষ্য হল অরণি পরিচয় এবং কবিতা। কবিতা লিখতে পারি বা না পারি আমার সাহসকে তারিফ করতেই হয়। দুটো লেখা দু জায়গায় পাঠিয়ে দিলাম—অরণিতে এবং কবিতায়। কবিতা পত্রিকায় একটি রোম্যান্টিক কবিতা। কবিতার নাম 'কনকচাঁপা'। ত্বরিত সম্পাদকের স্বহস্ত লিখিত উত্তর এল—কবিতাটি মনোনীত হয়েছে। কবিতাটির প্রথম তিনটি পংক্তি এই রকম :

কনকচাঁপার গন্ধ পেয়েছ অন্ধকারে?
পাওনি?
তবে এইখানে এস আলোটা নেবাও...

আমার প্রথম প্রকাশিত কবিতা কিন্তু 'বন্দর'—ছাপা হয়েছিল অরণিতে। কলেজ থেকে বাড়ি ফিরে দেখি মা অপেক্ষা করছে—হাতে দুপুরের ডাকে বুকপোস্টে আসা এক কপি অরণি। মা বললো—তোর কবিতা ছাপা হয়েছে। মনোনীত হয়েছি, মুদ্রিত অক্ষরে নিজের নাম দেখছি—এই ভার্জিন আনন্দের তুলনা হয় না। অরণিতে পর পর কবিতা ছাপা হল 'মিছিল' 'চেতনা' 'স্বগতোক্তি'। অরণি অফিস তখন বৌবাজার স্ট্রীটে। বৌবাজার স্ট্রীটে অরণি অফিসে সম্পাদক সত্যেন্দ্রনাথ মজুমদারকে দেখলাম—আলাপ হয়েছিল পরে তখন অরনি অফিস উঠে এসেছে বেনিয়াটোলা লেনে। অরণি পর্ব আমাকে একটু বিস্তারিত করে বলতে হবে। তার আগে একটা খবর দিয়ে রাখি পরিচয়ে আমার কবিতা প্রকাশিত হল। সেই আমার

ৃথম নিজেকে খুঁজে পাওয়া। কবিতাটি হারিয়ে গেছে—আমার সেই প্রথম স্বনির্ভর কবিতার প্রথম কয়েক পংক্তি আজও মনে আছে :

আমাকে দেখেছ তুমি
বহুবার দেখেছ আমায়—
কায়ুর ফাঁসির মঞ্চে
উক্রেনের আতপ্ত হাওয়ায়,
বাঁচার ঘনিষ্ঠতম বোধে
আমাকে দেখেছ তুমি
চীনের চৈনিক প্রতিরোধে।

কবিতাটি অনেকের মনোযোগ টেনেছিল। আমি নিজেও একটা আত্মপ্রত্যয় খুঁজে পেলাম।

কিন্তু আমার পরিচয় পর্বের পূর্ব পর্যায় অরণি পর্ব। তার আগে আমার নৈহাটি কাণ্ডের কথা একটু বলা দরকার। উনিশশো পঁয়তাল্লিশের একুশে নভেম্বরের আগেই আমি নৈহাটির একচ্ছত্র ছাত্রনেতা। সামনে বি. এ. পরীক্ষা। কে খবর রাখে। আমি ব্যস্ত ছাত্র সংগঠনে। একুশে নভেম্বর রামেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায় কলকাতায় পুলিশের গুলিতে প্রাণ দিল। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পরে সারা ভারতবর্ষে যে অগ্ন্যুদগিরণ শুরু হল তার প্রথম ঝলকানি একুশে নভেম্বর। বাইশে নভেম্বর সারা কলকাতায় হরতাল। আমি বেলা বারোটার মধ্যে নৈহাটি ফিরে এসে আমার ছাত্র বন্ধুদের নিয়ে তাৎক্ষণিক হরতাল হাঁকলাম। লোকের মন তখন এত উত্তপ্ত তৎক্ষণাৎ সেই ভরদুপুরে হরতালের ডাকে তাঁরা সাড়া দিলেন। গভীর রাত্রে একটা ষোল পংক্তির কবিতায় কলকাতার ক্রোধান্ধ ছবিটা এঁকে ফেললাম :

চলে না ট্রাম বাস দোকানপাট বন্ধ
সারা শহর ঝড়ের মেঘে অন্ধ...

কবিতাটি পরের দিনই অরণি অফিসে পৌঁছে দিলাম। সেই সপ্তাহেই কবিতাটি ছাপা হয়ে গেল। কবিতাটির একটি free adaptation তখনকার ছাত্র ফেডারেশনের সর্বভারতীয় ইংরাজি মুখপত্র The student-এ প্রকাশিত হয়েছিল। ইংরাজি স্বাধীন ভাষান্তর করেছিলেন সুব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়। কিন্তু একুশে নভেম্বর তো কেবল মহাকালের নাচ আরম্ভের ডমরুধ্বনি। পায়ে পায়ে এগিয়ে আসছে ফেব্রুয়ারি মাস। এল রশীদ আলি দিবস। ব্যারাকপুর জুটবেল্ট জ্বলে উঠল। আমাদের মনের মধ্যে তখন একটাই ধ্বনি—সময় হয়েছে নিকট এবার বাঁধন ছিঁড়িতে হবে। নৈহাটি স্টেশনের সামনে হাজার মানুষের ভীড়—নেতৃত্বে রয়েছে আমার বন্ধুরা—ছাত্র ফেডারেশনের কর্মীরা। জনতা বারুদের স্তূপ হয়েই ছিল। ছাত্র বন্ধুদের নির্দেশে রেলওয়ে রেলিঙের ওপর দাঁড়িয়ে এক চোঙা মুখে দিয়ে আগুন জ্বালানো বক্তৃতা দিলাম। আমার বক্তৃতায় আগুন কথাটা ছিল রূপকার্থে। মারমুখী জনতা সেটা গ্রহণ করল বাস্তবার্থে। হাজার জনতা স্টেশন আক্রমণ করল। কেরোসিনের টিন ও বোতল নিয়ে তারা চড়াও হলেন—সামনেই ছেলেরা আটকে দিয়েছে ডাউন একখানা এক্সপ্রেস ট্রেন। যাত্রীদের নামিয়ে দিয়ে ছেলেরা প্রথম শ্রেণীর কামরার গদি ব্লেড দিয়ে চিরে ছোবড়া বের করে কেরাসিনে

ভিজিয়ে আগুনই ধরিয়ে দিল। দাউ দাউ করে জ্বলে উঠল আগুন। আগুনের হল্কায় গাছ ছেড়ে পাখপাখালিরা উড়ে যেতে লাগল। দীপ্ত কমরেডদের মুখের দিকে চেয়ে মনে হল তাদের মনে হচ্ছে :

আগুন, আমার ভাই
আমি তোমারি জয় গাই।
তোমার শিকল ভাঙা এমন রাঙা
মূর্তি দেখি নাই।

দেখতে দেখতে বড় রাস্তায় মুসলিম লীগের একটা বিরাট মিছিল এসে হাজির দক্ষিণ দিক থেকে। শুকুর আলি নামে এক বেতের মতো পাতলা দীঘল চেহারার যুবক তার নেতৃত্বে। উত্তর দিক থেকে এগিয়ে গৌরীপুরের পাঁচ হাজার শ্রমিক—লাল ঝাণ্ডা নিয়ে তাদের নেতৃত্ব দিচ্ছে আমার আশৈশব বন্ধু কমরেড আশু বন্দ্যোপাধ্যায়। আমাদের পরিকল্পনা ছিল কংগ্রেস পতাকা লীগ পতাকা আর লাল পতাকার গাঁটছড়া বেঁধে নৈহাটি থানা আক্রমণ। কিন্তু তার আগেই ব্যারাকপুর থেকে সশস্ত্র গোরা সৈনিক এসে কোনো হুঁসিয়ারি না দিয়ে ফায়ারিং শুরু করল। জনতা ইঁটপাটকেল নিয়ে টমিদের মোকাবেলা করতে ঝাঁপিয়ে পড়ল। ফায়ারিঙে তিনজন তৎক্ষণাৎ মারা গেল। টমিরা আশুর বুকে বন্দুক ঠেকিয়ে তাকে বলল পতাকা ফেলে দিতে। আশু লাল পতাকা ফেলল না। বলল—নেভার। এ রকম ঘটনা স্বভাবতই নানা জায়গায় ঘটেছে। অরণিতে আবার বেরুল কবিতা :

এ মাটির বুকে রক্তের দাগ ভুলোনা
এ মাটির লাসে লাল হয়ে যাক সারা দেশ—

লেখক সিদ্ধেশ্বর সেন। যতদূর জানি এটাই কবি সিদ্ধেশ্বর সেনের অরণিতে প্রথম কবিতা। এইসব সময়ে আমাদের পারিবারিক জীবনে এক শোকাবহ ঘটনা ঘটে যার সঙ্গে রশিদ আলি দিবসের প্রত্যক্ষ না হলেও পরোক্ষ সংযোগ উপেক্ষা করা যাবে না। পার্থপ্রতিম আর আমার মধ্যে আমার আরো তিনটি ভাই ছিল। আসলে আমরা ছয় ভাই—বেঁচে আছি তিনভাই। যখন রশিদ আলি দিবসের আগুন জ্বলছে সে সময় আমার চতুর্থ ভাই কল্যাণ অষ্টম শ্রেণীর ছাত্র, প্রাক্-পেনিসিলিন যুগের টাইফয়েডে শয্যাশায়ী। আমরা তখন রেলকোয়ার্টার্সে থাকি। আগুনের আলো বাসার উঠোনে পড়তেই কল্যাণ 'আমার দাদা আমার দাদা' বলে একশ চার জ্বর সমেত লাফিয়ে উঠে ছুটতে চেয়েছিল। সেই যে তার হৃৎপিণ্ড জখম হল সে কয়েক দিনের মধ্যেই মারা গেল। আমিই তাকে পুড়িয়ে এলাম। গঙ্গার ঘাটে গিয়ে শ্রাদ্ধও আমিই করলাম। এই সব কিছুর মধ্য দিয়ে এগিয়ে আসছিল আমার বি. এ. পরীক্ষা। বাবা মা বন্ধুবান্ধব প্রায় সকলেই পরীক্ষায় বসতে বারণ করলেন। কিন্তু আমি নিজে নিজেই সম্ভাবিত প্রশ্নের তালিকা তৈরি করে রাত নেই দিন নেই পড়তে শুরু করলাম। আমি পাশও করে গেলাম। সে অবিভক্ত বাংলায় কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনস্থ সব কলেজের মধ্যে বাংলা পত্রের একশ নম্বরের পরীক্ষায় আমি খুব বেশি নম্বর পেয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের একটা ছোটখাট পুরস্কারও পেলাম। বিস্ময় হল—আরো বিস্ময়ের ব্যাপার আমার একখানাও বাংলা টেক্সট বই

রাজনৈতিক ডামাডোলে কেনা হয়ে ওঠেনি। আমার সাধারণ ভাবে পঠিত অভিজ্ঞতাকেই কাজে লাগালাম—একটা রচনা লিখেছিলাম বাংলা উপন্যাসের বিষয়ে—তাতে একান্ত অপক্ক উচ্ছ্বাসে তারাশঙ্করের জয়গান করেছিলাম।

বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হলাম। বাবা চেয়েছিলেন অর্থনীতি নিয়ে পড়ি। আমি বাবাকে না জানিয়ে বাংলায় নাম লেখালাম। বাবা আমার কাণ্ড শুনে সংক্ষিপ্ত মন্তব্য করলেন—বরাতে উপবাস অপেক্ষা করছে আর কী? ক্লাস আরম্ভ হবার আগেই শুরু হয়ে গেল কলকাতার ষোলই আগস্টের রক্তস্নান—কে বলবে এক পক্ষ আগেই উনত্রিশে জুলাইয়ের মতো আমহরতাল পালন করেছে কলকাতা। হয়তো উনত্রিশে জুলাই হয় বলেই ধনিক শ্রেণীর হাতে ষোলই আগস্টের মতো আয়ুধ গ্রহণ অনিবার্য হয়ে ওঠে।

তখনকার ভাষায় পঞ্চম বর্ষ—বিশ্ববিদ্যালয়ে যাই আসি। আমি মফস্বলের ছেলে। কে আমাকে চেনে? এমন সময় বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বাসায় ফিরে একটি চিঠি পেলাম। অরণি অফিস থেকে চিঠিটি লিখছেন অরুণ মিত্র। চিঠির মর্মার্থ অরণি পরিচালনা বিষয়ে একটু আলোচনার ব্যাপার আছে। একবার দেখা করুন। পরের দিন ক্লাস সেরে চলে গেলাম অরণি অফিসে। অরণিতে সমসাময়িক সাহিত্য নামে একটা ফিচার অতঃপর থাকবে, অরুণ মিত্রের প্রস্তাব—আপনি সমসাময়িক সাহিত্যের দায়িত্ব নিন। আমি বললাম—গদ্য আমার হাতে আসবে? অরুণদা বললেন—ভাল আসবে। বলা ভাল এর আগে আমার একটি গদ্য অরণিতে প্রকাশ করেছিলেন সুশীল জানা—তিনি তখন অরণি দেখাশুনা করতেন—সে লেখাটির বিষয় ছিল বঙ্কিমচন্দ্রের কবিতা—নাম বোধহয় বঙ্কিমী কবিতা। সুশীল জানা লেখাটির তারিফ করেছিলেন। অরুণদা লেখাটির কথা বললেন। স্থির হল আমাকে একটা ছদ্মনাম বেছে নিতে হবে। আর প্রত্যেক ফিচার পিছু আমি পাঁচটাকা করে পাবো। আমি রাজি হয়ে গেলাম। আমি নাম নিলাম অভিনব গুপ্ত। অরুণদাও মাঝে মাঝে হাত লাগাতেন। তিনি নাম নিলেন সত্যকাম। কিন্তু এগুলি যা হোক তা হোক আমার আসল প্রাপ্তি অন্যতর। আমি অরুণদার সান্নিধ্য পেলাম। তিনি আমাকে অবহেলা করলেন না, অনুকম্পা জানালেন না—তিনি আমাকে সর্বান্তঃকরণে গ্রহণ করলেন। তিনি আমাকে বুঝতে না দিয়ে শিক্ষিত করে তুলতে লাগলেন। তিনি আমাকে এলিয়টের গদ্যে দীক্ষিত করতে চাইলেন। মূল ফরাসী থেকে র‍্যাঁবো, এলুয়ার শান্তস্বরে আবৃত্তি করে আমাকে বাংলায় বুঝিয়ে দিতেন। আমি কলেজ কেটে তিনটে নাগাদ বেনিয়াটোলা লেনে চলে আসতাম। কলকাতার সাহিত্য জীবনের টুকিটাকি মজার খবর পেতাম। ছেচল্লিশ ধর্মতলায় এক সাহিত্যিক বিতর্কে অমরেন্দ্রপ্রসাদ মিত্র নাকি বিষ্ণু দে-কে চেপে ধরেছিলেন, অরণিতে প্রকাশিত বিষ্ণু দের একটি কবিতার মানে তাঁকে বুঝিয়ে দিতে হবে। উদাস গম্ভীর স্বরে বিষ্ণু দে যে জবাব দিয়েছিলেন তা এমন অবস্থায় পড়া যে কোনো কবির মনে রাখা উচিত—'লিখে যা বোঝাতে পারিনি বলে তা আপনাকে কী বোঝাবো বলুন তো।' এই উত্তরে অমরেন্দ্রপ্রসাদ আরো ক্রুদ্ধ হয়ে গেলে বিষ্ণু দে বলেছিলেন—এ কী, মারবেন না কি? সেবার শারদীয় সংখ্যায় ঠিক হল বেশি সংখ্যক কবির কবিতা অরণিতে যাতে ছাপানো যায় সে জন্য সকলকেই অনুরোধ করা হবে আঠারো কুড়ি পংক্তির মধ্যে

কবিতা শেষ করতে। এই নির্দেশ মেনেই বিষ্ণু দে লিখে দিলেন তাঁর বিখ্যাত কবিতা মৌভোগ। সে বছরের শারদীয় কবিতা আলোচনা কালে মঙ্গলাচরণ—এই কবিতাকে শ্রেষ্ঠ কবিতা বলে চিহ্নিত করেছিলেন। বিপদ বাধালেন বিমলচন্দ্র ঘোষ। তিনি অর্ধেক পৃষ্ঠা দখল করে ফেললেন—অথচ তিনি আঠারো পংক্তির নির্দেশ অতিক্রম করেননি। কিন্তু প্রত্যেকটি পংক্তি ডবল কলম খেয়ে দিয়েছে। কবিতার নাম লেনিন—যতদূর মনে পড়ছে। মাত্রাবৃত্ত চালের সে কবিতার এক পংক্তি একদমে পড়ে ওঠা ছিল দুষ্কর। অরণিতে পূজায় আমার কবিতা ছাপা হল, অরুণদা হাতে করে নিয়ে গিয়ে 'স্বাধীনতা' শারদীয় সংখ্যাতেও আমার একটি কবিতা প্রকাশের ব্যবস্থা করলেন। তখন এমনই ছিল দিনকাল, তরুণতর কবির জন্য অগ্রজ কবির উদার স্নেহ ছিল অকৃপণ। সে বছর পূজাতেই পরিচয়ে ছাপা হল আদাব—লেখক সমরেশ বসু। রাতারাতি বিখ্যাত হয়ে গেল সে। কোথায় থাকে? আতপুরে থাকে। তারপর আতপুর থেকে একদিন সুরথ এল। হাতে একটা নতুন গল্পের পাণ্ডুলিপি। সেদিন আমি জানলাম প্রথম সুরথই সমরেশ। অরণিতে একদিন সমরেশকে নিয়ে গেলাম। অরুণদার সঙ্গে দেখতে দেখতে সমরেশের সম্পর্ক গড়ে উঠল। অরণিতে বিকেলের আসরে আসতেন অনেকে। যেদিন সত্যেন্দ্রনাথ মজুমদার আসতেন সেদিন কৌতুকপ্রদ টুকরো কাহিনী হাসির ঝিকিমিকি ছড়াত। আগেকার কালের ব্রাহ্মদের সম্বন্ধে বিচিত্র গল্প তাঁর ভাড়ারে ছিল। বলেছিলেন এক রাজা-কল্প মানুষের লিখিত বক্তৃতা পাঠে পঞ্চম জর্জকে—'জর্জ ভি' বলে উল্লেখ করার হাস্যোদ্দীপক কাহিনী। একদিন এসেছিলেন কমলকুমার মজুমদার। তিনি বলেছিলেন খাঁটি বাঙালি মাত্রেই চারটি নেতির সমাহার—অ্যান্টি মুসলমান, অ্যান্টি বাঙাল, অ্যান্টি ইংরেজ ও অ্যান্টি অবাঙালি। আসতেন নিয়মিত কবি বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, আসতেন বিজন ভট্টাচার্য, আসতেন স্বর্ণকমল ভট্টাচার্য।

একদিন অরণি অফিস থেকে বেরিয়ে হ্যারিসন রোড উঠেছি, ট্রাম ধরবো, এক ভদ্র লোক বললেন 'পরিচয়' অফিসে একবার চলুন গোপালদা আপনার সঙ্গে একটু কথা বলবেন। ন্যাশনাল বুক এজেন্সিতে গিয়ে গোপালদাকে পেয়ে গেলাম। গোপালদা অর্থাৎ গোপাল হালদার। গোপালদা বললেন—'আপনার গদ্য আমাদের ভাল লাগে, আমাদের ইচ্ছা আপনি পরিচয়ে বুক রিভিউ করুন।' আজ বলছি গোপালদার প্রস্তাবে আমি উল্লসিত হইনি—উদ্বিগ্ন হয়েছিলাম। পরিচয়! সম্ভ্রান্ত পরিচয়। পুস্তক সমালোচনার জন্য বিখ্যাত পরিচয়! তাইতে আমাকে পুস্তক সমালোচনার জন্য আমন্ত্রণ জানানো হচ্ছে! আমি এ কাজের যোগ্য তো? পারবো তো? অরুণদাকে জিজ্ঞাসা করলাম—অরুণদা সাহস দিলেন। একদিন চলে গেলাম পরিচয়ে। গোপালদা হাতে ধরিয়ে দিলেন নরেন্দ্রনাথ মিত্রের উপন্যাস 'দ্বীপপুঞ্জ'। বললেন—নিজের সাহিত্যবোধের কাছে খাঁটি থাকবেন। আমি মন দিয়ে বইটি দুবার পড়ে লিখে ফেললাম আমার প্রথম পুস্তক সমালোচনা। পরের দিন পরিচয় অফিসে গিয়ে গোপালদার হাতে দিয়ে এলাম। ইত্যবসরে এম. এ. পরীক্ষার ফল বেরিয়ে গেল। ফল আশানুরূপ হয়নি, তবে খুব খারাপও হয়নি। মধ্যে ঘটে গেছে দুটি ঘটনা ফরাসী কম্যুনিস্ট পার্টির পলিটব্যুরোর সদস্য গারোদি ঘোষণা করেছেন কম্যুনিস্টদের পৃথক নন্দনতত্ত্ব বলে কিছু নেই। তা নিয়ে চারিদিকে

আলোচনা শুরু হয়েছে। আর তার পরেই পার্টির স্বাধীনতা-উত্তর কলকাতা কংগ্রেসে বি. টি. রণদিবে ভারতীয় কম্যুনিস্ট পার্টির নতুন তত্ত্ব ও নতুন রণনীতি নিয়ে উদিত হলেন। শেষ হল পূরণচাঁদ জোশির আমল। না পারি তা ঠেলতে, না পারি তা গিলতে। আমরা প্রায় বিশ্বাস করে ফেললাম বিপ্লব দরজায় কড়া নাড়ছে। খুলে দিলেই সে ঢুকে পড়ে। মানসিক বিশূন্যতার মধ্যে বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বিদায়। মনে মনে নন্দী ভৃঙ্গীকে (সত্যেন্দ্রনাথ মজুমদার) অনুকরণ করে, সেখান থেকেই ভঙ্গি ভাষা ধার করে বিদায় অভিশাপের একটা প্যারডি লিখে ফেললাম। বিশ্ববিদ্যালয় যেন দেবযানী আমি যেন কচ। বিদায়কালে বিশ্ববিদ্যালয় আমায় বলছে :

—যে বিদ্যার তরে
মোরে কর অবহেলা, সে বিদ্যা তোমার
সম্পূর্ণ হবে না বশ—তুমি শুধু তার
ভারবাহী হয়ে রবে করিবে না ভোগ,
শিখাইবে, পারিবে না করিতে প্রয়োগ।

কচরূপী আমি বললাম :

আমি বর দিনু দেবী, তুমি সুখী হবে,
একশ বৎসর তুমি ক্রমে প্রসবিবে।

ইতিমধ্যে পরিচয়ে দ্বীপপুঞ্জের সমালোচনা বেরিয়ে গেল। আমি যেটা জানতাম না, বা আমাকে যেটা বলা হয়নি সেটা এই যে বইখানি প্রথমে দেওয়া হয়েছিল মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়কে। মানিকবাবু বইটি পড়ে সমালোচনা না করে ফেরত দিয়েছিলেন। আমার সমালোচনার জল অনেক দূর গড়ালো। আমার দিক থেকে তার ফলও হল বিচিত্র। আপনাদের আগ্রহ থাকলে সে কাহিনী বারান্তরে বলা যাবে।

চার্বাক আর ইহসুখবাদ

রামকৃষ্ণ ভট্টাচার্য

চার্বাকরা কি ইহসুখবাদী ছিলেন? ইহসুখবাদ বলতে বোঝাচ্ছি hedonism। এই মত অনুযায়ী : সুখই জীবনের একমাত্র লক্ষ্য। মনের সাধ মিটিয়ে পান-আহার-মৈথুনই জীবনের সারকথা, তার বাইরে আর কিছু নেই—এ হলো ইহসুখবাদের সবচেয়ে স্থূল রূপ। মতটি আসলে এত খেলো নয়। হেডনিজম-এর সপক্ষে অতীত ও বর্তমানের অনেক দার্শনিকই অনেক কথা লিখে গেছেন। এই একই মতবাদের নানা শাখাও আছে।[১] চার্বাকরাও কি এমনি কোনো দলের ইহসুখবাদী ছিলেন?

সাধারণভাবে অনেকে সেই কথাই বিশ্বাস করেন। চার্বাকদর্শন নিয়ে আর কিছুই হয়তো জানা নেই, তবু একটি শ্লোক অনেকেই শুনেছেন :

> যতদিন বাঁচবে সুখে বাঁচবে; ধার করেও ঘি খাবে। দেহ একবার ছাই হয়ে গেলে, সে আর কোথায় (বা, কোথা থেকে) ফিরে আসে?

কয়েকটি সংস্কৃত কাব্যে ও নাটকে—ব্রাহ্মণ্য (বেদপন্থী) ও জৈন দুধরণের লেখকই—চার্বাকদের স্থূল ইহসুখবাদী রূপে হাজির করেছেন। কাপালিকদের সঙ্গেও তাদের যোগ ছিল, কোনো যৌন-অনাচারই বাদ যেত না—এমন কথাও বলা হয়েছে।

চার্বাকদের নিজেদের লেখা খুব একটা পাওয়া যায় নি। তবে কয়েকটি রচনার টুকরো উদ্ধৃতি থেকে তাঁদের মতামত মোটামুটি খাড়া করা যায়। কেউ কেউ মনে করেন, তেমন একটি চার্বাকসূত্র হলো : "কামই একমাত্র পুরুষার্থ (জীবনের লক্ষ্য)"। কেউ আবার বলেছেন : না, চার্বাকরা দুটি পুরুষার্থ মানতেন, অর্থ আর কাম। দুটি সূত্রের মধ্যে ফারাক আছে। তবে কাম বা সুখই যে জীবনের এক বা অন্যতম লক্ষ্য—একথা থেকেই যায়।[২]

চার্বাকরা কেন একথা ভাবতেন? ব্রাহ্মণ্য মতে, জীবনের লক্ষ্য হওয়া উচিত চারটি। অর্থ ও কাম তো বটেই, তার সঙ্গে ধর্ম ও মোক্ষ। চার্বাকরা সে দুটিকে বাদ দেন কেন? তার সপক্ষে একটি অনুমানেরও আশ্রয় নেওয়া হয়। চার্বাকদের একটি সূত্র বহুবার বহু জায়গায় পাওয়া গেছে। সেটি হলো : "পরলোকের বাসিন্দা (অর্থাৎ অমর আত্মা) নেই, তাই পরলোকও নেই।" এর থেকেই কেউ কেউ সিদ্ধান্ত করেছেন : যারা পরলোক মানে না, তাদের নরকের ভয় নেই, সুতরাং, ইহলোকে যা-ইচ্ছে-তাই করে চলাই তাদের পক্ষে স্বাভাবিক। পাপ-পুণ্যের বোধ না থাকলে, দেহসুখকেই একমাত্র সুখ বলে মনে হতে পারে। স্বর্গসুখের লোভে ইহজীবনে তারা নিজেদের বঞ্চিত করতে রাজি নয়। অমর আত্মা না মানলে পুনর্জন্ম মানার কোনো দায় থাকে না। সুতরাং পুনর্জন্মের হাত থেকে মোক্ষ বা মুক্তি পাওয়ার কথাও ওঠে না।

বস্তুবাদের সঙ্গে ইহসুখবাদের যোগ অন্যত্রও আবিষ্কার করা হয়েছে। ইওরোপের প্রাচীন দার্শনিকদের মধ্যে এপিকুরোস (খ্রি. পূ. ৩৪২-২৭০, ইংরিজি উচ্চারণে : এপিকিউরাস)

সম্পর্কেও একই ধরণের কথা চালু আছে। তাঁর নাম থেকেই ইংরিজিতে একটি শব্দ তৈরি হয়েছে : 'এপিকিওর'। শব্দটি দিয়ে বোঝায় : যে লোক ভালো খাবার দাবারে সুখ পায়। এপিকুরোস ছিলেন বস্তুবাদী দার্শনিক। সুতরাং ভারতের বস্তুবাদীরাও যে একই রকমের ইহসুখবাদী হবেন—সে আর বিচিত্র কি? যারা ধর্মকর্ম, স্বর্গ নরক মানে না, তারা তো স্থূল ইহসুখবাদী হবেই।

সব মিলিয়ে তাই এই সিদ্ধান্তই চালু হয়েছে যে চার্বাকরা ছিলেন স্থূল ইহসুখবাদী। যাবতীয় সাক্ষ্যপ্রমাণ ও দৃষ্টান্তই যেন সেই দিকে আঙুল দেখায়। রিশার্ড গার্বে ও মৈসূর হিরিয়ান্না-র কাছে অভিযোগটি অবাস্তব মনে হয়েছিল,[৩] কিন্তু লোকের কানে সে কথা পৌঁছয় নি। ভারতীয় দর্শনের বইপত্রে চার্বাকদের চূড়ান্ত স্থূল ইহসুখবাদী বলেই দেখানো হয়। তাই বিষয়টি নিয়ে আরও একবার আলোচনা করা দরকার।

প্রথমেই বলে রাখি, চার্বাক ও ইহসুখবাদের যোগ সম্পর্কে গোটা ধারণাটিই মিথ্যে। চার্বাকরা আদৌ স্থূল ইহসুখবাদী ছিলেন না। ইহসুখবাদী বলে তাঁদের মার্কা মারার মতো নির্দিষ্ট ও গ্রাহ্য কোনো তথ্যপ্রমাণ নেই। বস্তুবাদী হলেই তাকে ইহসুখবাদী বলে দাগিয়ে দাও; তাতেই তাকে যথেষ্ট হেয় করা যাবে—দর্শনের ইতিহাসে এই খেলাটিই বরং বারে বারে দেখা যায়।

এবার এই চলতি ধারণার খণ্ডনে একে একে যুক্তি-তথ্য হাজির করা যাক।

আগেই বলা হয়েছে, *চার্বাকসূত্র*-এ সঙ্কলিত কয়েকটি সূত্র ঘুরে ঘুরে বহু লেখায় আসে। একমাত্র সেগুলিকেই প্রামাণ্য বলে ধরা যায়। 'কামই একমাত্র পুরুষার্থ' এই 'সূত্র'টি প্রথম পাওয়া গেছে সদানন্দ কাশ্মীরক-এর *অদ্বৈতব্রহ্মসিদ্ধি* (সতেরো শতক)-তে। তার আগে *গীতা*, ১৩।২২-এর টীকায় শ্রীধর, মধুসূদন সরস্বতী ও নীলকণ্ঠ একই ধরণের কথা বলেছেন (অন্য টীকাকাররা অবশ্য এমন কিছু লেখেন নি)। আর 'অর্থ ও কাম (এ দুটি হলো) পুরুষার্থ'—এই 'সূত্র'টি দেখা যায় চার্বাকবিদ্বেষী এক বৈদান্তিক নাট্যকার, কৃষ্ণমিশ্র-র *প্রবোধচন্দ্রোদয়* (এগারো শতক)-এ। চোদ্দ শতকে এরই প্রতিধ্বনি করেছেন সায়ণ-মাধব।

দুটি 'সূত্র'রই প্রামাণিকতা নিয়ে সন্দেহ হয় এই কারণেই। একই সূত্রগ্রন্থে কি দুটি সূত্র পাশাপাশি ছিল? কখনোই তা সম্ভব নয়; যে কোনো একটি থাকার কথা। কোন্‌টি? সময়ের বিচারে মনে হতে পারে 'অর্থ ও কাম (এ দুইই হলো) পুরুষার্থ'—এটিই আদিরূপ। তাহলে প্রশ্ন উঠবে : *গীতা*-র তিন ভাষ্যকার ও সদানন্দ কাশ্মীরক 'অর্থ'-কে বাদ দিলেন কেন?

একই 'সূত্র'-র দুটি আলাদা রূপ দেখে বরং উল্টো সন্দেহ হয় : দুটি 'সূত্র'ই আসলে চার্বাকবিরোধীদের মনগড়া, *চার্বাকসূত্র*-এ দু-এর কোনোটিই ছিল না। এই সন্দেহের ন্যায্য কারণ আছে। চার্বাকরা অবশ্যই বস্তুবাদী ছিলেন, ধর্ম বা মোক্ষ তাঁদের মানার কথা নয়। কিন্তু তার মানে কি এই যে, তাঁরা স্রেফ অর্থ ও/বা কাম-কে জীবনের লক্ষ্য বলে মনে করতেন? উল্টে বলা যায় : পুরুষার্থ-র ধারণাতেই তাঁদের কোনো আস্থা ছিল না—ঠিক যেমন অপবর্গ (মুক্তি)-র ধারণাটিও তাঁদের পক্ষে অবান্তর। কোন্ দুঃখে তাঁরা 'মরণই অপবর্গ' 'অর্থ ও বা কাম-ই পুরুষার্থ'—এমন 'সূত্র' রচনা করতে যাবেন? এই পারিভাষিক শব্দগুলি

তাঁদের নয়। সূত্রগ্রন্থে এমন 'সূত্র' থাকার কোনো অবকাশ নেই।

সুতরাং এই দুটি 'সূত্র'-র ভিত্তিতে চার্বাকদের ইহসুখবাদী বলা যায় না। কিন্তু প্রশ্ন উঠতে পারে : চার্বাকরা তো পরলোকেও বিশ্বাস করতেন না। তবু তাঁদের সূত্রগ্রন্থে 'পরলোকের বাসিন্দা নেই অতএব পরলোক নেই'—এই সূত্রটি এল কী করে? লক্ষ্য করার বিষয় হলো, এখানে পরিষ্কার বলা হচ্ছে : পরলোক নেই, তার কারণ হিসেবে বলা হয়েছে : যেহেতু অমর আত্মা বলেও কিছু নেই। ব্রাহ্মণ্য, বৌদ্ধ ও জৈন নির্বিশেষে বহু দার্শনিক (এখনও পর্যন্ত আমার জানা সাতজন) এই 'সূত্র'টির উল্লেখ করেছেন। 'সূত্র'-র পাঠ হুবহু এক, একটি অক্ষরেরও এধার-ওধার হয় নি। কিন্তু অর্থ ও/বা কাম বিষয়ক 'সূত্র' দুটি সম্পর্কে সে-কথা বলা চলে না। ফলে সন্দেহ থেকেই যায়।

সন্দেহর আরও কারণ আছে। চার্বাকদের নিন্দে করে নৈয়ায়িক জয়ন্তভট্ট (ন শতক) বলেছিলেন : ওরা ইতিবাচক কিছুই বলে না, শুধুই নেতিবাচক কিছু কথা বলে।[৫] এই অভিযোগের মধ্যে কিছু সত্য আছে। জয়ন্তভট্ট দুটি দৃষ্টান্ত দিয়েছিলেন। চার্বাকরা বলেন : "ধর্ম (আচরণ) করা ঠিক নয়', "তার (ধর্মের) উপদেশে বিশ্বাস করা উচিত নয়"। কিন্তু ধর্ম আচরণ না করে মানুষ কী করবে সে-বিষয়ে চার্বাকরা কিছু বলেন নি—এইটিই জয়ন্ত ভট্ট-র আপত্তি। এদিক থেকেও পরোক্ষে প্রমাণ হয় : অর্থ ও/বা কামই পুরুষার্থ—এমন ইতিবাচক কোনো 'সূত্র' চার্বাকদের সূত্রগ্রন্থে ছিল না।

এ তো গেল 'সূত্র'-র কথা। 'ধার করেও ঘি খাবে'—এই বিখ্যাত রচনাটির কী হবে? শ্লোকটি প্রথম পাওয়া গেছে *বিষ্ণুধর্মোত্তর মহাপুরাণ*-এ।[৬] সেখানে কিন্তু 'ধার করেও ঘি খাবে'—এমন কথা নেই। তার বদলে আছে : 'মৃত্যুর অগোচর কিছু নেই'। তারপর আরও বারোটি জায়গায় শ্লোকটি নানা পাঠভেদসমেত পাওয়া গেছে। কিন্তু কোথাওই ধার করে ঘি খাওয়ার কথা ওঠেনি। এটি পাওয়া যায় একমাত্র সায়ণ-মাধব-এর *সর্বদর্শনসংগ্রহ*-এ (চোদ্দ শতক)। তাঁর আগে বা পরে কেউ অমন কথা লেখেন নি। সবচেয়ে মজার কথা হলো : সায়ণ-মাধব নিজে একই অধ্যায়ে শ্লোকটি দুবার উদ্ধৃত করেছেন, প্রথমবার আছে : "মৃত্যুর অগোচর কিছু নেই", দ্বিতীয়বার "ধার করেও ঘি খাবে"। ফলে ঐ শ্লোকটি দিয়ে কিছুই প্রমাণ হয় না।

তবু কেউ খুঁতখুঁত করতে পারেন : ধার করে ঘি খাওয়ার কথা না-হয় বাদই দিলুন, "যতদিন বাঁচবে সুখে বাঁচবে"—একথা তো বলা হয়েছে।

ঠিক কথা। কিন্তু সুখে বাঁচা মানেই যে গাণ্ডেপিণ্ডে গেলা—এমন ধরা হচ্ছে কোন্ যুক্তিতে? সুখ কি শুধু আহার-বিহার থেকেই আসে? ইন্দ্রিয়সুখ ছাড়াও মননচর্চার সুখও তো আছে।

এইখানে আমরা এপিকুরোস-কে স্মরণ করতে পারি।[৭] তার জীবনযাত্রার ধরণ ছিল খুবই সাধাসিধে, খেতেন শুকনো রুটি, উৎসব-পরবের দিনে একটু পনির (চীজ)। তবু তাঁর নামটিকে স্থূল দেহসুখের সঙ্গে এক করে দেওয়া হয়েছে। তার কারণ একটাই : সুখকেই তিনি জীবনের লক্ষ্য বলে মনে করতেন। এপিকুরোস-এর খুব বেশি লেখা পাওয়া যায় নি। তবে তাঁর

কিছু চিঠি পাওয়া গেছে। তার একটিতে দেখা যায় : সুখ বলতে তিনি মননচর্চার সুখকেই বুঝিয়েছেন, ইচ্ছেমতো মাছ খাওয়া নয়।[৭]

যেমন এপিকুরোস-এর ক্ষেত্রে, তেমনি চার্বাকদের ক্ষেত্রেও 'সুখ' কথাটির অপব্যাখ্যা করা হয়েছে—এমনই মনে হয়।

বুদ্ধের সমসাময়িক দার্শনিক, অজিত কেসকম্বল (সংস্কৃত : কেশকম্বলী)-কে ভারতের আদি বস্তুবাদী বলে ধরা যায়। আত্মা, পরলোক, পুনর্জন্ম ইত্যাদি তিনিও মানতেন না। কিন্তু তিনি যে ইহসুখবাদের কথা বলতেন—এমন কোনো প্রমাণ নেই। বরং তাঁর পোশাক থেকে মনে হয় : শরীরকে কষ্ট দেওয়াই ছিল তাঁর লক্ষ্য। তার জন্যেই তিনি গরমকালে গায়ে দিতেন একটা কুটকুটে কম্বল (এর থেকেই তাঁর উপনাম হয়েছিল কেসকম্বল)।

তবু, জৈনরা তাঁর অনুগামীদের সম্বন্ধে লিখে গেছেন : দেহসুখ নিয়েই তারা মত্ত থাকে।[৮]

আসলে শুধু অজিত কেসকম্বল নন, যাবতীয় বিরোধীদের সম্পর্কেই জৈন সমালোচনার বাঁধা গত হলো : দেহসুখ নিয়েই তারা মত্ত থাকে।

বিরোধীদের হেয় করার এই একই কৌশল অন্য এক ক্ষেত্রেও দেখা যায়। সাংখ্যদর্শন নিয়েও ঠাট্টা করে একটি শ্লোক আছে :

> সর্বদা হাসো, পান করো, খেলা করো, আনন্দ করো, সব বিষয় উপভোগ করো, ভয় করো না। যদি তোমার কপিলমত জানা থাকে, তাহলে তুমি মোক্ষও পাবে, সুখও পাবে।[৯]

চার্বাকমত তথা যাবতীয় বিরোধী মতকেই এইভাবে খাটো করার চেষ্টা হয়। প্রতিপক্ষকে ঘায়েল করার জন্যে এটি একটি বাঁধা কায়দা : চরিত্রহনন।

আমাদের যুক্তিতে সন্তুষ্ট না হয়ে কেউ হয়তো চার্বাকদের নামে প্রচলিত অন্য একটি শ্লোকের কথা বলতে পারেন :

> হে চারুলোচনে, পান করো; খাও, হে বরগাত্রি (সুন্দরী), যা অতীত তা আর তোমার নয়। হে ভীরু, যা চলে গেছে তা আর ফিরে আসে না; এই কলেবর (আগুন, বাতাস, মাটি জল-এর) সমষ্টিমাত্র।[১০]

কোনো নারীকে উদ্দেশ করে কথাগুলি বলা হয়েছে। দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় অনুমান করেছিলেন : এইভাবে, কোনো নারীকে সম্বোধন করে কিছু বলা একমাত্র তান্ত্রিক সম্প্রদায়ের রচনাতেই দেখা যায়।[১১] এর খেই ধরে তিনি তান্ত্রিক-কাপালিক ও লোকায়তর মধ্যে একটা সম্পর্কও টেনেছেন।

অত্যন্ত দুঃখের সঙ্গে বলতে হচ্ছে : দেবীপ্রসাদ একটু ভুল করেছেন। এই সুনয়নার সঙ্গে তন্ত্র-র কোনো সুদূর সম্বন্ধও নেই। শ্লোকটির পেছনে একটি গল্প আছে। এক নাস্তিক প্রত্যক্ষ ছাড়া আর কোনো প্রমাণ মানতেন না। তাঁর স্ত্রী কিন্তু যাবতীয় ধর্মীয় আচার মানতেন; কেন, কী করে—এসব প্রশ্নের ধার ধারতেন না। একদিন, তাঁর স্ত্রীর ভুল ধারণা ভাঙানোর জন্যে, তাঁকে সঙ্গে নিয়ে বেরিয়ে গভীর রাতে, শহরের পথে, হাতের আঙুল দিয়ে সেই নাস্তিক ধুলোর ওপর নেকড়ের পা-এর ছাপ এঁকে দিলেন।

পরদিন সকালে উঠে, সব বিদ্বান লোকজন অনুমান করলেন : এ তো নেকড়ের পায়ের ছাপ। নাস্তিকটি তখন তাঁর স্ত্রীকে বললেন :

এই জগৎ যতখানি, ততখানিই ইন্দ্রিয়গোচর (অর্থাৎ চোখ, কান ইত্যাদি দিয়ে জানা যায়)। ভদ্রে, বিদ্বানরা যাকে নেকড়ের পা বলছেন, সেটি দ্যাখো।

এর পরের শ্লোকেই সেই স্ত্রীকে 'চারুলোচনে' ইত্যাদি সম্বোধন করা হয়েছে।

মূল বক্তব্য খুবই স্পষ্ট : আগে প্রত্যক্ষজ্ঞান না থাকলে কোনো অনুমান আদৌ নির্ভরযোগ্য নয়। নেকড়ের পা-এর দাগ যে মানুষের আঁকা—এটি না জানার দরুণ বিদ্বান লোকেরাও বিভ্রান্ত হয়েছিলেন। নাস্তিকের স্ত্রী কিন্তু বুঝতে পারলেন : তাঁদের অনুমান ভুল, কারণ তিনি তো নিজের চোখে দেখেছেন : ঐ পায়ের ছাপ তাঁর স্বামীর আঁকা।

এরই সূত্র ধরে সেই নাস্তিক তাঁর স্ত্রীকে বোঝালেন : কী খাবে আর কী খাবে না, অখাদ্য খেলে নরক যেতে হবে—এসবই ভুল ধারণা, কারণ এসব বিধিনিষেধের পেছনে কোনো প্রত্যক্ষ জ্ঞান নেই। আর মানুষের দেহ হলো চারটি ভূতের সমষ্টি, মৃত্যুতেই সব শেষ হয়ে যায়, পরলোকে যাওয়ার মতো কিছু পড়ে থাকে না। তাই ধর্মীয় নিষেধ মেনে 'আজ বেগুন খেতে নেই, কাল কুমড়ো খাওয়া বারণ—এসব কথায় কান দিয়ে লাভ নেই।'

গল্পটি অনেক পুরনো। *মহাভারত*-এও এর উল্লেখ আছে (শান্তিপর্ব, পুণা প্রামাণিক সংস্করণ ১৩২।১.২; প্রচলিত সংস্করণে ১৩৪।২)। নেকড়ের পায়ের ছাপ নিয়ে শ্লোকটি পাওয়া গেছে খ্রিষ্টীয় ছ শতকের বই-এ। আরও অন্তত এগারোটি জায়গায় এটি পাওয়া যায়। এখানে মূল প্রশ্নটি দার্শনিক : কোনো প্রত্যক্ষ প্রমাণ ছাড়া স্রেফ অনুমান ও শাস্ত্রবাক্যে আস্থা রাখা যায়, না যায় না? উত্তর : যায় না, প্রত্যক্ষই সবচেয়ে বড় প্রমাণ। তার সমর্থন না থাকলে অনুমান ও শাস্ত্রবাক্যে আদৌ ভরসা করা যায় না।

এরই অনুসিদ্ধান্ত হলো : আহার-বিহার সম্পর্কে সব ভয়ই অমূলক। পান থেকে চুন খসলে নরকে যেতে হবে, এই দুর্ভাবনা বৃথা। গল্পটিতে সেই কথাই বলা থাকে। এর সঙ্গে তন্ত্র বা ইহসুখবাদ—কোনোটিরই কোনো সম্পর্ক নেই।

এবার আসা যাক শেষ, আর সবচেয়ে জটিল প্রশ্নে। চার্বাকমতের সঙ্গে তন্ত্র, বিশেষ করে কাপালিক ধ্যান-ধারণার কোনো যোগ আছে কি?

কথাটা শুনলে প্রথমে অবাক লাগবে। কিন্তু হরপ্রসাদ শাস্ত্রী এমন অনুমানই করেছিলেন।[১২] তাঁকে অনেকটাই সমর্থন করেছেন দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়।[১৩] ব্যাপারটিকে অস্বীকার করেও একটু দ্বিধাদ্বন্দ্বে ছিলেন দক্ষিণারঞ্জন শাস্ত্রী। শেষে তিনি অনুমান করেছেন : "অধঃপতিত চার্বাকগণ" কালক্রমে তাদের চারিত্রিক বল হারিয়ে ফেলে আর কাপালিকদের মতোই অবাধ যৌনসঙ্গমে রত হয়। আগে ধর্মের সঙ্গে চার্বাকদের কোনো যোগ ছিল না, পরে 'ধূর্ত চার্বাক'-রা কাপালিকদের উৎসবে যোগ দিতে থাকে।[১৪] এর সপক্ষে কোনো তথ্য তিনি হাজির করেন নি—সমস্তটাই আন্দাজ।

"চার্বাক-তান্ত্রিক অক্ষ' ব্যাপারটি শুরু হয়েছে *বার্হস্পত্যসূত্রম্* অর্থাৎ *বার্হস্পত্য অর্থশাস্ত্রম্*

(বারো শতক নাগাদ লেখা) থেকে। এ দু-এর ভিত্তিতে হরপ্রসাদ শাস্ত্রী অনুমান করলেন : অতীতে ঐ দুই সম্প্রদায়ের মধ্যে ঘনিষ্ঠ যোগ তো ছিলই, এখনও তাদের প্রভাব চলে যায় নি। যাঁদের বলা হয় সহজিয়া বৈষ্ণব, তাঁদের উদ্ভব ঘটেছিল বৌদ্ধ মহাযানের শেষ চেহারা থেকে। সহজিয়ারাও শুধু দেহতেই বিশ্বাস করেন—যেমন করতেন চার্বাকরা। এই হলো চার্বাক ও সহজিয়ার একমাত্র যোগসূত্র।

বার্হস্পত্যসূত্রম্ বইটি যে অনেকটাই জাল তার প্রথম সম্পাদক, এফ. ডবলিউ. টমাস ও ভগবদ্দত্ত সে-কথা অস্বীকার করেন নি। দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়ও লক্ষ্য করেছেন : বইটির মধ্যে অনেক পরস্পরবিরোধী কথা রয়েছে, চার্বাকদের নিন্দেও করা হয়েছে।[১৫] তবু হরপ্রসাদ শাস্ত্রী ও জুসেপ্পে তুচ্চি-র মতো তিনিও ধরে নিলেন : বইটির মধ্যে কিছু খাঁটি সূত্রও আছে।[১৬]

কী সেই খাঁটি সূত্র? তার একটি (২।৫) হলো : "অর্থ সাধনের সময়ে সর্বপ্রকারে লোকায়তিক (একমাত্র) শাস্ত্র", আর তার পরের সূত্রেই আছে : "কাম সাধনে কাপালিকই (একমাত্র শাস্ত্র)"।

এর আগে আমরা দেখেছি : চার্বাকদের দিয়ে বলানো হয়েছে : কামই পুরুষার্থ; কেউ কেউ আবার বলিয়েছেন : অর্থ আর কামই পুরুষার্থ। এখানে আবার দেখা যাচ্ছে অর্থ পড়েছে লোকায়তিকদের ভাগে; কাম কাপালিকদের। তাহলে কিসে এই সূত্র দুটিকে খাঁটি বলে ধরা যাবে? *বার্হস্পত্যসূত্রম্*-এর যে যে সূত্রে চার্বাকদের নিন্দে করা হয় (যেমন ২।৮, ৩।১৫) সেগুলোই বা খাঁটি নয় কেন? জাল বই-এর ভিত্তিতে কোনো সিদ্ধান্তই করা অনুচিত।

হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর অনুমানের দ্বিতীয় উৎস হলো : গুণরত্ন-র *তর্করহস্যদীপিকা* (পনেরো শতক)। আদতে এটি হরিভদ্রর *ষড়্দর্শনসমুচ্চয়* (আট শতক)-এর টীকা। সেখানে গুণরত্ন যা বলেছেন সেটি আরও গোলমেলে :

> প্রথমে নাস্তিকদের স্বরূপ বলা হচ্ছে। কাপালিক, ছাই ও ধুলো মাখা যোগী ও ব্রাহ্মণ ইত্যাদি থেকে নীচ জাতি পর্যন্ত কেউ কেউ নাস্তিক হয়। তারাও আত্মা, পুণ্য, পাপ ইত্যাদি মানে না। তারা বলে : জগৎ চারটি ভূত দিয়ে গড়া। কোনো কোনো ধরণের চার্বাক আকাশকে পঞ্চম ভূত বলে মানে, তারা বলে : জগৎ পঞ্চভূতে গড়া। তাদের মতে, এই ভূতগুলি থেকে মদশক্তির মতো চৈতন্য উৎপন্ন হয়। জীবগুলি (আত্মা) জলের বুদ্‌বুদের মতো। চৈতন্যবিশিষ্ট শরীরই (আত্মা)।[১৭]

কোনো কোনো চার্বাক সম্প্রদায় পাঁচটি ভূত মানতেন—কয়েকজন জৈন দার্শনিক ছাড়া আর কেউ একথা বলেন নি। ব্রাহ্মণ্য ও বৌদ্ধ রচনায় চার্বাকদের সর্বদাই ভূতচতুষ্টয়বাদী বলা হয়, ভূতপঞ্চকবাদী নয়। একটি বহু-উদ্ধৃত চার্বাকসূত্রে বলা হয়েছে : "মাটি, জল, আগুন আর বাতাস—এই চারটি হলো তত্ত্ব (মূল নীতি)।"

এর পরে গুণরত্নের লেখায় যে তিনটি সূত্র আছে, সেগুলি অবশ্য খুবই চেনা। অন্যত্র একই ভাষায় বা একটু অন্যভাবে এগুলি পাওয়া যায়। এর পরেই গুণরত্ন লিখেছেন 'ইতি'। অর্থাৎ, চৈতন্যবিশিষ্ট দেহই পুরুষ—চার্বাক মত সম্পর্কে ভূমিকার এইখানেই শেষ।

ষড়্‌দর্শনসমুচ্চয়-এর পরের শ্লোকগুলির (৮০-৮৭) টীকা এবার শুরু হবে। তা কিন্তু হয় না। গুণরত্ন ফিরে যান নাস্তিকদের প্রসঙ্গে :

> তারা মদ ও মাংস খায়, মা প্রভৃতির অগম্যাগমনও করে, প্রতি বছর একদিন সকলে জড়ো হয়ে যেমন ইচ্ছে অবাধে স্ত্রীসম্ভোগ করে। কাম ছাড়া অন্য ধর্ম তারা মানে না। তাদের নাম চার্বাক, লোকায়ত ইত্যাদি। চল আর চর্ব ধাতু দিয়ে খাওয়া বোঝায়। পুণ্য, পাপ, ইত্যাদি পরোক্ষ বস্তুজাত বিষয় তারা তত্ত্ব বলে মানে না—(এই অর্থে) তারা সেগুলি চিবিয়ে ফেলে, খেয়ে ফেলে। এর থেকেই তাদের নাম হয়েছে চার্বাক।

এর সপক্ষে গুণরত্ন ব্যাকরণের নিয়মের কথা বলেছেন (আসলে অনিয়ম—নিপাতনে সিদ্ধ)। ' "লোক" বলতে বোঝায় বিচারহীন সামান্য মানুষ। লোকায়তরা তাদের মতো আচরণ করত বলে তাদের লোকায়তিক বলে। বৃহস্পতি প্রণীত মতের কারণে তাদের বার্হস্পত্যও বলা হয়।'

এর পর শ্লোক ৮০-র ভাষ্য শুরু হয়েছে।

ব্যাপারটা ভালো করে ঠাওর করা দরকার। *ষড়্‌দর্শনসমুচ্চয়*-এর এই অধ্যায়ে 'নাস্তিক' শব্দটি নেই, 'বার্হস্পত্য'-ও না, আছে শুধু 'চার্বাক' (শ্লোক ৮৫) আর 'লোকায়ত' (শ্লোক ৮০, ৮৭)। গুণরত্ন কিন্তু শুরু করেন নাস্তিকদের স্বরূপ দিয়ে। তার মধ্যে পড়ে : কাপালিক, যোগী আর চার্বাক। কিন্তু প্রশ্ন হলো : চার্বাকদের মতের সঙ্গে কাপালিক ও যোগীদের কী মিল ছিল? তাঁরা কি জগৎকে চতুর্ভূতের সমাহার বলতেন? বস্তু থেকে চৈতন্য উৎপন্ন হয়—এমন দাবি করতেন? তার কোনো প্রমাণ পাওয়া যায় না। বরং কাপালিক ও যোগীরা যথাক্রমে শক্তি ও শিবের উপাসক ছিলেন, তাঁদেরই জগতের স্রষ্টা বলে মানতেন—এর ভূরি ভূরি প্রমাণ আছে সাহিত্যে, ভাস্কর্যে, গত কয়েকশ বছরে প্রত্যক্ষদর্শীর বিবরণে। বারো শতকের পরে কোনো চার্বাকপন্থীর খোঁজ মেলে না। কিন্তু কাপালিক ও যোগীদের রমরমা তার পরেও এতটুকু কমেনি, বরং বেড়েছে। গোটা ভারতেই তাদের সাক্ষাৎ পাওয়া যায়, কিন্তু কোনো চার্বাকের সন্ধান মেলে না। তাই চার্বাকরা কাপালিকদের দলে ভিড়ে অবাধ যৌনাচার করে বেড়াতেন, মদ-মাংস খেতেন—এমন গল্পের কোনো ভিত্তি নেই। বরং চার্বাকদের নামে চালু লোক-গাথায় আমিষ খাওয়ার নিন্দেই করা হয়েছে।[১৮]

'চার্বাক' বা 'লোকায়ত'-র ব্যুৎপত্তি সম্পর্কে গুণরত্ন যা লিখেছেন, তাও নিঃসংশয় নয়। 'লোকায়ত' শব্দটি বহু প্রাচীন, পালি ও বৌদ্ধ সংস্কৃত সাহিত্যেও সেটি পাওয়া যায়। 'চারুবাক্' থেকে 'চার্বাক' শব্দটি এসেছে—এমন মতও চালু আছে।[১৯] সব মিলিয়ে বলা যায় : গুণরত্নের ব্যাখ্যা আদৌ সর্বসম্মত নয়। আর নাস্তিকদের সম্পর্কে তিনি যা লিখেছেন তার কোনো কথাই *ষড়্‌দর্শনসমুচ্চয়*-এ নেই।

দক্ষিণারঞ্জন শাস্ত্রীও এই ব্যাপারটা বুঝেছিলেন। তিনি মনে করতেন : আদি চার্বাকরা ছিলেন শুদ্ধবুদ্ধি, শুদ্ধাচারী ও নির্মল, আর কাপালিকরা "অতি বীভৎস ঘৃণীর্হ ধর্মানুষ্ঠানপরায়ণ"। ফলে তিনি প্রথমে সিদ্ধান্ত করেছিলেন : "চার্বাকগণের প্রতি বিদ্বেষ-বশতঃই বোধ হয়

বেদপন্থিগণ ইহদিগকে ঘৃণিত কাপালিকদিগের সহিত সমান মর্য্যাদা এবং কেহ কেহ বা সমান-আখ্যা পর্যন্ত দিয়েছেন।"[২০]

এই হলো সহজ সত্যি কথা। চার্বাকমত একটি দার্শনিক তত্ত্ব, প্রচলিত সব রকম ধর্মেরই তা বিরোধী। সে-ধর্ম বেদপন্থী না বেদবিরোধী—সে বিবেচনা তার নেই। আর কাপালিক, যোগী থেকে শুরু করে, সহজিয়া, আউল-বাউল ইত্যাদি যাবতীয় দেহতত্ত্ববাদী কোনো-না-কোনো সাধনপদ্ধতির অনুগামী। হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর প্রভাবে দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় এই সাধন-পদ্ধতির দিকটিকেই বেশি গুরুত্ব দিয়েছেন :

> লোকায়ত বলতে ঠিক কি বোঝা হবে? কোন একটি বিশিষ্ট মত, না, কোন এক-প্রকার সুপ্রাচীন সাধন পদ্ধতি? উভয় সম্ভাবনার পক্ষেই সুস্পষ্ট সাক্ষ্য বর্তমান। অতএব তার কোন একটি সম্ভাবনাকে ঐকান্তিক সত্যের মর্যাদা দেওয়া অবশ্যই অসঙ্গত হয়।[২১]

দেবীপ্রসাদ তাই দুধরণের সাক্ষ্যকেই সমান গুরুত্ব দেন। "কিন্তু", তাঁর বিবেচনায়, "সাধন-পদ্ধতির ইঙ্গিতসূচক সাক্ষ্যগুলি মোটের উপর প্রাচীনতর"।[২২] এর দরুণ লোকায়ত-র দার্শনিক দিকটিকে তিনি গৌণ করে ফেলেছেন। লোকায়তিকরা যে "জটিল বিচার-বিতর্কের সাহায্যে দেহাত্মবাদ সমর্থন করতেন"—একথা মানতে তিনি নারাজ। তাঁর মনে হয়েছে : সহজিয়া-কাপালিক প্রভৃতি "সম্প্রদায়ভুক্ত সাধকদের ন্যায়দর্শনসম্মত বাদ-প্রতিবাদের পদ্ধতিতে বিশেষ পারদর্শী বলে কল্পনা করার কোনও কারণ নেই। পক্ষান্তরে, সে-কল্পনা উক্ত সাধন পদ্ধতির স্বরূপ নির্ণয়ের পরিপন্থীই হবে।"[২৩]

তাহলে চার্বাকদের দার্শনিক মতবাদের সপক্ষে অত সূক্ষ্ম যুক্তিতর্ক এলো কোথা থেকে? দেবীপ্রসাদ মনে করেন : এগুলিকে "প্রধানাংশে লোকায়ত-বিরোধীদেরই উদ্ভাবন বলে বিবেচনা করাই যুক্তিসঙ্গত।"[২৪] পূর্বপক্ষ স্থাপনের জন্য তাঁরাই নতুন নতুন যুক্তি উদ্ভাবন করেছিলেন ও পরে নিজেরাই সেগুলি খণ্ডন করেছিলেন।

দেবীপ্রসাদ যখন এসব কথা লেখেন তখনও চক্রধরের *ন্যায়মঞ্জরী-গ্রন্থিভঙ্গ* টীকা ছেপে বেরয় নি। বাদিদেবসূরি-র *স্যাদ্‌বাদ-রত্নাকর*, অনন্তবীর্য-র *সিদ্ধিবিনিশ্চয়টীকা* তাঁর কাছে ছিল না। এগুলিতে দেখা যায় : ভট্ট উদ্ভট নামে *চার্বাকসূত্র*-র এক টীকাকার কত জটিল তর্ক করতে পারতেন। অবিদ্ধকর্ণ নামে এমন এক চার্বাকপন্থীর কথা কমলশীলের *তত্ত্বসংগ্রহপঞ্জিকা* ও অন্যত্র আছে। ঐ একই নামে একজন নৈয়ায়িকের কথাও পাওয়া যায়। উদ্ভটভট্ট প্রসঙ্গে চক্রধর আরও এক চার্বাকপন্থী টীকাকারের নাম করেছেন। তিনি হলেন ভাবিবিক্ত। চক্রধরের মতে, ইনি ছিলেন 'চিরন্তন চার্বাক', অর্থাৎ উদ্ভট-এর মতো অভিনব কায়দায় নয়, প্রথাগতভাবেই তিনি চার্বাকসূত্রগুলির ব্যাখ্যা করেছিলেন।[২৫]

ভাবিবিক্ত নামে একজন নৈয়ায়িক-এর কথাও পাওয়া গেছে। অবিদ্ধকর্ণর মতোই, এঁরও কোনো বই পাওয়া যায়নি। ফলে অবিদ্ধকর্ণ ও ভাবিবিক্ত নামে দুজন নৈয়ায়িক ও দুজন লোকায়তিক ছিলেন কি না, না-কি এঁরা দুজনেই নৈয়ায়িক থেকে চার্বাকপন্থী, বা চার্বাকপন্থী থেকে নৈয়ায়িক হয়েছিলেন—এ ব্যাপারে নিশ্চিত কিছুই বলা যাচ্ছে না।[২৬] তবে তাঁরা যে

কোনো সাধনপদ্ধতির সঙ্গে যুক্ত ছিলেন না, দার্শনিক তর্কেই ব্যস্ত ছিলেন—তাঁদের রচনার টুকরো টুকরো উদ্ধৃতি থেকে এটুকু অন্তত স্পষ্ট। সাধনপদ্ধতির সমর্থনে গিয়ে চার্বাকমতের দার্শনিক দিক-টিকে দেবীপ্রসাদ অযথাই ছোটো করে দেখেছেন।

চার্বাক বিষয়ে তাঁর শেষ লেখাতে দেবীপ্রসাদের মত বদলায় নি। তিনি বইটি শেষ করেছেন এই বলে :

> ভদ্রসমাজের বাইরে আজো আমরা আউল-বাউল-সহজিয়া প্রভৃতি নানা নামে যে-সব 'দেহতত্ত্বে'র গান শুনি, তার মধ্যে প্রাচীন চার্বাক লোকায়তিকদের মূল কথা কোনোভাবে টিকে আছে কিনা—তা নিয়েও গভীরতর গবেষণার প্রয়োজন বেড়ে চলেছে। এরা বর্ণাশ্রম ব্যবস্থা মানে না, দেহ ছাড়া আত্মা বলে কিছু মানে না, কৃষকদের কানে যে গান পৌঁছে দিতে চায় তার একটা বড়ো কথা হলো : 'নিজের চোখে দেখতে চাই।'[২৭]

আউল বাউল ইত্যাদি নিয়ে গবেষণা অনেক হয়েছে ও হচ্ছে। কিন্তু সব আলোচনা থেকেই যে-কথা বেরিয়ে আসে সেটি এই : আগাগোড়াই এসবই হচ্ছে গুহ্য *সাধনপদ্ধতি*, চার্বাক মত কিন্তু প্রথম থেকে একটি স্পষ্টবক্তা *দর্শন*। এমন হতেই পারে যে একই উৎস থেকে ঐ দর্শন ও সাধনপদ্ধতির মূল দু-একটি তত্ত্ব পাওয়া গিয়েছিল। কিন্তু তার মানে এই নয় যে, চার্বাক মত আদতে একটি সাধনপদ্ধতি, পরে দর্শন। বা এমনও নয় যে, দেহতত্ত্বর গানে প্রাচীন চার্বাক-লোকায়তিকের মূল কথা টিকে আছে। একই অপরিণত উৎস থেকে, পরস্পরের মধ্যে কোনো যোগ না রেখে, একদিকে এক সাধনপদ্ধতির, অন্যদিকে একটি দর্শনের বিকাশ ও বিস্তার হয়েছে—এমনটি ঘটা অসম্ভব নয়। দেহকে বড় করে দেখার ঐতিহ্য আউল-বাউল-সহজিয়া ইত্যাদির বাইরেও আছে। দক্ষিণ ভারতের রসেশ্বর দর্শন সম্প্রদায় একমাত্র দেহকেই গুরুত্ব দিয়েছেন। রস (অর্থাৎ পারা) খেয়ে তাঁরা শিবত্বলাভ বা 'জীবন-মুক্তি'-র সাধনা করতেন।[২৮] কিন্তু এটিও এক সাধনপদ্ধতি। চার্বাকমতের সঙ্গে তার কোনো যোগ নেই। কেউ তেমন অনুমান করেছেন বলেও জানি না।

চার্বাকদর্শনের মূল কথা হলো : যে-কোনো আপ্তবাক্যকে প্রমাণ বলে না-মানা। আর আউল-বাউল ইত্যাদি সাধনপদ্ধতি ঘোরতর গুরুবাদী, মারফতি। গুপ্ত আচারগুলি পালন করে কী হবে—এ প্রশ্ন তোলার কোনো জায়গা সেখানে নেই। সাধনপদ্ধতিতে নিজের বিচার-বিবেচনার দরকার পড়ে না; গুরুর কথামতো চলাটাই কাজ। চার্বাকদর্শনের মূল প্রতিপক্ষ যাবতীয় বেদপন্থী ষড়্‌দর্শন (মীমাংসা, বেদান্ত, ন্যায়, বৈশেষিক, সাংখ্য, যোগ) আর সেই সঙ্গে জৈন ও বৌদ্ধ দর্শন সম্প্রদায়। ধর্মমত নয়, দার্শনিক মত নিয়েই যাবতীয় তর্ক চলে, তার মাধ্যমও 'বড় ঐতিহ্য'-র সংস্কৃত ভাষা, কোনো আঞ্চলিক ভাষা নয়। আউল-বাউল সম্প্রদায়ের সঙ্গে বৈদিক বা প্রতিষ্ঠিত ধর্মমতগুলির বিরোধ আছে—কিন্তু সে সবই সাধনপদ্ধতি ও বিশ্বাসের ব্যাপারে। এগুলি 'ছোটো ঐতিহ্য'-র সাধনপদ্ধতি, সূত্র-ভাষ্য-টীকা নয়, গ্রাম্য ভাষার সাঙ্কেতিক পদ্য বা গানই তাঁদের ধ্যানধারণা প্রকাশের একমাত্র বাহন। এতরকমের তফাত তো অগ্রাহ্য করা যায় না।

সার কথা দাঁড়াল এই : চার্বাকরা স্থূল ইহসুখবাদী ছিলেন—একথা কখনোই বলা যায় না। ভারতের আদি বস্তুবাদী, অজিত কেসকম্বল বরং দেহকেই কষ্ট দিতেন। পরবর্তীকালে চার্বাকরা সুখে থাকার কথা অবশ্যই বলে থাকতে পারেন, কিন্তু তার সপক্ষে কোনো একটি সূত্রও পাওয়া যায় না। যেসব কবি-নাট্যকার (হেমচন্দ্র, কৃষ্ণমিশ্র, শ্রীহর্ষ) তেমন ইঙ্গিত করেছেন, তাঁরাও তেমন কোনো উৎস নির্দেশ করতে পারেন নি। আর বস্তুবাদী হলেই ইহসুখবাদী হতে হবে—এমন কোনো বাধ্যবাধকতা নেই।[১৯] জীবনে সুখ আর দুঃখর মধ্যে সুখই শ্রেয়—একথা চার্বাকরা নিশ্চয়ই মনে করতেন। ঈশ্বর বা মোক্ষ লাভের জন্যে উপোস, তপস্যা ইত্যাদি আচারে তাঁদের বিশ্বাস ছিল না। ধর্মাচারের নামে কৃচ্ছ্রসাধন আর অবাধ ইন্দ্রিয়ভোগ—এ দু-এর মাঝামাঝি একটা পথ ধরে এগোতে বলেছিলেন বুদ্ধ। চার্বাকরাও যে সে-পথের পথিক ছিলেন না তা কে বলতে পারে? চার্বাকমতের ঘোর বিরোধী বিভিন্ন ধর্মমতের দার্শনিক (শঙ্করাচার্য, শান্তরক্ষিত, প্রভাচন্দ্র প্রমুখ) চার্বাকমতকে নানাভাবে আক্রমণ করেছেন, কিন্তু তাঁদের কেউই লোকায়তিকদের ইহসুখবাদ নিয়ে কোনো মন্তব্য করেন নি। তার থেকেও আমাদের সিদ্ধান্তই সমর্থিত হয়।

টীকা

১. বিস্তৃত বিবরণের জন্যে Richard B. Brandt, 'Hedonism', *The Encyclopedia of Philosophy,* ed. Paul Edwards, London; Macmillan, Vol 3, 1967, দ্র.। প্রাচীন দার্শনিকদের মধ্যে আরিস্টিপ্পোস, এপিকুরোস, ও রেনেসাঁস-পরবর্তী ইওরোপীয়দের মধ্যে লক, হব্‌স্‌, হিউম, বেন্থাম ও মিল ছিলেন ethincal hedonist (ঐ, পৃ. ৪৩২)।

২. চার্বাকসূত্র বিষয়ে আগেই আলোচনা করেছি ("চার্বাকসূত্র : পুনর্গঠনের দিকে", *অনুষ্টুপ,* বর্ষ ৩৫ সংখ্যা ৪, ২০০১, পৃ. ১-৪০)। এ বিষয়ে যাবতীয় উদ্ধৃতি ও উল্লেখের হদিশ এখানেই পাওয়া যাবে।

৩. Richard Garbe, "Lokayata", *Encyclopedia of Religion and Ethics*, ed. James Hastings, Edinburgh : T & T Clerk, 1953 (first ed. 1915), Vol. VIII, p. 138; M. Hiriyanna, *Outlines of Indian Philosophy*, Bombay : George Allen & Urwin, 1973 (first pub. 1932), p. 195.

৪. জয়ন্তভট্ট, *ন্যায়মঞ্জরী,* বারাণসী : সম্পূর্ণানন্দ সংস্কৃত বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৮২, ভাগ ১, আহ্নিক ৪, পৃ. ৩৮৮।

৫. বিস্তৃত উৎস নির্দেশের জন্যে "*'rnam krtva ghrtam pibet'*—Who said this?", *Journal of Indian Council of Philosophical Research.* Vol. XIV No. 1, September-December 1996, pp. 170-74 দ্র.।

৬. Frederick Albert Lange, *The History of Materialism*, London: Kegan Paul, Trench, Trubner & Co., 1925, p. 103; Bertrand Russell, "The Road to Happiness", *Portraits from Memory and Other Essays*, London : George Allen and Urwin Ltd., 1956, pp. 198-202 দ্র.।

৭. "Letter to Menoeceus", in Diogenes Laenteus, *Lives of Eminent Philosophers,* London : William Heinemann, 1926, p. 657.

৮. "Ajita Kesakambala : Nihilist or Materialist?", *The Journal of the Asiatic Society,* Vol. XLI No. 1, 1999, pp. 74-83 দ্র.।

৯. *সাংখ্যকারিকা* ৩৭ প্রসঙ্গে *মাঠরবৃত্তি*-তে এটি উদ্ধৃত হয়েছে। রাজশেখরসূরি সেখান থেকে এটি তাঁর *ষড়দর্শনসমুচ্চয়*-এ পুনরুদ্ধৃত করেছেন।

১০ বিশদ আলোচনার জন্যে "Haribhadhra's *saddarsanaSamuccaya* : Verses 81-84 : 4 Study", *Jain Journal*, Vol. XXXVI. No. 3, January, 2002, pp. 134-148 দ্র.।

১১. দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়, *লোকায়ত দর্শন*, খণ্ড ১ (দ্বিতীয় সংস্করণ), কলকাতা : নিউ এজ পাবলিশার্স, ১৯৬৯, পৃ. ১৬৭।

১২. Haraprasad Sastri, *Lokayata* (1926) in *Cárváka/Lokáyata*, ed. Debiprasad Chattopadhyaya and Mrinal Kanti Gongopadhyaya. New Delhi : Indian Council of Philosophical Research, 1990, pp. 377-383.

১৩. টী ১১, পৃ. ৬৬-৬৯, ৮৫-৯৩।

১৪. দক্ষিণারঞ্জন শাস্ত্রি, "কাপালিক ও চার্বাক", *চার্বাক দর্শন*, কলকাতা : পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ, ১৯৮২, পৃ. ১৭৪-৮৫।

১৫. *Barhaspatya Sutra*, ed. F. W. Thomas with Intro. etc. by Bhagvad Datta. Lahore : Motilal Banarsidass. 1921, pp. 8, 17.

১৬. টী ১১, পৃ. ৮।

১৭. *Saddarsana-Samuccaya with Tarkarahasyadípiká*, ed. L. Suali, Calcutta : The Asiatic Society, 1986 (first published 1905-14), p. 300.

১৮. সায়ণ-মাধব, *সর্বদর্শনসংগ্রহ*, অধ্যায় ১, শ্লোক ১১। *বিষ্ণুপুরাণ*, ৩।১৮।২৪-২৯-এ নাস্তিকমতের যে বিবরণ আছে সেখানেও যজ্ঞে পশুবধের নিন্দা করা হয়েছে। পদ্মপুরাণ সৃষ্টিখণ্ড, ১৩।৩২৫-২৭-এ একইভাবে মদ-মাংস খাওয়ার নিন্দে করা হয়েছে বৃহস্পতির মুখ দিয়ে।

১৯. তবুও এই ব্যুৎপত্তিটি নিয়েছিলেন হেমচন্দ্র (এগারো শতক)-এর ব্যাকরণ থেকে। চারুবাক্ > চার্বাক— এই ব্যুৎপত্তির জন্যে সর্বানন্দ পাঠক, চার্বাকদর্শন কী শাস্ত্রীয় সমীক্ষা, বারাণসী : চৌখম্বা বিদ্যাভবন, ১৯৯০, পৃ. ৪১ দ্র.।

২০. টী ১৪, পৃ. ১৭৪। চার্বাকদের সম্পর্কে শুষ্কবুদ্ধি ইত্যাদি বিশেষণের উৎস : *বিষ্ণুপুরাণ* ২।৬।১২ (ঐ, পৃ. ১৭৪ টী. ৩)। অন্যত্রও দক্ষিণারঞ্জন লিখেছেন : "ধারণা হয়, এই [চার্বাক] সম্প্রদায়ের মতামতগুলি নিন্দক ও বিরোধী পক্ষের হস্তে পড়িয়া কিছুটা বিকৃত হইয়াছে, কখনও কখনও কতকগুলি অশোভন মতামত বৃহস্পতির স্কন্ধে আরোপিত হইয়াছে।" "চার্বাক দর্শন (জড়বাদ)", *প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য দর্শনের ইতিহাস*, সর্বেপল্লী রাধাকৃষ্ণন্ প্রভৃতি সম্পা., খণ্ড ২, কলকাতা : এম. সি. সরকার অ্যাণ্ড সন্স, ১৩৬৬, পৃ. ১৫০।

২১. টী. ১১, পৃ. সাত।

২২. ঐ, পৃ. আট। *মৈত্রী উপনিষদ্*-এ এধরণের অনেক সাধক সম্প্রদায়ের উল্লেখ আছে। ঐ, পৃ. ৮৫-৮৮ দ্র.।

২৩. ঐ, পৃ. এগারো।

২৪. ঐ, পৃ. বারো।

২৫. "ভারতে বস্তুবাদ : চার্বাকের পরে", *অর্কিড*, বর্ষ ২১, সংখ্যা ২, জানুযারি ১৯৯৮ পৃ. ৬১-৬৫।

২৬. Eli Franco. *Dharmakírti On Compassion and Rebirth*. Wien (Vienna) : Arbeitkreis fuer Tibetische and Buddhistische Studien. Universitaet Wien. 1997. pp. 99. 142; *New Catalogus Catalogorum*. Madras . University of Madras, Vol. I, 1968, pp. 426-27-এ দুজন অবিদ্ধকর্ণ-র কথা আছে : একজন চার্বাক,

অন্যজন নৈয়ায়িক।

২৭. দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়, *ভারতে বস্তুবাদ প্রসঙ্গে*, কলকাতা : অনুষ্টুপ প্রকাশনী, ১৯৯৩, পৃ. ২১১।

২৮. সর্বদর্শনসংগ্রহ (টী. ১৮), অধ্যায় ৯। K. Vasudeva Sastri, Intro., *Anandakandam*, Tanjore, 1952, pp. VI-VIII. বিশেষ করে বইটির উল্লাস ২০ দ্র.।

২৯. একজন ইতালীয় মার্কসবাদী মনে করেন : নৈরাশ্যবাদ আর ইহসুখবাদ দুইই বস্তুবাদের অঙ্গ। Sebastiano Timpanaro, *On Materialism*, London : Verso, 1980, p. 66. কথাটি ঠিক বলে মনে হয় না। কার্যকারণ সম্পর্কে বিশ্বাস আর অ-লৌকিকে অবিশ্বাস—এই দুটি দিক বরং বস্তুবাদের প্রাথমিক শর্ত। K. Campbell, 'Materialism' in *The Encyclopedia of Philosophy* (টী. ১), Vol. 5, p. 179 দ্র.।

কৃতজ্ঞতা স্বীকার : রিঙ্কু চৌধুরী, সিদ্ধার্থ দত্ত।

গল্পের গণতন্ত্র

কার্তিক লাহিড়ী

আদিত্য লিখতে গিয়ে থেমে যাচ্ছে।

কেমন একটা ভয় জাপাটে ধরতে চাইছে—যা লিখতে চাচ্ছে তা কি তার বিশ্বাসের পরিপন্থী হয়ে উঠবে? পাঠক পড়ে বলবে, এতদিনে আদিত্যর আসল রূপ বেরিয়ে পড়ছে, বড় বড় কথা বলতো খুব, এঁড়ে তর্ক করতো যেন পান থেকে চুন খসে পড়লে মহাভারত অশুদ্ধ হয়ে যাবে, বিশ্বাস আদর্শের ভিত পুরো ধ্বসে পড়বে। আর সে ডুবতে থাকবে অকূল পাথারে, তাই কোনোরকম শৈথিল্য নয়, আদর্শের প্রতি একনিষ্ঠ থাকতে হবে, নইলে সমূহ সর্বনাশ।

চারপাশে তাকিয়ে অবশ্য সে তেমন সর্বনাশের কোনো চিহ্ন দেখতে পায় না, চলার গতি তেমনি আছে, থামার লক্ষণ নেই কোনো। চলতে গেলে কিছুটা আপোশ করতেই হয়, তাতে ক্ষতি-ও হয় না, বরং আদর্শের বনিয়াদ কত দৃঢ় তা পরীক্ষিত হয়ে যায় ঐ ভাবে।

আদিত্য জানে তা, কিন্তু জানলেও মন মানতে চায় না, রুখে ওঠে, একবার আপোশ করলে বার বার আপোশ করতে ইচ্ছা জাগবে, কারণ আপোশে স্বস্তি মেলে—সাময়িক হলেও আরাম পাওয়া যায়, তাতে মনের গিঁট-ও আলগা হয়ে পড়ে একটু, আর মন একবার ঢিল দিতে শুরু করলে কি যে কোথায় গিয়ে গড়াবে—কে বলতে পারবে তা? আপোশে ঝক্কি কমে, মসৃণ হয় এগনো, ফলে একের পর এক ঐ রাস্তা ধরতে হয় সামান্য সমস্যায় পড়লেই—আদর্শ-ফাদর্শ তখন চুলোয় যায়, আর মজা এই যে বোঝাই যায় না কখন একজন এই চোরাবালিতে পা রেখেছে।

আদিত্য তাই থেমে যাচ্ছে, যা লিখতে যাচ্ছে, সেটা কি বিশ্বাস করে সে? লেখার সঙ্গে বিশ্বাসের তো একটা যোগসূত্র থাকে, সেটা ছিঁড়ে গেলে মারাত্মক স্খলন ঘটতে পারে নিজের অজান্তেই হয়ত, তখন ফেরার উপায় থাকে না আর, পতন অনিবার্য তখন।

মনে মনে আদিত্য অস্থির হয়ে ওঠে এই সব সাত পাঁচ ভেবে, ততক্ষণে সে খেয়াল করে, লেখাটা শুরুই করেনি আদৌ, আর যা লেখাই হয়নি, সেই না-লেখা লেখা সম্পর্কে কি কোনো সিদ্ধান্তে আসা যায় কখনো, নাকি তা সমীচীন? প্রবন্ধ হলে হয়ত বলা যায়—বিষয় এই, আমি এই এই যুক্তি পর পর সাজিয়ে লিখবো, শেষে সিদ্ধান্তে পৌঁছবো, বাঁধুনি শক্ত করলে লেখা বেপথে যেতে পারবে না কিছুতেই, কিন্তু—

গল্প, উপন্যাস ইত্যাদি সৃষ্টিধর্মী লেখা সম্বন্ধে সে কথা কি জোর দিয়ে বলা যায়? তবু একজন লেখক বা ঔপন্যাসিক একটা ছক তো কেটে নেন মনে মনে লেখার আগে। শিক্ষা বা নীতিমূলক বা প্রচারমূলক গল্প ইত্যাদি হলে সমস্যা তেমন হয় না, ছক অনুযায়ী লিখে গেলে-ই লেখা একটা জায়গায় গিয়ে দাঁড়ায়, কিন্তু লেখক যেখানে দ্বিতীয় ভুবন—যে ভুবন

আমাদের মতো মনে হলেও আমাদের প্রথম ভুবন নয়, যে ভুবনের পাত্র-পাত্রী থেকে শুরু করে ঘটনা সংলাপ চেনা মনে হলেও সবটা চেনা থাকে না, তেমন লেখায় শব্দের বাক্যের চরিত্রের ঘটনার পরিবেশের নানা কাটাকুটি মিলমিশে ভাবা ছক তছনছ হয়ে যেতে পারে যে কোনো মুহূর্তে।

লেখা হচ্ছে তাই যা বাঁধা ধরা রাস্তায় চলে না, বেশি বাঁধাবাঁধি করতে গেলে লেখা নিষ্প্রাণ যান্ত্রিক হয়ে ওঠে। আসল লেখা হচ্ছে তাই যা লিখতে লিখতে ফুটে উঠতে থাকে, পাপড়ি মেলতে মেলতে কুঁড়ি যেমন ফুল হয়। কখনো সখনো কলমের ডগায় চলে এলো এমন শব্দ যা গোটা লেখাটাকে দাঁড় করিয়ে দেয় একেবারে অন্য জায়গায়, যা ভাবা যায়নি তেমন কিছু হয়ে যায় শেষে যেন,—হাঁস ছিল, সজারু,...হয়ে গেল 'হাঁসজারু'...কি করে এ রকম হয় তার থৈ মেলা ভার, কিন্তু হয়ে যায়...

এ রকম যদি কিছু হয়। শঙ্কা মাথা চাড়া দিয়ে উঠতে চায় তবু, আদিত্য অস্থির হতে থাকে, এভাবে চললে লেখাই বন্ধ হয়ে যায় একদম, নাকি এ হচ্ছে লেখা থেমে যাওয়ার পূর্বাভাস?

লেখার জন্য এতদিনের লালিত বিশ্বাস আদর্শ বিসর্জন দিতে হবে? ভাবতে গিয়ে একটু থমকায়, কিন্তু বিশ্বাস আদর্শ অর্জনের আগেই তো সে লেখা শুরু করে, তাহলে? সামনে তেমন কাউকে পেলে জিজ্ঞেস করতে পারতো, কিন্তু সে-ই কি উত্তর দিতে পারতো?

আদিত্য কোনো দল বা গ্রুপের সঙ্গে যুক্ত নয়। কলেজ জীবনে যাদের সঙ্গে মিশতো, তারা অবশ্য খুব গরম গরম বক্তৃতা দিত, কাজ করার বদলে কি করা উচিত তা বলতে বলতে তাদের শক্তি, উৎসাহ মিইয়ে যেত কিছুক্ষণ বাদে। এরা বাক্‌সর্বস্ব এবং অন্তঃসার-শূন্য জীবই ছিল না কেবল, নিজের সুবিধা নেবার জন্য যে-কোনো স্তরে নামতে কসুর করতো না। সে নিজেই একটা কিছু ঠিক করে নিতে থাকে চারপাশের অনাচার সুবিধাবাদ ইত্যাদি দেখতে দেখতে, আর আস্তে আস্তে তাই তার আদর্শ বিশ্বাসে দানা বাঁধতে থাকে, এবং নিজেই মনে মনে তুলে ফেলে খবরদারির এক পাঁচিল—এটা করা উচিত নয়, এটা বলা, যেন তা করলে বা বললে প্রতিক্রিয়ার হাত শক্ত হবে খুব।

কিন্তু প্রতিক্রিয়ার হাত-এর মানে খুঁজতে গিয়ে দিশেহারা হয় বেশ। মধ্যে মধ্যে বিদ্রোহী হয়ে উঠতে চায়, সব ভেঙে ফেলে একটা কিছু...হাত নিশপিশ করে, পাছে কিছু ক্ষতি হয়ে যায়, সেই ভয় উঁকি মারতে থাকে, আদিত্য চুপচাপ স্থিতাবস্থাই বজায় রাখে তাই...

কিন্তু এখন অন্য সময়, মুখ দিয়ে কথাটা স্ফুট হয়ে গেলে একটু তাজ্জব বনে, তাই তো, লেখা হচ্ছে লেখা, প্রথমে লিখে ফেলতে হবে, তারপর ভাবা—লেখাটা কেমন হল কি বলতে চায় ইত্যাদি, তাছাড়া

আর এই প্লটটা তো পড়ে পাওয়া চোদ্দ আনার মতো, ভোরবেলা আধো ঘুমের মধ্যে গল্পের আদলটা দেখা দেয়, কোনো খাটাখাটুনি করতে হয়নি এজন্য।

এতক্ষণে আদিত্য সুস্থির হচ্ছে, আউট-লাইনটা লিখে ফেলা উচিত, প্রথমে কাঠাম তৈরি হোক, তারপর না হয় চাপানো যাবে মাটি রং চালচিত্র ইত্যাদি। আদিত্য লিখে চলে—

১. নাম পরিমল, বয়স ২৫/২৬, বাপ-মা-র একমাত্র সন্তান, বি. এ পাশ এবং বেকার

চাকরির চেষ্টা করছে, ২/১ জায়গায় আশ্বাসও পেয়েছে, এক জায়গায় কথা প্রায় পাকা হয়ে এসেছে—সামনের হপ্তায় জয়েন করবে, সেল্‌স্‌-এর কাজ, ঘুরতে হবে খুব তবে পশ্চিমবঙ্গের মধ্যে—বাঁকুড়া, বীরভূম, পুরুলিয়া, বর্ধমান, মেদিনীপুর, হাওড়া, হুগলির নানা শহর ও গঞ্জে।

তা এতে সে অখুশি নয়, বের হলেই হাতে কিছু আসবে, আর এ ঘোরা তো কোম্পানির পয়সায়, গাঁটের পয়সা খরচ করতে হবে না, নতুন নতুন জায়গা দেখা হয়ে যাবে উপরন্তু, তবে সেল্‌ দেখাতে হবে, নইলে

নিজের উপর তার বিশ্বাস আছে, লোকের সঙ্গে মিশতে পারে খুব, শুধু মেশেই না সাহায্যের হাত বাড়িয়েই থাকে সর্বদা, আজ কাকে হাসপাতালে নিয়ে যেতে হবে, কার বিল জমা দিতে হবে, অসীমের কাকাবাবুকে স্টেশনে নিয়ে যাওয়া, ওর পিসি-কে পৌঁছে দেওয়া, আর কত শত কাজ করে সে নির্বিবাদে

পরিমল নম্র, বিনয়ী এবং ভদ্র, তার উপর হাসিখুশি চটপটে, লোকের উপকার করতে এক পায়ে খাড়া, এমন মানুষকে ভালো না বেসে পারা যায় না, প্রতিদানে পরিমল কিছু আশা করে না, যেন তার মূল মন্ত্র হচ্ছে—কাজ করে যাও, ফলের আশা করো না, ওর রক্তের ভিতরে বয়ে চলে কিছু করা করতে পারার আকুলতার স্রোত, সেই স্রোতে বীজ উপ্ত হয়, সামান্য হাসি কথায় তা অঙ্কুরিত হয়ে ফুলে ফলে ছেয়ে যায়, পরিমল নিজেকে ধন্য মনে করে, ধন্য হয় পরের জন্য কিছু করতে পারায়, কিন্তু

কি হল সেদিন? সাত সকালে কয়েকটা মারকুটে যুবক পরিমলকে টানতে টানতে বাড়ির বাইরে বের করে আনে, রাস্তায় শুইয়ে মেরে চলে কিল চড় ঘুষি, তার আর্তনাদে দু-একটা বাড়ির দরজা জানলা খুলে যায় বটে, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে বন্ধ হয়ে যায়, আর যুবকরা মারতে মারতে গালাগালি দিতে দিতে পরিমলের পেটে বুকে শরীরের যেখানে খুশি ছোরা বসিয়ে দেয়, তারপর—

বোমা ছুঁড়তে ছুঁড়তে পলকে উধাও হয়, পরিমল শব হয়ে পড়ে থাকে রাস্তার উপর, এগিয়ে আসে না কেউ কোনখান থেকে তবু...

২. বিপুল বেশ ঘর-কুনো, সাতে পাঁচে থাকে না কারো;

সরকারি অফিসের ছোট করণিক সে, মেশে না কারোর সঙ্গে, যেটুকু না করলে নয় মাত্র সেটুকুই কাজ করে,

আড্ডা মারে না, ক্যান্টিনে গিয়ে গেঁজায় না ঘন্টার পর ঘন্টা, চায়ের পেয়ালার ঝড় তোলে না কখনো, চুপচাপ বসে থাকে নিজের সিটে

জিজ্ঞেস করলে জবাব দেয়, নইলে বোবা একেবারে—স্পিকটি নট্‌, অন্যের ব্যাপারে নাক গলায় না, ইউনিয়নের মেম্বার হতেও চায়নি, অগত্যা হয়েছে, কিন্তু ইউনিয়ান অফিসে যায়নি কোনোদিন বা তাদের কাজকর্ম সম্পর্কে কৌতূহলী হয়নি মোটে, গুটিয়ে থাকে নিজের মধ্যে, দোল দুর্গোৎসব কোনো উৎসবেই সে মাতে না, হাউসিং বা পাড়ার লোক তাই তাকে

চেনেই না বললে হয়।

অবশ্য ছেলেবেলা থেকেই বিপুল ঐ রকম—মুখচোরা, লাজুক, অমিশুক, হয়ত নিজের সামান্য তোতলামি ঢাকতে সে এ রকম ভঙ্গি নেয়, জানে, মিশলেই বিপদ বাড়বে, বন্ধুবান্ধবরা ঠাট্টা করবে, খেপাবে এবং ভেঙাবে, অতএব নিজেকে দূরে সরিয়ে রাখে।

এভাবে সরতে সরতে নিজে একা হয়ে যায়, নির্বিকার ও উদাসীন চার পাশে কী হচ্ছে না হচ্ছে তাতে কি এসে যায় তার? পৃথিবী রসাতলে গেলেই বা কি, কিংবা রসাতল উঠে এলেও কোনও ধ্যাও-চ্যাও নেই তার, কে মরলো কে বাঁচলো—তাতে বা তার কি? শুধু তাই নয়, চোখের সামনে কিছু ঘটলেও নিমেষে সে পাশ কাটিয়ে চলে যায়, এমনকি বাড়ির ব্যাপারেও সে সমান উদাসীন, ঘটা না-ঘটায় সে তেমনই থাকে যেমন ছিল আগে।

তো সেদিন, একদল মারকুটে যুবক হৈ হৈ করে ঢুকে পড়ে তার ঘরে, তাকে টেনে নিয়ে আসে বাইরে, রাস্তায় ফেলে মারতে যাবে এমন সময় ওদের চেয়ে আরও হৈ চৈ হট্টগোল করতে করতে আর এক দঙ্গল যুবক এসে পড়ে, ওদের দেখেই প্রথম দল হাওয়া, চিহ্ন কোথাও থাকে না তাদের, দ্বিতীয় দলের ছেলেরা বিপুলকে মাটি থেকে তুলে দাঁড় করায়, আর বিপুল রক্ষাকারীদের দিকে এক পলও না তাকিয়ে সোজা ঢুকে যায় অন্দরে

দরজা বন্ধের শব্দ শোনা যায় রাস্তা থেকেও তখন...

লেখা শেষ হলেও আদিত্য হাল্কা বোধ করে বেশ। এবার গোটাটা পড়তে হবে, তারপর ঠিক করতে হবে—কোথায় বাড়ানোর দরকার কোথায় ছাঁটার। এতক্ষণ ধস্তাধস্তি করে এতটুকু লিখতে পেরেছে—এটাই যথেষ্ট, না লিখলে তো লেখা ছেড়ে দেবার কথা ভাবতে হত শেষমেশ। একবার যখন কাঠামটা দাঁড় করিয়েছে, তখন মাটি চাপাতে দোমাটি করে রং চাপিয়ে চোখ ফুটিয়ে প্রাণ প্রতিষ্ঠা করতে বেগ পেতে হবে না, হয়ত একটু সময় লাগবে এই যা...

খুশির আমেজ নিয়ে আদিত্য পড়ে যেতে থাকে যা সে লিখে ফেলে ঝড়ের বেগে একটু আগে এখন, ঝটিতি লেখা, তবু নিজের লেখা...

পড়া শেষ হলে একটু হতাশই হয়, গল্প নয়, গল্পের খসড়া মাত্র। প্রচুর ফাঁক-ফোকর রয়েছে, তা ভরতি করতে হবে নইলে গল্প দাঁড়াবেই না। কিন্তু সে সব ভর্তি হয়ে গেলে লেখাটা অনেকখানি বদলে যাবে নিশ্চয়? ভাবতে গিয়ে আদিত্য থমকে যায়—গল্পটা যদি এমনি থাকে, তবে কি উঠে আসবে ঐ লেখা থেকে এখন?

গল্পের প্রথম অংশ অর্থাৎ ১. বলছে—সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেবার কোনো মানে হয় না, পর পর-ই হয়। যতই তুমি অন্যকে সাহায্য করো না কেন, কেউ-ই পাশে এসে দাঁড়াবে না তোমার বিপদের সময়। ও সব কেতাবি বুলি, কেতাবেই শোভা পায়।

বরং নিজেকে নিয়ে থাকাই ভালো, সমাজ সংসার থেকে মুখ ফিরিয়ে থাকলে আখেরে লাভ-ই হয়। গল্পের দ্বিতীয় অংশ অর্থাৎ ২. তাই বলছে—কাউকে সাহায্য না করলেও তোমার বিপদে ছুটে আসবে অনেক লোক।

তার মানে, আদিত্য ধাঁধায় পড়ে বেশ, বিরাট ধাঁধা—পরের জন্য ভাবলে করলে সমূহ

বিপদ, নিজেকে নিয়ে থাকলে ঝামেলা নেই কোনো, বরং স্বস্তি শান্তিতে থাকা যায়। অথচ—

সে কেন সকলেই প্রায় জেনে এসেছে এর উল্টো-টাই। কোনটা ঠিক তবে? অস্থির হয়ে ওঠে আদিত্য, তবে কি পৃথিবী আমূল পালটে গেছে? নাকি সে-ই বদলে গেছে আগাপাস্তল? নিশ্চয়ই কোথাও গোলমাল হচ্ছে, নাকি পৃথিবী ও আমি দুই-ই পালটে গেছে একসঙ্গে যুগপৎ?

নিশ্চয় বদলে গেছি, নইলে কী করে লিখলাম পরিমলের এই পরিণতির কথা? পরিমলের মতো জনপ্রিয় নম্র বিনয়ী অ-দলীয় এক শান্ত যুবক বেঁচে থাকতে পারে না কিছুতেই এখন, দল-ছাড়া মানুষের দাম আছে কি বর্তমান সময়ে?

আদিত্য আরেকবার পড়ে খসড়াটা। এটা বাতিল করে দিলে কী হয়? এমন কিছু আহামরি বিষয় নয় যা লিখলে ছাপা হলে বিপ্লব ঘটে যাবে সমাজে, সাহিত্যে?

ভাবতে বোর্ডের ক্লিপ থেকে লেখাটা খসিয়ে দুমড়ে মুচড়ে ফেলতে গিয়ে সেই মুহূর্তে থামে, যদি—

যদি পরিমলকে কোনো রাজনৈতিক দলের সদস্য করে দি, তবে? শাসক দলের, না বিরোধী দলের? শাসক দলের করলে লেখাটা হবে এক রকম, বিরোধী দলের করলে আরেক রকম। শাসক দলের করলে সুবিধা হয় অনেক—দলের ছাড়াও প্রশাসন আরক্ষার প্রশ্রয় ও সাহায্য পাবে তখন, তাহলে?

তাই তো, আদিত্য সেই ভাবে পরিকল্পনা ছকতে গিয়ে উত্তেজিত হতে থাকে? তাই তো, তখন পরিমল-কে মারা সহজ হবে না, দলের ছেলেরা ছুটে আসবে, আর ওদের দেখে পালিয়ে যাবে সমাজ-বিরোধীরা, হাঁ তারাই, শাসকদলের সমর্থক বা সদস্য না হলে তাদের ঐ ভাবে দেগে দিতে হয়। পরিমল মরবে না তবে, এবং...

কিন্তু তারা কেন বাঁচাতে আসবে পরিমলের মতো নম্র ভদ্র পরোপকারী জনপ্রিয় ছেলে-কে? দলে সে তো অনেকের পথের কাঁটা হয়ে উঠেছে, তাকে সরাতে পারলেই তো বরং...

তাহলে কি পরিমলকে বিরোধী দলের সদস্য করে দিতে হবে, কিংবা কোনো বিপ্লবী গুপ্ত সংস্থার। এটা করলে অবশ্য সহজ হয়, তখন আরক্ষা-ই ছদ্মবেশী যুবক হয়ে হামলে পড়বে পরিমলের উপর, তারপর কাগজে বিবৃতি দেবে যে...

কিংবা পরিমলকে পাচারীদের সঙ্গে যুক্ত করে দিলে...

কিংবা, কিংবা

অনেক বিকল্প ভাবা যেতে পারে, আর প্রতিটি বিকল্পের গল্প হয়ে উঠবে আলাদা আলাদা, এক এক বিকল্পে পরিমল হয়ে উঠবে এক এক রকম, তার পরিণতি-ও...

এতক্ষণে আদিত্য সুস্থির হচ্ছে। সে কলম টেনে নেয়, কাগজে ঠেকাতে গিয়ে থামে, শুধু পরিমলকে নিয়ে ভাবছি কেন? বিপুলও তো আছে। সে ঘরকুনো, উদাসীন, নির্বিকার কিন্তু মানুষ তো নিশ্চয়।

এমন লোকের কি দরকার নেই কোনো দলের? দল ছাড়া কেউ আছে কি কোনখানে? নির্দল-ও একটা দল বটে, তাই

এক এক দল এক এক ভাবে ব্যবহার করবে বিপুলকে—কেউ তার মুখচোরা ভাবের, কেউ তার উদাসীনতার, কেউ তার ঘরকুনো মনোভাবের সুযোগ নেবে, এ-ছাড়া

আরও কত কত ভাবে কাজে লাগাবে তাকে, আর বিপুলকে ঠিক ঐ রকম রাখা যাবে না শেষে, যেমন আছে খসড়ায়।

গল্পটাকে আস্তে আস্তে মুঠোয় পেয়ে যাচ্ছে যেন আদিত্য। সে ঠিক করে, যত বিকল্প হতে পারে, তার সবগুলো নিয়ে লিখে ফেলবে লেখাটা, কোথায় গিয়ে ঠেকবে শেষে আদিত্য বলতে পারবে না, তবে বুঝতে পারছে—

লেখাটা আগাগোড়া নতুন হবে, আনকোরা একেবারে, কারণ এ ধরনের লেখা কেউ লেখেনি আগে কখনো আর...

ধজা গুণ্ডা

অতীন বন্দ্যোপাধ্যায়

ধূর্জটিপ্রসাদকে নিয়ে গল্প লেখার ইচ্ছে অনেকদিনের। দু'একবার চেষ্টা করেছি—তবে গল্পটা হয়ে ওঠেনি। এই এক স্বভাব আমার, লেখার পর লেখা, বার বার লেখা। যদি হয়ে ওঠে এই আশা। ধূর্জটিপ্রসাদ যে শেষে ধজা হয়ে গেল কি কারণে? পরিণতি মানুষের কেন এমন হয়। সমাজ বৃত্তে কে সাধু কে চোর বলা বড় মুশকিল। সাম্যবাদ জনগণতন্ত্র গণতন্ত্র, ধনতন্ত্র, যেখানেই উঁকি মারি না কেন, সর্বত্র দেখি ধান্দাবাজ মানুষের মিছিল। আসলে ক্ষমতা কুক্ষিগত রাখার কোনও কৌশল দ্বারা এই জীবন আয়ত্তের মধ্যে রাখা। সভ্যতা নামক এক পচা ধ্বংসস্তূপ রক্ষার্থে অবিরল মানুষের কাতর উস্কানি। কারণ শোষণ চারপাশে বিরাজ করে—মানুষের স্বভাব, আরও চাই। কে খেল না খেল বুঝি না, আমার আরও চাই। তারই সূত্রপাতে আন্দোলন, সংগ্রাম। ধূর্জটিপ্রসাদ গোঁয়ার গোবিন্দ না হলে সংগ্রামী পুরুষ। সব গেল তার।

শোষণ চারপাশে বিরাজ করে। সব মানুষই লোভ মোহ ইন্দ্রিয়পরায়ণের বশীভূত—চাই, আরও চাই, কে খেল না খেল বুঝি না, সেকি আইন কানুনের মধ্যে সে এক বিশাল অজগর। আহার উত্তাপ আশ্রয় চাই, বাড়ি গাড়ি চাই, ব্যাংক ব্যালেন্স চাই রমণী রমণে শিরোমণি হতে চাই—সব মুঠোর মধ্যে থাকুক—মুঠো আলগা করা যাবে না। মানুষের গহন অরণ্যে সে যে কীভাবে বিরাজ করে এবং গুঁড়ি মেরে এগিয়ে যায় টের পাওয়া যায় না। নিরাপত্তা নেই জীবনে—সুতরাং যতটা পারো গ্রাস করো। ধান্দাবাজ মানুষ রাজনীতির নামে—সমাজের হিতৈষী কিংবা চক্ষুষ্মান পণ্ডিতপ্রবর যেই হোক না, তার চাই একখানা সূর্য—সূর্য বগলদাবা করে হাঁটার মধ্যে জীবনের চারপাশে কারা পড়ে থাকল তার দেখার দায় থাকে না।

অতি কথনে গল্পটি না আবার মার খায়, কারণ গল্পের জন্য এ-সব হিতৈষী কথাবার্তার প্রয়োজন হয় না। তবু ধূর্জটিপ্রসাদ কেন ধজা হয়ে যায় তার কিছু সূত্র যদি আবিষ্কার করা যায়। আসলে এটা একটা খুনের গল্প হতে পারে আবার শোষণ থেকে মুক্তির গল্পও হতে পারে। যে যেভাবে দোল খায়, দোলাচলে যে নড়ে এবং উড়ে যায়। সবুজ শস্যক্ষেত্র বিনষ্ট করার স্বভাব তার।

ধজা যে সমাজবিরোধী বোঝাই যায়। তাকে আমরা থুথু দিই মুখে। কিন্তু ধজা সমাজবিরোধী কার স্বার্থে। ধূর্জটিপ্রসাদ সমাজবিরোধী হয়ে যাওয়ায় সবার কাছে ধজা গুণ্ডা।

ধজা গুণ্ডার একটা সাইকেল আছে।

এবারে গল্পটা আরম্ভ করা যাক।

ধজা গুণ্ডা শহরে উপদ্রবের সামিল। জেলহাজত তার কাছে কোনও সমস্যা নয়। বরং কোনও কোনও সময় জেল হাজত তার আত্মরক্ষার নিরাপদ জায়গা।

পুলিশ বাবারা ধজার নামে এজাহার দিতে গেলে হম্বিতম্বি—আরে বাপু কী হবে ধরে—পেছনে তার কারা আছে জান না। যাও যাও, ভাগো। ক'জনকে পুলিশ ধরবে, কাকে ধরবে না! জেল হাজতে শালা সব বেটাদের ঢুকিয়ে দিলে বাইরে ক'টা লোক থাকে দ্যাখো। ধজা হল রামের দোসর, লম্বা লেজ, লেজে আগুন ধরিয়ে দাও, দ্যাখো লঙ্কাদহন কারে বলে।

পুলিশের আবার হুমকি—মামলা তো ধজা নিজে লড়ে না—উকিল বাবারা লড়ে। উকিল বাবারা কার পোষ্য জান না! সওয়াল জবাবে প্রমাণ চাই। সাক্ষ্য দেবে কে? কার বুকের পাটা আছে, বলে, ধজা আমার মেয়ের উপর বলাৎকার করেছে, নেশা করে দলবল নিয়ে আমার ঘরে আগুন দিয়েছে। ধজার হিম্মত আছে, একদিনে শেষ করে দিতে পারি। কিন্তু তার পৃষ্ঠপোষকদের খেপালে যে আমরাও খতম হয়ে যাব বোঝো। যাও যাও ম্যাল্লা পেঁচাল সহ্য হয় না।

ইদানিং ধজার পা খোঁড়া হয়ে যাওয়ায় খুব একটা উৎপাত করতে পারছে না। কারা ধরে রাতের অন্ধকারে বেদম প্রহার দিয়েছিল—সে আজ পর্যন্ত তা বুঝে উঠতে পারছে না। রাস্তা থেকে পুলিশ তুলে নিয়ে হাসপাতালে ফেলে রেখেছিল।

ধজার যে গোপন আশ্রয়স্থলও আছে। কলোনির গরীব-গুরবো পুলিশ এলে অনেকেই তাকে আড়াল করে রাখে। তার দলবলও আছে। সমান সমান ভাগে কাজ হয়। সে কখনও বেইমানি করে না। পণের টাকা নিয়ে গোলমাল বাধলে সে হাজির। মেয়ের বিয়ে হচ্ছে না, সে হাজির। হাসপাতাল নিচ্ছে না, সে হাজির। গরীব-গুরবোর জমি দখল হলে সে হাজির। ধজা তখন অবতার বিশেষ।

পা খোঁড়া হয়ে যাওয়ায় বিপিনবাবুর কাছে তার মূল্য কিছুটা কমে গেছে। বিপিনবাবু জবরদস্ত পার্টি নেতা—পেরাইমারি ইস্কুলের ম্যাস্টার এখন এলাকার দণ্ডমুণ্ডের কর্তা। থানায় তার একটা ফোন গেলে পুলিস বাবারা হেগে মুতে দেয়। সেই বিপিনবাবু তার প্রতি যেন আগের মতো সদয় নয়।

ছিল বেশ ধজা, ইস্কুলে যেত, কলেজে যেত, তার দাদাটা পার্টির হোলটাইমার। তাকে গঙ্গার ধারে কে বা কারা খুন করল। এমন ভালমানুষ দাদাটা খুন হয়ে যাওয়ায় সে কেন যে স্থির থাকতে পারল না।

বিপিনবাবুর তখন বেনামিতে প্রমোটারি ব্যবসা। রমরমা ব্যবসার ভাগ সবাই কিছু না কিছু পায়। নানারকম ফাণ্ডে তার দানধ্যানও মেলা। সে একটা ইংরাজি মিডিয়ামের স্কুলও করে ফেলেছে। তিন বিঘা জমিসহ তিনতলা বাড়ির দামই যে কত, ধজার হিসেবে আসে না। মাত্র দশকাঠা জমি আর পেলেই তার মুরগি পোষার কাজটা মোটামুটি সফল হয়।

তবে ধজার মাতৃভক্তি অসীম।

যদি কোনও কারণে গভীর রাতে রেলিঙ টপকে বাড়ি ঢুকতে পারে—তবে মা মা ডাক শুনলে কে বলবে, ধজা ইচ্ছে করলে প্রকাশ্য দিবালোকে মানুষের মুণ্ডু হাতে ঝুলিয়ে সাইকেলে শহর পাক খেতে পারে। দেখলে দু-পাশের মানুষজনের দরজা জানালা বন্ধ না করে উপায় থাকে না। সেই ধজা মায়ের নাগাল পেলে হু হু করে কেঁদে ফেলে—মা জননী আমার পাপ

খণ্ডন করে দিন।

অবশ্য তখন ধজা নেশায় টং হয়ে থাকে।

আর বেশি নেশা করলেই ধজা মায়ের স্নেহ টের পায়। সে যেখানেই থাকুক ঠিক হাজির হবে এবং প্রণিপাত সাষ্টাঙ্গে। ধরণী তার শেষ শয্যা এবং মাতৃআজ্ঞা শিরোধার্য। কান মলে নাকে খত দিয়ে জননীর পদপ্রান্তে পড়ে থাকে।

আজকাল ধজার সেই জননী পর্যন্ত মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে। বিপিন সার খুন। তল্লাটের ডাকসাইটে নেতা খুন—সহজ কথা!

মানুষ তো জানে না, ধজাকে এই লোকটাই কুপরামর্শ দিয়ে দাদার প্রতিশোধ চরিতার্থে লাইনে তুলে এনেছিল। এখন সেই দশকাঠা জমির দখল বিপিনবাবুর চাই। এক বুড়ি ওয়ারিশান জমিটার—সেই বাগড়া দিচ্ছে।

ধজা!

আজ্ঞে বলুন।

কী হল। মঙ্গলময়বাবুর হাত বুঝতে পারলি। বুড়ি মঙ্গলময়বাবুর কথায় চলে।

তা মঙ্গলময়বাবু তো ভালমানুষ, তাকে খতম করে কি হবে।

ধুস, তুই কিছু বুঝিস না। আমি কি তা বলেছি!

তবে।

আরে বুড়িকে খতম করে দিলেই হয়। কেউ তো বুড়ির নেই। নো ওয়ারিশান।

ওটা পারব না স্যার।

না পারলে তুইও খতম হয়ে যাবি।

তা বিপিনবাবু পারে। সে সমাজের কুলাঙ্গার, সে মরে থাকলে কেউ কাঁদবার নেই। দুষ্কৃতি দমনে পুলিস কত বেপরোয়া তারও প্রমাণ হয়ে যাবে—তাছাড়া লাইনটা যে এক বন্যা, ঢুকলে বের হবার রাস্তা থাকে না—মা জননী কিছুতেই বুঝতে চায় না।

ধজার সেই জননী পর্যন্ত মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে।

সে সাধু হয়েও যেতে পারে না।

কারণ তারে সাপে খেলেও খাবে, বাঘে খেলেও খাবে। লাইনেরই দোষ। কারও হেপাজতে থাকলে গায়ে হাত দেয় কার সাধ্য—কিন্তু শেষে কিনা একটা বুড়ির জান খতম! হয়! টোকা মারলে পোকার মতো উড়ে যাবে, এমন একটা খুন তো নাকের নস্যি, লাইনের ইজ্জতের কথাও ভাবতে হয়, বিপিন সার কি টাকার লোভে অমানুষ হয়ে গেল!

সে বলল, পারব না।

তোকে পারতে হবে।

না। পারব না।

আমাকে তা হলে চিনিস না।

চিনি, পেরাইমারি ইস্কুলের ম্যাস্টার। চিনি না আবার। পার্টির দরজায় হত্যে দিয়ে আছেন, তাই কেউ কিছু করতে পারছে না।

কি বললি।

যা বলেছি ঠিক বলেছি।

ঠিক আছে যা।

এই 'ঘা' শব্দ কত মারাত্মক সে জানে। একবার ভাবল, রাজি হয়ে যায়। স্যারের যদি দয়া হয়—আর তখনই একটা ফড়িং উড়ে গেল, কীটপতঙ্গ পা বেয়ে উপরে উঠতে থাকল, সে প্রকৃত ধজা গুণ্ডা হয়ে যেতে থাকল—আর তখনই যে কি হয় মাথা ঠিক থাকে না। ব্রহ্মতালু জ্বলতে থাকে। তারপর কি হয় সে জানে না—লোকজন ছুটতে থাকে, সবই ফেলে সে ছুটতে থাকে—অন্ধকারের কাজ অন্ধকারে সেরে সে পালায়।

ধজার সেই জননী শেষে মরেও গেল।

ধজার নামে ওয়ারেন্ট। শ্মশানে, বাড়িতে রাস্তায় পুলিস থিক থিক করছে।

সে তার জননীর সৎকারে না এসে পারে না। পুলিস হন্যে হয়ে খুঁজছে—তিন চার মাস হয়ে গেল বিপিন সার খুন, আসামী ধজা। ধজাকে রাতে কর্তার সঙ্গে অন্ধকার বারান্দায় কথা বলতে দেখেছে তার পুত্রবধূ। ধজার তো মাথার উপর বিপিন সারই ছিলেন, পুলিস তাও জানে, সে কেন তার রক্ষাকারীকে খুন করতে যাবে! কিন্তু পুত্রবধূর বয়ান, এবং ধজা গা ঢাকা দেওয়ায় সংশয় যে অমূলক না, আর ধজাকে ধরে প্যাদালে, মারতে মারতে পাছায় ঘা করে দিলে এবং গুহ্যদ্বারে ষষ্টির প্রহারে ষষ্ঠীপূজা সারলে যতই হতচৈতন্য হউক—তার মাথার উপর কেউ নেই—এটাই পুলিসের বড় সম্বল। পেটা, শালাকে ধরে পেটা, যত পারিস পেটা, পুলিস পারে না কি—জনগণ দেখুক।

ধজার নামে ওয়ারেন্ট—সে তার জননীর সৎকারে না এসে পারে না।

অবশ্য ধজা ধরা না দিলে কে তারে আটক করে!

তার তো গা ঢাকা দেবার জায়গার অভাব নেই।

আর এত বেশী মাতৃঅন্ত প্রাণ ধজার যে প্রকাশ্য দিবালোকে সে শ্মশানে এসে হাজির। মায়ের দাহকার্য হয়ে যাওয়ার পর যেন তাকে হাজতে নিয়ে যাওয়া হয়—এই ছিল তার অনুরোধ।

সেই ধজার এখন পড়তি সময়। প্রমাণ না পেলে হাজতবাস আর কতদিন—কে দেখেছে? কেউ দেখেনি।

পুত্রবধূও দেখেনি। অন্ধকারে শুধু কথা বলতে শুনেছে। তারপর কি হয়েছে জানে না।

ধজাও জানে খুনটুন করলে কি হয়, সাক্ষ্য প্রমাণ যোগাড় করাই কঠিন, যোগাড় হলেও অসার কথাবার্তা, কোর্ট মান্য করবে কেন। এত সব জানে বলেই ধজা সহজেই পার পেয়ে যায়। তবে ধজার মাথার উপর কেউ থাকল না। কারা তাকে অন্ধকারে কব্জা করে বেধড়ক পিটিয়েছে। পেটাতেই পারে। সে তো ভাল হতে চায়, লাইন ছেড়ে দিতে চায়। চাইলেই কি হয়, তাকে কে বা কারা খোঁড়া করে দিল—মাথার উপর মুরুব্বি না থাকলে যা হয়।

ধজার সেই রবরবা নেই।

তার গোপন আস্তানাগুলিও ভেঙ্গে গেছে।

ও ধজাদা, বাবার জ্বর। বাবা কেমন করছে।

ধজা ছুটত। ঘরে ঢুকে এদিক ওদিক তাকাতো। ইস, সব ফাঁক, কিছু আর রাখেনি তোর বাপ, সব বেচে খেয়েছে।

কী করে থাকবে, মনার চাকরি করে দেবে বলেছিলে, তার তো কিছু করলে না। বাবা তো রোগে ভোগে বিছানায়।

হবে হবে। আগে খুড়ামশাইকে হাসপাতালে পাঠাতে হয়। হাসপাতালে থেকে এসে বলত, চা খাওয়া ঢুপি।

তখনো ধজা সেই সব কলোনি অঞ্চলে সাক্ষাৎ ভগবান। সে না থাকলে রোগির পথ্য জোটে না, কারও ইস্কুলের বইখাতা হয় না। এভাবে সব হয় পুজোয় জামাপ্যান্ট শাড়ি সায়া যার যে রকমের দরকার। ধজা দু-হাতে টাকা ওড়াতো। পুলিসই খবর দিত, ধজা পালা, আজ তর মরণ।

ধজার এখন পা খোঁড়া হয়ে সব গেল।

পায়ের গিঁট ফুলে আছে। ডাক্তার হাসপাতাল কিছু বাদ রাখেনি—এক কথা, রেস্ট দরকার। গোড়ালির হাড় থেঁতলে দিয়েছিল। ঢুপির ঘরে তার যাতায়াত আছে—ঢুপির বাপ ক্যাওড়া সমাদ্দারের অভাব অনটনের সে অংশীদার। তা তার মেয়ের শরীরে হাত ফাত দেয়—দিকগা, কিন্তু ধজা আছে বলেই ঢুপিও আছে, সেও আছে। অতবড় রোগভোগ থেকে সে সেরে উঠেছে, ধজা ছিল বলে। ক্যাওড়া ওরফে খুড়ামশাই ধজা এলে খুশিই হয়।

কারা যে অন্ধকার রাতে জঙ্গল থেকে উঠে এসে তাকে কাবু করে ফেলেছিল, সেটাই রহস্য। রাত বিরেতে যখন যেখানে তার চলাচল—সঙ্গে ন্যাপা না হয় গোপলা থাকত। শালা দুটোই জেলে পচছে।

সে একা যাচ্ছিল ঢুপির কাছে। শরীরে গরম ধরে গেলে যা হয়। কী করে জানবে জঙ্গল থেকে হারামজাদা লোকগুলি উঠে এসে চেপে বসবে তার ঘাড়ে। ইস, এক মেয়েছেলের লোভে সে পঙ্গু হয়ে গেল।

ধজা দেখল, কারবালার রাস্তায় কে রিকশায় বসে হন হন করে আসছে।

আরো এতো ইস্কুলের দিদিমণি, তপতি সাহা। কলোনিতে একটা লোকের সঙ্গে স্বামী স্ত্রী সেজে থাকত। ধরা পড়লে প্যাক খেতে পারে, পাড়া ছাড়া হতে পারে ভয়েই ধজাদার স্মরণ।

আরে সুন্দরী রমণী তারে ধজাদা বলছে। ধজাদা বললে, সে আর স্থির থাকতে পারে না। তার ঘোর সৃষ্টি হয়। বাবা মার কথা মনে হয়, ভাইবোনের কথা মনে হয়—তারা কেউ আর সম্পর্ক রাখে না। তা এই নারী ধজাদা ডাকছে, সে বলেছিল, কিছু বলবেন?

একদিন আসুন না। বিকেলে। চা খাবেন।

ধজাকে এত সম্মান কেউ দেয় না। সে কাহিল হয়ে পড়েছিল।

যাব।

কথা দিন।

যাব তো বললাম।

সে গেল, কথা দিলে কথা রাখে। সব শুনে বলল, কারও হিম্মত হবে না। আপনার বাড়িতে বসে চা খেয়ে গেলাম, এটাই যথেষ্ট।

সত্যি যথেষ্ট, তপতিকে আর স্কুলের রাস্তায় কেউ টিজ করতে সাহস পায়নি। মাঝে মাঝে অবশ্য দু'একশ টাকা চাইলে দিতে হত।

সে খোঁড়া মানুষ। পা ফুলে ঢোল। দেখে না ফেলে, কাছে আসতেই সামনে কিছুটা খুঁড়িয়ে এগিয়ে বলল—দিদি দশটা টাকা দিন, হাতে কিছু নেই।

তপতি কথা বলেনি। ব্যাগ থেকে দশটা টাকা বের করে বলেছিল, আর চাইবে না। চাইলেও পাবে না। ধজা বোঝে সে খোঁড়া।

বাড়ি যদি যাই?

বাড়ি গেলেও পাবে না। তুমি খোঁড়া লোক নিজে বোঝো না।

কে যেন বলল, ধজা তোর মরণ!

ধজা এ-ভাবে কারবালার প্রান্তরে দাঁড়ালে হাজার করতালি শুনতে পায়। কেউ বাহবা দিচ্ছে, কেউ সাবাস দিচ্ছে, কেউ বলছে ভগবান। শালা সেই ভগবানের পা খোঁড়া। টনটন করছে। যেন একমণি বোঝা পায়ে কেউ চাপিয়ে দিয়েছে। পকেট গড়ের মাঠ ছিল। দুপুরে তপতিদি দশটা টাকা দেওয়ায় পঞ্চাননতলার ঠাকুরের দোকানে তড়কা রুটি হয়ে যাবে।

তড়কা রুটিতে পেট ভরে নেশা হয় না। সাঁজ লেগে গেল, আকাশে চাঁদ দেখা গেল, পেটে এক ফোঁটা মাল পড়েনি। হামলা হুজ্জোতি করে, যতই সে খোঁড়া হোক এক বোতল খেনো তার চাই। কালীতলা পার হয়ে ননীগোপালের ডেরায় সে হাজির।

আরে ধজাদা।

হুম।

সব সাঁওতাল মেঝেন, কুলি কামিন আর দু-একজন ভদ্রবাবু সার দিয়ে বসে গেছে। ভাঁড়ে ঢেলে খাচ্ছে।

সে বলল, দে, দো বোতল। লিখে রাখ।

ধজাদা!

কী রে?

আগের এক গুচ্ছের টাকা বাকি।

পা টাটাচ্ছে, পেটে মাল না পড়লে মরে যাবে। সে চিৎকার করে বলল, কী বললি? না মানে!

ঠিক আছে, দিয়ে দেব। ভ্যানর ভ্যানর করিস না।

পা-টা কেমন আছে?

ভাগ্যিস গাছের ছায়ায় অন্ধকারে দেখা যায় না, দেখলে সব যাবে। সে যে খোঁড়া, সে যে অচল মাল টের পেলে তার সব যাবে।

সেরে গেছে।

সেরে গেছে, বল কি?

কেন সারে না? সারলে তোর ক্ষতি নারে?

না দাদা, সেদিন তো দেখলাম পা গোদের মতো ফুলে আছে।

সে আর পারছে না। মাল খেয়ে বেহুঁস না হতে পারলে সে ব্যথায় মরে যাবে। পা টনটন করছে। পুঁজ রক্ত জমে থাকলে যা হয়।

ননীগোপাল একটা প্লাস্টিকের পাত্রে দু'বোতল মেপে দিলে বলল, আরে বে শালা খচ্চর ননী, পা আমার ঠিক হয়ে গেছে, দে শালা আরও দু'বোতল।

ভাল হয়ে গেছ!

দে, তাড়াতাড়ি কর।

আসলে সে আর দাঁড়াতে পারছে না। বেশিক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকলে তার অবস্থা দেখে, চোখ-মুখ দেখে টের পেয়ে যাবে—যাও দিয়েছিল, তাও কেড়ে রাখতে পারে।

এখন শরিফ মেজাজ ধজার। সে অন্ধকারেই প্লাস্টিকের পাত্রটা সাইকেলে ঝুলিয়ে চেপে বসল। কুপির আলোতে আর রাতটা দেখা যেতে পারে। কোনওরকমে পালাতে পারলে বাঁচে। শালা এ-ভাবে কেউ বাঁচে! লাইন ছেড়ে দেবে ভাবছে। কিন্তু ছেড়ে দিলে খাবেটা কী! দিনের বেলা সে অচল, ধরা পড়ে যায় যদি সে পঙ্গু, রাতে বিশেষ সুবিধা। আমি ধজা, ধজা ঠাকুর—ছাড় শালারা, কী আছে দেখি। এ-ভাবে আর কতদিন।

ধজার রোয়াবি শেষ হয়ে গেলে লোকে থুথু দেবে মুখে। চুপির বাপ ক্যাওড়া, তার খুড়ামশাই, চুপি নিজেও তার আশায় বসে থাকে।

চুপির বাপ ক্যাওড়া সমাদ্দার বারান্দায় শুয়ে থাকে। চুপি কুপির আলো হাতে নিয়ে রাস্তায় দাঁড়িয়ে থাকে। ধজাকে দেখলেই ক্যাওড়া বারান্দা থেকে বের হয়ে আসবে। চারপাশে জঙ্গল, জঙ্গলের মধ্যে মাটির টালির ঘর। মিল বন্ধ আজ পাঁচমাসের উপর। ধজা ঠাকুর উদয় হয়েছিল বলে রক্ষা। আগে চুপির গায়ে হাত-ফাত দিত, এখন অন্ধকারে মেঝেতে ক্যাওড়া নিজেই মাদুর বিছিয়ে দেয়।

বাড়ি ঢুকলেই ক্যাওড়া হাত বাড়াবে, একটা সিগারেট হবে ঠাকুর।

ধজা সিগারেট বের করে দিলে কি খুশি।

সেই ধজা আজও এল। ডাকল চুপিরে। সাড়া নেই। সে ডাকল ও ক্যাওড়া কাকা, সাড়া নেই।

কী কারণ! পা পোকায় খাচ্ছে বলে কেউ-সাড়া দিচ্ছে না। অনেক রাত, দরজা খুলে কেউ মুখ বার করল না। যে চুপি কুপি নিয়ে রাস্তায় দাঁড়িয়ে থাকে সেও নেই। সে চুপির ঘর থেকে অন্ধকারে বের হবার সময় কারা যে ধরে পেঁটাল, চুপি তো মরে গেছে ভেবে হাউমাউ কান্না, ও ধজাদাগো আমারে কার কাছে রেখে গ্যালাগো! সেই চুপি পর্যন্ত সাড়া দিচ্ছে না।

সে সাইকেলটা দাওয়ায় হেলান দিয়ে বসল। প্যান্ট টেনে দেখল জায়গাটা মাছিতে ভনভন করছে। কেমন অসাড় হয়ে গেছে। এডার নাম গ্যাংগ্রিন কিনা সে জানে না। অন্ধকারেও

টের পেল ক্যাওড়ার দরজা বন্ধ। বাইরে থেকে তালা দেওয়া না ভিতর থেকে বন্ধ। উঠে না দেখলে হবে না। কিন্তু একি! সে উঠতে পারছে না। কোনও রকম প্লাস্টিকের পাত্রটা টেনে চুমুক দিল, শান্তি। মুড়ি ফুলুরি বের করল, ওরে টুপি, গরম গরম ফুলুরি, খা। কে তোরে খাওয়াবে।

না সাড়া নেই।

গরম গরম ফুলুরি মুড়ির লোভেই বোধহয় দরজাটা খুলে গেল। বের হয়ে ক্যাওড়া সমাদ্দার রাক্ষসের মতো মুড়ি ফুলুরি খেতে থাকল। রোগে ভোগে সেও দুবলা। কেবল খিদে ছাড়া তার অন্য কোনও অস্তিত্ব নাই।

মুখে মুড়ি হাতে ফুলুরি—ক্যাওড়া কথা বলছে, টুপি নাই ধজাঠাকুর। তারে তার স্বোয়ামী নিয়া গেছে।

স্বোয়ামী, সে আবার কি।

ঐ আর কি, খেতে পরতে দেবে। হ্যাঁ মানুষ ভাল। কথা দিছে, কন্যের কষ্ট হবে না।

ধজা একেবারে দণ্ডমূর্তি ধারণ করল ঠিক, দরজায় লাথিও মারল, তবে কিছু করতে পারল না। পা ফেটে বিজবিজে রক্তপুঁজ পোকা বারান্দায় ছড়িয়ে পড়তে থাকল।

ধজা চিৎ হয়ে পড়ে আছে। আর দুর্গন্ধ। মানুষের শরীরে এত পচা দুর্গন্ধ থাকে!

মনিরুদ্দিদের নিজস্ব রাষ্ট্র

জ্যোতিপ্রকাশ চট্টোপাধ্যায়

এ গল্পটা এক নদীর। শুধু নদীর নয়, এক পথেরও। সেই নদীর গা ছুঁয়ে ছুঁয়ে চলে যাওয়া পথের। পথটা ছোট, মাটির। সে পথে মানুষ হাঁটে, ছাগল হাঁটে, গোরু-মোষ হাঁটে। একসময় ঘোড়াও হাঁটত, ঘোড়ার গাড়িও চলত। এখন চলে গোরুর গাড়ি, মোষের গাড়ি। চলতে গিয়ে গভীর করে চাকার দাগ রেখে যায়।

পথটা খুব মজার। বছরভর সেখানে হাঁটা-মানুষের গোড়ালি ডুবে যায়। বর্ষায় ডোবে কাদায় আর শীতগ্রীষ্মে ধুলোয়। তখন পায়ে পায়ে, চাকায় চাকায় ধুলো ওড়ে। ধুলোয় বাতাস ভরে যায়। দু'পাশের গাছপালার পাতা আর ঝোপঝাড় ধুলোর আস্তরণে সন্ন্যাসীর উদাসিন রঙে ডুবে যায়।

বর্ষায় সে-রঙ ধুয়ে যায়। সব আবার মায়াময় হয়ে ওঠে। সবুজ রঙের মায়া। কত রকম সবুজ! নারকেল আর সুপুরি গাছের পাতার গাঢ় সবুজের সঙ্গে কোনও মিল নেই আষ্টেল বনের নিক্তিমাপা সবুজের। প্রবীণ জাম গাছের পাতার সঙ্গে আমের কচি কলমচারার পাতার সবুজেরই বা মিল কতটুকু? কিংবা গোটা গ্রীষ্ম ঝলসে ঝলসে ক্লান্ত কুলগাছের পাতার সবুজের সঙ্গেই কি মিল পাওয়া যায় কচা গাছের চনমনে সবুজের? অথচ সবুজ তো সবাই। কতরকমের সবুজ। সবুজের মেলাই যেন বা। ঝলমলে মেলা।

গাছে গাছে ঝোপঝাড়ে সেই মেলা যখন বসে, রুক্ষ, উদাসিন সেই পথ একেবারে বদলে যায়। সে আর শুকনো থাকে না। ধুলো ওড়ায় না। বৃষ্টিতে বৃষ্টিতে কালচে রঙ ধরে তার গায়ে। গা ভ'রে কাদা জমে। মাঝে মাঝে রোদে পুড়ে শক্ত হয়ে উঠতে গিয়ে দু'দিনের বৃষ্টিতে, যেন স্নেহে আর মমতায়, আবার নরম হয়ে যায় সে। তখন আবার গোড়ালি ডুবে যায়। কাদার মুঠো থেকে পা টেনে তুলতে কষ্ট হয়। চলার গতি কমে যায়। তখন গোরু-মোষের গাড়ির চাকা, লোহার বেড়ি পরানো ভারি চাকা, কিছুক্ষণ পর পরই ফেঁসে যায়। ফেঁসে, থেমে, স্থির হয়ে যায়। তখন মাতা ধরিত্রীর গ্রাস থেকে চাকা মুক্তো করে চলা শুরু করতে প্রাণ যায় গাড়োয়ানের, গাড়িওয়ালার, গাড়ির মালওয়ালার, যাত্রীর। পেছন থেকে ঠেলে, সামনে থেকে টেনে, গোরু-মোষের ল্যাজ মুচড়ে, তার পিঠে ছড়ির বাড়ি মেরে মেরে সে চাকা তোলার কাজে হাত লাগাতে হয় সবাইকেই। হাত লাগাতে হলে নামতেই হয় কাদায়। তখন কাদায় পা ডোবে, গোড়ালি ডোবে। তখন দু'হাতে চাকা চেপে ধরে, চাপ দিতে দিতে শিরদাঁড়া আর পায়ের হাড় ভেঙে ফেলতে ফেলতে, বুকের ভেতর থেকে সব বাতাস বেরিয়ে যাওয়ার আগে বাতাসের চাপে বুক যখন প্রায় ফেটেই যায় তখন বোঝা যায়, কী কষ্ট হয়েছিল কর্ণের, কুরুক্ষেত্রে। তখন বোঝা যায় মাতা ধরিত্রীর শরীর শুধু দয়া দিয়ে গড়া নয়, অপরিসীম নির্মমও হতে পারেন তিনি।

সেইসব মুহূর্তে পথের পাশে দাঁড়িয়ে ধরিত্রীর সঙ্গে মানুষের যুদ্ধ দেখতে দেখতে মনিরুদ্দিকেই তিতিরের মনে হয় কর্ণ। তখন পথের কাদা, কাদামাখা চাকা আর কাদাময় মনিরুদ্দির শরীর মিলে মিশে একাকার। সব মিলে যেন একটাই অস্তিত্ব। এক রঙে আঁকা একটাই ছবি। শুধু আলাদা হয়ে যেতে চায় তার বুকের, হাতের, পিঠের আর পায়ের পেশী। দম বন্ধ করে সে যখন চাকাটা গড়িয়ে দিতে চায়, তার পেশীগুলো তখন ফুলে ফুলে উঠে চামড়া ফাটিয়ে বেরিয়ে আসতে চায়, যেন রাগে। তখন তিতির তাকে কর্ণ ছাড়া আর কিছুই ভাবতে পারে না। শুধু তার পিঠে তূণ নেই, তূণে বাণ নেই, মাথায় শিরস্ত্রাণ নেই। মাটিতে গেঁথে গেছে তার থ্যাবড়া, খালি পা তার পরণে রঙচটা খাটো লুঙ্গি, নগ্ন বুক পিঠ। পিঠের কালো চামড়া কেমন মোটা মোটা ঠেকে। হয়ত ঘামাচির কারণে, হয়ত মোটা বলেই, এমন মোটা যেন বর্ম।

বুড়িপিসিমার কোলে মাথা রেখে তাঁর কাছে ভূতপেত্নীব্রহ্মদত্যির গল্প যেমন শোনে, রামায়ণ মহাভারতের গল্পও শোনে তিতিররা। বুড়িপিসিমা সকলেরই বুড়িপিসিমা, যেমন তিতিরদের, তেমনি তাদের মা-মামা-মাসীদের, পাড়াপ্রতিবেশীর, গোটা গ্রামেরই। তাঁকে দেখতে খুব সুন্দর। ধবধবে ফরসা। দুধের ফেনার মতো চুল। রেখায় রেখায় আচ্ছন্ন মায়াময় প্রাচীন মুখ।

বুড়িপিসিমার গল্প বলার ভঙ্গিটি অসামান্য। তাঁর কথার আঠায় শুধু তিতিররা নয় বড়রাও আটকে যায়। এমনভাবে বলেন তিনি, গল্পের চরিত্রগুলো যেন জ্যান্ত হয়ে চারপাশে চলেফিরে বেড়ায়। ইচ্ছে করলেই যেন তাদের সঙ্গে কথা কওয়া যায়, আঙুল দিয়ে ছোঁওয়া যায়। তাদের ঘৃণা করা যায়, তাদের ভালবাসা যায়। তাদের ওপর রাগ করা যায়, তাদের সঙ্গে ঝগড়া করা যায়। কিন্তু কিছুতেই চলে যাওয়া যায় না তাদের ছেড়ে।

অন্নমাসী রান্না করছে। কোনও কারণে দেরি হচ্ছে হয়ত। সন্ধেবেলা পড়ার পালা শেষ। পশ্চিমের দালানে একতলায় রান্নাঘরের সঙ্গে লাগানো লম্বা বারান্দায় এসে জুটেছে তিতিররা। খিদের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে বাড়ছে গোলমাল। অন্নমাসীর সাড়া নেই। গোলমাল বাড়তে বাড়তে যখন মারামারি লাগে লাগে, বুড়িপিসিমা এসে হাজির।

সেই বারান্দার ঠিক মাঝখানে যেন পদ্ম হয়ে বসলেন তিনি। তাঁর কোলে মাথা রেখে পদ্ম হয়েই শুল তিতিররা। কেউ কেউ তাঁর পিঠে ভর দিয়ে বসল তাঁর পেছনে। বুড়িপিসিমার গল্প শুরু হল। কৃষ্ণপক্ষ হলে তিতিরদের চোখের সামনে আকাশময় ঝলমল করে তারা। শুক্লপক্ষে বাতাস ভরে যায় জ্যোৎস্নায়। গল্প খানিক এগোতেই কালো আকাশ হয়ে ওঠে কুরুক্ষেত্র বা লঙ্কার রণক্ষেত্র। তারাদের কেউ পদাতিক, কেউ রথী, কেউ মহারথী। বুড়িপিসিমার কল্যাণেই রামলক্ষ্মণসীতাহনুমান আর রাবণমন্দোদরীমেঘনাদ অথবা কৃষ্ণযুধিষ্ঠিরঅর্জুনভীমদ্রৌপদী আর ধৃতরাষ্ট্রগান্ধারীবিদুরদুর্যোধনদুঃশাসনকর্ণ সকলেই তিতিরের খুব চেনা। এত চেনা, তিতির যেন তাদের দেখতে পায় যেখানে সেখানে, যে-কোনও সময়। তার খুব কষ্ট হয় কর্ণের জন্যে, অশ্বত্থামার জন্যে আর একলব্য-র কথা ভেবে।

ভরা বর্ষায় আকাশ যখন ভাসিয়ে দিচ্ছে সারা বিশ্বকে, নবগঙ্গা যখন ফুঁসে ফুঁসে আছড়ে

পড়ছে কূল ছাপিয়ে ডাঙার ওপর, তখন পথের ওপর, মাটিতে বসে যাওয়া গোরুর গাড়ির চাকার পাশে তিতির দেখে কর্ণকে, নিজের চোখে। এরকম সে দেখেই থাকে অনেককেই, মাঝেমাঝেই।

মঠের কাছে বাঁক নিয়ে পথটা নদী ধরে ধরে সোজা চলে যায় শহরের দিকে। এ মঠ কারা তৈরি করেছিলেন, কেনই বা করেছিলেন তা আজ আর কেউ জানে না। জানার কারণও নেই। অব্যবহারে অব্যবহারে পড়ো হয়ে পড়ে আছে গ্রামের প্রান্তে। মঠের সামনের বড় মাঠটা শুধু কাজে লাগে। মেলা হয়। কংগ্রেসের মিটিং হয়। তিতিরের মা যেতেন সেসব মিটিঙে। মাঝেমাঝে তিতিরও যেত তাঁর সঙ্গে।

শহর বলতে যা বোঝায় মাগুরা ঠিক তেমন নয়। কলকারখানা নেই। রেল স্টেশন নেই। আছে একটা বন্দর। দূর দূর থেকে বিশাল বিশাল মালবোঝাই নৌকো আসে, বজরা আসে। যাত্রী নিয়ে নানা আকারের নৌকো আসে। ডাক নিয়ে আসে। তাদের মধ্যে সবচেয়ে বড় আকর্ষণ গহনার নৌকো।

শহরের দিকে নদীর পাড় ধরে ক্রমাগত ছড়িয়ে পড়েছে ঘাট, একটার পর একটা। সব ঘাটেই নৌকো লাগানো। লোক নামে, ওঠে। মালপত্তর তোলা হয়, নামানো হয়। সার সার দোকান। মাঝে মাঝে গুদাম। সব মিলিয়ে লোকে বলে বন্দর। বন্দরে ভেড়ানো নৌকো সরে গেলেই নতুন নৌকো এসে লাগে। বাকিরা অপেক্ষা করে মাঝনদীতে তেমোহনার কাছে। যেখানে একটা বড় নদীতে পড়েছে নবগঙ্গা। পড়ার পরেই কোনও নদীই আর নদী থাকে না, যেন সাগর হয়ে যায়। সেই সাগরে ভাসান হয়। মা দুর্গা ভাসান যান। মা কালীর ভাসান হয়। নৌকার বাইচ হয়। বাইচ নিয়ে গ্রামে গ্রামে রেযারেষি হয়। কখনও কখনও হিন্দুমুসলমানেও হয়। লাঠি সড়কিও বেরিয়ে পড়ে। কিন্তু দু'পক্ষের মাতব্বররা মাঝখানে দাঁড়িয়ে মিটিয়ে দেন। ব্যাপার দাঙ্গা পর্যন্ত গড়ায় না।

গঞ্জই হোক আর বন্দরই হোক মাগুরা তবু শহরই। শুধু শহর না, রীতিমতো মহকুমা শহর। সেখানে হাই ইস্কুল আছে, বড় পোস্টাপিশ আছে, থানা আছে, পুলিশ আছে, বড় দারোগা আছেন। আদালত আছে, আদালতের জজসাহেব আছেন। এস-ডি-ও আছেন, তাঁর বাংলো আছে। তাঁরা সবাই সাহেব, লালমুখো। তাঁদের বাড়িতে, আপিশে টানা পাখা চলে। তিতির জানে, তাদের মইনেদা', মনিরুদ্দির দাদা জজসাহেবের বাংলোয় পাখা টানে। গ্রামে, মুসলমানপাড়ায় তার খাতিরই আলাদা।

পথ আর শহরের মাঝখান দিয়ে বয়ে যায় নবগঙ্গা। নদীর দিকে তাকিয়ে তিতিরের মনে হয় এত বড় নদী বোধহয় পৃথিবীতে আর নেই। তার মাথাটা ঘোরে। মইনেদা সেকথা বোঝে না। দাঁড়ায় না, সে চলেই যায়। মাঝে মাঝে পেছন ফিরে ডাকে, চইলে আসো তিতিরবাবু, পা চালায়ে আসো।

তিতির আসতে চায় কিন্তু পা যেন তার বশে নেই, চলতে চায় না। এই সাঁকো কি পার হওয়া যায়? মানুষ পারে পার হতে?

সেই পথকে শহরের সঙ্গে যুক্ত করেছে একটা সাঁকো। বাঁশের সাঁকো। হলদে হলদে,

সবুজ সবুজ বাঁশের। সোজা সোজা, আঁকাবাঁকা বাঁশের। বাঁশ পুরোনো হলে রোদে জলে রাত্তিরের হিমে হলুদ হয়ে হয়ে পচন ধরে ঝরে ঝরে যায়। সাঁকোর মাঝখানে এখানে ওখানে লম্বা হাঁ তৈরি হয়। যেন গিলবে। সময় হলে, হুকুম হলে, টাকা বরাদ্দ হলে সেই হাঁ বোজানো হয় নতুন বাঁশ দিয়ে, সবুজ রঙের। বাঁশ বাঁকা হলে হাঁ-র পুরোটা বোজে না। গিলে খাওয়ার ভঙ্গিটুকু থেকেই যায়। সেই সঙ্গে থেকে যায় কিছু পুরোনো হাঁ। তারা তো গেলেই।' তেমনি একটা হাঁ-এর পাশে পৌঁছে তিতির স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে যায়। তার পা শিরশির করে। শীত করে। যেন খুব জ্বর।

তাকে দাঁড়িয়ে পড়তে দেখে মনিরুদ্দি চেঁচায়, নীচের দিক তাকায়ো না, তিতিরবাবু, নদীর দিকি দেইখো না।

ততক্ষণে দেরি হয়ে গেছে, তিতির তাকিয়ে ফেলেছে। তার পায়ের কাছে হাঁ-এর মধ্যে দিয়ে চোখ চলে গেছে তলায়। সে চোখ আর ফেরানো যায় না। সে চোখ তলা পর্যন্ত দেখে। জল দেখে। অন্তহীন তলদেশে কুচকুচে কালো জল। তিতিরের দিকে তাকিয়ে আছে, হাঁ করে। তাকে ডাকছে। তিতির পালাতে চায়। চোখ ফিরিয়ে আনতে চায়। পারে না। তিতির জোর করে পা তোলে।

মনিরুদ্দি লাফ দিয়ে তার কাছে পৌঁছবার আগেই সেই হাঁ তিতিরের একটা পা কামড়ে ধরে। চিৎকার করে ওঠে তিতির। যতটা যন্ত্রণায় তার চেয়ে বেশি আতংকে। মনিরুদ্দি তাকে দু'হাতে আঁকড়ে ধরে। আরও দু'চারজন এগিয়ে আসে। তিতির মুক্ত হয়। কিন্তু ততক্ষণে তার পা ছ'ড়ে, চামড়া উঠে, রক্ত পড়ে বিতিকিচ্ছিরি কাণ্ড। তার চেয়ে বিতিকিচ্ছিরি চারপাশের লোকজনের হাসাহাসি। পায়ের ব্যথার চেয়ে যেন তাদের হাসাহাসিই বেশি করে তার চোখের জল টেনে বের করে আনে।

মনিরুদ্দি বোঝে না কী করবে। তিতিরকে বুকে জড়িয়ে দাঁড়িয়ে থাকে। আর শুধু বলে যায়, কাইন্দো না তিতিরবাবু, কাইন্দো না। অ্যাকখনি সব ঠিক হয়ে যাবে। তুমি কাইন্দো না।

বলে, কিন্তু নিজেই সে বোঝে না কীভাবে সব ঠিক হয়ে যাবে; কীভাবে সব ঠিক করে দেওয়া যায়। তিতিরের কান্না থামে না। কমেও না।

কী ভেবে কে জানে, তিতিরকে পাঁজাকোলে মনিরুদ্দি পেছন ফিরে সেই পথ ধরে বাড়ির দিকে দৌড় দেয়। তারা বাড়ি পৌঁছতে পৌঁছতে প্রায় সন্ধে। বড়বাবুর বারবাড়ির আসর তখন জমজমাট। গড়গড়ার গুড়ুক গুড়ুকের মাঝখানেই অনাদিপুরুত ধমকানোর মতো করে কবরেজ মশাইকে বোঝাচ্ছেন,

আরে বললিই হল পাকিস্তানে যাবে? খোদ মাউন্টব্যাটেন সাহেব বইলে দেসেন, হিন্দুমেজরিটি ডিস্ট্রিকট থাকবে হিন্দুস্তানে। আর য়শোর-খুলনা তো...

তিতিরকে নিয়ে মনিরুদ্দি ঢুকে পড়ে তার মধ্যেই। দাদামশাইকে দেখেই তিতির হাউমাউ করে ওঠে। তিনিও গড়গড়ার নল ফেলে ধড়মড় করে উঠে দাঁড়ান। তিতিরের পায়ের রক্ত খানিকটা শুকিয়ে এলেও অনেকটাই তখনও কাঁচা রয়েছে। রক্তের কিছুটা মনিরুদ্দির

লুঙ্গিতেও লেগেছে।

কী ব্যাপার? কী হয়েছে? রক্ত কেন? রক্ত কোত্থেকে... বড়বাবুর মুখের দিকে তাকাতে পারে না মনিরুদ্দি। সব দোষ তো তারই। তার ওপরেই তো ভার ছিল তিতিরের।

সরকারবাড়ির মেজকত্তা মজুমদারমশাই-এর কানের কাছে মুখ নিয়ে ফিসফিস করে জিজ্ঞেস করেন, মাইগ্‌রোয় কি দাঙ্গাটাঙ্গা লাইগে গেল নাকি?

বৃত্তান্তের খানিকটা শুনেই বড়বাবু হাত তোলেন। মনিরুদ্দি চুপ করে যায়। শান্ত গলায় তিনি মনিরুদ্দিকে বলেন,

ওকে কালিদাসের ওখানে নিয়ে যাও, সে-ই করবে যা করার।

পায়ে ব্যাণ্ডেজট্যাণ্ডেজ বেঁধে তিতির বাড়ির ভেতরে ঢুকে আগে পশ্চিমের দালানে যায়। খিদেয় তার পেট তখন চোঁ চোঁ করছে। এত খিদে, কালিদাসমামা আইডিন লাগাবার সময় যে সাংঘাতিক কষ্ট হচ্ছিল তা-ও যেন টের পায় না।

অন্নমাসী, ও অন্নমাসী...

ডাকতে ডাকতে সে রান্নাঘরের দ্বিতীয় দরজার সামনে গিয়ে দাঁড়ায়। অন্নমাসী বেরিয়ে আসেন। এসে, তার পায়ের ব্যাণ্ডেজ দেখেই চ্যাঁচামেচি জুড়ে দেন,

এ কী করিচ? কী হইচে তুমার, বাপধন? কেডা তুমারে কী করিচে?

তাঁর চেঁচামেচি শুনে এবাড়ি-ওবাড়ির অনেকেই ছুটে আসে। তিতিরকে ঘিরে গোল একটা ভিড়ই জমে যায়। মনিরুদ্দিকে আবার অপরাধীর ভঙ্গিতে দাঁড়াতে হয় উঠোনের একপাশে। কোনমতে সে বলে যায় যা ঘটেছে। তিতির ততক্ষণে ঘটনাটার এবং তার নিজের গুরুত্ব বুঝে ফেলেছে। মনিরুদ্দির মুখ থেকে কথা কেড়ে নিয়ে সে-ই বর্ণনা করতে আরম্ভ করে। বলতে বলতে সে যখন কালিদাসমামার ডাক্তারখানায় পৌঁছেছে, এবং কীভাবে ভীমের মতো বীরত্ব দিয়ে তাঁর আইডিনের সঙ্গে লড়াই করেছে তার বিবরণ দিচ্ছে, ঠিক তখনই অন্নমাসী হাত নেড়ে বলে ওঠেন,

নামো, নামো, বারান্দাতে নামো। এডা রান্নাঘরের বারান্দা, তা-ও খেয়াল নেই?

তিতির থতমত খেয়ে থেমে যায়। তাঁর দিকে তাকিয়ে থাকে হাঁ করে। তাঁর কথার মানে বোঝে না। তবু, অন্নমাসী যখন বলেছে...নিঃশব্দে সে নেমে যায় উঠোনে। সেখানে একটু তফাতে দাঁড়িয়ে আছে মনিরুদ্দি। অন্নমাসী গর্জে ওঠেন,

মইনে, তুই ওরে ছুঁয়ে দিছিস?

মনিরুদ্দি চুপ। চারপাশের ভিড়ও চুপ।

কী? ছুঁইচিস?

না, মানে, কোলে তুইলে...এতটা পথ, ওই অবস্থায়...কোলে তুলতি হলি তো না ছুঁয়ে...

এবার অন্নমাসীর থতোমতো খাওয়ার পালা। অতটুকু ছেলেকে ওই আঘাতের পর এতটা পথ হাঁটিয়ে আনা...কিন্তু না ছুঁয়ে কোলে তোলা যায় কিনা অথবা কোলে তুলে নিয়েও না ছুঁয়ে...এই জটিল ধাঁধা তিনি ভেদ করতে পারেন না। প্রায় না ভেবেই চিরকালের চেনা সহজ পথই নেন তিনি।

ঠিক আছে। নদীতে যায়ে, নয়ত পুকুরিই যাও, একটা ডুব দিয়ে আসো। তার আগে রান্নাঘরের...

না, না, ওখেনে জল লাগানো যাবে না, কিছুতিই না, জল লাগলিই সিপট্যাক হয়ে...সব্বোনাশ হয়ে যাবে ঠাইরেন, কালিডাক্তার বারবার কইরে...জল লাগাতি বল্লবেন না, দুহাই আপনার...বিশ্বাস না হয়...

মনিরুদ্দি প্রায় ঝাঁপিয়ে পড়ে অন্নমাসীর পায়ে।

আবার একটা ধাঁধায় পড়ে যান অন্নমাসী। ডুব দিয়ে পবিত্র হয়ে না এলে, সব জানার পর জানত তিনি তিতিরকে রান্নাঘরের বারান্দায় উঠতে দেন কেমন করে? দিলে রান্নাঘরটা, রান্না করা খাবারদাবার সবই তো যাবে। তখন রান্নাঘর ধোও। খাবারদাবার ফেলে দিয়ে নতুন করে রান্না চড়াও...আবার রান্নাঘরে ওকে না এনে খেতেই বা দেবেন কী করে? খিদেয় মুখখানা শুকিয়ে আমসি হয়ে গেছে বেচারার। এখন কী করা? ওই ব্যাটা মনিরুদ্দিটাই যত নষ্টের...

আবার তাঁর মাথায় সহজ পথটাই খেলে। বলেন,

থাক, তুমারে আর চ্যান করতি হবে না। মাসিমার কাছে যাও। মাসিমা ঠাকুরঘরে আছেন। উনি একটু গঙ্গাজল ছিটোয়ে দিলিই...যাও, তাড়াতাড়ি যাও। আমি ততক্ষণে তুমার জন্যি...

তিতির যেন ধড়ে প্রাণ পায়। ছুট লাগায় দিদিমার ঠাকুরঘরের দিকে। মনিরুদ্দির পাশ দিয়েই যেতে হয় তাকে। সে তখনও মুখ নিচু করেই দাঁড়িয়ে আছে, যেন চোর। তার সামনে গিয়েই, যেন অকারণেই, থমকে দাঁড়ায় তিতির। তার মুখের দিকে তাকিয়ে দেখে, মইনেদা নীচের দিকে তাকিয়ে আছে। নীচে, পায়ের পাশে সাঁকোর হাঁ। হাঁ-এর নীচে শূন্যতা, গভীর গভীর শূন্যতা। তার শেষে, আরও তলায়, একেবারে পাতালের কাছে জল, কুচকুচে কালো, গভীর জল। সেই জলে পড়লে আর...তিতিরের মনে হয়, মইনেদা সেই জলে পড়ে যাচ্ছে। সাঁকোর হাঁ দিয়ে গলে ক্রমাগতই পড়ে যাচ্ছে...পড়তে পড়তে...বিশাল শূন্যতা আর কুচকুচে কালো জলে পড়তে পড়তে...

বুড়িপিসিমার গলা থেকে দুঃখ দুঃখ ভাবটা চলে যায়। কেমন একটা তেজ আসে স্বরে।...তখন দুর্যোধন এগিয়ে এলেন। কর্ণের কাঁধে হাত রেখে তিনি বললেন, মুখ তোলো! তারপর চারপাশে তাকিয়ে, সমবেত রাজা মহারাজা, বড় বড় মন্ত্রী মহামন্ত্রী, বীর মহাবীর, হাজার হাজার প্রজা, সকলের দিকে, সমস্ত পৃথিবীর দিকে তাকালেন ঘুরে ঘুরে। আকাশের দিকে তাকিয়ে বললেন, ঈশ্বরকে সাক্ষী রেখে, আপনাদের সকলকে সাক্ষী রেখে আমি কর্ণকে, বসুসেন নামে পরিচিত এই মহাবীরকে, অঙ্গরাজ্যে অভিষিক্ত করলাম। আজ থেকে, এই মুহূর্ত থেকে সে আর পরিচয়হীন নয়, গোত্রহীন নয়। সে-ও রাজা। হে রাজন্যবর্গ আজ থেকে এই বীর আপনাদেরই গোত্রভুক্ত, নিজ রাষ্ট্রের অধীশ্বর, যেমন আপনারা। এবার আপনারা এর জয়ধ্বনি করুন।

চাঁদপাল ঘাটের পীনাস

সাধন চট্টোপাধ্যায়

নিজেই নিজেকে সতর্ক করল।

এই-সব অপরাধ ঘটাবার ঠিকঠিক আগের মুহূর্তগুলোতে স্থির বুদ্ধি ও ঠাণ্ডা মাথার প্রয়োজন। স্বাভাবিক চিন্তায় ভাবতে হয় চারপাশের তুচ্ছ টুকরো স্মৃতির কথা কিংবা ইন্দ্রিয়ের যথাযথ ব্যবহারে হেসে সুন্দর ভদ্রতায় চুটকি বা জোক্ বানানো দরকার। মি. দণ্ডপাট বসলেন মস্ত টেবিলটার কোণায়, একেবারে ধার ঘেষে। হাঁটা ও খানিক আগের তিনতলার সিঁড়ি বাইবার ঘামটুকু যত্নে মুছে নিলেন রুমালে; কলম ও ডায়েরিটি পাশে শুইয়ে রেখে, চোখের হাসিতে 'ভালো তো!' দেয়ালে টাঙানো 'স্তব্ধতা বজায় রাখুন'-এর জন্য মহিলাটিও ঘাড় কাতিয়ে, ঠোঁট-কপোল ও ছড়ানো লিপস্টিকে জবাব দিলেন, হ্যাঁ, ভালোই।

মি. দণ্ডপাটের মনে হল মিসেস দাশগুপ্তকে আজ খাসা লাগছে দেখতে। হাল্কা গোলাপী রংয়ের শাড়ি, ম্যাচিং ব্লাউজ—দুই হাতার প্রান্তে রুচিশীল কারুকার্য করা, গলায় আঁটোসাঁটো নকল মুক্তার মালা, শাড়ির রংয়ের সোয়েটের টিপ, চুলগুলোয় ডাই-শ্যাম্পু, বার বার কপাল ছেড়ে ফার্স্ট ব্রাকেটের মতো গালে এসে দাঁড়াতে, উনি দুই আঙুলে ঘন ঘন ঠেলে সরিয়ে দিচ্ছেন। হাল্কা জলরংয়ের পালিশ, যত্নেকাটা নখগুলোতে। চোখদুটি ঘন কালো। ঠোঁটের রংয়ে রুচির ছোঁয়া আছে। নাকটি ছোট, খাড়া এবং এত সরু—চশমাটা পিছলে দুচোখের ঊর্ধ্বদৃষ্টির ফাঁক খুলে দিয়েছে। কাজ কেমন চলছে উনি এবার জিজ্ঞেস করলেন ফিসফিস করে। মি. দণ্ডপাটও চাপা ভুল্যমে বললেন লাইব্রেরি-ওয়ার্ক সামনের মাসেই শেষ হবে। আপনার? পাল্টা প্রশ্নে মিসেস ঠোঁট চেপে হাসলেন এমন, ন্যাজে-গোবরে হয়ে আছেন যেন। মাঝ-নদী।

এখন বেলা বারোটা পুরনো ঐতিহ্যশালী গ্রন্থাগারটির নির্জন পাঠকক্ষে দুটি-একটি পিপাসুরা জড়ো হয়েছেন। আলমারি, র‍্যাক ও গ্রন্থ বা সাময়িকপত্রগুলোর ডাঁইয়ের আড়ালে খোপ-খোপ পরিবেশে কে কোথায় নিঝুম গবেষণায় বোঝা যায় না। দণ্ডপাট ভাবলেন 'স্তব্ধতা বজায় রাখুন' সতর্কটি না থাকলে ভল্যুম তুলে দাশগুপ্তকে জিজ্ঞেস করা যেত, তার রূপটি চাঁদের পক্ষকালের মতো কেন। পনের দিন আলো, বাকি অন্ধকার। ক'দিন বেশ আকর্ষণীয়, মোহময়ী লাগে মহিলাকে, আবার বেশ কিছুদিন ধরে ম্যাড়ম্যাড়ে, বিয়াল্লিশ-তেতাল্লিশের গিন্নি মনে হয়—অনেকটা ঘামাচি-কাঁধে ঘাম শুকোনো নুনের জেগে ওঠার মতো। মি. দণ্ডপাট ভেতর-ভেতর যতই সজাগ-সতর্ক হচ্ছেন, টেনশনে ডায়রি-কলমটা দ্বিতীয় স্থানে সরিয়ে, জলের বোতলটি নিয়ে ভিন্ন দরজা পেরিয়ে বারান্দার ওয়াটার-কুলারের কাছে গেলেন। চটজলদি খেয়াল হল, এ-ঘরের চেয়ারে-বসা লোকটি গোপন দৃষ্টিতে রিডিং রুমটি ফলো

করে চলেছেন। দণ্ডপাট বেশ কিছুদিন ধরেই অনুমান করছিলেন, পেছনে গোয়েন্দা লাগানো আছে। হয়তো মাথা ঝুঁকিয়ে একাগ্রে দ্রুত নকল করছেন, ছায়াটা আচমকা সরে গেল। চোখাচুখি ধরা পড়লে, ঝকঝকে দাঁতে কাছে দাঁড়িয়ে যত্নে বলেন, আপনি? আপনিই জেরক্স করতে পাঠিয়েছিলেন?

না, ধন্যবাদ।

দণ্ডপাটও সাজানো হাসিটি সম্পূর্ণ ফিরিয়ে দেন প্রশ্নকর্তাকে। নিচে জেরক্স-এর সুবিধে জেনেও দেড়বছর রিডিংরুম ব্যবহারের মধ্যে একটি দিনও পাঠান না কাউকে। আসলে দণ্ডপাট বুঝে নেন, আড়ি পাততে এসেছিল।

কুলারে কী মোলায়েম ঠাণ্ডা জল। বোতলের শরীরটা পর্যন্ত আকড়ানো তালুকে আরাম দিচ্ছে। ঘরে চেয়ারে-বসা লোকটির গোঁফ আছে। পড়ুয়াদের সঙ্গে বিশেষ আলাপ করেন না। মিচকি হেসে কার্ডটি নিয়ে দরকারি গ্রন্থ বা সাময়িকির নাম লিখে কার্ডটি রেখে দিলেন ড্রয়ারে এবং র‍্যাক ও আলমারির নির্দেশ দিয়ে চোখ ঘুরিয়ে নেন। ছোট্ট 'হ্যাঁ' বা 'না' উচ্চারণে মনে হয় একটি শিলাখণ্ড—কোথাও ফাঁক-ফোকর নেই।

দণ্ডপাট মশাই বোতল হাতে ফেরার সময় ভেন্ন অলি-গলি দিয়ে চলে এলেন। সামান্য সার্বিক দৃষ্টিতে হিসেব করলেন সাকুল্যে পাঁচ-সাতজন আছে এখন; তিনটের পর কিছু ছাত্র-ছাত্রী ঢুকবে—শোনা যাবে জুতোর আওয়াজ, টাঙানো নির্দেশ ভাঙার জন্য দুচারবার গুঁফো লোকটার উঠে আসা ইত্যাদি। দণ্ডপাট এই মুহূর্তে বৃদ্ধ টেকো লোকটির নীরব হাসিকে অভিনন্দন জানালেন। অপরাধ ঘটাবার আগের মুহূর্তগুলোয় এ-ভাবেই স্বাভাবিক রাখতে হয় নিজেকে। টেকো লোকটি রিটায়ার্ড, খুবই সাধারণ একজন কলেজ-শিক্ষক, ছাত্র-ছাত্রীদের কাছে খুব সফল ছিলেন না। গোল্লায় যাওয়া বড়লোক ঘরের ছেলে-মেয়েদের গোপনে সম্ভাব্য-প্রশ্ন বিক্রি করতেন। অসৎ উপায় খুঁজতে হয় এ-জন্য। কাগজে একবার ছোট্ট খবর বেরুতে, সাবধান হয়ে গেছলেন। গত আড়াই বছর ধরে উনি নিয়মিত আসেন। প্রচুর নোট করেন, জেরক্স করান তলা থেকে এবং দণ্ডপাটের সঙ্গে দৃষ্টিবিনিময়ের বন্ধুতা হতে হতে, বেরিয়ে রাস্তাঘাটেও অনেক কথা হয়। ড্রয়ারে কার্ডভরে-রাখা গুঁফো কর্তাব্যক্তিটি যে আসলে কোনো বিদ্বান-পণ্ডিত নন, এককালের মারকুটে রাজনৈতিক কর্মী, পরিচয়টি জানাতে ভোলে না টেকো মানুষটি। মিসেস দাশগুপ্ত যে একজন ডিভোর্সি, বহু ঘাটের জলখাওয়া এবং ক'মাস ধরে লোকটির খপ্পরে পড়তে চলেছে, নিখুঁত তথ্য দিয়ে দণ্ডপাটকে বোঝান। গ্রন্থাগারের পরিচালক সমিতি, মোট কত অনুদান পায় সারা বছরে, কোন কোন দুষ্টচক্র এখানে বজায় আছে—সব খবর টেকোর নখদর্পণে। কিন্তু মি. দণ্ডপাট বেশ কিছুদিন টের পাননি আসলে লোকটি একজন সফল বশংবদ ও দালাল; ঐ গোঁফওয়ালা ইয়াকুব সাহেবেরই এজেন্ট।

এই ৫২ বছরে দণ্ডপাট তো আর কাঁচা খোকাটি নন। তিনিও জানেন জটিল কাজ কীভাবে জাদুর মতো ঝুঁকি নিয়েই সারতে হয়। হঠাৎই তিনি পুরনো জায়গাটি বদলে জানলার একদম ধারে, ভিন্ন একটি খোপে গিয়ে বসলেন। মাথার ফ্যানটা ঠিকঠিক ঘুরছে তো—দেখে নিলেন।

কব্জিঘড়িতে টের পেলেন বেলা একটা এবং আজকের তারিখটি পর্যন্ত। তিনি ভুলে গেছলেন দিন-ক্ষণ। কী ক্ষতি হয় ভুলে গেলে? মনে মনে একধরনের দার্শনিকতায় নিজেকে স্বাভাবিক বানিয়ে তুলতে থাকেন। কিন্তু দুপুরে এত কম আলো কেন পৃথিবীর? জানলায় চোখ ভাসিয়ে দিতেই টের পেলেন সেজেগুজে বেশ মেঘ জমছে। টেরই পাননি এতক্ষণ। চারদিক দম মেরে আছে।

জার্নালটা এতই পুরনো, ন্যাতনেতে সূঁচের মুখ পাতা কেটে গড়গড়িয়ে চলবে কিনা সন্দেহ। এই মুহূর্তে ধোঁকা দিতে একাগ্রে কিছু নকল করে যেতে হবে; দগুপাট জানেন গোয়েন্দারা ছায়া হয়ে র‍্যাকের আড়ালে নিঃশব্দে সরু রাস্তা ধরে চলাচল করবে, যেন ঝড়ের সম্ভাবনায় চারপাশ সামলাবার মতলব করছে।

আপনার চাবি? ফেলে এসছিলেন? গুঁফো মানুষটি—ইয়াকুব সাহেব—মিচকি হেসে পাশে দাঁড়ালেন। থতমত তাকিয়ে দগুপাট সরি! বলেই হাসলেন। লোকটি অধিক ভদ্রতা ও বিনয় ছুঁড়ে দিয়ে গেলেন। ভাগ্যিস দগুপাট লিখছিলেন পাশে জার্নালটি রেখে! দরকারি কিছু নয়, চিরকুটে মিসেস দাশগুপ্তের উদ্দেশে, ধন্যবাদ, টিক্ মেরে প্রশ্নগুলোর উত্তর দেবেন। একটু জোক্ করছি মনে করবেন। ১. প্রথম দেখাতেই ভালোবাসা-র থিওরিতে বিশ্বাস করেন? হ্যাঁ বা না। ২. দক্ষিণের খোপের টেকো অধ্যাপকটি যে দাগি ক্রিমিন্যাল, বিশ্বাস করেন? হ্যাঁ বা না। ৩. আপনি ১৫ দিন অন্তর সুন্দরী হন?... ৪. শুধু এই রিডিং রুমটাতেই কি দালাল স্তাবকরা গিজগিজ করছে...? ৫. স্বপ্নের দেশ বলতে সাগরপারের একটা দেশকেই বোঝায়?...

মি. ইয়াকুব চাবিটা রেখে চলে যেতেই দগুপাট হাঁফ ছাড়লেন। ইস্! ভুল হয়ে গেছে। সিগরেট-এর প্যাকেট থেকে ধারালো সূঁচটি আলাদা করা হয়নি। চট করে বাথরুম ঘুরে আসতে হবে। দাশগুপ্তের জন্য ডায়রির পাতাটি ছিঁড়ে গুজলেন পকেটে। ঈষৎ ফ্যাস্ শব্দে একটা ছায়া সজাগ চাউনিতে দু-চারটে খোপ ঘুরে গেল। মানুষ এত নিঃশব্দে হাঁটতে পারে! দগুপাট আজ সামান্য বিচলিত হচ্ছেন। গত ১ মাস ধরে ছোটখাট অপরাধগুলো সজাগ করিয়ে দিয়েছে—কর্তৃপক্ষ সতর্ক। সেই থেকে ষষ্ঠ ইন্দ্রিয় নিয়ে চলাফেরা করতে হয়। ধরা পড়লে নির্ঘাৎ লালবাজার, হাজত, কাগজে ছাপা হওয়া! ইয়াকুব সাহেব ঝি-কে মেরে বৌ শেখানোর মতো, বেয়ারা ছোকরাটাকে যখন শোনাচ্ছিলেন, মি. দগুপাট সবে নিচে র‍্যাক সার্চ করিয়ে উপরে উঠে এসেছেন। সামান্য দাঁড়ালেন।

এখন মি. দগুপাট জানলার সামনে সামান্য ঝুঁকে। যেন লিখে লিখে খানিক ক্লান্ত। আকাশ গাজছে-গুছছে। ঠিক নিচে রাস্তায় ঠ্যালা-গাড়ির সারি। সবুজ ছড়াছড়া কলা, করোগেটেট টিন কিংবা বড়লোক বাড়ির হাগা-মোতার চিনেমাটির সরঞ্জাম, কোনো নতুন বইয়ের ফর্মার স্তূপ—ঘেমেচুমে কুলিগুলো নিয়তির বাঁধা পশুর মতো ঠেলে নিয়ে চলেছে। অজস্র বাস-টেম্পো-মিনি! হর্ণের শব্দে অসহিষ্ণুতা। মুখোমুখি আর একটা চারতলা বহু পুরনো বাড়ি—চাতালে নাকি বলনাচের আসরে সাহেবসুবোরা আসতেন।

বাথরুমে যাওয়ার আগে জার্নালের নির্দিষ্ট পাতাটি খুঁজে বার করলেন কেবল, পড়ে

দেখলেন না। অপরাধ ঘটাবার আগে দ্রুত একবার চোখ বোলাতে হবে। একটু এলোমেলো ভেবে নেয়া যাক। মি. দগুপাটের মনে আসে এক বৃদ্ধ ব্যাকরণবিদ পণ্ডিতের কথা, যিনি বহু বছর আগে মিনমিনে গলায় বলেছিলেন, দুর্গা বানানে কেউ দীর্ঘ উ দিলে, কান ধরে একটা থাপ্পড় দেবে। অথচ মফস্বলে 'দূর্গা বিড়ি'-র বিজ্ঞাপন ছেয়ে ফেলেছে। কিছুতেই দগুপাট শুদ্ধাচার ঘটাতে পারেননি। একবার ব্যানার-লিখিয়েওয়ালার মস্ত দোকানে ঢুকে বলেছিলেন—আপনারাই কালপ্রিট। হ্রস্ব উ হবে দুর্গায়। বিড়ির ধোঁয়ায় শিল্পী তুলি হাতে চোখ কুঁচকে দীর্ঘ চুপ থেকে উত্তর দিয়েছিল, পার্টি যা লিখে দেবে, লিখব মশাই!...সেখানে যান।

একজন শিক্ষিত, মোটা মতো মানুষ বসেছিল পাশে। বলে দিল—দুটোই হয়। ভীষণ রাগ হয় দগুপাটের। আগবাড়িয়ে দালালি না করলেই কি চলত না? আসলে শহরে এখন স্তাবক ও দালাল ছাড়া কেউ-ই তেমন সুবিধে করতে পারছে না। তারাই গণ্যিমান্যি ও শক্তিমান।

বাথরুমের পথে পেছনের খোপে টুক করে চিরকুট-টা বাড়িয়ে দিতে মিসেস দাশগুপ্ত ঘাবড়ে যান। দু-বার মুখের দিকে তাকিয়ে হাতে নিলেন, পড়লেন, গালজোড়া মুহূর্তে কৌতূহলী হল। ঈষৎ ঘাড় নেড়ে বোঝালেন, ফিরে আসুন, প্রশ্নের জবাব পৌঁছে যাবে।

বাথরুমের মধ্যে প্রথমেই সিগরেট প্যাকেট থেকে তীক্ষ্ণ সূঁচটি বার করে, খানিক পর এলেন বাইরে। বারান্দার কোণায় দাঁড়িয়ে সিগরেট ধরালেন, চোখের কোণায় দেখে নিলেন ইয়াকুব-কে। দু-চারজন সাগরেদ নিয়ে ধান্দা-পানির আলোচনায় মশগুল। দগুপাট চোখ তুলে মাঝে মাঝে পুরনো কড়ি-বর্গার ছাদ দেয়াল দেখছিলেন। আসলে, তিনি খুবই স্বাভাবিক থাকবার চেষ্টায় ব্যস্ত। দু-চারজন সাহেব-সুবোর অয়েল-পেন্টিং জীবন্ত তাকিয়ে আছেন যেন।

যদিও ইয়াকুব সাহেবদের ঘিরে নীরবতা বজায় রাখার কোনো নির্দেশ নেই, মাঝে মধ্যেই সেল-ফোনের উৎপাত। দূরের খোপ থেকেই বাজনা শোনা যায়। দগুপাট ভাবলেন, এইসব মহামান্য প্রতিকৃতিগুলো যখন অতীতে শহরের পথে পাল্কি বা ঘোড়ার গাড়িতে যেতেন, নিশ্চয়ই রাস্তা সাফ রাখার জন্য সামনে হাঁক দিতে দিতে নেটিভ-রা ছুটত।

ঘড়ি দেখে তাগিদ বোধ করলেন ফিরে যেতে। এরপর কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ের ছেলেমেয়ে ঢুকবে কাজ করতে। দ্রুত সিগরেটটি জুতোয় ঘষে, ইয়াকুবদের পাশ দিয়ে ভেতরে ঢুকলেন। মিসেস দাশগুপ্তর উত্তরের প্রতি টান নেই এখন; টেকো অধ্যাপকটির পাশ দিয়ে চোখ না-ফিরিয়ে ফের নিজের টেবিলে চলে এলেন। আচ্ছা, খুলে এনে পাতায় চোখ বোলাবে, নাকি চোখ বুলিয়ে খুলবে পাতাদুটি? উত্তেজিত যেহেতু, বুদ্ধিমান দগুপাট কিছুটা সময় নিলেন। খানিক অংশ পড়েই ফেললেন, হাতে কলম পাশে ডায়রির পাতাটি—খানিক আগের ছেঁড়া অংশটি ফ্যানের বাতাসে ঘাড় তুলছে। মনে ভাবলেন, এবার থেকে তিনি এই কু-কর্মের জন্য ডবলমূল্য হাঁকবেন। এতখানি ঝুঁকি নিয়ে বুদ্ধিমান গবেষকদের যখন তথ্য ও তত্ত্ব সাপ্লাই দিচ্ছেন, চড়া নোটের গোছা ছাড়া কি চলে? এতো আর মামুলি পঁচিশ, তিরিশ কি চল্লিশ বছরের কথা নয়—পৌনে দুশ বছরের কথা!

পাতাটি ছিল একটি প্রশংসাপত্রের রিপোর্ট। দর্পণ-টাইপের নাম; রেয়ার জার্নাল বলা

যেতে পারে।

কলকাতায় সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারক ইস্ট সাহেব—সাগরপারের খাঁটি ধবল চামড়ার—কর্মজীবন ছেড়ে পাকাপাকিভাবে এ-দেশ ছেড়ে বিলাত রওনা দেবেন তাই নেটিভ বিত্তবান শহরবাসীরা কৃতজ্ঞতায় তাঁর মূর্তি স্থাপনের অর্থ তুলছিলেন। হাকিমসাহেব ভীষণ দয়ালু, সুদক্ষ বিচারক। কর্মজীবনে মাত্র ন'টি মূল্যবান মনুর-পালকের কলম ভেঙেছিলেন। ফাঁসির বিধানের নিয়ম, হুকুমলেখা কলমটি চিরতরে ভেঙে ফেলতে হয়। দণ্ডিতের সাথে দণ্ডদাতা কাঁদে...ইত্যাদি।

যে-সব দুর্জন নেটিভদের গলায় দড়ি জুটেছিল, সেই-সব খুনী-ডাকাতদের মধ্যে নীল চাষি, বা তাঁতিদের খেপানোর মানুষজনও ছিল কয়েকজন।

কালে-কালে ক্ষয় পেয়ে পাতাগুলো হলদে মুচমুচে। অক্ষরের কালি খেয়ে-খেয়ে অসংখ্য ছ্যাঁদা হয়ে গেছে বহু স্থানে। লোপ পেয়ে গেছে সঠিক অর্থ। মি. দণ্ডপাট তো এ-জন্যই পারিশ্রমিকের কথাটা ভাবছেন।

"মহামহিম করুণাসাগরসদ্বিচার—তিমির হর—মিহির...সজ্জন...মানস-রঞ্জন দুষ্টাশিষ্ট-দল-দলন দীনগণাভিলাষপূরক শ্রীল শ্রীযুক্ত...ইস্ট নাইট প্রধান বিচারক দোর্দণ্ডাখণ্ড—প্রবল—প্রচণ্ড—প্রতীপেষু।

কলকাতা নগর নিবাসিগণের নিবেদন। ধর্ম্মাবতারের শ্রীযুক্ত কোম্পানী বাহাদুরের হিন্দুস্থান মধ্যগত শাসিত রাজ্যে ধর্ম...অষ্টবর্ষ পর্যন্ত সদ্বিচার...এতদ্রাজ্যে দুষ্টদমন শিষ্ট পালন...পরমেশ্বর অস্মদ্দেশের এবং অস্মদীয় সন্তানের দিগের বর্তমান ভবিষ্যতের মঙ্গলোন্নতি বিধায়ক মহাশয়কে এই কৃত হর্ষান্বিত লীলাস্পদ হইতে প্রস্থানানন্তর গম্যমানোত্তম স্থানে নিত্যারোগ্য সৌভাগ্যযুক্তে কৃতপরোপকার জনিতামোঘ ফলজন্য মহাসুখভোগে রাখিবেন। অস্মাদাদি...যাদৃশ ভাবোদয় হইল তাহার বিবরণ আমাদিগের বংশপরম্পরার জ্ঞাপনার্থে অঙ্কিত করণের প্রার্থনা করি।...

প্রলিখন্ কলিকাতাস্থাস্তেষোং স্মরণ কারিকাং।।"

এর ঠিক নিচেই ছিল 'সুখ্যাতিপত্রে স্বাক্ষরকারী'।।

প্রায় দেড়শজনের নাম। সব্বাই দেশ ও সমাজের মাথা। ফার্সি, বাঙলা ও ইংরেজি—তিন ভাষায় রচিত, চতুর্দিক স্বর্ণমণ্ডিত, মূল্যবান চর্মে লিখিত, বিশিষ্ট নাগরিকদের বহু নাম আজও দণ্ডপাটের স্মৃতিতে জ্বলজ্বল করছে।

পুরাতন জার্নালটিতে আরও লেখা ছিল,

"৩ মাঘ মঙ্গলবার বেলা দ্বিতীয় প্রহরের সময় শ্রীল শ্রীচিফ্ জাস্টিস প্রধান বিচারকের সুখ্যাতিপত্র প্রদান করেন কলিকাতাস্থ এবং তন্নিকটস্থ প্রায় সমুদায় মর্যাদাকন্ত প্রধান হিন্দু মুসলমান বড় আদালত নানকগৃহে একত্র হইলেন। সার্দ্ধেক ঘণ্টার সময় শ্রীশ্রীযুত ঐ গৃহে শুভাগমন করিলেন তদনন্তর চতুরস্র স্বর্ণচিত্রিত দৃতি নির্মিত পট্টে সুলিখিত ইংরাজি বাঙালা পারসী ভাষাত্রয় সুরচিত সংকীর্ত্তিপত্র...শ্রীহস্তে সমর্পিত হইল।...তৎপরে ধর্ম্মাবতার করুণাসাগর

বাষ্প গদগদস্বরে তাহার সদুত্তরামৃতাভিষিক্ত করিয়া সকল লোককে গন্ধ তাম্বুল প্রদান দ্বারা স্বহস্তে ভারতীয় প্রথায় আতর দিয়া তাঁহাদের নিকট হইতে বিদায়গ্রহণ করেন এবং ১৭ জানুয়ারি (বৃহস্পতিবার) "চান্দপালের ঘাটে পীনাস আরোহন" করিয়া "গঙ্গাসাগরে জাহাজে আরোহন করিয়া ইংলণ্ডে" যাত্রা করেন।"

শেষ বাক্যটির ন্যাজের গোড়ায় মি. দণ্ডপাট কেন জানি তারাচিহ্নিত করলেন। তখনই দূর থেকে পায়ের শব্দ শোনা গেল। সতর্ক হতে হয়; জার্নালটি র‍্যাকে যথাযথ রেখে, তুলে নেয়া পাতা দুটি যত্নে মস্ত ডায়রির কভারের মধ্যে ঢুকিয়ে, উঁকি দিয়ে দেখলেন, মৃদু হাসিতে ১৮ বছরের যুবতীর মতো মিসেস দাশগুপ্ত আসছেন, হাতে স্পষ্ট একটি চিরকূট। উত্তর টিকিয়ে এনেছেন সম্ভবত। দণ্ডপাটের ভয় বা টেনশন ছাড়ল কিছুটা। তখন ডায়রির সাদা পাতায় তারাচিহ্নিত করে ফুটনোটটি লিখতে ভুললেন না...'বর্তমানে শুধু পীনাস ও চাঁদপাল ঘাট বাতিল হয়ে গেছে।...উড়োজাহাজে সাগর পেরতে এখন যাত্রা করেন সবাই।'

খুব কাছে দাঁড়াতে, মিসেস দাশগুপ্তের শরীর থেকে বিরল গন্ধ আসছিল।

থুক্কু

জ্যোৎস্নাময় ঘোষ

কিচ্ছু না, কিচ্ছু না। চড়াই-ই বল, আর, উতরাই-ই বল, এরে থামাতে পারে, এমন মদ্দ এই ভূ-ভারতে নাই। কী চলন-দেখবা। চলতে একবার শুরু করুক।—উঠে পড় হে—

বলতে-না-বলতেই থুক্কুর মুখে আলো ভাঙে। মাঝবয়েসী সা-জোয়ান সওয়ারির দিকে তাকিয়ে তাড়া দেয়, কই, ওঠা লাগে।

রতন তবু দোনামোনা করে, যেন ভরসা পায় না। বোধহয় ভাবে, এতটা ঢেউ খেলানো পথ ব্যাটা টানতে পারবে তো? ট্রেনের জন্যে এর মধ্যেই ঘন্টা দুয়েক সুমায় বরবাদ হয়ে গেছে—র‍্যালবাবু শালাদের ধরে ধরে লাগাতে হয়। স্বভাব খারাপ হয়ে গেছে শালাদের। ট্রেন সুমায় মত না ছাড়ে, না আসে। হয়রানির শ্যাষ নাই। কিন্তু এই সদ্য দুধের দাঁত নড়া ছাওয়ালটার ওপর ভরসা করাটা কী ঠিক হয়?

নাম কী?

পক্ষীরাজ। ছুটবে যখন বোঝবা—

ধুর ব্যাটা। নিজের নামখান যদি যদি জানা থাকে, বল।

ই কীরম কথা! নিজের নাম জানব না মানে?

সেটা কী?

থুক্কু।

কী।—আরে অই?

থুক্কু।

কী—আরে—থুক্—

কু। থুক্কু। তুমি খেলাধুলা করলে জানতে পারতা, যখন কারো খেলা ভেঙে চলে যাওয়ার মন হয়, সে বলে, থুক্কু। ইস্টপ্অ, বন্দ। সে চলে গেলে তবে খেলা শুরু করা যায়। ইচ্ছা করলে সে-ই শুরু করতে পারে আবার।

আরে, তার সঙ্গে তোর নামের সম্পক্ক কীরে, শালা!

নামখান দিয়েছিল আমার দাদি। খুব—কী বলব?—ভংকর মেয়েমানুষ। তার আষ্ট-হাতের মধ্য দিয়া কেউ আসা-যাওয়ার কল্‌জে রাখত না।

তোর দাদু—সে কী করত?

দ্যাখ, ট্যারা কথা বলবা না। তুমি কী যাবা? না'হলে আমি চল্লাম আমার পক্ষীরাজ নিয়ে।

আরে, যাবো তো বটেই—

তবে উঠে পড়। ভাড়া, ষোল আর জলপানি পাঁচ, একুনে একুশ। জলপানির টাকা আগাম।

রিকশাঅলার খাওয়ার দায় সওয়ারির না রে।—আমারে ধুর পেয়েছ, আঁই? তুই ব্যাটা খাবি, কি উপোস থাকবি, তাতে আমার কী হে?

তুমি কেমন লোক হে? খালি প্যাটে গাড়ি চালানো যায়? তুমি পার?

শালার কথা শোন! আমি হলাম গে—খচ্চরের খচ্চর। তুই আমারে গাড়ি চালাতে বলিস, আঁই! চাবকে একেবারে—মনে মনে গুলিগোলা দেগে রতন বলে, বোঝানোর মত করে, কথাগুলোন মিস্টি করে বলতে হয়। যদি বলতে যে, কত্তা, আমার খিদে লেগেছে, খাব,তবে কি সিকিটা আধুলিটা দেয়া যায় না? কিন্তু তুমি যদি পার্টির লোকেদের মত 'চাই চাই ইনকিলাব' হাঁক ছাড়, হাত উপুড় করার পাত্তর নই হে, দাদির নাতি।

কী করতে চাও তালে?

হাটে যেতে চাই। তুমি নিয়া যাবা। ভাড়া তুমি হেঁকেছ। আমি সেটা মানি নাই। এখানে আমি নতুন। পথঘাট চিনি না। ভাড়াও জানা নাই। হাট পজ্জন্ত তো পৌঁছই আগে। তারপর বেবেচনা করে দেখা যাবে, তোমার চাওয়াটা—ঐ ষোল টাকা—কতখানি নায্য। খাওয়ার খরচা দিব, আগাম। তালে দুগ্‌গা বলে—

আমার প্যাটে মোচড় দেয়। আমি যেতে পারব না।

আরে বদের বদ, কাজের কথায় তোমার হাগা পায়!

পেলে কী করব?

আটকে রাখবে। ভদ্দরনোকেরা কী করে জান? মোটে হাগে না। মাসে, কি দুই মাসে, ওই দু' এক কোঁত কোনরকমে—

আমি কি ভদ্দরনোক নাকি?

হতে তো কোন নিষেধ নাই। হও, এখন থে।

অ। ঘড়িখান তালে খোল।

কী—ঈ—

হাতে বেদে ভদ্দরনোক হব।

শালা কতবড়—তোমারে আমি ষোলই দিব।

দ্যান।

আরে! পৌঁছে দে আগে। আগাম ভাড়া দেওয়া—না, কোন নিয়ম নাই।

র‍্যালে ওঠার আগে টিকিট কাটতে হয়, নগদ পয়সায়। আমার পক্ষীরাজ র‍্যালের নিয়মে চলে।

তোরে পুলিশে দেব রে, র‍্যালবাজ।

তা দিতে পারেন। খারাপ কী? ওঠেন, থানা কাছেই। দুই টাকার মামলা।

তুই কি আমারে শুক্‌কুরের হাটে নিয়ে যাবি, নাকি তামাশাই দেখাবি!

আরে, নিয়ে যাব বলেই তো পক্ষীরাজ নিয়ে বসে থাকি। কিন্তু পরতা পড়তে হবে না, বাহ!

আমারে পরতা বোঝাস না রে ব্যাটা। আমি হচ্ছি রতন মণ্ডল, মহাজনি আমার কারবার। তুই আমারে পরতা বোঝাবি: বিপদে পড়েছি বলে তোকে কিছু বলছি না। —এটা এট্টা

কোন জায়গা। স্টেশন চত্বরে একখান মাত্র রিকশা।

আর একখান আছে গো। নিরাপদর—

তোর নিরাপদর গুষ্টি কিলাই। তুই রিকশায় উঠবি? নাইলে তোমার চাম—এই নে। যোল আর পাঁচে, একুইশ। শালা খচ্চর, হারামি, বদমাশ, ইয়্যুতে, মর। জোরে চালা, জোরে প্যাডেল ঠ্যাল রে—নামটা ক্যান কী?—না, না, এখন থেকে তোর নাম হোল খতমবাজ—

হি—হি—

চুপ—বজ্জাত—

ঝাড়খণ্ড লাগোয়া এই অঞ্চলের প্রকৃত এবং ভূবিন্যাসের কোন নির্দিষ্ট চেহারা নেই। কোথাও তা এবরো-খেবরো, টিলা সমাকীর্ণ। গেরুয়া আঁচল বিছিয়ে প্রকৃতি রিক্ত সেখানে। কোথাও বা মাঠ জুড়ে বিছনো শরতের অকৃপণ দাক্ষিণ্য। মনে হয়, যেন দিগন্ত জুড়ে পাতা আছে এক্কা-দোক্কা খেলার এক কোর্ট, তার ওপর দিয়ে লাফিয়ে লাফিয়ে চলে যাচ্ছে কচি এক জোড়া চোখের প্রগাঢ় বিস্ময়। চাকা ঘোরে, রাস্তা রাস্তা করে দেয়। বর্শার ফলার মত রোদ চলন্ত অ্যাস্‌ফালটে ধাক্কা খেয়ে ঠিক্‌রে ঠিকরে যায়, আর দাদির টকটকে লাল চোখের কথা মনে পড়ে।

দাদি গান্ধি ছাড়া কারোরে মান্য করত না। এখন যেডা গান্ধি ময়দান, গান্ধি সেখানেই একদিন মিটিন করেছিল। তারপর থেকেই, দাদি বলেছিল, যা ছিল মেলার মাঠ, তা হয়ে গেল গান্ধি ময়দান। গান্ধিকে দাদি দেখেছিল, একেবারে সামনে থেকে। তখন তার কী চেহারা। গায়ের রং এই ফাটে, এই ফাটে! কী তখন খ্যামতা তার। এই মিটিন করছে, বক্তিতা দিচ্ছে, দেখতে দেখতে ভিনিস! পুলিশ ব্যাটারা—হাঁ! —ধর শালারা। যাকগে। দাদি গান্ধিবাবারে হাত বাড়ায়ে পেন্নাম করতেই সে বলল, কী হতে চাও ভেবেচিন্তে বল। দাদি ভাবতে বসল, আর ওদিকে মানুষের ঢল গান্ধিবাবারে ভাসায়ে নিয়ে গেল। দাদির আর চাওয়া হলো না। না হলে, আমারে আজ রিক্সা চালাতে হয়। যার ঠ্যাংয়ের উপর ঠ্যাং তুলে সব বজ্জাতদের টিট করার কথা, সে কিনা—যাকগে যাক। দাদিরে সব শালা ডরাত। গান্ধি দেখা মানুষ বলে কথা। সব পার্টির লোক তার কাছে টিট। একবার, হয়েছে কি, দাদির নদর এক খাসি কেটেকুটে খেয়ে ফেলেছে মাহাত পাড়ার দুর্‌মুসোরা। তারা জানত না, খাসিখান ছিল দাদির। যেই শুনেছে, সে মাংস আর হজম হয় না। প্যাটের মধ্যে ঘুরে ফিরে খালি ডাকে। পাড়ার লোকেরা দেখল যে, বিপদ। দাদি জানার আগেই মাহাতপাড়ার মাতব্বররা দাদির পায়ের ওপর সবক'টা চোর উচ্ছুগু করে দিয়ে বলল, কী সাজা হয়, বাতাও। বড় মাহাতর নাতিডারে কান ধরে তুলে ঠাস ঠাস করে খানকতক লাগিয়ে দাদি গজ্জে উঠল, এই শয়তান, মাংস খাওয়ার শখ হয়েছিল, বলতে পারনি, হারামজাদা? আমার খাসি খেয়েছ যেমন, এবার আমিও তোদের খাব। ওবেলা আসবে সব। যাও এখন। শোন, যে আসবে না, তার বাপরে ধরে সপাং সপাং ছপটি। মনে রেখো।

সবাই মনে ভাবল, আজ আর রক্ষা নাই চোরপাট্টির। মাহাতপাড়ার বাপেরা সব সরে পড়ল এদিক-ওদিক। আমরা ভেবে থুলাম, আজ রাতে জমবে কীচকবধ পালা। অমা, কোথায়

কী! চোরেরা দু'পেট মাংস সেটে দাদি-গান্ধি-জেন্দাবাদ' হেঁকে ঘরে ফিরল। —'দাদিগান্ধি' নামটা কিছুদিন চলেছিল। তারপর, যেমন হয়—নতুন নতুন নাম জানা নাম ভুলায়ে দেয়, নয়া নয়া ঘটনা পুরানো ঘটনার উপর চেপে বসে, সময় বড় তেজীয়ান হে। তোমারে ঠেলে-ধাক্কিয়ে ঘেটি ধরে চিৎ করে ফেলে রাখবে রাস্তার ধারে। কেউ তোমার নামও করবে না।

দাদির নামও লোকেরা ভুলে গেছে। খালি তার কথাই বা বলি ক্যানো? গান্ধিবাবার নামও কি, এ্যাঁ?—যাকগে যাক্।

তা, সে বুড়ি দাদিমা আমার ও-রকম একটা হ্যাটা-খাওয়া নাম যে দিলে দিল—ফিচেল বুড়ি, বেঁচে যদি থাকতে পারতিস, তরে আমি যমের সঙ্গে নিকে করাতাম রে। বলে, থুক্কু অপছন্দের নাম হতে যাবে কেন? একদিন বলেছিল। খেলায় যখন থুক্কু হাঁক, তার মানেডা জান তো? থেমে যাও, নতুন করে শুরু কর আবার।—তোমার আসাটা ঠিক সময়ে ঠিক মত হয় নাই। তাই থুক্কু দিয়ে তোর মা বেটিরে নয়া করে দ্বিতীয় খেপ তোরে বিয়োতে বলেছিলাম। তা সে-বেটি শুনল? তোরে কলা দেখিয়ে ভগা হারামিরে বগলদাবা করে কেটে পড়ল। তুই থুক্কু হয়েই থাকলি।—এ নিয়ে মনে কোন দুঃখ রাখিস না। ক্রেমে ক্রেমে বুঝবি, দ্যাশের বেশির ভাগ লোকেরই নাম হওয়া উচিত ছিল থুক্কু। তোর মতই সব থুক্কু—থুক্কু থানাদার, পাঞ্চেৎ প্রধান, সভাধিপতি—থুক্কু, হি-হি। থুক্কু পাট্টি, থুক্কু মন্ত্রী, চান্দিকে খালি থুক্কু থুক্কু—হি-হি। পেতিস না, বাপ। তোমার ইচ্ছা হলে আমারে থুক্কু দাদি বলে ডাকতে পার। আমি আপত্ত করব না।

তো, কথা নাই, বাত্তরা নাই, বুড়ি একদিন হাঁটা দিল উপরের দিকে। অনেকেই হিক্কা তুলে গান ধরেছিল, অরে, দাদি তোর সগ্গে গেল রে—এ—এ—সব একেবারে সগ্গে তুলে দিয়ে এল যেন। তা সে বুড়ি সগগেই যাক, আর নরকেই যাক, আমি এখন যাই কই, খাই কী?

বুধু—শালা মহাজন, খচ্চরের খচ্চর, সাত সকালে এসে হাজির—মহাজন থাক, এট্টু হাওয়া খেয়ে নিই।—এই যে সওয়ারি—নাম ভুলে গেছি—নামতে পার ইচ্ছা করলে। এই যে বাঁদিকে বিল দেখ, এর নাম হলো পাল্‌কি পোঁতার বিল। নাম। আরে, নাম হে। দ্যাখ্, রিকসা যখন চলে, তুমি তখন সওয়ারি। রিকসা যখন থেমে আছে, তখন, কী, এ্যা—নট্‌কা। —বসে থাকতে পার। তার জন্য আলাদা চার্জ। প্রতি পাঁচ মিনিটে—

রতন মহাজন ঝট্ করে নেমে পড়ে। নেমেই ঝিলের ধার ঘেঁষে হাঁটতে থাকে। বেশ ঠাণ্ডা হাওয়া দিচ্ছে। শরীর—না, শরতের এই সকালবেলাতেও—চোখ-মুখ দিয়ে যেন ভাপ বেরতে থাকে। আসলে ভেতরে যখন আগুন লেগেছে, তখন বাইরের হাওয়ায় তা নেভবার নয়।—বড় প্যাঁচে পড়ে গিয়েছি হে। নাহলে তোর মত.আবাত্তি খচ্চরের ঘেটিখান একটানে একেবারে—হ্যাঁ। বুঝতিস, কারে কী কয়। চাকা গড়ালেও পয়সা, না গড়ালেও পয়সা। বোঝ। আরে অই, বজ্জাত, এর নাম ব্যবসা, না, ডাকাতি। চল, হাটে পৌঁছাই একবার, তারপর দেব ভাড়া। মুখে পিসাব করে দেব।

আমি রতন সিং, আমাকে ধুর পাট্টি পেয়েছিস রে, ছিঁচড়া কাঁহাকার। আমরা সিং, সিংহ—

টাইগার। না, টাইগার তো হলো বাঘ। সিংহ হলো লাইয়ন—আরে এই, লাইয়ন মানে কী বলতে পারিস?

সিংহ।

তাজ্জব, এ শালা লাইয়নের মানে—কে যে কী জানে কিচ্ছু মালুম হয় না আজকাল। তো সিংহ, ওই লাইয়নই হলো। —তুমি জান, ব্যাটা, আমার নামে বাঘে-গরুতে একঘাটে পানি পীয়ে।

তো?

কেয়া 'তো'?

তাতে কী হলো? আমি বাঘও না, গরুও না। তারা একঘাটে জল খাক, খাক। তুমি মুখ ডুবাতে পার ইচ্ছা হলে।

কী—ঈ। আমারে জাবনা খেতে বলিস—

তুই খা।

আমি তো খাবোই। এই দেখ—।

চ্যাতে না। বস।—এই হলো পাল্‌কিপোঁতা বিল। কেন জান? সে অনেককাল আগের কথা। বিয়ের পর নতুন বউ যাচ্ছে শ্বশুরবাড়ি। সঙ্গে বর। চার বেহারার পাল্‌কি। চার দুনো আট ভোজপুরী লেঠেল চলে পাল্‌কির পাশে পাশে। তারা যখন্‌ এই বিলের ধারে এসে পৌঁছল—তখনও এর নাম পালকিপোঁতা হয় নাই—সুজ্জি তখন ডোবে-ডোবে। চারপাশ আবছা হয়ে আসছে। হঠাৎ—আকাশ বুঝি খান্‌খান্‌ হয়ে ভেঙে পড়ল। হীরা ডাকাত তার সাঙ্গপাঙ্গ নিয়ে পথ আটকে দাঁড়াল। শালার গলা তো না, য্যান শিঙ্গা—'মা, আমি হীরে। তোমার সন্তান। ভয় করো না। ছেলে বিপদে পড়েছে, মা। গয়নাগুলো দে—

বর গজ্জে ওঠে, হীরে, সরে যা। আমি দুরমুটের ছোট সামন্ত, সরে যা বলছি।

হীরা তারে লাঠির প্যাঁচে পেন্নাম ঠুকে বলে, কত্তা, ক্যান মিছামিছি রক্তপাত করাবেন। নক্‌খি নিয়ে যাচ্ছেন। তার কাছে আমাদেরও কিছু চাওয়া পাওয়ার থাকে—

সামন্তকত্তা বললে, এই নে।

লাঠি চলল। লাশ পড়তে লাগল। কত্তা আর তার আষ্ট লাঠিয়াল মুখ থুবড়ে পড়ে থাক্‌ল। তখন—গপ্পের মত শোনাবে—পাল্‌কি থেকে নেমে এল সেই নক্‌খি। হাতে তরোয়াল। চিৎকার করে বলল, হীরা কে? সামনে আয়।—সামনে তো সে এল, বুঝেছ? তারপর—এক কোপের মামলা। চক্ষের পলক ফেলতে না ফেলতে মুণ্ডু তার উড়ে গিয়ে পড়ল বিলের গভভে। হীরের সঙ্গীরা কতক পালাল, বেশির ভাগই কাটা পড়ল। পরদিন স্বামির দেহ চিতায় তুলে দিয়ে পালকিখানা বিলে পুঁতে দিয়ে বউরানি বলল, থাক জলে ডুবে, অলুক্ষুনে বেটি।—কিন্তু, রাতবিরেতে পাল্‌কিখান উঠে আসে, ভংকর চিৎকারে ফেটে পড়ে, কত্তা হে, আমি যে দম ফেটে মরলাম—! কী, বিশ্বাস হচ্ছে না? শুনবেন?

রতন মহাজনকে কিছুটা বোকাবোকা দেখায়, ভীতও। হাসার চেষ্টা করে, পারে না। খেঁকিয়ে ওঠে, একটা কথা মনে রাখিসরে। বজ্জাতের বজ্জাত। থানা পুলিশ পাট্টি 'এমলে' আমার ট্যাকে গোঁজা। ইচ্ছা করলে, পালকি সমতে বিল হাজতে পুরে দিতে পারিরে, রিকসা-

বাজ্ব হারামি।

আমি এখন চান করব।

কী করবি?

চান। খুব ঘাম জমেছে।

দ্যাখ বাপু, কী যেন নাম, ভুলে যাই, যাই হোক—আমারে শুক্কুরের হাটে পৌঁছে দিয়ে তুমি যা খুশি করতে পার। যা শুরু করেছ, আমি পৌঁছাতে পৌঁছাতেই সব গরু-ছাগল বিক্রি হয়ে যাবে।

কী যে বলেন। চারপাশে গরুছাগল কিছু কম নাকি। কিনবেন—

দেখ, অনেক বাচলামি করেছ। রিকশায় উঠ। বাজে কত জান?

ওঠেন তাহলে। ঠিক মত, বেশ আরাম করে বসেছেন তো?

আরে, ফাত্‌রা কথা থুয়ে প্যাডেল ঠ্যাল।

হুম্‌।

উৎরাইয়ের মুখ এখানটায়। চালানোর শ্রম নেই বললেই চলে, কিন্তু গাড়ি এত জোরে নামতে থাকে যে নিয়ন্ত্রণ হারানোর ভয় জড়িয়ে রাখে আষ্টেপৃষ্টে। এই বুঝি ভারসাম্য হারালো। এ-রকম এক আশঙ্কা বুকের ভেতর খোলকর্তাল পিটতে থাকে।

রতন, চকিতে এই গতি বেড়ে যাওয়ায়, পড়ে যাচ্ছিল প্রায়। প্রাণপণে সীটের হ্যাণ্ডেল চেপে ধরে অবস্থাটা সামাল দেয়। তারপরই বেজায় খুশি হয়ে ওঠে, দমকে দমকে হাসতে থাকে, হাত-মাথা নেড়ে বাহবা দেয়, বাহ্‌ বাই, বাহ্‌। বাড়াতি পাঁচ ট্যাকা দিব রে ব্যাটা। আরো জোর, আরো জোরে প্যাডেল চাপ দে রে হারামজাদা। পাঁচ ট্যাকা নগদ—হা—হা—বাহ্‌বাই, উড়ে পক্ষীরাজ—

হঠাৎ থেমে যায় রিক্‌সা। হয়তো হঠাৎ নয়, গতি ধীরে ধীরে কমে আসছিল। রতন খেয়াল করে নি। তখনও সে গতির ঘোরের মধ্যে রয়েছে।

থুক্কু নেমে আসে। কোমর থেকে গামছা খুলে নিয়ে ঘাম মোছে। শরীরে বুঝি বান ডেকেছে নোনা জলের। সমুদ্দুরের জল নাকি নোনতা। তার ভেতরে কি তবে ছোটখাট এক সমুদ্দুর ঝিম মেরে রয়েছে। কথাটা ভালমত বসতে পারল না। পিঁড়ি দেয়া হলো না। তখনই মনে পড়ে আর এক কথা। সাঁ করে ঘুরে গিয়ে রতনের সামনে এসে বলে, ট্যাকা পাঁচটা বার করেন।

রতন অবাক হয়। ভুরু কুঁচকে চোখ ছোট করে বলে, কিসের ট্যাকা, ওই খচ্চর?

এই দেখ, আমার সঙ্গে দুই নম্বরি করতে এসো না। ঝিলের মধ্যে ধাক্কা দিয়ে ফ্যালায়া দেব।

রতন দুই লাফে রাস্তার ওপারে। চার দিকে চোখ বুলিয়ে দেখে, জনমনিষ্যির কোন চিহ্ন নাই। শালা যদি বিলের মধ্যে ঠেসে ধরে তো হৈল। ব্যাটা দেখতে ছোট, কিন্তু ত্যাঁদরামিতে বাপ জ্যাঠারে পেছনে ফেলে। আমিও কিছু কম ভাবিস না রে, ব্যাটা। জ্যালের ভাত খাওয়াব তোরে, দ্যাখ।

ট্যাকা ছাড় হে—

অই, কিসের ট্যাকা?

নিজেই তো বললা যে সাঁ সাঁ করে নামতে পারলে পাঁচ। —আরে, তোমার ওটা মুখ, না, গাধার পোঁদ?

শালা, আমার জাত মারলি? তোরে আমি—ডাণ্ডা নাকি কাজের সময় পাওয়া যায়!

শোন, মাজন, বেশি ক্যারদানি দেখাবা তো এক চটকানে—ট্যাকা ছাড়। কথা না। ট্যাকা। নিজের মুখে বলেছ।—কই?

আস্তে। বলছি যখন, দিব। চেঁচানোর কিছু হয় নাই।—তিন ট্যাকা নে।

পাঁচ।

নে, আরও আট আনা।

পাঁচ।

আচ্ছা, আচ্ছা, তোর কথাই থাক। ধর—

চার! তোমার কি আমাশা আছে, এট্টু এট্টু করে ছাড়?

নে, এই পুরাই ছাড়লাম। খা, আমাশার হাগা।

নোটখানা পরিপাটি করে প্যান্টের চোরা পকেটে গুঁজে দিয়ে সীট থেকে ঝপ্ করে নেমে পড়ে, হ্যাণ্ডেলে হাত রেখে বলে, ঠেলতে হবে। ঠেল—

কী! কী করতে হবে?

ঠেলতে হবে।

রিকসা?

না, আমারে। এত আবাতুরো কথা বল কেন?

ভাড়ার ট্যাকা গুনে নেবা তুমি, আর রিকসা ঠেলব আমি! আমারে বেকুব পেয়েছ?

তবে রিকসাতেই বসে থাক। ঠেলার জন্য বাড়তি তিরিশ ট্যাকা দাও। ঠেলার লোক জুটোয়ে নিচ্ছি।

আরে ওই বজ্জাত, এখানে লোক পাবি কই রে!

পাব, পাব। ট্যাকা ছাড়, তারপর দেখ, লোক আসে কোত্ থে।

রতন আর কথা বাড়ায় না। রিকসার পেছনে সরে আসে। দু'হাত এগিয়ে দিয়ে ঠেলতে থাকে।

ভাত খাও, না, বাল্লি খাও! জোর নাই গায়ে? জোরে ঠেল—

খানিকখনের ভেতরেই কথা বলার অবস্থা থাকে না রতনের। রোমকূপের মুখগুলো খুলে যেতে থাকে, আর ঘামের বান ডাকে বুঝি। চোখ জ্বলে যায়, মুখ নোনতা স্বাদে ভরে ওঠে। থুতু কাটতে হয় ঘন ঘন। ছোঁড়ার কথায় যেন বিশ্বব্রহ্মাণ্ড জ্বলে ওঠে, জ্বলতে থাকে দাউ দাউ। কিন্তু কিছু করার থাকে না। মনোযোগ করে গেলেই রিক্সা ঠেলে-গুঁতিয়ে আধমরা করে কোথায় যে আছড়ে ফেলবে, খোদাই মালুম। তাই রিক্সা থেকে, রাস্তা থেকে চোখ তোলবার কোন চেষ্টাও সে করে না। —চড়াই ঠেলে আগে উঠে তো নেই, তারপর-তারপর হচ্ছে তোর।

মোক্ষম ঠেলায় রিকসাখানা চড়াইয়ের মাথায় তুলে দিয়ে যেন নিশ্চিন্ত হলো। বড় করে

দম ছাড়া-নেয়া করতে থাকে। হাতের ডানা টনটন করতে থাকে। তবু এটা ভেবে নিশ্চিন্ত হয় যে, এখন গড়গড়িয়ে চলবে পক্ষীরাজ। লাফ দিয়ে উঠে পড়ে, কর্কশ গলায় বলে, অনেক খেলা দেখিয়েছ, আর যদি—

আমি কী করব?—প্যাডেলে চাপ দিয়ে থুক্‌কু সীটে উঠে বসে, বলে, আমি কি ইচ্ছে করে তাই—

ঠিক আছে। তোমার মত ভাল্ ছাওয়াল আশমানের তলায় আর একখানও নাই। এখন একদমে সাঁ করে চল দেখি গরুহাটায়—

পারব বলে তো মনে হয় না।

পারতেই হবে, য়্যার্কি নাকি। ট্যাকা নিলি তুই, আর শালা হাটে পৌছে দেবে নিদু মোক্তার। বহৎ কথা হয়েছে। কথা নয়, কাজ চাই, জিন্দাবাদ।

আরও চারখানা চড়াই আছে, চারখানা উৎরাই আছে সামনে। চার চার আটবার ওঠা নামার হ্যাপার জন্য দু'শ চল্লিশ ট্যাকা বাড়াত লাগবে। দিবে যদি বল, ভেবেচিন্তে—

মহাজন বুঝি ভাবতেই বসল। তাকিয়ে রইল কিন্তু থুক্‌কুর দিকে। থুক্‌কুও চোখ সরায় না। এক সময় ভয়ঙ্কর একটা গর্জনে ঝিম ধরা চারপাশে কেঁপে ওঠে যেন।

থুক্‌কুর যেন জানা ছিল, গর্জনটা উঠে আসবে বুক খালি করে। বোঝ, মাত্তর দু'শ চল্লিশ ট্যাকার শোকেই যদি এতবড় হাঁক ছাড়তে পার—এখন পজ্জন্ত তোমার ট্যাকা তোমার কাছেই গচ্ছিত রয়েছে—তালে যারা জমি খোয়ায়, গরু ছাগল তোমাদের গোয়ালে বাঁধা পড়ে যাদের, তারা সক্কলে মিলে যদি হাঁক ছাড়তে পারত, তবে তার ধাক্কায় খাড়ায়ে থাকতে পারবা তো? আমি থুক্‌কু। দাদির দেয়া নাম। আমার বাপেরে যখন তোমার নেঠেলরা মেরে ফেলল, দাদি আমার গালে ঠাস ঠাস কষিয়ে গজ্জে উঠেছিল, তুই ছাওয়াল বাপেরে মরতে দেখ খাড়ায়ে খাড়ায়ে। তুই হারামজাদা থুক্‌কু ছাওয়াল। ঘুরত যা মার প্যাটে রে, দুরমুসা, ঘুরত যা—

তাই নাকি যায়। যায় না।—চিতে, আমার বন্ধু, বলেছিল। আমার মতই রিক্‌সা চালাত। বলেছিল, এ-জন্মের কাম তোমাকে এ-জন্মেই করতে হবে। এ-ব্যাপারে কোন ধারবাকি কারবারের চল নাই। দ্যাব্‌তাদের দেখিস না—পাপের সাজা নগদ নগদ। রাম খুন করল রাবণরে, কংস মলো কেষ্টর হাতে। কেউ বলল কী যে, থাক, সামনের জন্মে হবে তোর সঙ্গে বোঝাবুঝি?—আদলা ইটের কেরামতি দেখাব রে, শালা তোরে।—অদৃশ্য শত্রুর দিকে চেয়ে তাল ঠুকেছিল, আয়, —আয়—

চিতে এখন কোন জেলে, কে জানে। তাদের জমিজিরেত চলে গেল যার গভ্ভে, যার জন্যে বিবাগী হয়ে গেল বাপ তার, মা হয়ে গেল ভিখিরি—বেটা কথা রেখেছিল। ইটের এক ঘায় ছোটকত্তার মাথাখান—

কী রক্ত! এত রক্ত নাকি থাকে মান্‌ষের শরীরে!—এদের থাকে। ভালমন্দ কিছু কম তো খায়নি।

রতনের থ্যাতলানো মাথাটা পা দিয়ে ঠেলে দিয়ে হো হো করে হেসে ওঠে থুক্‌কু, শুনে রাখ লোকজন, আজ থে আমি আর থুক্‌কু নই হে—হা—হা—হা।

দেড়খানা ঘোড়ার গল্প

বশীর আল্‌হেলাল

বাবা, দেখো, দেখো দেখো দেখো দেখো।

পল্টু নিশ্চয় কিছু একটা দেখেছে সত্যি আশ্চর্যজনক। না হলে ওইভাবে ডাকবে? ছেলে আশ্চর্য কিছু পেলে বাবাকে ভাগ না দিয়ে ছাড়ে না, সে বইয়ের পাতায়, স্কুলে, পথে-ঘাটে, মায়ের বিয়ের টিনের বাকসোটায়, যেখানে হোক না কেন। আবার পল্টু ও জিনিসটা তার এ বাবার কাছ থেকে পেয়েছে, এমন আধুনিক কালে অমন অবাক হওয়ার ক্ষমতা। অর্থাৎ দুই হাবারাম বাবা রয়েছে এ-বাড়িতে। বাবা পল্টুর ওইরকম ডাক শুনলে প্রায় পড়িমরি ছোটেন। কিন্তু ঘরের মধ্যে এখন তাঁর হাতে ভয়ানক গরম আইরন, ওই পল্টুরই কালকের স্কুলের নীল শর্টস্ সাদা শার্ট ইস্তিরি করছেন। ওটা মেঝেতে খাটের তলায় সাবধানে খাড়া করে রেখে ছুটলেন বারান্দায়। পল্টু 'বাবা বাবা' করে ডেকেই চলেছে। কী রে? বারান্দায় তিনতলা থেকে বাবা আকাশ থেকে পাতাল পূর্ব-পশ্চিম হাতড়াতে লাগলেন। কী রে, কেন চিল্লাচ্ছিস? পল্টু আঙুল দিয়ে দেখালো। দেখো। দেখেছ?

এইমাত্র বলা হয়েছে, বাপেরও নাবালক ছেলের মতো অবাক হওয়ার ক্ষমতা একটু বেশি। বাঁয়ের বাড়িটাকে লোকে বলে এসপি সায়েবের বাড়ি, তিনতলা। ওটার এ-পাশের প্লটটা খালি পড়ে আছে। হিন্দুর জায়গা, তাই খালি পড়ে আছে। সেইজন্যে এ তিনতলা থেকে দেখা গেল ওই খালি প্লটের পাশের রাস্তায় লালচে-রঙের, ঘোড়া নয়, ঘোড়ার একটা বাচ্চা। ঘোড়ার বাচ্চা না হয়ে ধাড়ি ঘোড়া হলেও পল্টুর বাবা আখলাক সায়েব অবাক হতেন। কিন্তু ঘোড়ার বাচ্চা? আমাদের এ মহল্লায় ঘোড়ার বাচ্চা? তাই তো, ঘোড়ার বাচ্চা? কোথা থেকে এল? কে আনল? পল্টু বলল, বাবা, দেখেছ?

বাবা বললেন, হ্যাঁ, দেখছি তো?

তিনি মাথা ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে এদিক ওদিক দেখছেন। ক্রমে একটু অস্থিরও হলেন। মাথা জানালার গ্রিলের বাইরেই নিয়ে যাবেন যেন, ঠোকর খেলেন। 'উহ্' বলে ওখানটায় দুটো আঙুল ঘষলেন। পল্টু উদ্‌বিগ্ন হয়েছে। বাবা, তুমি কী খুঁজছ?

ওই রাস্তাটা সামনেই বড় রাস্তায় গিয়ে পড়েছে। কিন্তু সবখানে বাড়ি আর বাড়ি তিন চার পাঁচতলা। দু-একটা প্লট বাড়ি উঠবে বলে খালি পড়ে আছে। ওই রকম খালি প্লটের ফাঁক দিয়ে খানিকটা দেখা যায়, খুব বেশি দেখা যায় না। ঘোড়ার বাচ্চাটা কে কিন্তু ও অবাক হয়েছে বলে মনে হয় না। কেবল চুপচাপ ঘাড় বাঁকা ক'রে দাঁড়িয়ে আছে। ল—ম্বা তার বাঁকা ঘাড়ের ডগায় মাথাটা, নামিয়ে, পথের ধারে দু-একটা ঘাস আছে মনে হয়, অনিচ্ছায় খুঁটে খাচ্ছে। মনে হয় ওর আসল উদ্দেশ্য বড় রাস্তাটায় যাওয়া। তাহলে তো তখন আর দেখা যাবে না ওটাকে। পল্টু আবার বলল, বাবা, তুমি কী খুঁজছ?

বাবা বলেন, হ্যাঁ রে বোকা, ওইটুকু একটা ঘোড়ার বাচ্চা, ওর মা থাকবে না?

তাতে পল্টু আরো অস্থির হয়ে উঠল মনে হয়। সে চিৎকার করে ডাকতে লাগল, মা মা, জলদি এসো।

মা দৌড়াতে দৌড়াতেই এলেন। কী?

ওই যে দেখো, ঘোড়ার বাচ্চা একটা। দেখছ? ওই যে লাল বাচ্চাটা? দেখতে পাচ্ছ?

পাচ্ছি।

আখলাক সায়েব বললেন, আশ্চর্য কোথা থেকে এল ঘোড়ার বাচ্চা একটা? তাহলে ওর মা-টা তো থাকবে। আরো ঘোড়া থাকবে। একটা লোক তো থাকবে।

মা দুপুরের ঘুম থেকে উঠেছেন। এলোমেলো কতকগুলো চুল পেছনে নিয়ে গিয়ে ঝাড়া দিতে লাগলেন। তারপর নীরবে চলে গেলেন।

পল্টু মুখ তুলে বাবার মুখ দেখল। বাবা?

কী?

ঘোড়ার বাচ্চাটা সুন্দর।

হ্যাঁ।

ঘোড়ার বাচ্চাটা এখনো ঘোড়া হয়নি, তাই আরো সুন্দর। ধড়ের চাইতে দেখেছিস পা-চারটে অনেক লম্বা?

পল্টু বাচ্চা এর আগে দেখেনি। বাবা যখন জিজ্ঞেস করলেন, পল্টু, বাচ্চা ঘোড়া আগে দেখেছ?

পল্টু বলে, না। চিড়িয়াখানায় বড় ঘোড়া দেখেছি। ঘোড়ার পিঠে চড়তে চাইলাম, মা চড়তে দিল না। কিন্তু ঘোড়ার বাচ্চা আর দেখিনি।

পল্টু ডানাওয়ালা ঘোড়ার গল্প পড়েছে, ছবিও দেখেছে। তাই তার মনে হচ্ছিল, ওই যে ঘোড়ার বাচ্চাটা রাস্তায়, কোন্‌দিকে তার পথ বুঝতে না পেরে উড়ে চলে যাবে নাকি? কিন্তু ওটা ওখানে দাঁড়িয়েই আছে। এ-কাধ পা যাচ্ছে।

বাপ-বেটা, অবাক যেহেতু কারোরই গেল না, হঠাৎ দু'জনেই দেখে ঘোড়ার বাচ্চাটা নেই। পল্টু বলে, বাবা, ঘোড়ার বাচ্চাটা কই?

বাবা বলেন, তাই তো!

আসলে বলতে গেলে ব্যাপার তেমন কিছু নয়। আবার ব্যাপার একেবারে কিছু নয় তাই বা কেমন করে বলা যায়? প্রথমে ঐতিহাসিক, তার পরে ভৌগোলিক কথা দু-একটা এখানে বলে নেয়া যায়।

এ ঢাকা শহরে ঘোড়া ছিল চিরকাল। বুড়িগঙ্গা নদীর তীরে সপ্তদশ শতকে বাংলার সুবাদার ইসলাম খান যখন এ শহর পত্তন করেন তখন থেকেই এ শহরে ঘোড়া চলে। হাতিতেও লোকে চলাচল করত। নৌকাও চলত এ শহরের এ-মাথা ও-মাথা যে-সব খাল ছিল তাতে। ক্রমে মানুষ বেড়েছে, ইংরেজ আমলে ব্যবসা বেড়েছে, [illegible] অফিস-

আদালত স্কুল-কলেজ, পরে এমনকি বিশ্ববিদ্যালয় হয়েছে, ঘোড়ার গাড়ি হলে তখন একসময় ঢাকা শহরকে ঘোড়ার গাড়ির শহরই বলা হতো। ১৯৪৭-এ ইংরেজরা বিদায় হলে, পূর্ব পাকিস্তান হলে, তখনো খুব চলেছে দুই-ঘোড়ার চার-চাকার গাড়ি হেট্‌হেট্‌। বাষ্পীয় দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে এক-শ চাকার রেলগাড়ি ফুলবাড়িয়া স্টেশনে এসে দাঁড়ালে, চার থেকে ছ'আনা তখন ভাড়া, তাই নিয়ে ঘোড়ার গাড়ির স্ট্যাণ্ডে প্যাসেঞ্জারে-কোচওয়ানে দর কষাকষির হুজ্জত-হাঙ্গামা থেকে রসিয়ার তিতামিঠা মস্কারি বাতাস দিত উতাল করে, যার স্মৃতি কপচাতে আজও পাওয়া যায় তেমন লোক এ মহানগরে। তবে তিন-চাকার রিকশা তার জায়গা দখল করতে শুরু করলে, এক সময়ে তো, এমনকি স্বাধীন বাংলাদেশ হলে ১৯৭১ সালে, এর নাম রিকশার শহর চালু হয়ে যায়। একেবারে বিলুপ্ত হয়ে যায় ঘোড়া-সহ ঘোড়ার গাড়ি। কিন্তু হায়, সময়ের দাবি কে বলে, সে আধা-যান্ত্রিক রিকশাকে এবার ঢাকা মেট্রোপলিসের রাস্তাগুলি ছেড়ে দিতে হচ্ছে আধুনিক থেকে আধুনিকতর মোটরকার, ট্যাক্সি-ক্যাব, একতলা দোতলা ভল্‌ভো এ-সব বাস-কে। কিন্তু এখনো সেই পুরনো লোক আছে কান পাতলে সে শুনতে পায় খুরে নাল আঁটা সেই দুলকি শব্দ খট্‌খট খট্‌খট খট্‌খট, আর ঘোড়ার নাকের ঘৃষ্ট শব্দ। পলটুর বাবা আখলাক সায়েব, সরকারের মাঝারি অফিসার, অত পুরাতন নন যে, অটোমোবাইল চলা পথে হঠাৎ একটা আনমনা ঘোড়ার বাচ্চা দেখে ইতিহাসের অত দূরের পায়ের ধ্বনি তাঁর কানে বাজবে। বরং কতকগুলো পুলিশের আর আর্মির ঘোড়া ছাড়া আর ঘোড়া ঢাকা রাজধানীতে আছে এ বোধই তাঁর মাথায় ছিল না।

আর ভূগোলের কথাটা হলো এই যে, ঢাকা শহরের খাল-বিল লেক দিঘি পুষ্করিণী সব লোপাট হয়ে গেছে। লোপাট কিছু করেছে সরকার নিজে, বেশির-ভাগ নেতারা আমলারা, তথাকথিত ডেভেলপাররা। পরিবেশবাদীরা বুক চাপড়াচ্ছেন, কিন্তু করতে পারছেন না কিছুই। খাল বিল লেক দিঘি পুষ্করিণীর কথা কী বলছি, ঢাকা নগরীর কণ্ঠহার আর বাজুবন্দ বুড়িগঙ্গা, তুরাগ নদী, তাও ওরা গ্রাস করতে লেগেছে রাষ্ট্র ও তার সরকারের আদুরে লোক-গুলি, ওরা আসলে আদরের অজগর।

একজন ছড়া কাটেন :

জল নাই পানি নাই
ছিলেন ভগবান
তাঁর হলো অভিমান
চলে গেলেন গঙ্গোত্রী
বুক চাপড়ায় ভাইরে
এখন হিন্দুমুসলমান

ঢাকার সে কবিও কতকগুলি ঢাকাবাসীর মুখে ওই ছড়া তুলে দিয়ে কোন্ দিকে উধাও হয়ে গেলেন। ফেরেশতা মিকাইলের কী যে রাগ হলো, তিনি তৃতীয় আসমানটাকে ভেঙে খানখান করে দিলেন। বললেন, দে, ওদের বৃষ্টি দে। এমন বৃষ্টি হলো জ্যৈষ্ঠ থেকে ভাদ্র, খাল-বিল অবশিষ্ট নেই বললে চলে, নদ-নদী ভরাট হয়ে গেছে, ছোট দেশ বাংলাদেশ, বন্যা

যেন তাকে গিলে ফেলেছে। এক মন্ত্রী বললেন, বন্যার সঙ্গে আমাদের অভ্যস্ত হয়ে পড়তে হবে। তিনি কথাটা হয়তো মন্দ বলেননি। কিন্তু ওই কথার কত রকমের মানে হতে পারে। তিনি জানতেন না আকাশ যখন অঝোর ধারায় বৃষ্টি ঝরায়, মিকাইল ফেরেশতাও তখন তার সঙ্গে কাঁদেন, বৃষ্টির ধারার সঙ্গে তাঁর অশ্রুও মেশে, সে অশ্রু অবশ্য কেবল দুঃখের হয় না, সুখেরও হয়। সে মন্ত্রী কি জানতেন না মিকাইল আজিরাইল ইস্রাফিল ছাড়া আরো ফেরেশতা, যেমন জিব্রাইল আছেন? নে, তোরা কত অভ্যাস করবি দেখি। সকালবেলা ঘুম থেকে উঠে ঢাকাবাসী দেখল তাদের রাজধানী ঢাকায়ও বন্যা ঢুকে গেছে। বাঁধানো রাস্তায় পানি ভাঙার হড়হড় শব্দ শুনলেন দোতলা তেতলা চৌতলার ভাগ্যবান ও ভাগ্যবতীগুলি। একতলাবাসীদের উপর মিকাইল ফেরেশতার অভিমান মনে হয় বেশি হয়েছিল।

কিন্তু সমস্ত মহানগরে বান ঢোকেনি। কতকগুলো উঁচু এলাকায়, বিশেষত নতুন গজিয়ে-ওঠা হাউজিংগুলোতে ঢোকেনি বা এখনো ঢুকতে পারেনি, হয়তো পরে ঢুকবে। সেইজন্যেই তো পল্টু আর তার বাবা প্রমুখের এ গল্পটা এ অনতিপ্রস্তুত কলমে রচিত হলো, বাংলার পালল মাটিতে যেমন ইদানীং পাথর মুল্লুকের আঙুর চাষের প্রয়াস হচ্ছে। ঢাকা মহানগরী বন্যাপ্রতিরোধ বেড়ি বাঁধ দিয়ে ঘিরে ফেলা হচ্ছে। তিনদিক ঘেরা হয়েছে, পূর্বদিক বাকি। পশ্চিমের বাঁধ ছাদে উঠলে দেখা যায়। ওর উপর মজবুত রাস্তা হয়েছে। দিনরাত ট্রাক ছুটছে। প্রকৃতির গতি ঠেকিয়ে দিয়ে যন্ত্রের গতি বাড়িয়ে দিলাম। আখলাক সাহেব হঠাৎ ছেলেকে জিজ্ঞেস করলেন, হ্যাঁ পল্টু, ঘোড়ার বাচ্চাটা দেখে তুমি অবাক হয়েছ, তাই না?

পল্টু বলে, তুমি হওনি?

আখলাক এতে থমকে গেলেন। বললেন, আমরা এক জেনারেশন আগের মানুষ। আমরা ঘোড়ার কাছাকাছি ছিলাম। আমাদের আগের জেনারেশনের মানুষ হাতির কাছাকাছি ছিল। তুমি আছ জেট প্লেনের কাছাকাছি। তুমি কেন হবে না অবাক ঘোড়ার বাচ্চা দেখে?

ছেলে ব্যাপারটা বুঝতে পারল না। বলল, বাবা, আমি কিন্তু হাতির বাচ্চাও দেখিনি। দেখেছি, কিন্তু টেলিভিশনে। আসল দেখিনি। আমাদের চিড়িয়াখানায়ও নাই। বাবা?

কী?

হাতির বাচ্চা কিন্তু সব সময় দেখেছি দলের সঙ্গে আছে। ঘোড়ার বাচ্চাটাকে একা দেখলাম কেন? বাবা?

বাবা বলেন, আমিও তো তাই তাই ভাবি রে? বানে ভেসে এল নাকি?

বাবা?

কী?

ছেলে বলে, কেউ ওটাকে নিয়ে নেবে।

নিলে নেবে।

বাবা?

কী?

ঘোড়ার বাচ্চাটা খুব সুন্দর।

হুঁ।

বাইরে বিশ্বপ্রকৃতিতে কিছু অন্যরকম ঘটছে বলে আখলাক সায়েব অনুমান করেন, মানে খবরের কাগজের বাইরে। শেষ বিকেলের দিকে ছেলেটাকে নিয়ে একচক্কর কী কত্দূর ঘুরে আসা যায় দেখবেন ভেবেছিলেন। ছুটির দিনে কয়েকটা অফিসের ই-মেল বাড়ি থেকে পাঠাতে হচ্ছিল। সময় কুলোতে পারলেন না।

কিন্তু পলটু পরদিন ছাড়ল না। প্রথম বিকেলেই বাবার হাত ধরে বের হলো। দুই বোনের ছোটটা, নাতেকা, সঙ্গে যেতে চেয়েছিল। যেতে দিল না। জানিস্ কোথায় যাচ্ছি?

নাতেকা জানতে চায়, কোথায়?

পলটু বলে, কোথায়? আমরাই কি জানি কোথায়?

ডাইনে গিয়ে বাঁয়ে মোড় নিতেই পলটু বাবাকে জিজ্ঞেস করে, বাবা, কোথায় যাচ্ছি?

বাবা বলেন, তুমি নিয়ে যাচ্ছ, তুমি জানবে কোথা আমরা যাচ্ছি।

আগে বলা হয়েছে, এরা দু'জনেই সরল না হলেও সহজ ধরনের মানুষ, পলটু আর তার বাবা আখলাক সায়েব। বাঁয়ে পড়তে ও রাস্তাটা সোজা চলে গেছে উত্তরে। সোজা এ বড় রাস্তাটাকে একটার পর একটা ছেদন করেছে পূর্ব-পশ্চিম ছোট রাস্তাগুলি। তাতে ডানদিকে পড়ে বৃহত্তর যে ঢাকা। ওরি একটা রাস্তা দিয়ে স্কুলে যায় পলটু, নাতেকা। এ বড় রাস্তা যত উত্তরে যায়, ডাইনে-বাঁয়ে নির্মিত বা নির্মীয়মান বাড়িগুলি হালকা হয়ে আসে, সামান্য ইটের বাউণ্ডারি দেয়া ফাঁকা প্লট বাড়ে। এ বড় রাস্তা আর ছোট রাস্তাগুলি ক্রমে জলে-কাদায় এবড়োখেবড়ো ঘোলাটে হয়ে আসে। হঠাৎ পলটু বলে, বাবা, এই তো আমাদের রাস্তা এটা। কাল-কেমন করে স্কুলে যাব? কই রিকশাও তো চলছে না।

বাবা বলেন, কালকের কথা কাল। সামনে তাকিয়ে দেখ্।

একবার ঘাড় ঘুরিয়ে তিনি পেছনে দেখলেন। দেখ্, সামনের অবস্থা দেখ্।

বাবা ছেলেমেয়ে তিনটেকে তখনি 'তুমি' আবার তখনি 'তুই' বলেন। কখন কোন্টা বলেন তার হিসাব নেয়ার দরকার নেই। আবার এখন সেই তাঁর অবাক হয়েছেন। তিনি দেখেন সামনে পানি ঢুকেছে আদাখেচড়া আকারে। বুঝলেন, যত যাবেন আদাখেচড়া থাকবে না, পানি মাটি ঘাস আগাছা ডুবিয়ে সমান করে দিয়েছে। পলটু বলল, বাবা, আরো যাবে?

বাবা বললেন, তুই না বান দেখতে চেয়েছিলি? চল্ না, মনে হয় দেখা যাবে।

দেখা যাবে?

চল্ তো দেখি।

আখলাক সাহেব যেমন যেমন যান, লুঙ্গি তুলতে হচ্ছে। পলটুর সে ঝামেলা নেই। চপ্‌পল ঘষে ঘষে তাঁরা যাচ্ছেন। সামনে রাস্তার দু-দিকে দুটো খানিকটা-করে-ইট-গাঁথা বাড়ি নজর আড়াল-করা ছিল। পার হয়ে দেখেন, ওরে সর্বনাশ খালি পানি। ওঁদের বড় রাস্তাটা ওখানটায় বুঝি ঢালু হয়ে নেমেও গেছে। ওখানে সামান্য ছলাৎ ছলাৎ করে পানি মাটিতে আঘাতও করছে। তার অবশ্য একটা কারণ, বাহ্, বেশ কয়টা ছোট নৌকা, ডিঙি ভিড় জমিয়েছে। ও, ওগুলি কেরায়া নৌকা, ওগুলি কোথায় কোথায় লোক নিয়ে যাচ্ছে। কেউ

কেউ জলবিহারেও যাচ্ছে গো। বেশ কিছু মানুষ, ছেলেছোকরা বেশি, বসে দাঁড়িয়ে এ জায়গায়, কী বলা যায়, বলতে হয় মজাই দেখছে। পলটু বলল, বাবা।

বাবা যেন গলায় তাঁর ছলাৎ ছলাৎ আওয়াজেই বললেন, কী রে?

পলটু বলে, এই কী বান, বন্যা, বাবা?

বাবা বলেন, তবে আর কারে কয় বান রে?

পলটু লেখাপড়ায় ভালো তো। সেটাও আখলাক সায়েবের কাছে অবাক না হলেও একটা রসাত্মক কাণ্ড বটে। পলটু পরীক্ষার ফল হাতে পেলে তার নম্বরের টিপিগুলি দেখে' সেও নিজে অবাক হয়। সে বাড়ি এসে নাকি সুরে বলে, বাবা, উঁ উঁ উঁ, আমি এত নম্বর পাই কেমন করে? আমার চেয়ে ভালো ছাত্রগুলি আছে না বাবা আমাদের ক্লাসে? উঁ উঁ উঁ।

মা তখন আসেন চোখ পাকিয়ে। তিনি কিন্তু ডাঁটালো মেয়ে, যদিও শিক্ষক নন, একটা আধা-সরকারি অফিসের কেরানিনি। কিন্তু মা না? তিনি? তিনি বলেন, খবরদার পলটু, যা বললি, এ কথা আর কখনো বলবি না, বলে বেড়াবি না, কোথাও না। ঠিক আছে?

পলটু মাথা তুলে মা-কে খানিক দেখে নিয়ে বলে, আচ্ছা।

বাবা ওকে টানতে টানতে বারান্দায় নিয়ে যান। তিনি সহজে বুঝতে পারেন, পলটু অবাক হয়েছে। তিনি তার মাথাটা একটু বুকে চেপে রাখেন। বলেন, এই বোকা, তোর একটা ক্ষমতা আছে জানিস যা অন্যদের নেই?

কী?

তোর কলমে জিনিস আছে, বুঝলি, যা বইয়ে থাকে না।

ব'লে তিনি খুব করে আথালি-পাথালি হাসেন।

এ ঘটনার কথা বলা হলো এইজন্যে যে, গুটিগুটি পায়ে এগিয়ে আসা ঘোলা-জলের বানের সামনে দাঁড়িয়ে ছেলে সব বাদ দিয়ে বাবাকে বলে, বাবা?

কী?

কাল স্কুল যাব কেমন করে?

যখন নিশ্চয় অন্য ছেলেগুলি বাবা-মাকে বলছে, মা, বাবা, স্কুল নিশ্চয় বন্ধ হয়ে যাবে।

কিন্তু পলটু, নাতেকা দু'জনেরই স্কুলে চকমপ্রদ একটা ব্যবস্থা হয়ে গেল।

আখলাক সায়েব বন্যা দেখে ছেলেকে নিয়ে বাড়ি ফিরছিলেন ছেলে 'বাবা বাবা' বলে আবার চেঁচিয়ে উঠল। সে এবার যা দেখেছে তার উত্তেজনা বন্যা দেখার চেয়ে বেশি। দেখেন, ওই যে ওখানে, ভালো করে নজর করলে একটা উঁচু বাদামগাছের তলায় প্রথমে দেখেন সেই যে সেই বাচ্চা ঘোড়া তার মা ধাড়ি ঘোড়াটাকে, তারপর আর একটু ভালো করে নজর করলে দেখেন বাচ্চা ঘোড়াটাকে। চল্ তো দেখি। ছপ্ ছপ্ করে কাদাপানি ভেঙে দু'জনে গেলেন। ঘোড়ার মালিকটাও রয়েছে। সত্যি কী অপরূপ দৃশ্য। একটা মাদি ঘোড়া আর তার বাচ্চাটা গায়ে গা ঠেকিয়ে চুপচাপ দাঁড়িয়ে আছে বন্যার জলে ছলকানো সন্ধ্যারাগের আলোয়। এবং কাছেই তাদের মালিক ঘোড়াওয়ালা, তার গায়ে স্যাণ্ডো গেঞ্জি, ছেঁড়া, মাথায় লাল ময়লা গামছা পেঁচানো, দুই বাহুতে আর গলায় মাদুলি তিনটি।

এ ঘোড়াওয়ালার, করমালির বৃত্তান্তও লিখলে আর এক গল্প হতে পারে যা আখলাক সাহেব আজ যেটুকু শুনলেন তার কাছে এবং পরবর্তী দু-তিন দিনে শুনলেন। সে এখানে থাক।

এটুকু বলা যায়, পুরাতন ঢাকা শহরে সোয়ারি ঘাটের ওদিকে ইতিহাসের শেষ সাক্ষীর মতো এখনো দু-চার ঘর ঘোড়ার গাড়িওয়ালা তাদের ঘোড়া-প্রজনন-প্রতিপালনের কারবার টিকিয়ে রেখেছে। সম্প্রতি করমালির রহমালি ফরমানালি দুই ভাই আর তাদের মা করমালিকে এ দেড়খানা ঘোড়ার ওয়ারিসান বুঝিয়ে দিয়ে পৈতৃক ঘরবাড়ি থেকে লাঠিপেটা করে ভাগিয়ে দিয়েছিল। আখলাক সায়েবের অনুমান, এ করমালির খুব খারাপ খাসলত কিছু আছে, না হলে অতি-বুড়ি মা তার প্রথম গর্ভের প্রতি এত নিষ্ঠুর হয়? এ করমালি কিন্তু আবার বলে, সেই পাপে সেই মুহূর্তে, বৃষ্টি তো প্রতি সনই হয়, এ-সন কোথা থেকে যে অসম্ভব বন্যা ঝাঁপিয়ে পড়ল, তাদের ঘোড়াগুলি সমেত ঘরবাড়ি ধুয়ে মুছে ভাসিয়ে নিয়ে চলে গেল। ভাঙা দু-খানা ঘোড়াগাড়ির লাশ তো নয়, কঙ্কাল নিয়ে ওরা দুই ভাই আর এক মা (দুই মায়ের এক মা ওদের আগে চলে গেছে) বুক চাপড়াচ্ছে। করমালি তার ঝুপড়িটা কোন দিকে গেছে ফিরে দেখেনি, এই দুটিকে নিয়ে টাউনের এ উঁচা জায়গায় নিরুদ্দেশ পালিয়ে এসেছে। জায়গাটা উঁচু ছাড়াও কাছে বিলে ডুবো-ঘাস আছে। আপাতত ওই দুই বোবা প্রাণী আর তার নিজের প্রাণ তো বাঁচুক। পরে দেখা যাবে। বৃষ্টি হলে আর রাত্রিবেলা ওই যে ওই দেখেন একতলার ফাঁকা ছাদটা ওর নিচে থাকে। সায়ে র ওকে থাকতে দিয়েছেন।। করমালি বলে, ঘোড়া দুইটা আওলা-বাওলা সারা তল্লাটে ঘুরতেছিল। দুষ্ট পোলাপানগুলি ধাড়িটারে তো ডরায়, বাচ্চাটার পিছে লাগে। শ্যাষে এক বুদ্ধি বার করছি। একেকজনের বেশি না, দুই ট্যাহা কইরা দিলে ঘোড়ায় চড়াইয়া একচক্কর ঘুরাইয়া আনে। একটারে সামনে একটারে সামনে একটারে পিছে বসায়। এই খেলাডা বেশ জমছে। আমার দুইবেলার খাওনটাও হয়।

তখন আখলাক সায়েবের মাথায়ও বুদ্ধিটা আসে। আরে ভাই ও করমালি মিয়া, তাহলে তো আপনি আমারও একটা কাজ করে দিতে পারেন। আমার এই ছেলে আর ওর পিচ্চি ছোট বোনটা, ওই যে দেখেন ওদের কী হাল রাস্তার, পানিও বেড়ে চলেছে, আপনার ঘোড়ায় ওদের স্কুলে সকালে দুপুরে আনা-নেয়াটা করে দেন। স্কুল কাছে। রিকশার পয়সাটাই আপনাকে দেয়া যাবে।

করমালি বলে, ঠিক আছে, স্যার, অসুবিধা নাই।

এত বড় কাণ্ড পল্টু চিন্তা করতে পারেনি। পরদিন সকালে, ঘোড়ার পিঠে জিনটিন তো নেই, একটুকরো চটের উপরে করমালি, তার সামনে নাতেকা, পেছনে পল্টু, পিঠে ব্যাগগুলি, ওদের চড়িয়ে দেয়া হলো। ওরা ঘোড়ায় চড়ে চলল স্কুলে। ঘোড়ার বাচ্চাটি চলল। পিছে পিছে ছায়ার মতন। করমালি বলল, না ওই বাচ্চায় ওর মায়ের পিছু ছাড়ত না।

ঘোড়ায় চড়ে স্কুলে যাওয়া-আসা, পল্টু-নাতেকা বিখ্যাত হয়ে গেল তল্লাটে। আরো কোনো কোনো বাড়ির ছেলেমেয়ে ওইরকম বিখ্যাত হওয়ার চেষ্টা করেছিল। কেউ পেরেছে, বেশির-ভাগ পারেনি। এ-সবই বন্যা রাজধানীতে ঢুকেছিল বলে।

কিন্তু চার কি পাঁচ দিন হবে, সকালবেলা স্কুলে যেতে গিয়ে দেখা যায় করমালি নেই, করমালির ঘোড়া নেই। পলটু নাতেকা কেবল কাঁদতে বাকি রাখে না ঘোড়ার জন্যে তত নয়, ঘোড়ার বাচ্চাটার জন্যে।

যাকগে। মনে হয় আরো তিনদিন পর। আখলাক সায়েব দুপুরের পর আজ ঘরে কারো কাপড় ইস্তিরি করছিলেন না। একটা কাঁঠাল কিনেছেন মাঝারি সাইজের, সেটা পেকেছে কিনা, ভাঙা যাবে কিনা খুব বোঝার চেষ্টা করছিলেন। বারান্দা থেকে পলটু অস্থির ডাকাডাকি করে, বাবা, বাবা, বাবা বাবা বা।

কী?

জলদি এসো।

গিয়ে দেখেন, সেই জায়গায় যেখানটায় রাস্তায় প্রথম ঘোড়ার বাচ্চাটাকে দেখা গিয়েছিল, ঠিক সেখানে, সামনে পেছনে মোট পাঁচ মজুর ঠেলাটাকে টানছে ঠেলছে। তার উপরে চড়েছে সিডান, চকচকে বেগুনি, ১৬০০ সিসি হবে। বান ঢুকেছে ওটার গ্যারাজে তাই আত্মীয়-বন্ধুর গ্যারাজে শিফ্‌ট হচ্ছে। পলটু বলে, বাবা?

কী?

গাড়িটা তুলল্ ঠেলায়। অত বড় কেমন করে?

তোলা দেখলে বোঝা যেত।

পলটু বলে, এটা একটা অবাক কাণ্ড, বাবা। মা-কে ডাকি?

বাবা বলেন, ডাকবি? কী দরকার?

বাবা, পলটু একে অপরের মুখের দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে হঠাৎ কী হলো, আখালি-পাথালি হাসতে লেগে গেল।

লজ্জা

শচীন দাশ

চিৎকারটা কি হচ্ছে এখনো? নাকি শব্দটা থেমে গেল? থামল, না নতুন করে শুরু হওয়ার আগে আবারও একটি প্রস্তুতিপর্ব। ঠিক যেভাবে সকালের দিকে হই হই করতে করতে এসে পড়েছিল ওরা। পরণে হাফপ্যান্ট। সাদা। গায়ে টি-শার্ট। কপালে সবারই প্রায় কাপড়ের ফেট্টি। হল্লা করতে করতে, আক্রোশে ফুলতে ফুলতে, উন্মত্ত ও ভয়ংকর একটা ঢেউয়ের মতোই এসে আছড়ে পড়েছিল ওদের মহল্লার। এবং এরপরেই সেই নারকীয় উল্লাস। ছুরি হাতে, লোহার রড নিয়ে, তলোয়ার উঁচিয়ে মকাইয়ের ক্ষেতে ঝাঁপিয়ে পড়া দলবদ্ধ পঙ্গপালের মতো। প্রায় লাফিয়েই নেমেছিল ওদের ঘরবাড়ির ওপরে। নেমেই এরপর দরজা ভাঙা, ঘরে আগুন লাগানো এবং ঘর থেকে বেরোতে না দিয়ে জ্বলন্ত আগুনে পুড়িয়ে মারা। কিংবা মেয়েদের টেনে-হিঁচড়ে বের করে নিয়ে এসে, জোর করে জামা কাপড় খুলেই এরপর সেই লজ্জাজনক ঘটনাটি। একের পর এক অনেকের ওপরেই, ঠিক যেভাবে আচমকা ঢুকে রেশমার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়েছিল ওরা। শুধু রেশমা কেন, ঝাঁপিয়ে ছিল না ফরিদার ওপর, টেনে নিয়ে গিয়েছিল না হামিদাকে! আর সোফিয়াকে তো ধরল ওরা দু'জনে, তারপর চর্চর করে ওর সালোয়ার কামিজটা ছিঁড়ে, টেনে খুলে, ওর পা দুটো ধরে উল্টে টানতে টানতে নিয়ে গিয়েছিল বাইরের চাতালটার কাছে। এবং এরপর ওকে চিত করে শুইয়ে দিয়ে পরপর ওই দু'জনে মিলে আঁচড়ে কামড়ে ছিঁড়ে ফেলেছিল না সোফিয়ার দেহটা! রেশমা ওই সময়েই সুযোগটা নিয়েছিল; জ্বলন্ত আগুনের মধ্যে তার ছুঁড়ে ফেলা দেহটাকে কোনোরকমে টেনে তুলেই সবার অলক্ষে একটা দেওয়ালের পাশে চলে গিয়েছিল। এরপর একটু একটু করে পিছিয়ে যেতে যেতে প্রায় হঠাৎই দৌড়। আর কীভাবে যে তারপর প্রায় এক নিঃশ্বাসে দৌড়ে এখানে এসে এই ঝোপের ভেতরে ঢুকে পড়েছিল, তা নিজেও জানে না রেশমা। জানল এখন, এই এতক্ষণে ঝোপের ভেতরে বসে, চারদিকে তাকাতে তাকাতে।

রেশমা চমকে উঠল।

কোথায় কি একটা শব্দ হল! ঠিক যেন শুকনো পাতার ওপর কিছু একটা এসে পড়ল। পড়ল, না লাফিয়ে কেউ নামল গাছ থেকে। মানুষ না জানোয়ার। শেয়াল হতে পারে। কিংবা ভাম। হয়তো পোড়া মাংসের গন্ধে সাবরমতীর ওপাশ থেকে ধূর্ত পায়ে এগিয়ে এসেছে। নাকি গিধ্বর। আসমান থেকে লাফিয়ে নেমেছে নিঃশব্দে। হয়তো গন্ধ পেয়েছে পোড়া মাংসের। গন্ধ পেল, না আকাশ থেকেই লক্ষ করেছে ওকে। কিন্তু দেখল কী করে? চারপাশে যা কাঁটা ঝোপ। গুল্মলতা। লতার গায়ে পোকামাকড় আর অন্ধকার। সে অন্ধকারে কীট-পতঙ্গ ও মচ্ছর। ঘুরছে ফিরছে; বিনবিনিয়ে উড়ছে। কিন্তু উড়লেও প্রায় পাথরের মতোই রেশমা। নড়বে যে তারও উপায় নেই। একে ঝোপঝাড়, গায়ে অনবরত কাঁটার খোঁচা, তার

ওপর শরীরের এখানে ওখানে পোড়া মাংসের দহন ও নিম্নাঙ্গে নাভিপ্রদেশ থেকে আরও খানিকটা নীচে যৌনাঙ্গের চারপাশে তীব্র এক যন্ত্রণার বিষক্রিয়া। যন্ত্রণা যত না, তার চেয়ে ভীষণ এক লজ্জার অনুভূতি। কেন কিনা, এই মুহূর্তে আর কোনো পরিধেয় নেই তার শরীরে। সাতসাতটা শকুনে ঠুকরে-ঠাকরে, কামড়ে-খুবলে, টেনে-হিঁচড়ে শেষ সুতোটাও তুলে নিয়েছে তার অঙ্গ থেকে। ফলে বস্ত্রমুক্ত এখন রেশমা এবং তার বছর পনেরর রক্তাক্ত ও যন্ত্রণাবিদ্ধ দেহটা কাঁটাগুল্মের অন্তরালে, সবার অলক্ষে। বেরোবে যে সে চিন্তাও করছে না। বরং ভয়; ভয় ও আতঙ্ক ওই চিৎকারের শব্দে। কেননা চিৎকারটা এখনো অতিশয় স্পষ্ট এবং এতটা দূর থেকেও। মাঝে মাঝে অবশ্য ভেসে আসছে, আচমকা এক একসময়, এরপরেই আবার নিশ্চুপ, নিথর। কী জানি বলা যায় না, হঠাৎ করে আবার এদিকেও এসে পড়তে পারে। আসার অবশ্য কথা নয়, কেননা নির্জন নদীতীর, কোনো মহল্লাও নেই এদিকে, কেবল জঙ্গল, জঙ্গল আর ঝোপঝাড়। তবু খবরটা পেলে হয়তো এদিকেও ছুটে আসতে পারে। রেশমা তাই স্থির, নড়ছেও না এখন ঝোপের ভেতরে। তবে তাকাচ্ছে ভয়ে ভয়ে। ওপরে এবং আকাশের দিকে। এই আকাশেই বিকেলের রঙ নেমে এলে, পুবের দিকে ছায়া ঘনালে ও ছায়াটি প্রলম্বিত হতে হতে একসময় হারিয়ে গেলে তারপরেই অন্ধকার। আর ওই অন্ধকারেই একসময় বেরোবে, ভেবেছে সে। কিন্তু বেরিয়ে? কোথায় যাবে ও। কোনদিকে। ভাবছিল রেশমা। এবং ওই সময়েই আবারও ওই শব্দটা। কিন্তু এবার আর 'ঝুপ' করে নয়, যেন চাপা একটা পায়ের শব্দ। শুকনো পাতার গায়ে চেপে বসে আসার মতো। তবে কি টের পেয়ে গেল ওরা। নাকি দেখে ফেলেছে কেউ। হয়তো শেষ মুহূর্তে কারো চোখে পড়েছে, ভর দুপুরে আগুনের লেলিহান শিখার প্রান্ত থেকে উঠে কোনো রকমে পালাচ্ছে একটি উলঙ্গ শরীর।

সাবধানে, সতর্ক চোখজোড়া একবার পেছনে রাখে রেশমা। কিন্তু পুরোপুরি আর ঘাড় ঘোরাতে পারে না। না পারার কারণ তার এই শরীর। আর শরীরটা যেহেতু উন্মুক্ত, তার নিরাভরণ ধবধবে দুই হাত তাই বুকের ওপরে। আড়াআড়িভাবে স্তনদুটিকে আড়াল করা এবং ততোধিক আড়ালে তার দুই উরুর মধ্যবর্তী অংশটি। ফলে দেখতে আর পারল না কিছু; তবে অনুমানে বুঝল শব্দটা এবারে ঠিক তার পাশেই। কিন্তু ঝোপের ভেতরে যে ঠিক কোথায় তা আর বুঝতে পারল না রেশমা। না পেরে আতঙ্কে সে নিথর প্রায়। তবে ভাবলও আবার, বোধহয় মানুষ নয়। মানুষ হলে তার উপস্থিতি কি এত নিঃসাড়ে হয়!

ভাবছিল এ সবই। এই সময়ে হঠাৎই ডানা ঝাপটানোর শব্দ একটা। এবং শব্দটা যেন উড়ল। আর উড়ে এসে রেশমার সামনে দিয়ে চকিতবেগে সরে যেতেই রেশমা দেখল দুটো মরগাঁ। পাল্লা বেঁধে একে অন্যের পেছনে এসে লেগেছে। ঝাঁপাচ্ছে তাই। আবার গোপন পায়ে লুকিয়েও ফেলছে নিজেকে। লুকিয়েই ঝোপঝাড়ের এখানে-ওখানে, পা টিপে টিপে এগোচ্ছে।

রেশমা হাঁপ ফেলে; যাক, তাহলে ওদের কেউ নয়। মুরগিদুটোই ঘুরছে ঝোপের ভেতরে। শুকনো পাতার ওপর; তাই অমন মৃদু খুচখাচ, থেকে থেকে একটা শব্দ উঠছিল।

রেশমা চোখ তোলে। আর তুলতেই চোখে পড়ে, কেমন একটা ঘন ছায়া। ওই ছায়ার ভেতরে যেন অস্পষ্ট কিছু সূর্যাস্তের আলো। আলোটা কমছে, কমে আসছে আস্তে আস্তে। রেশমা নড়েচড়ে বসে একটু। তাকায় আবারও ঘনঘন, আকাশের দিকে।

এবং আরও পরে, আকাশের আলো নিভে এলে, চারপাশে যখন গভীর অন্ধকার, ঝিঁঝিঁ ডাকছে, জোনাকি উড়ছে ঠিক সেসময়ে আস্তে আস্তে ঝোপ থেকে বেরিয়ে আসে রেশমা। বেরিয়েই এপাশে ওপাশে তাকায়। কিন্তু তাকালেও ঠিক ঠাহর পায় না। কেউ কি দেখছে ওকে? নাকি নিজেকে নিয়ে ওর নিজেরই লজ্জা। রেশমা উঠে দাঁড়ায়। উঠেই পায়ে পায়ে এগোতে থাকে। কিন্তু একটু এগিয়েই থমকে দাঁড়ায়। একটা চাপা জ্বলুনি যেন শরীরের চারপাশে। হালকা বাতাসে পোড়া চামড়ায় যেন টান ধরেছে। সেই সঙ্গে দুই উরুর মাঝখানের জায়গাটায় তীব্র এক যন্ত্রণার অনুভূতি। রেশমা চোখ রাখে সন্তর্পণে। এরপর আবারও পা ফেলে। কিন্তু এগোতে গিয়েও পারে না। পায়ের পাতায় কোথায়ও যেন জড়তা এসে যায়। অথচ দুপুরের ওই সময়ে, প্রকাশ্য দিবালোকে দগ্ধ, ধর্ষিত ও উলঙ্গ দেহটা নিয়ে সে যে কী করে এখানে চলে এসেছিল সেটা ভেবেই অবাক এখন। অবাক এই জন্য যে এমন শরীর নিয়ে বেরিয়ে সে এল কী করে, বেরিয়ে কী করেই বা এতটা রাস্তা পার হল দিনের আলোয়! তখন লজ্জা হয়নি? অথবা সংকোচ! সম্ভবত লজ্জা বা সংকোচের কোনোটার কথাই আর মনে ছিল না তখন। থাকার অবশ্য কথাও নয়; কেননা প্রাণভয়ে, নিজেকে বাঁচাবার জন্য তখন যে যেভাবে পেরেছে দৌড়ুচ্ছে।

রেশমা পা বাড়ায়। সন্তর্পণে আবার হাঁটতে থাকে। এবং যতটা সম্ভব নিজেকে লুকিয়ে, রাতের অন্ধকারে। না লুকোলে কে যে কখন দেখে ফেলে! অবশ্য দেখবেই বা কে! এদিকে আর কোনো জনপ্রাণী আছে নাকি? মহল্লার পর মহল্লা পুড়ে তো ছাই। মরেও তো গেছে অনেকে। মরেছে নয়, মেরে ফেলা হয়েছে। ঘরদোরে পেট্রল ঢেলে আগুন লাগিয়ে, টেনে টেনে যাকে যেমন পেরেছে আগুনে ঠেলে দিয়েছে। বুক থেকে গলার কাছাকাছি কান্না একটা ঠেলে ওঠে রেশমার। কিন্তু কাঁদতে আর পারে না। উদ্‌গত কান্নাকে চেপে রাখে শব্দের ভয়ে; কেননা কাঁদলেই তো শব্দ এসে যাবে, ভাষা এসে যাবে। রেশমা পা ফেলে সাবধানে। মাঝে মধ্যে দাঁড়ায় ও দাঁড়িয়ে দূরে তাদের মহল্লা খোঁজার চেষ্টা করে। কিন্তু অন্ধকারে কিছুই দেখা যায় না সেসব। সবই কেমন ঝাপসা, তাল তাল অন্ধকারে ঢাকা। অথচ কালও ওখানে কত আলো, কত হইচই আর কথাবার্তা। টিভি চলছে। সিনেমা হচ্ছে। মহল্লায় মহল্লায় কারো কারো ঘরে হাসি, কোথায়ও বা কোনো বাচ্চার কান্না। আবার রাত একটু বাড়লে, বা নির্জনে যখন চলে যাচ্ছে রাতটি, ঠিক সে-সময়ে সাবরমতী থেকে ভেসে আসা কোনো বাঁশির সুর। মৃদু হাওয়ায় সে সুর যেন হারিয়ে যাচ্ছিল কোন দিগন্তে। বুঝতে তবু পারেনি রেশমা। শুধু রেশমা কেন, এ-মহল্লার কেউ কি ধরতে পেরেছিল? বুঝেছিল কি, এমন কিছু একটা ঘটতে চলেছে। তবে না বুঝলেও, আব্বা বোধহয় অনুমান করেছিল কিছু। মনে মনে বোধহয় খানিকটা আন্দাজও করেছিল। তাই একটু দুশ্চিন্তায়ও ছিল সে এবং আম্মার ভেতরেও সে ভাবনাটা একসময় চারিয়ে দিয়েছিল।

নাহ্, অবস্থা কিন্তু ভালো বুঝছি না নাসিমা বিবি...আমার কেমন যেন ভয় হচ্ছে—

ভয়! ভয় কীসের? নাসিমা অবাক। রেশমাকে সামনে বসিয়ে তার দুই হাতের তালুতে মেহেন্দি করছিল যত্ন নিয়ে। আব্বার কথায় মুখ না তুলেই অবাক হল।

ততক্ষণে আবার সরব হয়েছে আব্বা। হলেও তার গলায় চাপা স্বর। উদ্বেগ ও উৎকণ্ঠায় মেশানো।

কী জানি, বাজারে সব ফিসফাস আলোচনা আর চাপা চাহনি। কেউ কারো সঙ্গে দিল খুলে বাতচিজ করছে না। আমার এতকালের বন্ধু কেশুভাই...কথা বলতে গেলাম...কিন্তু সে কেমন এড়িয়ে গেল।

কিন্তু তা তো হওয়ার কথা নয়—

নীচু হয়ে হাতের তালুর ওপর কোণ চেপে রঙ বের ক'রে আলপনার ডিজাইন তুলতে তুলতেই উত্তরটা দিল নাসিমা, এতদিনের ঘনিষ্ঠতা...একসঙ্গে পড়াশোনা করেছ, গল্পগুজব করেছ তা সে কেন এমন করবে! ও তুমি ভুল দেখেছ।

ভুল হলেই ভালো।

বুক থেকে গভীর একটা নিঃশ্বাস বেরিয়ে এসেছিল ইরফানের। ইরফান আস্তে আস্তে বেরিয়ে গিয়েছিল। এবং এরপরেই সোজা আবার দোকানের দিকে। পরে দোকান থেকে ফিরলে, একটু রাতের দিকে নাসিমাই আবার তুলেছিল প্রসঙ্গটা।

কী হল, দেখা হল এবেলা কেশুভাইয়ের সঙ্গে?

নাহ্। কেন বল তো? ইরফান অবাক।

নাসিমা মাথা নাড়ল, এমনিই। সকালে বলছিলে তো...

যা বলেছিলাম ও-বেলা তা এখনও বলছি নাসিমা। আমার কিন্তু ব্যাপারটা ভালো লাগছে না। কিছু একটা কিছু হচ্ছে কোথায়ও যা আমাদের অজানা। সেই যে কথায় আছে না, চেহরা মন কা আয়না হো। মুখই হল মনের আয়না...।

কেন, এ-কথা বলছ কেন? নাসিমার স্বরেও এবার যেন কোথায়ও একটা অস্বস্তি। এ জীবনে সে-ও তো কম দেখল না, যতই তার বয়স পঁয়ত্রিশ হোক।

ইরফান ঠোঁট ওল্টায়, বললাম মানুষের মনের ভাষাটা পড়তে পারছি বলে। তাছাড়া কত নতুন নতুন যে লোক ঢুকে পড়েছে শহরে—

তারা কারা! আর তাদের নিয়ে তোমারই বা কেন এত শোচ্‌না!

হাতে সরবতের একটা গেলাস ছিল। ইরফানের দিকে এগিয়ে দিতেই ইরফান সেটা এক চুমুকে শেষ করল। পরে গেলাসটা রেখেই নাসিমার দিকে চোখ তুলল আস্তে আস্তে।

ভাবছি কী আর এমনি এমনি নাসিমা। মন বলছে আবারও একটা দাঙ্গা বাধাবার চেষ্টা হচ্ছে এখানে—

দাঙ্গা! হায় আল্লা। কী বলছ কী তুমি?

ঠিকই বলছি বিবি। তুমি মিলিয়ে নিও। কম দিন তো হল না এই শহরে। প্রায় চারপুরুষ।

কিন্তু—

নাসিমা কী ভেবেই আবার বলে সঙ্গে সঙ্গে, পাড়াপড়শিদের সঙ্গে কথা বলতে গিয়ে তো কিছু বুঝতে পারছি না। ওই তো রঙ্গার মা, হরিচরণের মা-বাবা, শিউভাই, নলিনীভাই...রোজই আসতে যেতে দেখা হয় ওদের সঙ্গে। কাল বিকেলেও তো রঙ্গার মা-র সঙ্গে দাঁড়িয়ে কত কথা। কিন্তু—

মুখ গম্ভীর করেছিল ইরফান। পরে আস্তে আস্তে মাথা নেড়েছিল, সেটাই তো ধরতে পারছি না। তবে ঘরপোড়া গরু, সিঁদুরে মেঘ দেখলে তো ডরাবেই।

বলে আস্তে আস্তে ঘর ছেড়ে বেরিয়ে এসেছিল ইরফান। মহল্লা পার হয়ে একসময় বাইরে গিয়ে দাঁড়িয়েছিল। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে আকাশ দেখেছিল। অন্ধকারে মুখ তুলে ছেলেবেলার অভ্যেসের মতো, আকাশের তারা গোনার চেষ্টা করেছিল। কিন্তু বৃথা সে চেষ্টা। একটা গুনতে গিয়েই দেখে তার পাশে আর একটা, সেটা ধরতে গিয়েই দেখে তারও পাশে আরও একটা ফুটে উঠেছে। অনন্ত সীমাহীন আকাশে অজস্র নক্ষত্রমালা। ফলে কত আর গুনবে। কিন্তু গুনতে না পারলেও রাশি রাশি ওই নক্ষত্রের মাঝে তাকিয়ে থাকতে থাকতে তার মনে পড়ছিল কত কথা। সেই কবে এসেছে এখানে, কবে যে ঠিক মনে নেই এখন আর। তার পূর্বপুরুষের একজন এসেছিল প্রথমে প্রাচীন খাম্বাজ শহরে। সোনারুপোর বাসন বিক্রি করত সে। প্রায় তিনশ বছর আগে খাম্বাজ শহরে আসবাবপত্র বা থালাবাসন বলতে কিছুই ছিল না। শহরের অভিজাত বাসিন্দাদের পছন্দ ছিল সোনা বা রূপোয় তৈরি থালা। তাতেই তাদের আহার ছিল। পূর্বপুরুষ নাদির আলম গ্রামে ঘুরে ঘুরে নিপুণ কারিগরদের ধরে তাদের দিয়ে ওই সব থালা বাসন তৈরি করিয়ে আনত। এনে শহরের একপাশে দোকান সাজিয়ে সেগুলি বিক্রি করত। এতে ব্যবসায়ী হিসেবে তার নামযশ যেমন হয়েছিল, তেমনি পয়সাও করেছিল সে। ক্রমে শহরের মাঝামাঝি মাহি নদীর পাড়ে বাড়িও একটা তৈরি করে সে। পাথর আর চুন-সুরকির গাঁথনির ওপর সুদৃশ্য টালির ছাদ, দেওয়ালের গায়ে কারুকার্য, সামনে দাঁড় করানো ঘোড়ায় টানা গাড়ি। কিন্তু রাজনৈতিক টানাপোড়েন, গুর্জরের প্রজাদের বিদ্রোহ, পর্তুগিজ ব্যবসায়ীদের আধিপত্য প্রতিষ্ঠা ও পরে পরেই ইংরেজ বণিকদের শহর দখল নেওয়ার চেষ্টায় খাম্বাজ শহরটি তার কৌলিন্য হারাতে থাকে। ফলে পূর্বপুরুষ নাদির আলমও খাম্বাজ ছেড়ে চলে আসে আহমাবাদ এবং তারও পরে আর একটু পিছিয়ে শাহপুর। এই শাহপুরেই ইরফানের জন্ম। শুধু ইরফান কেন, ইরফানের আব্বাজান, তারও আব্বার জন্ম এই শাহপুরে। পূর্বপুরুষ ছিল ব্যবসায়ী। ঘাড়ে করে করে কাপড়ে বেঁধে বাসনকোসন বিক্রি শুরু করেছিল সে; ফলে বারে বারে উচ্ছেদ ও বসতিস্থাপনেও রক্তের সেই নেশাটি তার যায়নি এবং তাই শুধু নয়, উত্তরকালের সন্তান-সন্ততিদের মধ্যেও সেই বৃত্তির বীজটি সে বপন করে দিয়েছিল। এবং সেই সূত্রেই বংশপরম্পরায় তারা ব্যবসায়ী। কিন্তু হলেও ব্যবসা করতে করতেই ইরফানের বাবা গিয়াসুদ্দিন জড়িয়ে পড়েছিল দেশের আজাদির লড়াইয়ে। বাপুর সঙ্গে সত্যাগ্রহেই প্রথম তার হাতেখড়ি। তারপর মিছিল মিটিং আইন-অমান্য। ইংরেজ তুমি দেশ ছাড়ো। এ দেশ আমার, আমাদের। এই দেশই আমার মাতা। মেরি মা। তুমি তাকে দখল করে রাখতে পারো না। কাজেই হটো। হট যাও।

শাহপুরে বড় একটা মুদি দোকান দিয়েছিল ইরফানের দাদা ইজ্জাজ। ইজ্জাজুদ্দিন। বড় ছেলে গিয়াসুদ্দিন দোকানে বসতে বসতে মাঝেমধ্যে যে উধাও হয়ে যেত, সে খবরটা জানত। কিন্তু কোথায় যে যেত সেটা বুঝতে পারত না প্রথম প্রথম। ভেবেছিল, বা ভাবত, লেড়কা তার বড় হয়েছে, অমন যৌবন তার শরীরে, হয়তো কোথায়ও কোনো লেড়কিকে দিল দিয়েছে। তাই অমন উদাস দৃষ্টি। থেকে থেকে কী যে ভাবে, কী যে করে, কাজে যেন মন নেই তার। এর চেয়ে সাদি দিলে বোধহয় শান্ত হবে ছেলেটা। কাজকর্মেও মন দেবে। এমনই ভাবনাচিন্তায় যখন ইরফানের দাদা ইরফানের দাদির সঙ্গে নানা শলাপরামর্শ করছে সেই সময়েই একদিন, প্রায় হঠাৎই ধূমকেতুর মতো একটা খবর। লেড়কা তার ধরা পড়েছে। ধরেছে একটা মিছিল থেকে। ইংরেজ সিপাই। অতএব জেল। এবং জেলেই আছে সে বিনা বিচারে।

দাদা তো স্তম্ভিত। এই কিনা তার প্রেম!

শ্রদ্ধায় মাথা নীচু করে ফেলেছিল দাদা। এবং এরপর আর কোনোদিনই ছেলের বিষয়ে মাথা ঘামায়নি।

ইরফান মুখ নামায়। নক্ষত্রমালা থেকে মুখ নামিয়েই আবার হাঁটতে থাকে। আজ ক'দিন ধরে দিনের দিকে খর্খরে একটা গরম পড়লেও হালকা বাতাসে রাতে আবার সিরসিরে ভাব। গায়ে লাগলে বেশ আরামই লাগে।

কিন্তু আরাম লাগছিল না ইরফানের। মাথায় কোথায়ও একটা অস্বস্তি। আর অস্বস্তিটা যেন একটু একটু করে বেড়েই চলেছে। এবং সেই সঙ্গে একটা প্রচ্ছন্ন ভয়। ভয়টা এই জন্যে যে, কোথায়ও কিছু একটা ঘটতে চলেছে। কিন্তু সেটা আর ঠিক বুঝতে বা ধরতে পারছে না সে। এই শহরে ওদের এতকালের বসবাস, ওর নিজেরও পঞ্চাশ হয়ে গেল প্রায়। এই পঞ্চাশবছরে ও নিজেও তো শহরটাকে চিনেছে নিজের হাতের তালুর মতোই। দাঙ্গা দেখেছে। দুর্ভিক্ষ দেখেছে। দেখেছে খরা ও বন্যায় মানুষকে অবহেলায় মরতে। তবু সে সময়টাকে একরকম বুঝত। কিন্তু এখন—! এখন যেন সবকিছু তার বোধের বাইরে। কারা এরা! এবং এই সমস্ত অচেনা মুখ। আজ ক'দিন ধরেই শহরময় দাপিয়ে বেড়াচ্ছে। এক একটা অটোয় আসছে, যাচ্ছে। সেই সঙ্গে বাজারে দোকানে, দোকানের গোপন কামরায়, চুপচাপ-ফিসফাস আলোচনা। কী আলোচনা করছে এরা!

অনেকটা এগিয়েও আবার ফিরতে থাকে ইরফান। মাথার ভেতরে তখনো হিজিবিজি নানা ভাবনা। ভাবনার সুতোগুলো যেন জড়িয়ে জড়িয়ে মাথার ভেতরে জট পাকিয়ে যাচ্ছিল। জড়িয়ে আরও যাচ্ছিল টুকরো টুকরো, ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন নানারকম চাপা সংলাপে : ইয়ে দেশ তুম্হারা নেহী, তোমাদের নয়। এখানে থাকতে হলে আমাদের কথা শুনতে হবে। আমাদের মতো করে চলতে হবে...সামঝা—!

চাপা একটা স্বর। চাপা, অথচ ক্রুর। কেটে কেটে, ভাঙা গলায় কেউ যেন কাকে বলছিল কিছু। কিন্তু বললেও পাল্টা উত্তর কিছু শোনেনি। না শুনলেও, না-শোনা কথাটা যেন গভীর কোনো খাদে পড়ে আবার ওপরে ওঠার জন্য ছটফট করছিল। কিন্তু উঠতে তাকে আর

দেওয়া হয়নি। চাপে রেখে, চাপের মধ্যেই খাদের অতলে কোথায়ও সরিয়ে দিয়েছিল। সরালেও কথাটা উঠে এসেছে বারবার, সেই যেমন আগেও এসেছিল একসময়, দেশভাগের ঠিক পরে পরেই, গিয়াসুদ্দিনের কাছে। কিন্তু অবাক হয়নি গিয়াসুদ্দিন। জানত, বা অনুভব করেছিল সে, যে বিষ ঢুকেছে একবার জাতির শরীরে, কোনো দাওয়াই বেরোয়নি এখনো সে বিষকে শরীরমুক্ত করতে। বরং তীব্র বিষক্রিয়ায় আস্তে আস্তে ওই শরীরেই ধরবে একদিন পচন; তারপর তার এখানে ওখানে কেটেছেটে তাকে ব্যবচ্ছেদ করা ছাড়া উপায় থাকবে না আর।

চাপে পড়লেও তাই যায়নি গিয়াসুদ্দিন। নড়েনি এই মাটি থেকে। কেননা এই মাটিতেই ঘুমিয়ে আছে তার পূর্বপুরুষেরা। এই মাটির সম্মানেই সে আজাদির লড়াইয়ে ঝাঁপিয়ে পড়েছে একদিন। কাজেই সে কেন যাবে এই মাটি ছেড়ে। যায়নি তাই গিয়াসুদ্দিন। ছেলেদেরও তাই বুঝিয়েছিল সে। ভাইদেরও একান্তে বলেছিল। কিন্তু ভাইরা মানেনি সে কথা। দেশভাগের পরে পরে, দাঙ্গার ভেতরেই ছেড়েছিল তারা দেশ। এবং করাচিতে তারাই এখন মুজাহিদ।

ইরফান থমকে দাঁড়ায়। কে দাঁড়িয়ে আছে ওখানে। মহল্লার ভেতরে ঢুকতে গিয়েই ইরফান আবিষ্কার করে নাসিমা। নাসিমার পেছনে যেন রেশমাও দাঁড়িয়ে আছে।

কোথায় গিয়েছিলে তুমি...ইত্নি রাত হুয়ি—

ইরফান হাসে একটু।

রাত কাঁহা! চলো অন্দরমে—

ভেতরে এসেছিল ইরফান। কিন্তু এলেও ঠিক স্বাভাবিক হয়নি। কী যেন ভাবতে ভাবতে, ভাবনার ভেতরেই একসময় সে নিঝুম হয়ে পড়েছিল। ধরতে তবু পারেনি। পারল পরেরদিন, সকাল ন'টায়, হঠাৎই একটা চিৎকারে। চিৎকার কেন?

ইরফান দৌড়ুল। চটপট ঘরের বাইরে এসেই ছাদের সিঁড়িটা ধরল; কিন্তু সিঁড়ি ধরে ছাদে উঠতেই ভীষণই চমক। বাইরে রাস্তার ওপারে অন্তত এক-দেড়শ সশস্ত্র লোক। ভোজালি আর তরোয়াল উঁচিয়ে দৌড়ে আসছে। সেই সঙ্গে পাথুরে বৃষ্টি। ঝাঁকে ঝাঁকে উড়ে আসছে এদিকে। উড়তে উড়তে শার্সিতে পড়ছে, ছাদে ভাঙছে এবং মহল্লার বাড়িগুলোর গায়েও অনবরত, অবিরত ছোঁড়া তীরের মতো, প্রচণ্ড গতিতে এসে ছিটকে যাচ্ছে।

দেরি আর করেনি ইরফান। যেমন দৌড়ে উঠেছিল ঠিক তেমনিই আবার তরতর করে নেমে এসেই হুঁশিয়ারি। কিন্তু তারও বুঝি সময় পেল না; তার আগেই ওই সশস্ত্র দলটি জলস্রোতের মতো বিশাল একটা ঢেউ তুলেই তীব্র শব্দে আছড়ে পড়েছে মহল্লার ভেতরে। এরপর জায়গায় জায়গায় ঢেলেছে পেট্রল, পেট্রল আর কেরোসিন এবং তারপরেই বারুদের স্ফুলিঙ্গ একটা; স্ফুলিঙ্গ উঠতেই দাউ দাউ আগুন, আগুনের দামাল শিখা, দপ্ করে জ্বলে উঠেই ছড়িয়ে পড়েছিল সারা মহল্লায়। সেই সঙ্গে একটা নারকীয় উল্লাস : 'কাটো...কাটো ইন্ লোগকো...জ্বালা দেও ইয়ে সব মোকান, আওর কোঠ্‌ঠি।'

তা জ্বালিয়ে দিয়েছিল মুহূর্তেই এবং তখনই রেশমার চিৎকার। আতঙ্কে কেঁপে উঠেছিল রেশমা। চমকে উঠেছিল এই দেখে যে, তার আব্বা ইরফানের ঘাড়ে, প্রায় পিঠের ওপর

থেকে আচমকা একটা তলোয়ারের কোপ এসে পড়ল এবং কোপটা ফেলেই রক্তাক্ত দেহটাকে লোহার রডে খুঁচিয়ে কেউ ফেলে দিল আগুনের ভেতরে; বাধা দিতে এসেছিল নাসিমা। মুহূর্তে তুলে তাকেও, মুখ চেপে বস্ত্রমুক্ত করে, অশ্লীল চিৎকারে দেহটি ছেড়ে দিল তিন কিশোরের হাতে। বলাবাহুল্য, এরপর আর দেখারও সময় পায়নি রেশমা। কিছু বুঝে ওঠার আগেই টের পেয়েছিল, রোমশ ঘন কুচকুচে দুটি কালো থ্যাবড়া হাত, তুলে নিয়ে ওকে, প্রায় ছুঁড়েই দিল পৃথুল দুই বয়স্কের কোলে। এবং এরপরেই ওই দুই শকুন মিলে ছিঁড়ে খুবলে তৃপ্তিতে খেয়েছে ওকে, অনেকটা সময় ধরে। আর তারপরেই ওকে আগুনে নিক্ষেপ। কিন্তু কী করে যে বেঁচে গেল রেশমা।

হাঁটতে হাঁটতে অন্ধকারেই দাঁড়িয়ে পড়ে রেশমা। পেছনে একবার তাকায়; আবার সামনেও চোখ ফিরিয়ে আনে। ওই তো, ওই দূরেই বোধহয় ওদের মহল্লা। ধোঁয়া উঠছে কি এখনো ওই অন্ধকারে, ধ্বংসস্তূপ থেকে? নাকি আগুন জ্বলছে এখনো ধিকি ধিকি। প্রাণের সাড়া আছে কি। এবং আম্মা? আম্মা কোথায়। আর সাকিল? ঘরে আগুন লাগাবার পরেও তো ছোটভাইটা ঘরেই ছিল। ভয়ে কেঁদে ফেলেছিল না সে। তপ্ত আগুনের আঁচে মেঝের টাইলসগুলো গরম হয়ে ওঠায় আতঙ্কে ছোটাছুটি করছিল না সাকিল?

রেশমা গলা উঁচু করে, তাকায়। দূরে কি একটা আলো দেখা যাচ্ছে? আলোটা কি এদিকে আসছে? চটপট একটা গাছের আড়ালে নিজেকে সরিয়ে নেয় রেশমা। আড়ালে থেকে লক্ষ করে। কিন্তু আলোর হদিশ আর পায় না সে। না পেয়েই রেশমা আবার আড়াল থেকে বেরিয়ে আসে, সন্তর্পণে হাঁটতে থাকে।

যদিও এটা নদীতীর, মাঝে মাঝে ঝোপঝাড় ও বড় বড় বৃক্ষেরা দাঁড়িয়ে আছে, তবুও রাস্তা একটা আছে এখানে। কাঁচা হলেও এ-রাস্তায় বয়েল গাড়ি চলে। লোকজনের যাতায়াতও পাওয়া যায়। সাইকেল যাত্রীও থাকে মাঝেমাঝে। কিন্তু সকালের ওই ঘটনায় রাস্তাটি এখন এদিকে নির্জন; শুধু মাঝেমধ্যে দু'একটা কুকুরের ডাক, দূর থেকে যেন ভেসে আসছে।

ভয় হয় রেশমার। যদি একবার কুকুরে দেখে ফেলে তবে আর ছাড়বে না ওকে। তাড়িয়ে নিয়ে বেড়াবে। অন্ধকারেই আশেপাশে তাকায় রেশমা। এরপর আবার পা ফেলে। কী করবে, কোথায় যাবে বুঝতে না পেরে আন্দাজে মহল্লার দিকেও পা বাড়ায়। কিন্তু শরীর দিচ্ছে না, থেকে থেকে যেন পা দুটো ভেঙে আসছে। হাঁটুর জোড় যেন খুলে যাবে এখুনি। এবং গলাও শুকিয়ে কাঠ। একটু পানি পেলে হত। পানির আগেও দরকার এক টুকরো কাপড়া। বুকের ওপরে হাতদুটো তুলে আচমকা দাঁড়িয়ে পড়ে রেশমা।

কৌন—।

রেশমা জড়সড়ো। কে যেন দাঁড়িয়ে না ওখানে?

কৌন হুঁ—? অস্ফুট গলায় কোনোরকমে বলেই একটা হাত নামিয়ে দেয় সে নীচের দিকে। নাভিপ্রদেশের আরও নীচে। এতে ওর দেহ বিভঙ্গটি অদ্ভুত হয়, হলেও লজ্জা তো ঢাকে খানিকটা। কিন্তু ঢাকলেও ভয় পায় রেশমা। কে ও। নারী না পুরুষ? ঘন অন্ধকারে ঠিক বোঝা না গেলও অনুমানে টের পায়, নারীই হবে এবং তারই মতো উন্মুক্ত শরীরে;

কিন্তু দাঁড়িয়ে কেন ওখানে? তবে কি ওদেরই মহল্লার কেউ?

রেশমা মুখ তোলে। কিন্তু তুলতেই অবাক। কেউ তো নেই। তবে একটু আগে যে দেখল ওখানে। তাহলে কি ভুল দেখল ও। ভুলই হবে। অন্ধকারে ঠিক বুঝতে পারেনি রেশমা। এপাশে ওপাশে তাকিয়ে বিভঙ্গটি পাল্টে সাবধানে এগিয়ে যায় রেশমা। আর এগোতেই একটু পরে মহল্লার মুখে।

কিন্তু চিনেও যেন ঠিক চিনতে পারে না রেশমা। এ কোথায় এল। এ কোন্ জায়গা? কোথায় সেই ঘরবাড়ি? কোথায় সেই হাসি-কান্না আর আলো। জায়গাটা যেন গোরস্থানের মতো স্মৃতিসৌধ নিয়ে পড়ে আছে।

অন্ধকারে, ভাঙা-পোড়া, দগ্ধ ও অর্ধদগ্ধ ঘরবাড়িগুলোর ভেতরে ঢুকে পড়ে রেশমা। এটা কাদের দোকান। সামনে পোড়া ভাঙা দরজা। নীচে কালো পোড়া জল থকথকে জঞ্জাল। হয়তো পরে আগ নেভানোওয়ালারা এসে পানি ঢেলে ঢেলে আগুন নিভিয়েছে। রেশমার চোখ জোড়া আচমকা জ্বলে ওঠে এবং তারপরেই চোখ বেয়ে হু হু করে কান্না। কিন্তু পানি নেই যেন সে কান্নায়। কান্নাটা যেন বুক থেকে গলা বেয়ে উঠে গলার মাঝামাঝি কোথায়ও আটকে যাচ্ছে।

রেশমা জায়গাটা পার হয়। পার হতেই এবার সে চিনতে পারে। ওই তো, ওই বড় ইউক্যালিপটাস গাছের পাশেই তাদের বাড়ি। ওই তো দরজাটা। তবে পাল্লাটা পুড়ে গিয়ে ভাঙা, ভেঙে নীচে পড়ে আছে। কিন্তু ওরই পাশে ওটা কী? রেশমা একটু তাকিয়ে বুঝল স্কুটার একটা। পোড়ানো হয়েছে সম্ভবত। সম্ভবত এই কারণে যে, একে অন্ধকার তার ওপর নীচে জল থইথই; ফলে ঠিকমতো দেখতে আর পারছিল না সে। তবু আন্দাজ মতো আস্তে আস্তে ভেতরের দিকে ঢুকে পড়ে রেশমা। ঢুকেই এপাশে ওপাশে চোখ রাখে। খুঁজলে ঘরের কোথায়ও কি সালোয়ার কামিজ পাওয়া যাবে না দু'একটা। ওর কিংবা মা-র? কিংবা মা-র কোনো শাড়ি। অন্ধকারে পা বাড়ায় রেশমা। কিন্তু বাড়ালেও দাঁড়িয়ে পড়ে একসময়। যদিও পানি দিয়ে আগ নেভানো হয়েছে তবুও ভেতরে একটা গুমোট গরম। সেইসঙ্গে পোড়া জিনিসের গন্ধ একটা। ছপ ছপ করে জলে পায়ের পাতা ভিজিয়ে এগোয় রেশমা। কিন্তু কিছু নেই। কোথায়ও কিছু দেখা যাচ্ছে না।

চুপ করে অন্ধকারেই থমকে দাঁড়ায় আবার রেশমা। আর দাঁড়াতেই চমকে ওঠে। এই তো সেই জায়গাটা। এখানে এসে দাঁড়াতেই তো আব্বার ঘাড়ে তরোয়ালের কোপটা নেমে এসেছিল। আর তখনই আগুন লাগিয়েছিল না ঘরে? এবং ওই আগুনেই তো ছুঁড়ে ফেলেছিল ওরা আব্বাকে। কিন্তু আম্মা? আম্মা কোথায়। আম্মা কি বেঁচে আছে কোথায়ও! বুক থেকে, গলা বেয়ে, কণ্ঠনিঃসৃত একটা কষ্ট যেন পাক খাচ্ছে আবারও রেশমার চারপাশে। কিন্তু কান্না নেই তবুও কোথায়ও। চোখ ফেটে ঝাপসা হয়ে এলেও পানি নেই এক ফোঁটাও চোখে। রেশমা হাত বাড়ায়। হাত বাড়িয়েই দেওয়াল ধরে। আর ধরতেই বিস্ময়। আবারও সেই ছায়ামূর্তি।

কে! কে ওখানে? রেশমা সচকিত। ভয়ে দু-পা যেন পিছিয়েই আসে। কৌন হ্যাঁ?

চুপ করে অন্ধকারে তাকিয়ে থাকে রেশমা। কিছু একটা যেন সরে গেল না সামনে থেকে! কোনো মানুষ কি? নারী না পুরুষ! একটু আগে মহল্লার বাইরে এ-রকমই কাউকে যেন দেখেছিল রেশমা!

কৌন হুঁ তুম?

ফিসফিস করে জিজ্ঞেস করে রেশমা। কিন্তু নিজের গলা নিজের কাছেই যেন দূরের বলে মনে হয়। রেশমা অন্ধকারেই দৃষ্টি সূচালো করার চেষ্টা করে। কে? কৌন হুঁ—!

ম্যঁয় কুলসুম।

কুলসুম!

হ্যাঁ!...তুমি আমাকে চিনতে পারবে না, আমি কিন্তু তোমাকে চিনি—

চেন?

হ্যাঁ।

কী করে চিনলে?

তোমার মতো আমিও এক টুকরো কাপড় খুঁজে বেড়াচ্ছি। আজ পঞ্চাশ বছর ধরে...

পঞ্চাশ বছর!

হ্যাঁ। কেননা তোমার মতো আমিও দাঙ্গার শিকার আমাকেও রেপ করে আগুনে ফেলে দেওয়া হয়। কিন্তু দিলেও প্রাণে বেঁচেছি কোনোরকমে তবে লজ্জা বাঁচাবার কাপড় পাইনি—

তাহলে!

সাড়া দেয় না কুলসুম। রেশমা তাকায়। চাপা স্বরে ডাকে একবার কুলসুমকে। কিন্তু রা নেই কুলসুমের। রেশমা আবার ডাকে। আবারও। আর ঠিক তখুনি অন্ধকারে পোড়া মহল্লা কাঁপিয়ে একটা গাড়ির শব্দ। একটা ট্রাক যেন এসে থামল। তারপরেই ঝুপঝাপ ভারী পায়ের শব্দ।

লাও ভাই, দেখো অন্দরমে...কই মুর্দা হায় তো ওঠা দেও ট্রাক মে...

রেশমা স্তব্ধ। নিঃশ্বাস যেন বন্ধ হয়ে আসে তার। আর সেই অবস্থায় একটু পিছিয়ে আসে সে। একটা ভাঙা দরজার আড়ালে চট করে ঢুকে যায়। এবং ঢুকতেই দু'তিনটে আলোর রেখা। আড়াআড়ি ঘুরতে ঘুরতে মহল্লা পার হয়, পার হতে থাকে। হতে হতে একসময় ভারী বুটের শব্দগুলো মিলিয়ে যেতেই এবার দরজার আড়াল থেকে বেরিয়ে আসে রেশমা। বেরিয়েই নিচু হয়। প্রায় হামাগুড়ি দিয়েই এগোতে থাকে। কেন কিনা, হঠাৎ আলোর ঝলকানিতে পোড়া জঞ্জালের স্তূপের ভেতরে যেন এক টুকরো ছেঁড়া ন্যাকড়া দেখেছে রেশমা। কিন্তু যেমন চকিতে দেখেছে তেমনি চকিতেই আবার হারিয়ে গেছে কাপড়ের টুকরোটা। তবে হারালেও রেশমা হাত বাড়ায় আন্দাজে। হাত বাড়িয়ে বাড়িয়ে খুঁজতে থাকে। খুঁজতেই থাকে।

কাব্যনাট্য

থেরসারিপুত্ত ও ভদ্দাকুণ্ডলকেশা

নন্দদুলাল আচার্য

(কথারম্ভ ঃ গত বৎসর আফগানিস্তানের বামিয়ান পার্বত্য অঞ্চলে বর্বর তালিবানদের হাতে দুহাজার বছরের অনুপম শিল্পকৃতি বুদ্ধমূর্তি চূর্ণ হওয়ায় সারা পৃথিবীর মানবতাবাদী ও সংস্কৃতি প্রেমিক মানুষ ধিক্কার ও ক্ষোভ প্রকাশ করেছিলেন। আপামর মানুষের প্রতি প্রেম ভালোবাসা-করুণাসিঞ্চিত যে মূল্যবোধ ছিল বুদ্ধদেবের জীবন ও ধর্ম, সেই অনন্য ব্যক্তিত্বকে স্মরণ করে, থেরীগাথার একটি কাহিনী অবলম্বনে লেখা হয়েছে নিম্নোক্ত কাব্যনাট্যটি।)

স্থান ঃ শ্রাবস্তির জেতকুঞ্জবন। ত্রিশরণ মন্ত্রোচ্চারে ভরে আছে সংঘের বাতাস। ছায়াশ্রিত বেদীতলে চিন্তামগ্ন সারিপুত্ত থের। সেই লগ্নে ভদ্দাকুণ্ডলকেশা তার অঝোর রূপ লাবণ্য নিয়ে যুক্ত কর, প্রণত ভঙ্গি। দাঁড়িয়ে রইলেন অগ্রশ্রাবক সারিপুত্তের সম্মুখে। অধীরা।

সারিপুত্ত।। (বিস্ময়ে) কে তুমি?
যৌবন গন্ধার ঘ্রাণ, ভেসে আসে বর তনু থেকে।
কুঞ্চিত কুন্তলে দোলে সীমান্ত মালিকা।
নব কদম্বের মালা পরেছ গলায়।
দু-কানে দ্রাক্ষার দুল।
ক্ষীণ কটি মেখলা শোভিত।
কঙ্কণে তুলো না ধ্বনি।
মৃত্যুরূপী মহানাগ তোমার কি পায়ের নূপুর?
ঊর্ধ্বগ্রীব এনমৃগ চেয়ে আছে নিষ্পলক চোখে।
অনুপম দীপ্তিময়ী, তুমি কে?

ভদ্দা।। লেহনে-দংশনে মুখে লেগে আছে
কলঙ্কের কালি। আমি কুণ্ডলকেশিনী ভদ্দা।
হে অগ্রশ্রাবক, বলো,
জ্বলন্ত শরীর নিয়ে যা চেয়েছি এত কাল,
তা কি দিতে পেরেছে বৈশালি?
সারিপুত্ত, বলো, কোন দৈবী অসন্তোষ
জন্মু পরিব্রাজিকার বুকে জমে ফের?
অচিরাবতীর জলে ছুঁড়ে ফেলে তর্কশাস্ত্র

জীর্ণ পুঁথিখানি,
কেন ছুটে চলে আসি দুপারের তরণী পুড়িয়ে
তোমার পায়ের তীর্থে থের?

সারিপুত্ত।। তুমি, কুণ্ডলকেশিনী ভদ্দা?
রাজগৃহ নগরের মেয়ে?
আগুনের এত নদী, দহনের অজস্র প্রহার
তোমাকে পারেনি খেতে।
আঁধিতে-ও অবিচল।
মুখশ্রীতে নবীন বর্ষার ঘন শ্যামছায়া।
শরীর চুঁইয়ে নামে চিদাভাস। এসো প্রাণময়ী।
বসো, এই শ্রাবস্তীর জেতকুঞ্জবনে।

ভদ্দা।। তার আগে বলো, কান্তিমান,
কেন রাজা থেকে রাজনটী, দণ্ডপাল, সান্ধিবিগ্রহিক,
আত্মধ্বংসপটিয়সী বারাঙ্গনা, তাপস ব্রাহ্মণ,
চুন্দ থেকে শল্লাতক, শ্রমণ, শৌণ্ডিক,
রাজমাতা মহাপ্রজাপতি, উপাসক, উপাধ্যায়,
আটবিক দস্যুদল, ধনাঢ্য বণিক,—বুদ্ধের
শরণাগত হল?
তিনি বুঝি যাদুকর?

সারিপুত্ত।। মানুষের পরমকল্যাণ মিত্র তিনি।
এই শান্ত সংঘারামে মুক্ত অমৃতের দ্বার।
সমস্ত অর্হৎকুল অবিদ্যাকে করেছে উন্মূল।
এখানে দলিত তৃষ্ণা সম্বুদ্ধের পায়ে।
মৈত্রী ও করুণা দুই জন্ম সহোদরা
হনন করেছে দ্বেষ।

ভদ্দা।। সংঘ তো স্বদেশ নয়।
সংঘের বাইরে দ্যাখো, পড়ে আছে দীর্ঘতম দেশ।
এখানে মানুষ বড়ো অসহায়। তার
শোণিতের গূঢ় কোষে প্রাচীনকালের শত্রু
তৃষ্ণা অবলীন।
সুযোগ পেলেই জাগে। ঈর্ষা তার সহচর।
সে যে কত হন্তারক,
সংহার মূর্তি তার দ্যাখোনি শ্রাবক?

সারিপুত্ত।। এই ধূলিলিপ্ত পৃথিবীতে

শীলবান মানুষের সংখ্যা তত অপ্রতুল নয়।
প্রবৃত্তির বিষচক্র থেকে একদিন মুক্ত হবে
মানুষ-মানুষী। সত্যের অনেক মুখ।
আমি জানি, তমসাই শেষ কথা নয়।
লক্ষ লক্ষ বছরের শ্রমে ঢালা
মানুষের এত কৃতি, বিফল কি হয়?

ভদ্দা।। থের আমি সামান্য মানুষী।
আমি কি দেখিনি বৃজ্জি, অবন্তী, গান্ধারে?
হীরণ্যবতীর পারে কুশীনরে, কুরু, বৎস্য
মৎস্য ও পাঞ্চালে? আমি কি দেখিনি,
অঙ্গ, শাক্য, মিথিলায়—যত মহাজনপদ
ভরে গেছে ভ্রষ্টাচারে, মোষপুরুষের ভিড়ে?
তুমি-ও দ্যাখো নি শ্রাবক, চারিদিকে মূল্য ভ্রান্তি,
নারীত্বের চরম লাঞ্ছনা? দুঃখভারে আনীল অবনী?

সারিপুত্ত।। সুহাসিনী, বিগ্রহ সভ্যতার মর্মকথা নয়।
মানব সভ্যতা এক বিশাল অক্ষয় বট;
ভ্রষ্টাচার কতটা কাটবে তাকে। নারীত্বের
চরম লাঞ্ছনা কী পুরুষের পরাভব নয়...
তবু অদৃষ্টবাদী নই আমি। জানি, সময়ের
গর্ভ থেকে জন্ম নেয় সময়ের ত্রাতা।

ভদ্দা।। সময়ের ত্রাতা?

সারিপুত্ত।। শোন ভদ্রে, সময়ের স্রোতস্বিনী যখন
আবদ্ধ হয়ে পড়ে, গ্রহণে ছায়া পড়ে মানুষের
আয়ত সংসারে। বিনাশের অন্ধকূপে ধেয়ে
যায় নীতি ও সংযম, ভেঙে যায় পরিবার।
দলপতিদের লোভ গ্রাস করে শুদ্ধ রাজনীতি।
রক্তস্রোতে সিক্ত হয় দীর্ঘ চরাচর।
তখন আসেন তিনি।
তিনি এসেছেন, ভদ্দা।

ভদ্দা।। আমাকে শোনাও সেই আভাময়
পুরুষের কথা।

সারিপুত্ত।। তোমাকে শোনাব আজ, সেই পরিব্রাজকের কথা।
তোমাকে শোনাব কেন সিদ্ধার্থ গৌতম,
রাজ আভরণ খুলে, স্বর্ণ অঙ্গে তুলেছিল

ভিক্ষুর চীবর? মৃন্ময় করঙ্গ হাতে নগরীর
দুয়ারে দুয়ারে, কেন সেই চিন্ময় তরুণ,
চেয়েছিল শ্যামাক তণ্ডুল? সুভদ্র কাঞ্চনা—
তরুণী বধূকে রেখে, কেন তার গৃহত্যাগ?
কোন অপ্রাপ্তির ক্ষোভে সঙ্ঘের কুটির থেকে
ফিরেছিল সঙ্ঘের কুটিরে? কেন মহানাম,
অশ্বজিৎ তারই সতীর্থদল ত্রিশরণ নিয়েছিল
সুগতের পায়ে।

ভদ্দা।। নিখিলের অর্চনীয় তিনি।
মেঘলোকে প্রসারিত তাঁর কীর্তিগাথা।
আমাকে শোনাও তাঁর জন্মের কাহিনী।

সারিপুত্ত।। মনে করো সুশোভিত লুম্বিনী উদ্যান।
দুধের বাটির মতো আকাশে টলমল করছে
চাঁদ। এতো আলো—চরাচর ভেসে যাচ্ছে
আলোর প্লাবনে; সেই পূর্ণিমায়, মায়ার জঠর
থেকে জন্ম হল যার, অবনীর দুঃখভার
লাঘবের দায়, একদিন সেই কাঁধে তুলে
নেবে। নেয়নি কি?

ভদ্দা।। জানি না, জানি না। শুধু জানি,
তাঁর পুণ্য আবির্ভাবে, ধানক্ষেতে বৃষ্টিকণা
হেসে উঠেছিল। খঞ্জনা, বঞ্জুল, শ্যামা,
গান গেয়েছিল গাছে গাছে। উচ্ছ্বসিত হয়ে
তটের সীমানা ভেঙে ফেলেছিল সব জলাধার।
শরীরে বকুল গন্ধ, আছড়ে পড়েছিল হাওয়া
মৃত্তিকার বুকে। আর ছিল, আকাশ পাগল করা
আলো।

সারিপুত্ত।। শোন ভদ্রে, এর থেকে বহু, বহুগুণ আলো
একদিন দীপ্র হলো তার করোটিতে। নৈরঞ্জনা
নদীতীরে সুজাতার পরমান্ন কি তাকে
দিয়েছে বোধির পন্থা? প্রতিটি অণুতে তাঁর
জ্বলে উঠল হাজার পূর্ণিমা। উদ্ভাসিত হল মুখ।
জন্ম হল বোধিপ্রাপ্ত যুগ পুরুষের। তিনি শান্ত,
সুগম্ভীর, আয়ত দুচোখে মৈত্রী, হৃদয়ে করুণা।
অথচ শোণিতে তাঁর নীরবে গর্জন করে প্রতিবাদ।

পৃথিবীর প্রথম বিদ্রোহী তিনি।

ভদ্দা।। প্রথম বিদ্রোহী শাস্তা? অজিতকেশ কাম্বলী নন?
নন কাত্যায়ন? মস্করি বা কেন নন?
কেন নন পূর্ণ কাশ্যপ?
আর-ও যত শ্রমণ, আচার্য, আজীবিক?
ভরণ্ডু কালাম?

সারিপুত্ত।। এই সব মুক্তিকামীদের, কর্মে ও কথায়
ছিল না কি যোজন যোজন ব্যবধান?
গোপন অস্মিতা যেন খেয়েছিল এদের মনন।
তাই বেদের বিরুদ্ধে, কূট তর্কে প্রগলভ,
হৃদয়ের সংরাগ কোথায়? ফলিত প্রয়োগে
কেউ জ্বলে তো ওঠেনি, বজ্রসার সম্বুদ্ধের মত?
তাই প্রথম বিদ্রোহী তিনি।

ভদ্দা।। কেন তাঁর এই দ্রোহ?

সারিপুত্ত।। তুমি বলো, কেন চতুর্বর্ণ প্রথা?
ভেদপন্থা কেন? বিশ্বজুড়ে রক্তিল সন্ত্রাস?
গোলাভরা ধান, তবু মানুষের সৃষ্টি করা
মন্বন্তরে মরে যায় হাজার মানুষ? তাই,
শক্তিধর ক্ষত্রিয়ের ভোগবাদ, ধনাঢ্য বৈশ্যের
হীন ষড়যন্ত্র, অষ্টবজ্র যুক্তি দিয়ে ছিন্ন ভিন্ন
করে দেন তিনি। দহনে ও দুর্বিপাকে,
মায়ের বাহুর মত প্রসারিত তাঁর বরাভয়।

ভদ্দা।। কিন্তু, কোন যাদুগুণে মরুতে কেতন ওড়ে তার?

সারিপুত্ত।। ভালোবাসা, পারাবারহীন ভালোবাসা।

ভদ্দা।। তিনি-ও কি বেদের বিরোধী?

সারিপুত্ত।। ভদ্দা, শাস্তা শীলবান। মর্মে তবু ঝড়।
ব্রাহ্মণতন্ত্রের ধ্বজা যুক্তি দিয়ে পরাভূত
করেছেন তিনি। কেন শুধু জন্মের কারণে,
ব্রাহ্মণ সবার উঁচু হবে? কেন সামাজিক ন্যায়
থেকে বঞ্চিত হবেন শূদ্র?
কেন থাকবে অসম বিকাশ?

ভদ্দা।। ব্রাহ্মণে চণ্ডালে কোন ভেদ নেই?

সারিপুত্ত।। ভেদ নেই।
ব্রাহ্মণে চণ্ডালে কোন ভেদ নেই।

তাই সহস্র বর্ষের লজ্জা, চণ্ডালিনীর অপমান,
মুছে দিতে তাঁর অনুব্রতী আসেনি এগিয়ে?
অস্পৃশ্য চণ্ডালকন্যা প্রব্রজিত আনন্দের করতলে,
তর্ষময় ঠোঁটে, ঢালেনি কি জলধারা, অকুণ্ঠ
কলসে?
কুণ্ডলকেশিনী ভদ্দা, আসলে মানুষ।
মানুষের থেকে কিছু বড় নেই, সম্মানীয় নেই।
তাই মিথ্যা বর্ণাশ্রম, দণ্ডভেদ, হানাহানি
মানুষে মানুষে।

ভদ্দা।। অপেক্ষায় অপেক্ষায় পুড়ে গেছে আমার
দুচোখ। যখন পেয়েছি এতো কাছে,
সারিপুত্ত বলো, বুদ্ধ তো শ্রমণ;
মাধুকরী বৃত্তি যার। আহার্য গ্রহণ করে
বিনাশ্রমে, পরজীবী বায়সের মত।
তাই কাশী ভরদ্বাজ ধিকৃত করেছে তাকে।
করেনি কি?

সারিপুত্ত।। শাস্তা কি কৃষক নয়? বিশ্বাসের বীজে,
বপন করেনি শস্য? বৃষ্টি যাঁর জীবন তপস্যা;
প্রজ্ঞা ছিল বৃষ ও লাঙ্গল। সদা জাগরূক থেকে
আগাছা নিড়াননি তিনি? প্রয়াসের বলীবর্দ
কর্ষণ করেনি তাঁকে দুঃখহীন আনন্দের দিকে?
তাই তিনি শ্রেষ্ঠ কৃষক। অমরত্ব শস্যকণা
ফলে যাঁর সুকল্যাণ ব্রতে।

ভদ্দা।। থের, তুমি এমন শ্রমণ পন্থা বলো,
যাতে শুধু মননের সিদ্ধি নয়, শরীরের
সমস্ত প্রহার যেন শান্ত হয়ে আসে।
বাসনায় দীর্ণ ও শরীর, আমি-ও তোমার মত
তুলে নেব ভিক্ষুণীর জীর্ণ চীরবাস।

সারিপুত্ত।। মেধাবিনী, আমাকে মার্জনা করো।
স্মৃতি হত্যা পাপ। আমি তার গুণ বন্দী।
আমি কি দেখিনি, ফেটে পড়া যৌন কদমের
বাষ্পাকুল কাতরতা ছুঁড়ে ফেলে, শুধু মানুষের জন্য,
ছুটন্ত শরীরে তাঁর উদ্বেগ কাতর ভালোবাসা?
দাঙ্গার বিরোধী বলে, শাক্য সংঘ, কাকে

নির্বাসন দণ্ড দিয়েছিলো?—সে তো সিদ্ধার্থ গৌতম।
বারুণী নদীর জল শুধু শাক্যরাই নেবে একা,
কলিঙ্গ নেবে না?
অহিংসার কথা বলেছিল বসে, শাক্য সংঘ
কাকে দিয়েছিল নির্বাসন? সম্বুদ্ধ ঈশ্বর নন,
দেবতা-ও নন। এ মাটিরই রক্তের সন্তান।
কোথা হতে অসীমের তৃষ্ণা তাঁকে ছুঁয়ে দেয়।
সেই থেকে তাঁর, শোণিতে গর্জন করে সৌরঝড়।
ভদ্দা, আমি সারিপুত্ত, তাঁর অগ্রশ্রাবকের
এক দীনজন। দেখেছি আগুন এসে প্রণাম জানায়
তাঁর আভাময় পায়ে। এতকাল ওই মহামানবের
তপস্যার, মেধার নির্যাস, বজ্রশিলা
করেছে ধারণ। আমি সেই পবিত্র পিটকে
চোখ রেখে, তোমাকেও বলি, যাও ভদ্রে,
বুদ্ধের শরণ নাও। আমি তাঁর দীন
অনুসারী। নবীন মেঘের মত,
শাস্তার সমস্ত সত্তা ছেয়ে আছে
মর্মের আকাশ।

সীমায় অসীমে

বীরেন্দ্র দত্ত

ঘুম ভেঙে গেল সুরূপার। এখন রাত কত কে জানে। উঠে এই অন্ধকার হোটেল ঘরে টেবিলে রাখা হাতঘড়ি দেখতে ইচ্ছে করছে না ওর। ভোর শেষ হওয়ার পর হাওড়া স্টেশন থেকে ছাড়া ট্রেন এখানে পৌঁছতে বেশ কয়েক ঘণ্টা দেরী করে। তার ওপর সমুদ্রের ধার ধরে রিকসা আসার সময় ঘন কালো মেঘে ঝোড়ো হাওয়ার মধ্যে ভরাট আয়োজন দেখেছিল। এখন দোতলার ঘরের জানালার কাঁচে জোর সমুদ্র-হাওয়ার আছড়ে পড়া তুমুল বৃষ্টি, উথাল-পাথাল বাতাস আর বড় বড় ঢেউয়ের মাথায় দৈত্যের মত মেঘেদের পা-রাখার দামাল স্বভাবে এত আকর্ষণ কিসের!

যে যার ঘরে নিশীথ, ইন্দ্র, কুশল, অপরূপ—নিশ্চয়ই এতক্ষণ ঘুমে বিভোর। ওরা তো ট্রেন-জার্নি থেকে মুক্তি পেয়ে ফ্রেশ হওয়ার পর হোটেলের নিচে ডাইনিং হলে খাওয়ার সময় সেই যুক্তি দেখাচ্ছিল। ওরা চারজনই প্রত্যেকে বসল সমুদ্রের ধারে আর আশপাশে আগে অনেকবার নিজেদের চষে বেড়ানোর স্বভাবে কাটিয়ে গেছে। সুরূপার এই প্রথম দেখা। এমন সমুদ্র, দুরন্ত বালু-ঝড় আর বৃষ্টির মধ্যে সমুদ্রের গর্জন! সুরূপা এখন এত আপন নিজের কাছে!

মাকে তো মনে পড়ছেই। মাস দেড়েক আগে মা একেবারে হঠাৎই চলে গেল। সুরূপার কাছে মা ওর পুরনো বন্ধু, আশ্রয়, সাহস, একপক্ষে উদাসীন নিরাপত্তাও। কলকাতায় শ্রাদ্ধ-শ্রান্তির পর থেকে কেমন এক শূন্যতা ওকে ঘিরে ভুতুড়ে ছায়ার মত ধরেছিল। শূন্যতা থেকে তৈরি হওয়া কঠিন শীতের মত ভয়, নিঃসঙ্গতা ওর পক্ষে দুরূহ ভার হয়ে উঠছিল, মায়ের রেখে-যাওয়া লোকজনের পারিবারিক কাঠামোয় বাইরের বদলে সুরূপা এতটুকুও অস্বস্তি বোধ করেনি। বদল মনেই হয়নি। কিন্তু মায়ের নিজের তৈরি করা বিপুল সম্পত্তির যে শ্বাস বন্ধ করা চাপ তৈরি করছিল, তা থেকে মুক্তি পেতেই তো এখন বাইরে চলে আসা। এরই মধ্যে বাবার স্মৃতি পুকুরের জলের সঙ্গে জলজের মত ওর মধ্যে নতুন ঘ্রাণের বাতাসে ঢাকতে থাকে।

বাবা একেবারে অন্য মানুষ। সংসার ছাড়া। নিজে পালাগান লিখতেন নিজের খেয়ালে। স্বদেশী পালাগান। মাঝে মাঝে কোন কোন দলে ভিড়ে গিয়ে কোথায় যে উধাও হতেন আজও সুরূপা তা জানে না। বাবা ছিলেন চৈতন্য ভক্ত। এই পুরীতেই চৈতন্যের মৃত্যু রহস্য আছে আজও অন্ধকার-ঢাকা। বাবা যেন আজীবন সেই অন্ধকার-ঢাকা আলোর রহস্য সন্ধান করতেই বেরিয়ে পড়তেন। প্রথম দিকে মাসে মাসে চিঠিপত্তর এলেও মা কোন খোঁজ রাখতো না শেষ দিকে। আর বাবার এই ছন্নছাড়া স্বভাবের জন্যই মা ক্রমশ সুরূপার কথা ভেবে, নিজের নিরাপত্তার কথাও সামান্য স্থাবর সম্পত্তিকে মূলধন করে বিপুল বিষয়-আশয় করে

রেখে গেছে। এত সম্পত্তি আমার কি কাজে লাগবে। আমি এ নিয়ে কি করব? এই দুরূহ পাষাণভার থেকে মুক্ত শ্বাস নিতেই সুরূপা চলে এসেছে এখানে। সঙ্গে আছে বন্ধুর মত নিশীথ, ইন্দ্র, কুশল, অপরূপরা। এমন চলে আসায় মা বেঁচে থাকলে গভীর বিশ্বাসের সঙ্গে খুশিতে মেয়েকে জড়িয়ে ধরত।

কলকাতার বিশাল বাড়ির একতলার একটা বড় ঘরে নিশীথ ইন্দ্রদের নিজেদের মত একটা ক্লাব করতে দিয়েছিল। মা কোন যুক্তিই করেনি মেয়ের সঙ্গে। আর বাবার তো দেখাই মিলত না তেমন করে, তাঁর কোন মত-অমতও এ ব্যাপারে ছিল না।...

'শোন্ রূপা, এত বড় বাড়িতে যতই কাজের লোক থাক, সেফটি থাকব আমরা তো দুজন। তাই ওদের নিজেদের মত করে থাকতে বলেছি।'

সুরূপা তখন বুঝে যায়, ওরা চারজন—নিশীথ, ইন্দ্র, কুশল আর অপরূপ।

'খুব ভাল ছেলে এরা। ভদ্রবংশের। সবাই আমার চেনা। শিক্ষিত।'

সুরূপা মায়ের মুখের দিকে তাকিয়ে থাকে। আরও কিছু যেন শুনতে চায়।

'তোর বাবাকে তো দেখলি। এসব লোক কেন যে সংসার করতে আসে। স্বরে প্রচ্ছন্ন শ্লেষ। 'গান লিখে দেশউদ্ধার!'

ভিতরে সতর্ক হয় সুরূপা। বাবার ওপর মায়ের সেই অবিশ্বাস, তাচ্ছিল্য, অনিশ্চয়তা, ঔদাসীন্য, সেই গোপন নিষ্ঠুরতা যেন কথাটায় জড়িয়ে থাকে। সুরূপা বড় হয়ে বুঝেছিল, মায়ের দিক থেকে যত বেশি বিষয়ের চরম সীমার দিকে একগুঁয়ে স্বভাবে, জিদে এগিয়ে যাওয়া ঘটছিল, ততই যেনবা আত্মভোলা হয়ে যাচ্ছিলেন। মুখে বাবা কিছু বলতেন না, বাইরে থেকে ঘরে ফেরা ক্রমশ কমেও যাচ্ছিল।

সেদিনের মায়ের কথার কোন উত্তর দেয়নি সুরূপা।

সোজা মা সুরূপার একেবারে বুকের কাছে চলে এসেছিল। 'তোর বয়স হয়েছে রূপা। লেখাপড়ার শেষ সীমা তুই পেরিয়ে এসেছিস। যাদের ক্লাবে আসতে দিয়েছি, ওদের দিকে নিজের মত করে একটু দ্যাখ। এমন বন্ধুদের থেকেই তো বাছতে হবে।'

সুরূপা লজ্জা সরায়। 'কি বলছ তুমি মা!'

'ঠিক বলছি। এত বড় সম্পত্তি তো তোরই। তোকেই সামলাতে হবে। অবাধ্য হবি না। আর এদের মধ্যে থেকেই নিজের মত করে গুছিয়ে নে।'

যেমনভাবে মা কারোর সাহায্য না নিয়েই এত বড় সম্পত্তি করেছে, ঠিক সেই ভাবনা-চিন্তায়, কৌশল আর বুদ্ধিতে মেয়েকে সম্পত্তির সঙ্গে জড়িয়ে নেওয়ার পরিকল্পনা করে।

সুরূপাকে একভাবে নীরব নিশ্চুপ থাকতে দেখে মা শেষ কথা বলেছিল, 'আমি তোকে বিশ্বাস করি রূপা। তোর বাবা যা ভুল করে গেছে তুই সেই ফাঁদে পা দিবি না। জেনে রাখ্ সংসারটাই জীবন।' একটু থেমে কি যেন ভাবে, 'ওই চার বন্ধুর সঙ্গে খোলামেলা মিশে যাবি। এই মেলামেশার মধ্যে তোর একেবারে নিজের মতই যেটুকু চেনা, সেটাই তোর, আর আমারও সমান লাভ। নিজের মত বেঁচে থাকার মানেই তো তা-ই। অক্ষমতায় এড়িয়ে যাওয়ার মধ্যে কোন পৌরুষ নেই।'

শেষ কথাটা বুঝি বাবাকে ভেবেই বলেছিল মা।

মায়ের চিন্তার সূত্রে বাবার কথা মনে পড়তেই সুরূপা সচেতন হয়। বাইরের তুমুল বৃষ্টি আর সমুদ্রের গর্জন যেন দুই মিলে ওর হোটেল-ঘরের জানালার বাধা বুঝি সরিয়ে ঘরের মধ্যে ঢুকতে চাইছে। জানালার কাঁচে বুঝি প্রাগৈতিহাসিক কোন জন্তুর কামড়। যেনবা সুরূপাকে জড়াতে চায়। বাবার সঙ্গে শেষ দেখা হওয়ার দিনটা মনে পড়ে। দেয়ালে ঠেস দিয়ে বিছানার ওপর বসে থাকে সুরূপা। দৃষ্টি কাঁচের সার্শি ছাড়িয়ে কোন স্মৃতিকে ধরতে চায়।....

সেদিনও কলকাতা এমন ঝড় জলে প্রায় মাতাল হয়ে উঠেছিল।

দুপুরে বাবা হঠাৎ এসে হাজির। মা তখন নিজের তৈরি অফিস আর কারখানার তদারকিতে ব্যস্ত। সুরূপা শেষ পরীক্ষায় পাশ করার পর বাড়িতে বসা।

'এই বৃষ্টিতে। বাবা তুমি!'

বাবা ভিজে ছাতাটা মেয়ের হাতে দেয়, 'ধর, খুলে রাখ।'

'কোত্থেকে আসছ?'

'সে অনেক কথা।' বাবা সাজানো বৈঠকখানার কোচেই বসে পড়েন। তোর মা কোথায়?'

'মা তো অফিসে।' সুরূপা ইতস্তত বোধ করে। 'মাকে ফোন করব?'

'না, না ফোন করিস না কাজে ব্যস্ত। তুই বোস তো। কথা আছে।' মেয়ের দিকে তাকিয়ে থাকলেন।

সুরূপা এতদিনে বাবার খেয়াল খুশি অনেকটাই বুঝে গেছে। বাবার কথায় বসে পড়ে বাবার পাশেই।

বাবা একভাবে বসে থাকেন মেয়ের দিকে তাকিয়ে।

'কিছু বলবে?' সুরূপার স্বর কেমন করুণ, বিষাদের ছাই-রং জড়ানো।

'কিছু মনে করিস না মা। মাকে রাগ করতে বারণ করিস। আজই সন্ধের ট্রেনে পুরী চলে যাচ্ছি। সঙ্গে লোক আছে।' একটু থামেন। 'তোর মা যা ব্যস্ত ওকে বিরক্ত করা ঠিক নয়। মানুষটা কি পরিশ্রম করছে বল!' কেমন অন্যমনস্ক দৃষ্টিতে তাকিয়ে দেখেন মেয়েকে, 'তোকে দেখার বড় ইচ্ছে হল, তাই এলাম রে রূপা!' বাবার দু'চোখ উন্মুখ।

বাবার গলায় কি যেন ছিল। সুরূপার সেই মুহূর্তে দু'চোখ ছাপিয়ে আসার মত জল জমছিল। বাবাকে দেখতে থাকে একভাবে। কত রোগা হয়ে গেছে। কাঁধে সেই ব্যাগ। নিশ্চয়ই নতুন কোন লেখা পালাগান-এর কপি ওর ভেতরে। জামা-কাপড় কিছুটা ময়লা। মাথায় এক ঝাঁক চুল—একটিও পাকেনি। দু'চোখ ঝকঝকে কিন্তু সারা মুখে লেপে আছে এক মহিমময় বিষণ্ণতা। তার মধ্যেই দু'চোখের কৌতূহল কেমন নির্ভীক, অনেকটা যেন বেমানান।

'বাবা তুমি বরং কদিন এখানে থেকে যাও, বিশ্রাম নাও। শরীরটা ঠিক করো।'

'থাক মা। শরীরের দিকে তাকালে সব সময় চলে না। আমি ঠিক আছি।' দু'চোখে জল। 'তোকে আমার ভীষণ ভয়। কি যে বুঝতে পারি না।'

'কি সময় চলে না?' বিড়বিড় করে সুরূপা এবার মনে করিয়ে দেয়, 'বাবা আমাকে

একবার পুরী দেখাবে বলেছিলে!'

'এর পর এসে নিয়ে যাব। তোরই তো যাওয়া দরকার! ইতিহাসের ছাত্রী!'

বড় করে শ্বাস পড়ে সুরূপার। সেই যে গেলেন, আর ফিরলেন না। কোনদিনও না। ক্রমশ চিঠি আসাও বন্ধ হয়ে গেল। কে একজন রিসার্চ করছিলেন চৈতন্যদেবকে নিয়ে হঠাৎ কাগজে ছোট করে খবর, মানুষটা সমুদ্রের চরে মৃত পড়ে আছে। কোন তল্লাসিই হয়নি। বাবা তো ওঁর সঙ্গেই যোগাযোগ রেখে চলতেন।....

অন্ধকার ঘরে নড়ে চড়ে বিছানায় বসেই থাকে সুরূপা। বাবা কোথায়? এই পুরীতে কোথাও আছেন, না—। সুরূপার এক কষ্ট ঠেলে ওঠে। কলকাতায় এত সম্পত্তি, এত সাচ্ছন্দ্য সুখ সব ছেড়ে বাবা এভাবে আড়াল হলেন কেন? মাকে এত সংসারমুখী দেখেই? মা বলত 'তোর বাবা এরকম ছিল না তুই একটু বড় হওয়ার পরেই—এই বছর চারেক—মানুষটা বদলে গেল!'

বাইরে বাতাসের দাপট একটু কম। সমুদ্রের গর্জনের মধ্যে বৃষ্টির শব্দ ঢাকা পড়ে গেছে। সুরূপা কখন যেন গভীর ঘুমে ডুবে যায়।

নিশীথ

কদিন ধরে টানা বৃষ্টি সঙ্গে ঝোড়ো হাওয়া ছিল। সফল স্বভাবে সমুদ্রও উত্তাল। ওদের কাল পুরী এসে পৌঁছনোর পর আজ সকালে সমুদ্রতীর স্বাভাবিক। রোদ ঝকঝকে। একটু বেলায় ব্রেকফাস্টের পর অপরূপ বলল, 'আগেই তো বলেছিলাম, পুরী অনেকবার এসেছি। আজ বরং কুশলকে নিয়ে চিল্কায় চলে যাই। লঞ্চ ট্যুর।'

নিশীথ বলল, 'কুশলের তো স্টেশনে গিয়ে রিটার্ন টিকিটের ব্যবস্থা করার কথা!'

কুশল সুরূপার দিকে তাকায়। 'বরং রূপার তো এখানে আসা এই প্রথম। ওকে নিয়ে নিশীথই যাক স্টেশনে টিকিটের ব্যবস্থা করতে! হয়ে গেলে ফেরার পথে রূপাকে রিকশা করে ঘুরিয়ে দিক শহরটা।

'তা হলে তো ইন্দ্র একা হয়ে যায়!' অপরূপ সমস্যা তোলে।

'ওর আবার একা হওয়া! এখানে এত পুজো-আচ্চার ব্যাপার আছে' বলে কুশল তাকায় ইন্দ্রর দিকে। 'ও বরং ওর পুজোর দিকটা সেরে নিক! নিশীথ-রূপা ফিরলে একসঙ্গে তিনজন—মন্দ লাগবে না।'

সেই মত ওরা ছড়িয়ে গেল সমুদ্রতীর থেকে আশপাশে।

দেরি না করে নিশীথ স্বরূপাকে নিয়ে রিকশায় স্টেশনের পথ ধরে। ইন্দ্র হোটেলে ওর ঘরে ফিরে পুজো দেওয়ার তোড়জোড় করে।

স্টেশনের পথে রিকশায় বসে নিশীথ হঠাৎ চুপ হয়ে যায়। পাশে বসা সুরূপা উদাসীন সমুদ্রতীর ছাড়িয়ে দূরের ঢেউগুলোর ওপর দৃষ্টি ফেলে রাখে। বেলায় ঘুম ভাঙলেও ঘুম ভাঙার আগে সুরূপা একবার বাবাকে যেন স্বপ্নে দেখেছিল! দেখেছিল আবছা ছবির ভাষায়

বাবাকে সমুদ্র স্নান করতে। কখনো বা পাড়ের ঢেউয়ের মাথায় ভেসে থাকতে।

'কথা বলছ না যে!' নিশীথ ওর দিকে না তাকিয়েই একটা সিগারেট ধরিয়ে যেন বিড় বিড় করে।

'বাবাকে আজ ভোরও স্বপ্নে দেখেছি।' সুরূপার স্বর সমুদ্রের শব্দের মধ্যে কিছুটা বাতাস জড়িয়ে ঢেকে যায়।

'বাবার কথা ভুলে যাও রূপা।' নিশীথ গলার স্বর স্পষ্ট করে। 'তোমার মায়ের কথা ভাবো। কত সহজে বাবাকে মানিয়ে নিয়েছিলেন। না মানাতে পারলে এত সম্পত্তি করতে পারতেন?'

'একে মানানো বলে।' সুরূপার স্বর স্পষ্ট। 'আজ এ সম্পত্তির কি দাম? বাবাকে সব দিক থেকে হারানোর মধ্যে এর দাম একেবারে তুচ্ছ। একটা বড় সম্পর্কের বিকল্প এই ভোগ, সুখ, সম্পত্তি। আমি সহ্য করতে পারছি না।' এমন ব্যাখ্যা কলকাতাতেও বলে সুরূপা।

এবার নিশীথ তাকায় সুরূপার মুখের দিকে। 'সম্পত্তি সব সময় বিলাসের হয় না রূপা। দারিদ্র্য যে কী ভীষণ জীবনকে ধ্বংসের মুখোমুখি দাঁড় করায়, তা তুমি জানো না রূপা।'

'আমার বাবা দরিদ্র ছিলেন না।'

প্রতিবাদ আর করতে চায় না নিশীথ। এই সমুদ্রের ধারেই শপথ নিতে হবে ওদের। সুরূপাকে রাজি করাতে হবে। কলকাতায় কথা দিয়ে এখানে এসেছে সুরূপা।

সুরূপার মা ওকে না জানিয়েই নিশীথকে সাহস দিয়েছিলেন, 'তুমি তৈরি হও নিশীথ, আমি মেয়েকে রাজি করাবো।'

সেই থেকে অদ্ভুত এক লোভ নিশীথকে চালনা করে। একটা সাধারণ অনাথ আশ্রমে কী দীন হীন জীবন কাটিয়েছিল নিশীথ। কি ভয়ংকর অবজ্ঞার অশ্রদ্ধার জীবন, করুণ ভিক্ষার্থীর অভিজ্ঞতা নিশীথকে যেন বা জাগ্রত অবস্থায় একদিকে কান্না দিয়ে ঢাকছিল দিনগুলো, একই সঙ্গে স্বপ্ন দেখাচ্ছিল, কষ্টের লেখাপড়ার জীবন শেষে নিশীথ সেই স্বপ্নটুকু ধরার মুখেই সুরূপার মায়ের গড়া কোম্পানির বড় মাপের পদ পেয়ে যায়। ক্রমশ সুরূপা নয়, সুরূপার সূত্রে ওদের সম্পত্তির বড় অংশীদারের আলোনয় উচ্চাশা ভেতরে আড়ালের স্বভাবে জাগিয়ে রাখে। আলো হল সেই লোভ। মা চেয়েছিল একা সুরূপার বিশাল সম্পত্তির ভবিষ্যৎ নিরাপত্তা। তিল তিল করে ছোটবেলা থেকে দারিদ্র্য যে হীনমন্যতার দিক রচনা করে, নিশীথ তা থেকে বেরিয়ে আসার আশায় লোভকেই একমাত্র রক্ষাকবচ করেছিল। সুরূপার আজকের বিশাল সম্পত্তির অধিকার-কর্তৃত্ব নিশীথের দরকার। সুরূপার সম্পত্তির ভোগদখল একমাত্র সুরূপার সঙ্গে স্থায়ী সম্পর্কেই সম্ভব। সম্পত্তির নিরাপত্তা আর সুরূপার মত অপূর্ব সুন্দরী, সপ্রতিভ, শিক্ষিত রমণীর প্রেমজীবন এক। সুরূপা যদি ঠিক সেভাবে না আসে....!'

নিশীথ সচেতন হয়। 'আমরা দুজন এখন শপথ নেওয়ার পক্ষে খুব স্বাভাবিক অবস্থায় আছি। তোমার কথা বলো।'

সুরূপা এতক্ষণ অন্যমনস্ক নিশীথকে দেখছিল। নিশীথ যে শুধু ওকে নয়, ওর দুর্ভার সম্পত্তির সঙ্গে জড়িয়ে ওকে পেতে চায়—অনেক আগেই বুঝেছিল। যে মানুষ ছোটবেলা

থেকেই নিঃস্ব উচ্ছিষ্টের মত জীবন কাটাতে কাটাতে এত বড় হয়েছে। তার লোভ তো ছোট হতে পারে না! মায়ের সম্পত্তির ওপর আরও লোভ জমাতে জমাতে একদিন নিশীথ তো সুরূপাকেই হারিয়ে বসবে। অন্যের অর্থকে গুছিয়ে-গুটিয়ে ক্রমশ নিজের না করতে পারলে তো সম্পত্তির বিশালতা আসে না। বাবা একদিন এই কথাটা বলেছিলেন। মায়ের সম্পত্তির ওপর, ভোগের উপাদানের ওপর আরও বোঝা চাপাতে চাপাতে নিশীথের মত মানুষ তো সুরূপাকে ভোগ্যপণ্যের যন্ত্র করবে। বাবা যন্ত্র হওয়ার আগেই মুক্তি নিয়েছিলেন নিজের মনের গভীরে। সুরূপা কি পারবে?

নিশীথ সুরূপার অনড় মানসিকতা ভাঙাতে ওর ডান হাতের মুঠো ধরে, 'বলো রূপা, এই সমুদ্রের ধারে আমার কাছে চলে এসো। আমরা এত কাছে!'

সুরূপা বড় বড় চোখে তাকায় নিশীথের দিকে। 'আমাকে ভাবতে দাও।'

'এই সমুদ্র কি বলছে জানো?'

'কি?'

'তোমাকে আমার কাছে আসতেই হবে। যে-ভাবে হোক!'

'মানে!' অন্যমনস্ক সুরূপা বিড়বিড় করে।

'তুমি আমার যখন, তোমার সম্পত্তিও আমার।' হঠাৎ হেসে ওঠে, 'তুমি তো মেয়ে হিসেবে এত মূল্যবান সম্পত্তি, তোমার জমানো সম্পত্তিও তা-ই। তোমার মা এটা ভাবতেন।' গলা নামায়। চিবুকের কাছে মুখ আনে, 'তোমার মা কিন্তু একজন দক্ষ জহুরী। তোমার বাবাকেও এভাবে ধরতে পেরেছিলেন।'

সুরূপা ভিতরে অন্যমন থাকে নিবিড়। 'আমাকে আর একটু সময় দাও।' কথাটায় সমুদ্রের আছড়ে পড়া ঢেউয়ের মত চাপা তাচ্ছিল্য, কিছুটা বা উপেক্ষা।

রিকশা দ্রুত গতির স্বভাবে রাস্তার একটা ঢালু অংশ থেকে নিচের দিকে গড়ায়।

ইন্দ্রনাথ

এখন রাত দশটা বাজার পরেও মিনিট কুড়ি বেশি। কিছু আগে ওরা পাঁচজন নিচের ডাইনিং হল ছেড়ে ওপরে উঠে এসেছে। দুটো এ্যাম্বাসাডার নিয়ে ওরা পাঁচজনেই ভাগাভাগি করে কোণারক ঘুরে প্রায় বুড়ি-ছোঁয়ার মত কয়েকটা জায়গায় বেড়িয়েছে। কোণারক অনেকবার দেখা বলে নিশীথ, কুশল আর অপরূপ ওপর ওপর দেখে ওদের গাড়ি নিয়ে কিছুটা আগেই হোটেলে ফিরে পড়ে। কথা ছিল গাড়ি ছেড়ে সমুদ্রতীরে বেশ কিছুটা সময় আড্ডায় কাটাবে ওরা সকলে একসঙ্গে।

ইন্দ্রনাথের ওপর দায়িত্ব দেওয়া ছিল সুরূপাকে নিয়ে কোণারক, ভুবনেশ্বর ও আরও কিছু দেখার জায়গা ভাল করে দেখিয়ে দেওয়ার। সুরূপা ইতিহাসের ছাত্রী ছিল, তার ওপরেই ওর শেষ গবেষণার কাজ। তাই ইন্দ্রনাথ ধৈর্য ধরে ওকে সব দেখাতে পারবে, বোঝাতেও। কোণারক শুধু নয়, ভুবনেশ্বর এমনকি পুরীর মন্দিরের কাজ, কোণারক থেকে নানা মূর্তি

নিয়ে অন্যান্য মন্দির সাজানোর দিক সুরূপা ভাল করে বুঝে নিয়েছে। সঙ্গ দিতে ইন্দ্রনাথের কোন ক্লান্তি ছিল না, উৎসাহের অভাবও ছিল না। দেরিতে ফিরে ওরা পাঁচজনই একসঙ্গে সমুদ্রের ধারে সন্ধের মুখ থেকে রাত ন'টা পর্যন্ত কাটায়।

নিজের ঘরে বসে এতক্ষণ সুরূপা আজকের সারাদিনের ব্যস্ত অতীতটা এভাবে মনের মধ্যে গোছাতে থাকে। কলকাতা থাকতেই ইন্দ্র সুরূপাকে এইভাবে একটা পরিকল্পনার আন্দাজ দিয়েছিল। ওর তো একটু আগে সুরূপার ঘরে আসার কথা। একা। কি যেন বলবে! মন্দির দেখানোর মধ্যে ইন্দ্রর নিজের যেন একটা ঘোর ছিল। সুরূপার বুঝি কিছু আড়ষ্টতাও ছিল। সুরূপা নিজের মধ্যেই অস্বস্তি বোধ করে। ওদের দোতলার লম্বা প্যাসেজের সব আলো কি নিভে গেছে! আজ আবার সন্ধের কিছু পরে মেঘ ঘন হয়ে যেনবা সমুদ্রকে ভয় দেখাচ্ছিল। এখন কি বৃষ্টি নামবে? সমুদ্রের গর্জন এত হঠাৎ জোর হল কেন? আড্ডার মধ্যে সুরূপার বার বার বাবার কথা মনে পড়ছিল। বাবাকে তো পুরী, এর সমুদ্র ভীষণভাবে টানত। পৃথিবীর মধ্যে সবচেয়ে নির্মম, নিষ্ঠুর দিক হল সমুদ্রই!

দরজায় ডোর বেল থাকলেও বাজল না। যেন টুকটুক করে ডোর বেল্টটা বারদুয়েক নড়ল। অপেক্ষা করে সুরূপা। আবার সেই শব্দ। উঠে এসে দরজা খোলে।

'ঘুমিয়ে পড়েছ?' ঘরে ঢুকেই ইন্দ্রর প্রশ্ন।

'বসো।' দরজা বন্ধ করে সুরূপা। 'এখনো বিছানায় উঠিনি, কোচটায় বসো।' নিজে সুরূপা আগেই বসে পড়ে।

ইন্দ্র কোচের এক প্রান্তে বসে পিছনে ঠেস দিয়ে।

সামনে বড় জানালার ঝকঝকে কাঁচের সার্শি দু'জনের দৃষ্টি বুঝিবা সমুদ্রের প্রসারিত আলো অন্ধকারে ধরে রাখে। দুজনেই কিছু সময় অন্যমনে নিশ্চুপ।

সুরূপা কথা শুরু করে। 'কলকাতায় তুমি বলেছিলে ইন্দ্র, সমুদ্রের ধারে বসে তুমি নাকি তোমার সব কথা আমাকে বলতে পারবে!'

'তোমার মা আমাকে বলতে বলেছিলেন!'

সুরূপা হেসে ওঠে। 'তোমার কথা না তা হলে!' ইন্দ্রকে লক্ষ করে।

ইন্দ্রও হেসে ওঠে। 'আসলে আমারই কথা। মা কেন যেন আমাকে সাহস দিয়েছিলেন।'

'ও।' সুরূপা বাইরের দিকে দৃষ্টি ফেরায়। 'আমাকে তুমি ভালোবাসো, মা সেই সাহসটুকু তোমার মধ্যে জাগিয়ে দিয়েছে! তাই না?'

'আপত্তি কোথায়? এখনি তো তোমাকে ডিসিসান নিতে হবে!'

সুরূপা চুপ করে যায়। দেখে, ইন্দ্র একটা সিগারেট ধরাতে ব্যস্ত। ইন্দ্র দেখতে সত্যিই সুন্দর। অত্যন্ত সপ্রতিভ। নাম করা বিজনেসম্যানের একমাত্র ছেলে। মায়ের পছন্দ ছিল। মায়ের তৈরি-করা বিষয় সম্পত্তির সঙ্গে একদিন তো ইন্দ্রর নিজের ব্যবসার ক্যাপিটাল যুক্ত হবেই। মায়ের স্বপ্ন কেমন আগ্রাসী। আর সুরূপা! বাবার খোঁজেই যেনবা বাহিরটাকে তন্ন তন্ন করে বুঝতে চেষ্টা করে। বাবা বাইরের কোন্ ডাকে এমন মাতাল হয়? কেন বাবা বারবার শুধু সুরূপাকে একবার দেখতেই ছুটে আসে ওর কাছে! সুরূপা কি বাবার বন্ধন,

নাকি এক অন্য মুক্তির স্বাদ! স্বদেশী পালাগানে, তার সুরে-কথায় বাবা কাকে খোঁজে, কোন সত্যকে ছুঁতে চান? দেশকে ভালবাসার না মুক্তির! বাবার নিজের লেখা পালাগান, তার সুর, লয়, তার স্বর যেন বাবার হাতে বাউলের একতারায় বিচিত্র সব সুর।

'কি! কথা বল?' ইন্দ্র যেন সচেতন করে সুরূপাকে।

'মায়ের দেওয়া সম্পত্তির ভার আমার কাছে বোঝা মনে হয় ইন্দ্র।'

ইন্দ্র নির্নিমেষ তাকায় সুরূপার দিকে। ঘরের নীল আলোয় ইন্দ্র নতুন করে দেখে। 'এত সম্পত্তি আর তোমার এত রূপ, সৌন্দর্য, সুরূপা, সব মিলে তোমাকে অনেক বড় জায়গায় নিয়ে যেতে পারে।'

সুরূপা এই মুহূর্তে কোন কথা বলতে পারে না।

'তোমার রূপ আমাকে পাগলের মত, আমার পুজো-আচ্চার মত করে সুরূপা। তুমি তো জানই তার সঙ্গে যদি সম্পত্তির ভরসা বজায় থাকে, তা হয় অন্য নিরাপত্তা।' একটু থামে। জোরে জোরে সিগারেট কয়েকবার টানে। 'তুমি আমার কাছে থাকো। নিজের সৌন্দর্যকে সম্মান দাও।' একভাবে তাকিয়ে থেকে বলে, 'তোমার এত রূপ সম্পত্তির উদারতাতেই আদিম।'

'আমি খুব ক্লান্ত ইন্দ্র।'

'কোণারকে এত মূর্তি দেখলে ভুবনেশ্বর, পুরীর মন্দিরের গায়ে এত সুন্দরকে জীবন্ত করে দেখলে। কোথাও ক্লান্তি দেখেছ? ভাস্করদের সাধনাতেও ক্লান্তি ছিল না।'

ফিস ফিস করে সুরূপা, 'এসবের শেষ ভোগেই। সম্পত্তির মত।'

ইন্দ্র যেনবা উত্তেজনায় সরে আসে সুরূপার কাছে। 'ভুল কথা, ভোগবিলাস আনে, সম্পত্তির উপরি দিকটাও বিলাস। দুটো মিলেই তো জীবন।

'আমাকে ভুলে যাও ইন্দ্র।' মাথা নিচু সুরূপার। স্বর ভারী।

চকিতে ইন্দ্র মাথা হেঁট সুরূপার মুখটা ওর মুখের দিকে ফেরায়, চুমু খায়। কয়েক মুহূর্ত। চাপা শ্বাস ফেলে সুরূপার ঠোঁট থেকে মুখ সরিয়ে, 'কথা দাও।' ফিস ফিস করে। 'আমার ভালোবাসায় কোন বাধা মানব না। বাধা থাকতেই দেব না।'

সুরূপা এরকমই এক ঘটনার দিক আঁচ করছিল সারাদিন একটু একটু করে। ইন্দ্র জোর চায়। কলকাতাতেও একা থাকার সময় এভাবে দুরন্ত হয়ে উঠত। নগ্ন মিথুন মূর্তিগুলোর সামনে ইন্দ্র অন্যরকম। সুন্দরকে জয় করতে চায়। নিজে অসাধারণ সুন্দর বলে? নাকি সেই পৌরুষের অধিকারবোধ?

'আমাকে কথা দাও।'

'থাক।' সুরূপা হঠাৎ উঠে দাঁড়ায়, 'আজ তুমি যাও ইন্দ্র, কিছু মনে কোরো না। তোমার কথা বরং কলকাতায় ফিরে গিয়ে নিও।'

ইন্দ্র কিছু সময় গুম হয়ে বসে থাকে। হঠাৎ উঠে দাঁড়ায়। 'ঠিক আছে, আমি কিন্তু...।' ইন্দ্র ধীর পায়ে বেরিয়ে যায় কথাটা অসমাপ্ত রেখেই।

দরজা বন্ধ করে সোজা বিছানায় উপুড় হয়ে শোয় সুরূপা। চকিতে মনে ভাসে সারাদিনের

সই আপ্তোক্তির প্রশ্ন, বিশাল সমুদ্র কি ওর নিজের উত্তর ঠিক করতে পারবে?

কুশল

হোটেল থেকে নিশীথ ইন্দ্র অপরূপ একটু আগে বেরিয়ে সমুদ্রের ধারে চলে আসে। সুরূপাকে নিয়ে কুশলকে সেখানে আসতে বলে। সুরূপা বেরুতে দেরি করছিল। কুশল একটু সময় অপেক্ষা করে ওকে নিয়ে হোটেল ছাড়ে। বালিতে পা ডুবিয়ে কিছুটা সমুদ্রের দিকে এগিয়ে আসার পর নিশীথদের ওরা দেখতে পায়। হাত নাড়ে কুশল সুরূপা দুজনেই।

'ওরা তো আমাদের দেখেছে। চল বরং ওপাশটায় কিছুটা ফাঁকা আছে, ওখানেই বসি।' কুশল থমকে দাঁড়িয়ে সুরূপার দিকে তাকায়।

'চলো। আজকের সন্ধের সমুদ্রটা আরো চার্মিং, তাই না?' সুরূপা সহজ হয়। নিজে নিজেই হেসে ওঠে। 'এমন সমুদ্র তো আজই প্রথম দেখছি সেই এখানে আসার পর।'

দুজনে ভিড় থেকে বরং আরও কিছুটা নির্জন পরিবেশ পেয়ে বসে পড়ে বালিয়াড়ির ওপর। মুখোমুখি।

সুরূপা কুশলের দিকে একভাবে তাকিয়ে থাকে। কলকাতায় কুশলই অনেক কথা বলত ওকে। সামলাতে পারত না সুরূপা। হাঁপিয়ে উঠত। আজ হঠাৎ এত চুপ কেন। একসময় হাতের মুঠায় বালি ভর্তি করে।

'আমি জানি, তুমি কেন চুপ করে আছ!' সুরূপার স্বর কটু শোনায়।

'তুমি জানো! কি?' কুশল সুরূপার দৃষ্টি ধরে রাখে।

'আমার মা মারা যাবার আগে তুমি বিয়ে করেছ।'

'কি করে জানলে!' কুশল যেন ডুবন্ত মুখটা তুলে শ্বাস নেয়।

'মা-বাবার পছন্দ করা।' সুরূপা যেন এক জিদে কঠিন কিছুটা।

কুশল ভিতরে নিঃসাড়, হতভম্ব।

'তোমার স্ত্রী মণিকা মাকে ফোনে জানিয়েছিল। তোমার মায়ের কথাতেই।' একটু থামে সুরূপা। সময় নেয়। 'তোমার মা তো আমার মায়ের পাতানো সখির মত। তাই না?' হাতের বালি সামনে ছড়িয়ে দেয় সুরূপা।

কুশলের হাতের সিগারেট নিভে গেছে। পাশেই ফেলে দেয়। বিড়বিড় করে, 'তোমাকে আমার কথাটা জানাবো বলেই এদিকে দুজনে বসেছি। ওরা কেউ জানে না। রেজেস্ট্রি বিয়ে।'

সুরূপা এই মুহূর্তে কোন অপরাধ দিয়ে কুশলের বন্ধুত্ব মাপতে চাইছে না। কুশলের গলার স্বরে কি ক্ষমা চাওয়ার চাপা আবেদন আছে? অন্যমনস্ক হয় সুরূপা। সামনে আছড়ে পড়া ঢেউয়ের ওপর সন্ধের অন্ধকার নামার এক গৈরিক বিষণ্ণতাকে অনুভব করে।

'আমি তোমাকে ভালবাসি আমার মা জানতো, তোমাকেই মা চেয়েছিল'। এ যেন কুশলের ধরা পড়ে যাওয়ার পর স্বীকারোক্তি।

'আমার মা-ও তোমাকে!' সুরূপা কুশলকে মুখর করতে চায়।

'তুমি তো রাজি হলে না। মায়ের ক্ষোভ দূর করতে আমাকে রাজি হতে হয়েছে

'আমার মায়ের তো ভয়ংকর চেষ্টা ছিল তোমার সঙ্গে আমাকে জড়িয়ে দেওয়ার।' থা সুরূপা। 'আমি মায়ের পক্ষে যাইনি, সে আমার অক্ষমতা।'

কুশল সোজা হয়ে বসে। কিসের অক্ষমতা?' থেমে থাকে। সময় নিতে নতুন সিগারে ধরায়। এক মুখ ধোঁয়া ছেড়ে বলে, 'তোমার তো কোন অভাব নেই!'

'এইটাতেই আমার ভেতর এ্যাডজাস্ট করার ক্ষমতা ছিল না। আজও নেই।' শেষ কথা স্বর চাপা।

উত্তেজিত হয় কুশল। 'তোমার বাবাকে আইডিয়াল কোরো না সুরূপা। বাবা অন্য মানুষ জোরে জোরে কয়েকবার সিগারেট টানে। 'মা যা করে গেছেন, তাকে স্বীকার করে নিতে হবে।'

বাবার প্রসঙ্গ উঠতেই সুরূপা কেমন দূরের হয়ে যায়। সমুদ্রের ঝোড়ো হাওয়া সুরূপা মাথার চুল এলোমেলো করে তোলে। পোশাক করে উদাসীন। বেশ কিছু সময় অবহেলা সরে থাকে দুজনের মাঝখান থেকে মূল কথাটা।

যেন সিদ্ধান্তে আসতে চাইছে কুশল। 'মা তো হঠাৎ চলে গেলেন, এবার কি করবে?

'আমি বিশাল সম্পত্তির ভার থেকে মুক্তি চাইছি।'

'তা হয় না। তোমার সম্পত্তি তো তোমার বেঁচে থাকার সিকিউরিটি।' প্রসঙ্গ সরা 'তুমি কি বাবার মত হারিয়ে যেতে চাও?'

'হয়ত।' সুরূপা যেন ভিতরে এক একাকীত্ব থেকে আচমকা শব্দটা বলে।

কুশল কী যেন ভাবে! কিছু সময় নীরব থেকে বলে, 'আমাকে কি তুমি এখনো ভালবাস?

'কেন!'

'আমার হয়ে তুমি আমার কাছে থাক সুরূপা।' এবার যেন তৈরি হয় কুশল নিজে মত করে। 'আমার স্ত্রী থাক তার মত। তুমি আমার বন্ধু হয়ে থাক। আজীবন। তুমি তো সংসার থেকে মুক্তি চাও। আমিও এত বন্ধন ভালবাসি না। এসো। তোমার-আমার সম্পর্ক সুন্দর পৃথিবী দেখার সুবাদে সম্পত্তির ভোগে পূর্ণ হয়ে উঠুক। কেউ জানবে না। আমাদের সম্পর্কে কোন সংসার নেই। অথচ পূর্ণ ভোগ আছে।' কুশল নিজের কথাগুলো গুছিয়ে বলতে পেরে মুক্তি বোধ করে।

বাবা এমন ঘুরে বেড়ানো সাংসারিক ছিল না কুশল। সুরূপার কথা ভারী গাঢ় শোনায় 'তুমি বিলাসের কথা বলছ!'

'হয়ত, বন্ধুত্বের বিলাস তো ভিন্ন স্বাদের।'

'দায়দায়িত্বহীন রক্ষিতাপালন?' চাপা স্বরে শব্দ কঠিন।

কুশল কথায় কিছু জড়ায়। 'আমি সে অর্থে বলছি না। তোমার সংসারহীন মুক্ত আনন্দে আমিও তো তোমার বন্ধুত্বের ভিক্ষার্থী। আমার স্ত্রীকে তুমি ভাবছ কেন?'

সুরূপা একেবারে নীরব হয়ে যায়। চারপাশের অন্ধকারে সুরূপা সমুদ্রের আসক্তিহীন তীরে আছড়ে পড়া ঢেউয়ের গর্জনের মধ্যে ক্রমশ সুদূর হতে থাকে। কেমন বিভ্রান্ত বো

রে।

'আমি তোমাকে এখনো ভালবাসি সুরূপা! আমাকে তুমি সেইভাবে তোমার কাছে থাকতে াও। দেখবে কোথাও বোরডম থাকবে না।'

কুশলের কথাগুলো সুরূপার কানে ঢুকছেই না। সমুদ্র বুঝি মানুষকে অন্তহীন বোবা রে রাখার সুযোগ আর শিক্ষা দেয়। সমুদ্রের কাছে কেনই বা এমন নিঃসাড় আত্মসমর্পণের প্রয়োজন চলে, সুরূপা জানে না।

অপরূপ

বিকেল গড়িয়ে আসার সঙ্গে সঙ্গেই আজ আবার মেঘ ঘন হতে শুরু করেছে তারা-ঝোলানো অসীম আকাশ আড়াল করে। দুরন্ত ঝোড়ো হাওয়ার রাক্ষস-নৃত্য। ঢেউগুলোর ওপর দলবদ্ধ হাতিদের দাপাদাপি।

কাল কলকাতায় ফিরে যাওয়ার দিন। আজ দুপুরে লাঞ্চের টেবিলেই ঠিক হয় সুরূপা যাবে না, বাকি ওরা চারজন সমুদ্রের ধার ও শহর জুড়ে শেষ আড্ডায় বেরুবে। সুরূপার নিজেরও তো কোন কেনাকাটা নেই! নিশ্চিন্ত সুরূপা নিজের ঘরে বসে। হঠাৎ ডোরবেল বেজে ওঠে। দরজা খুলেই ওদের বেয়ারা দীনুকে দেখে অবাক। 'কি ব্যাপার?'

'বাবু ডাকছেন।'

'বাবু!' কি বুঝে বিস্ময় আর চমক সামলে নেয়, 'বলো যাচ্ছি।'

সুরূপা বারান্দা ধরে সোজা এসে থমকে দাঁড়াল। অপরূপের ঘরে তালা দেওয়া নেই। ভিতর থেকে বন্ধ। ডোর বেল বাজাতেই দরজা খুলে যায়। সুরূপা ঘরে ঢুকতে ঢুকতেই বলে, 'তুমি যাওনি!'

'তোমার সঙ্গে কথা বলতেই থেকে গেলাম। বসো।' ভিতর থেকে দরজা বন্ধ করে অপরূপ।

সুরূপা অবাক হয় না। এরকম একটা সিচুয়েশান তৈরি হবে ও আগেই আন্দাজ করেছিল। কলকাতাতেই অপরূপ বলেছিল, কিছু কথা সমুদ্রের ধারে গিয়ে হবে। তারই প্রস্তুতি এখন। সুরূপা কোচে বসে পড়ে।

'তোমরা ফেরার টিকেট কেটে এনেছ। কাল সন্ধেয় যাওয়া।'

'মনে আছে।'

'বাইরে তো একসঙ্গে' কফি খাওয়া হল না। এখন খাবে?'

'হলে ভাল।'

'অবশ্য আগেই বলে দিয়েছি বাচ্চা-দীনুকে। এল বুলে।' অপরূপ সুরূপার থেকে দূরত্ব রেখে বসে পড়ে কোচের প্রান্তে। কোন নেশা নেই অপরূপের। অনেকটা সাত্ত্বিক মানুষ। মায়ের পছন্দ ছিল। পুরোপুরি বিলাসী মানুষ নয়। তাই মুক্ত ভোগে যেমন নয়, তেমনি নিরলস ত্যাগেও অপরূপের অভ্যাস ছিল না। মা ভাবত এরকম ছেলেকে সুরূপা নিজের

মত করে গড়তে পারবে, ছোটখাটো চেহারা অপরূপের। ব্রিলিয়ান্ট ছাত্র। ফিজিক্সে ফার্স্ট ক্লাস। কলকাতার নামী কলেজের স্থায়ী অধ্যাপক। কোন পিছুটান নেই। মায়ের সময়ে অসময়ে এরকম এক যুবকের কাছে আসা বড় জরুরি ছিল। অপরূপ কফির অপেক্ষায় কলকাতা থেকে আসা কালকের কাগজটায় যেন চোখ বুলিয়ে চলে। সুরূপা কিছু সময় ওকে লক্ষ করে যায়।

বাচ্চা দীনু দরজা ঠেলে ঘরে ঢুকে ওদের সামনের টেবিলে দুকাপ কফি রেখে বেরিয়ে যায়। অপরূপ কাগজ সরায়। 'নাও।'

সুরূপা কফির কাপ হাতে নিয়ে চুমুক দিতে শুরু করে।

'তোমাকে একটা খবর দি।' কফির কাপ হাতে নিয়েই বলে অপরূপ, থামে না। 'কলেজের চাকরিটা ছেড়ে দিয়েছি।'

'সে কি!' গরম কাপ-প্লেট হাতে ধরে থাকে সুরূপা। এতটা তো ভাবেনি। অপরূপের থেকে দৃষ্টি সরায় না।

'আমি যে ছাড়ব, তোমার মা কিছুটা আন্দাজ করেছিলেন বলেই মৃত্যুর আগে আমার আশা ভুলতে চেয়েছিলেন।' অপরূপ অন্যমনস্ক হয় কিছুটা।

সুরূপা এবার প্রসঙ্গটাকে খোলামেলা করে। 'তুমি কিন্তু এখানে আসার দু'দিন আগেও কলকাতায় তা ইঙ্গিত দাওনি রূপ!'

'হ্যাঁ ঠিকই, তখনো আমি তোমাকে চাইছিলাম। আমার মত করে।' উদাস চুমুক দেয় কাপে। 'চাকরি ছাড়লেও তোমাকে ভুলতে চাইনি।'

'এখনো আমি কিন্তু মায়ের বোঝার কথা ভেবেই সমান ক্লান্ত।' নিজের যুক্তি শোনানোর মধ্যে সুরূপার স্বর সুদূর হতে থাকে। 'তা দিয়ে আমাকে কেউ বাঁধুক তার জীবনপণ করে, আমি তা এ্যাডজাস্ট করতে পারছিলাম না রূপ। আগেও ব্যাপারটা অনেকবার বলেছি তোমায়।'

'তার থেকেও অন্য একটা কথা আছে রূপা!'

সুরূপা ঠাণ্ডা কাপটা ঠোঁটে ঠেকিয়ে কাপডিস টেবিলে নামিয়ে রাখে। নির্বাক থেকে দুচোখ উৎসুক হয় ওর। স্থির তাকিয়ে থাকে অপরূপের দিকে।

অপরূপ যুক্তি দেয়, 'তোমার বাবার এক গভীর বিষাদ তো ছায়ার মত তোমাকে ঘিরে জড়ানো থাকে। তুমি কিছুতেই তা থেকে বেরুতে চাইছ না রূপা। তা বুঝি।'

মায়ের উত্তরাধিকার তো তাঁর রেখে যাওয়া বিশাল সম্পত্তি! বাবার দিক থেকে—কী এটা ভাবতে ভাবতেই তো এদের সঙ্গে এই পুরীর ধারে এসেছে সুরূপা! অপরূপ কি তবে বাবার দিক থেকেই তাকে ভাবছে? বাবাকে ক্রমাগত হারিয়ে সুরূপার যে শূন্যতা, অস্বস্তি, হতাশা, এই একা হয়ে যাওয়া, এসব বুঝেও কি অপরূপ ওর কাছে থাকতে চায়? সুরূপা মুহূর্তে নিজের মধ্যে কিছু খুঁজে চলে।

'চাকরি ছাড়ার পরেও তোমার কথা ভেবেছি রূপা, নিজের মত করে।' অপরূপ যেন দম নেয়, তুমি তো গীতা পড়েছ। গীতায় বলেছে 'তানি সর্বাণি সংযম্য যুক্ত আসীত

'মৎপরঃ'—সমস্ত ইন্দ্রিয়কে সংযত করে নিজের চেষ্টায় নয় ঈশ্বরে সমাহৃত হয়েই মুক্ত হতে হবে। আমি বলি কি, ঈশ্বর প্রসঙ্গ বাদ দাও। 'ধ্যায়তে বিষয়াণ পুংসঃ সঙ্গস্তেষুপজায়তে/ সঙ্গাৎ সঞ্জায়তে কামঃ....' ঠিকই বিষয়ের চিন্তা করতে করতে আসক্তি আসে, আসক্তি থেকে কাম, কামনা...' মাঝখানে হঠাৎ থেমে যায় অপরূপ। 'আগে বরং বলে নি। আমার ইচ্ছে হরিদ্বারের দিকে একটা আশ্রম গড়ি। সেখানে তুমি আমার সঙ্গে থাক।

কেমন ছাড়া ছাড়া মনে হয় অপরূপের কথা। 'কি বলছ রূপ! আশ্রমে আমার সঙ্গে তোমার থাকার চিন্তা...। সুরূপার ভুল হয় যেন।

'ঠিকই। তুমি তো বাবার মত কঠিন নিরাসক্ত। বলছিলাম কি আসক্তি থেকে যে কামনা—যাকে কাম ভাবছ, তা তোমার মধ্যে থাকার নয়। আমিও মুক্ত। তুমি আমার কাছে আকর্ষণহীন হয়ে দেবীর মত থাকবে। তোমার এত লাবণ্য সৌন্দর্য আমার আশ্রমের শোভা হবে, আশ্রম জীবনে আমার শক্তি।

'আমার কাছে আমার বাবা তোমার ধারণা থেকে আলাদা রূপ।' সুরূপা নিজের মধ্যে ভার অনুভব করে। 'আমি তো তোমার কোন কাজেই লাগবো না।'

'মায়ের দেওয়া সম্পত্তি আমার হবে যদি তুমি আমার হও। তা দিয়ে বিশাল আশ্রম গড়ব নির্জন পাহাড়ের গায়ে। তোমার তো আর তাকে ভার মনে হবে না। তোমার তখন মুক্তজীবন। এটা তোমার পছন্দ নয় কেন!' অপরূপ সমর্থন ভিক্ষার ছলে স্বর সুরূপার বিশেষ অনুগত করে।

অপরূপের ঘরে সমুদ্রের দিকের জানালা খোলা। দুরন্ত হাওয়া ভারী গর্জন বয়ে নিয়ে যেন সারা ঘরের শান্তি ভাঙছে পাথর খণ্ডের মত। হঠাৎ দুজনেই চুপ। সুরূপা এর কি উত্তর দেবে। এসবই তো কলকাতায় কতবার যে ওর কাছে একা হয়ে বলেছে অপরূপ। আজ আবার সেই মায়ের দেওয়া বিশাল সম্পত্তি, টাকা পয়সাকে জড়াতে চাইছে ওকে কাছে টানার সূত্র ধরে। সুরূপা ভিতরে কিছুটা বিভ্রান্ত, বিহ্বল। বুকে চাপ অনুভব করে। হঠাৎ উঠে দাঁড়ায় সুরূপা। 'আমি উঠি রূপ।'

'আমার শেষ কথাটা তো এখানেই বলার কথা!'

'আমাকে একটু একা থাকতে দাও। তোমাকে পরে বলব।' দরজার দিকে এগোয়, 'চলি।' ভারী শ্বাস বুকে নিয়ে পিছন ফেরে। 'কিছু মনে করছ না তো!'

'না, না। এসো।' অপরূপ উঠে এসে ভেজানো দরজা খুলে দেয়।

সুরূপা ধীর পায়ে বেরিয়ে আসে। বারান্দার আলো বাতাসে কাঁপতে থাকে। সুরূপা এবার বুক ভরে ঝড়ের বাতাস থেকে শ্বাস নেয়।

সুরূপা

সমুদ্রের ওপর বৃষ্টি আর ঝোড়ো হাওয়া উথাল-পাথাল হওয়ায় ওরা পাঁচজন ডাইনিং হলে ডিনার তাড়াতাড়ি শেষ করে। খাওয়ার সময় নিশীথ, ইন্দ্র, কুশল, অপরূপ খোলামেলা

কৌতুকে ডুবে যায় নিজেদের মধ্যে। সুরূপাও সমান তালে ওদের সঙ্গে মেতে ওঠে। ওদের সামনে এত উচ্ছল সুরূপাকে কোনদিন দেখেনি ওরা। কিন্তু খাওয়া শেষ হলেই ওরা কেউ আর নিচে থাকে না। যে যার ঘরে চলে আসে।

সুরূপা নিজের ঘরে ঢুকে সঙ্গে সঙ্গে দরজা বন্ধ করে। কেমন যেন ফাঁকা মনে হয় নিজের ভিতরটা। একটা অদ্ভুত শূন্যতা ওকে গিলে নেয়। সেই সঙ্গে এক অশরীরী নিঃসঙ্গতা ওর মধ্যে শিহরণ তোলে। ওর কি দম বন্ধ হয়ে আসছে? এ থেকে নিজের সাময়িক মুক্তি খোঁজার জন্যেই একসঙ্গে আড্ডাটা সহজ করে নিয়েছিল। কিন্তু এখন। যেন নিজের ওপর কোন বিশ্বাস নেই। কোন নিয়ন্ত্রণও নেই। এই মুহূর্তে কেউ যেন ওকে বিছানায় গভীর অবসাদে আর ক্লান্তিতে শুইয়ে দেয়। নিশীথ, ইন্দ্র, কুশল আর অপরূপ—ওরা একে একে প্রত্যেকেই মায়ের দেওয়া অধিকারে সুরূপাকে চায়। মায়ের রাখা বিশাল সম্পত্তিকে আশ্রয় নির্ভরতাকে জড়িয়ে। অথচ সুরূপার মধ্যে তেমন কোন জোর নেই। এত দুর্বল। আমার বাবা সব ছেড়ে এখন কোথায়? সেই শূন্যতায়, একা হয়ে যাওয়ার মধ্যে এরা তো কেউ নেই। মা আমার কঠিন বন্ধন। বাবা? বাবা আমাকে টানেন। আমার পরম মুক্তি কি আমার বাবা! বাবা, তুমি কোথায়? তোমাকে নিজের মধ্যে দেখতে চাই, পেতে চাই বলেই তো এমন বেপরোয়া হয়ে সমুদ্রের ধারে এসেছি। তুমি কি সমুদ্রেই হারিয়ে গেছ? মায়ের সম্পত্তি তুমি ফিরেও দেখলে না। কেন? অভিমান, হতাশা, তোমার পালাগানের ক্রিয়েশান থেকে তা ছোট কৃত্রিম বলে। কেন তুমি আমাকে দেখতে ছুটে আসতে? আমি তোমার আর এক সৃষ্টি। এখানে তুমিই তোমার সৃষ্টি, আমি আর এক। আমি তোমার ভার নই, তোমার নতুন নতুন পালাগানের মত নিঃসঙ্গ, নিঃস্ব বিবেকশক্তির প্রতিরূপ? কেন যেন মনে হয় বাবা, আমিই বুঝি তোমার একমাত্র উত্তরাধিকার। যারা আমার সঙ্গে আছে, তাদের কেন বিশ্বাস করতে পারছি না! এরা বুঝি মাকে জড়িয়ে তোমাকে অসম্মান করতে চায়। আমার কেন যেন মনে হয়, বাবা, তুমি এখানেই আছো। মন্দিরে, ভ্রমণ বিলাসীদের মধ্যে নও, আশ-পাশে কোথাও! সুরূপা হঠাৎ উত্তেজনায় কেঁপে ওঠে। কিসে যেন ও সম্মোহিত হয়ে যায়। বাইরে সেদিনের সেই ঝড়, সেই বৃষ্টির দাপট আর সমুদ্রের লক্ষ লক্ষ প্রাগৈতিহাসিক প্রাণীদের গর্জন, আস্ফালন। সুরূপা ক্রমশ যেন চারপাশের আস্ফালনে একা একা এক সময়ে ঘুমের মধ্যে ডুবে যায়। ভিতরে এক বিষাদময় নিঃসঙ্গতায় আক্রান্ত হয়।

আচমকা ঘুম ভেঙে যায় সুরূপার, রাত এখন কত? এখন কি ভোর! হয়ত। এই বুঝি বেড়াতে যাওয়ার সময়। ডিনার খেয়ে আসার পর সুরূপা রাতের পোশাক বদলাতে ভুলে গেছে। শরীর ঢাকা নাইটি নেই, আছে শাড়ি। কিছু মুহূর্ত বিছানার ওপর বসে থাকে। ঝোড়ো বাতাস আর বৃষ্টির বেগ কম। সমুদ্রের আস্ফালন একই রকম। সমুদ্রের ডাকে বুঝি মোহ থাকে। কদিনে ও এই অভিজ্ঞতায় বুঝিবা ভিতরে স্থবির হতে থাকে। এক সম্মোহনী শিক্ষা ওর অভিজ্ঞতার শেষ কথা। দরজা খুলে সুরূপা বেরিয়ে পড়ে। সন্তর্পণে দরজা বন্ধ করায় ভুল হয় না। রাস্তা পেরিয়ে বালিয়াড়িতে পা ডোবায়। আকাশের বিপুল নক্ষত্ররাশি অন্ধ। চারপাশ অন্ধকার। গুঁড়ি গুঁড়ি বৃষ্টি আর শ্বাপদদের শ্বাসের মত শব্দ ওকে আচ্ছন্ন করে,

চুম্বকের মত টানে। একসময় জলে পা ডুবে যায়। থমকে দাঁড়ায় সুরূপা। সমুদ্র কিছু চায় না, কিছু নেয়ও না। তা হলে বাবাকে কি করে লুকিয়ে ফেলে। নদী ভাঙে গড়ার শর্ত রেখে। কিন্তু সমুদ্র তীর ভাঙে। শুধু ভাঙেই, এক একটা ঢেউ তার পৃথিবী শোষণের, স্থলের শোষণের শ্বাস-প্রশ্বাস দীর্ঘশ্বাসের মত। এত টানে জীবন্ত মানুষকে? সুরূপা কেঁপে ওঠে। পায়ের ঢেউয়ের ধাক্কায় ভয়ংকর শক্তি। শক্ত বালিয়াড়ি বাবা-মায়ের স্নেহের মত গলে যায়। এমন পা ধরে কারা টানছে ওকে! কি চায় ওর কাছে! হঠাৎ একটা বিশাল কালো পাহাড়ের সচল সবল টিলার মত ঢেউয়ের পাথর সুরূপাকে টানতে থাকে। সমুদ্রের ঢেউয়ে এত সুখ, এত আরাম! তাই এত সমুদ্র-স্নানের আয়োজন। আহ....

না, ফিরে আসে না সুরূপা, ওকে প্রবল আছড়ে ফিরিয়ে দেয় ভিজে বালির স্তূপে ঢেকে সিংহের কেশর বিছানো মাতাল ঢেউয়ের আগ্রাসনে।

সুরূপাকে নিয়ে পুতুল খেলার মত মেতে ওঠার প্রস্তুতি এবার অন্ধকার সমুদ্রের বুক জুড়ে।

গভীর অসুখ এখন

সুদর্শন সেনশর্মা

ভদ্রলোক কি বলবেন হেমেন্দ্র জানেন। হেমেন্দ্র তাই হন হন করে, যত তাড়াতাড়ি পারা যায় হাঁটছিলেন এড়িয়ে যাবার জন্য।

—এই যে মশাই শুনছেন? চলে যাবেন না...ভদ্রলোকও পেছন থেকে তাড়া করতে করতে আসছেন, চিৎকার করে বললেন—এই যে দিস্তে দিস্তে কাগজ, গ্যালন গ্যালন কালি এ নয়-ছয় না করলেই নয়?

হেমেন্দ্র অগত্যা রণে ভঙ্গ দিয়ে দাঁড়ালেন। চোখের পাতা দু'বার কাঁপেও। ভদ্রলোক হন্তদন্ত ছাতা বগলে দাঁড়িয়ে পড়েন, খুব যেন প্যাঁচ মারছেন তেমন গলায় বলেন কেন লেখেন মশাই অ্যাঁ? সাম্প্রতিক বা পুরাকাল কে ছোঁয়? আপনার লেখা? তাচ্ছিল্যের হাসি মুখময়—মহাকালের ছাঁকনিতে আপনার লেখা আটকাবে? তবে কেন...তবে কেন...কেন মিছে...এই...—এই রে, খেয়েছে ভদ্রলোক যে আবার রবিঠাকুরকে নিয়ে...

হেমেন্দ্র দু'চোখের পাতা যতখানি খোলা যায় তার থেকেও খানিকটা যেন বেশি খোলার চেষ্টা করেন, ভদ্রলোককে দু'চোখ ভরে দেখার মত দেখেন...তবু তো জিজ্ঞেস করছেন। হেমেন্দ্র ক্যামেরার সাটার বন্ধ করার মত দু'চোখের ঝাঁপ হঠাৎ বন্ধ করে ভদ্রলোককে মস্তিষ্ক গহ্বরে যেন ঠেলে দেবার চেষ্টা করেন। চোখ বুজলেও হেমেন্দ্র এখন তাঁকে দেখতে পাবেন।

—কি মশাই কথা বলছেন না যে...

হেমেন্দ্র আবার হাসেন মাথা দোলান। ঐ যে কবি বলেছেন না তুমি বাহির থেকে দিলে বিষম তাড়া...তারপর ড্যাশ ড্যাশ ড্যাশ...শেষে অন্তরে পাই সাড়া...

—আপনার খালি কথা! আপনাকে কে তাড়া দিচ্ছে মশাই। হেমেন্দ্র হাসেন। হাসতেই থাকেন। চোখ বন্ধ। চোখ বন্ধ করে হেমেন্দ্র কত দূরের জিনিস কত বেশি দেখতে পান ভদ্রলোকের জানার কথা নয়।

...যাচ্চলে আপনার আবার চোখবন্ধ রোগ আছে...বলে ফেলুন না...

এই তো বললাম—হেমেন্দ্রর মুখে হাল্কা হাসি।

—ওসব কথার কথা। আপনাকে তাড়াটা কে দিল শুনি?

তাড়া দেয়নি? আপনি এই যে বাসস্টপ থেকে তেড়ে এলেন...এটা তাড়া নয়? হেমেন্দ্র চেষ্টা করে যাচ্ছেন, তবে কি নাড়া বলব, নাড়া? ধরে নিন না মাঝে মাঝে ধাক্কায়, আচমকা নাড়া লেগে আমাদের ঘিলুও নড়ে যায়...

তখন হাত চলতে শুরু করে। তখন সে হাত যদি একটা কলম পেয়ে যায় তো সোনায় সোহাগা। টেবিলে রাখা শূন্য পাতায় অলখ মায়ার জগৎ থেকে ভালোলাগার কিম্বা রাগী শব্দব্রহ্ম কোন যাদুতে উঠে আসে বিশ্বাস করুন জানিনা।

—এই এই এখানে কি...একা একা দাঁড়িয়ে বিড় বিড় করছেন কি সেই দূর থেকে দেখছি হেমেন্দ্রর কাঁধে এক ঝাঁকুনি

—হেমেন্দ্র চোখ খুলে দেখলেন তাঁর সামনে দাঁড়িয়ে অফিসের প্যানেল ডাক্তার শ্রীপলাশলোচন পানিগ্রাহী তাকে আপাদমস্তক খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখতে দেখতে বলছেন ভাল লক্ষণ নয়...এখানে আপনি, কি ব্যাপার অ্যাঁ?

হেমেন্দ্র এখন মনে করতে পারছেন গত হরতালের দিন পলাশবাবু তার নিজের পুরোনো গাড়িটা নিয়ে অফিসে আসার পথে হরতালপন্থীরা তার গাড়ি আটকে দিয়েছিল। তারপর তিনি ডাক্তার পরিচয় দেবার পরও (তাঁর গাড়িতে কোন ক্রশ নেই) তারা তড়পে বলেছিল দূর ঢ্যামনা এমনিই কাজ করিস না...হরতালের দিন ভড়ং কাজ দ্যাখাচ্ছে...ন্যাকড়াবাজি...গাড়ি ঘোরা...

পুলিসের এক গাড়ি, দিলখুস এক পুলিসের গাড়ি তারপর তাকে সেদিন এগিয়ে দেয়...

সেই ডাক্তারবাবু রাস্তার একপাশে টেনে নিয়ে গিয়ে হেমেন্দ্রকে বললেন...এখানে কোথায়?

হেমেন্দ্র বললেন...আমিও সেকথা বলতে পারি। সেসব তবে থাক, গাড়ি কোথায়?

এখন পদব্রজে যাচ্ছি। হ্যাঁ হেমেনবাবু আমি বলি কি আপনার মন্ত্রশিষ্য বিশুকে একটু সামলান...একদম ভরাডুবি না করে ছাড়বে না...

কি। হেমেন্দ্র অস্ফুটে বলেন...চোখের সামনে দেখতে থাকেন ক'দিন ছুটির পরে ইন্দুভূষণ অফিসে ঢুকছেন...ঢুকতেই টাইপ মেশিনের আড়াল থেকে ফচকে গলায় বিশু বলল ইন্দুবাবু আর হিন্দু নেই...কে আবার ধুয়ো ধরার মত বলল কবীর ইন্দুভূষণ...

ইন্দুবাবু গজ গজ করতে করতে প্যানেল ডাক্তারবাবুর কাছে গিয়ে বললেন...আমার অপারেশনটার কথা হাঁটুর বয়সি ছেলেগুলোকে বলে দিলেন...

ডাক্তারবাবু যতই বোঝান...ইন্দুবাবুর আক্ষেপ কমছে না...একটু বাদে বিশুও ডাক্তারবাবুর ঘরে চলে গেল। ইন্দুবাবু রাগী গলায় বিশুকে বললেন...তুমি আবার এখানে কেন?

বিশু রাগিয়ে দিয়ে বলল...অপারেশন করাবো না ইন্দুদা...আপনার ওই অপারেশনটা সেই ছোটবেলায় হয়ে গেছে আমার...এই অবেলায় এই অপারেশন করিয়ে পরেরগুলো...খিক খিক হাসে বিশু কবে করাবেন এবং করবেন...তারপর গলা নামিয়ে...আমায় একটু অ্যাবডেক ড্রপ দিতে হবে ডাক্তারবাবু।

ডাক্তারবাবু জিজ্ঞেস করলেন—বাচ্চা কত বড় হ'ল?

ইন্দুভূষণ লাফিয়ে ওঠেন কি সর্বনাইশ...অর আবার ছেলে কিসের ডাক্তারবাবু...

আমার নয় চন্দনার বাচ্চা...বিশু গলা আর একটু খাদে নামায়।

চন্দনার বাচ্চার জন্য চন্দনা বলবে...

ইন্দুবাবু বাগে পেয়েছেন যেন এবার, মুখঝামটা দিয়ে বলেন ডেসপ্যাচের চন্দনার বাচ্চার জন্য তোমার এত মাথাব্যথা কেন...

ডাক্তারবাবু হাসেন...না হয় হ'লই...কাঁচা বয়স ইন্দুবাবু ব্যাপারটা নিয়ে এত হইচই কি

ভালো।

বিশুর কোথায় লজ্জা হবে...সে দু'গাল ফুলিয়ে হাসছে...রেগো না ইন্দুদা ছোটদের অপারেশন বুড়ো হয়ে করালে...এই হয়

—এই তুই থামবি...

ডাক্তারবাবু খুলেই বলি তবে...হাতিবাগান থেকে আমি একটা চন্দনা পাখির বাচ্চা কিনেছি...তার জন্য ভিটামিন...

এখন রাস্তার একপাশে দাঁড়িয়ে ডাক্তারবাবু হেমেন্দ্রকে বলছেন—একটা কথা জিজ্ঞেস করি। চামড়ার নীচে কি আছে বলুন তো...

হেমেন্দ্র বলেন কোথায় কী।

ডান হাতটা বাড়িয়ে দিয়ে পলাশলোচন হাতের চামড়া দেখিয়ে বলেন...এর নীচে...

পড়া ধরছেন, ভেবে এক সময়ের জীববিদ্যার মাস্টার হেমেন্দ্র বলেন ত্বকের নীচে ত্বক অধীনস্ত কলা, সাবকিউটেনিয়াস টিস্যু, ফ্যাট এইসব...

পলাশলোচন হাসেন...ওসব আপনাকে কে বলতে বলেছে এরপরে বলবেন ডিপ ফ্যাসা, মাসল...বোন...

...কি বলব তবে...হেমেন্দ্রর কেমন সব গোলমাল হয়ে যাচ্ছে

—পারলেন না তো পারলেন না তো বলতে বলতে হেমেন্দ্রকে ছাড়িয়ে খানিকটা চলে গিয়ে, যেতে যেতে মুখ ফিরিয়ে ডাক্তারবাবু বললেন...মৌলবাদ, স্রেফ মৌলবাদ।

ঘরে ফিরে ছোট বাচ্চাটাকে হেমেন্দ্রর গল্প বলতে হয়। সব পরিবারেই নিজস্ব গল্প থাকে। পুরুষানুক্রমে গল্পটা চলতে থাকে। তাদের এই গল্পটা এখন চারপুরুষের। সাড়ে তিন বছরের টাবুও গল্পটা শুরু করে এইভাবে লুনসি (রুনসি) গ্রাম, ঝালকাঠি থানা, জেলা বলিশাল (বরিশাল) বাঘ পলেছিল (পড়েছিল) শশী সেনের বাড়িতে। হেমেন্দ্রর বাবার তখন তিনবছর বয়স, তিনি তার বড়মা শশী সেনের স্ত্রীর কোলে বসে খাঁচায় বাঘ দেখেছেন। খোঁয়াড় পেতে বাঘ ধরা হয়েছিল ছাগলের টোপ দিয়ে। হেমেন্দ্র গল্প শুনেছে পিতামহের কাছে...হেমেন্দ্রর ছেলে শুনেছে হেমেন্দ্রর বাবার কাছে...হেমেন্দ্রও এখন বলে। সম্বুদ্ধর একটা বইএ এ ঘটনার বর্ণনা আছে হেমেন্দ্রর এক গোলন্দাজ জ্যাঠামশাই-এর গোলাবারুদ সহ...গল্পটা বাঘের গরু নিয়ে পালিয়ে যাওয়া দিয়ে শুরু করতে হয়...গল্পে এক ক্ষেত্র ধোপাও থাকেন না থাকলেই টাবু ভুল ধরবে...গল্পটা শেষ হবে বাঘটাকে গুলি করে মেরে...নদীতে ভাসিয়ে দিয়ে...ক্ষেত্র ধোপারা বাঘকে হিয়াল বলত কেন...সেটাই টাবুকে বোঝান যাচ্ছে না...এই যেমন হেমেন্দ্র তার মাথার ভেতরে ঝনঝন শব্দব্রহ্মের উৎসারে ক্ষেত্র ধোপার চিৎকার বুঝি এখন স্পষ্ট শুনতে পান...ঠাকুর্দা হিয়ালে আমার গরু নিল...হিয়ালে গরু নিল...

টাবুর গল্পের ভাড়ারে হালে একটা সত্যিকারের শেয়ালের গল্পও ঢুকেছে। এমনিতেই টাবুর ভয়ডর কম। একমাত্র রাতে হেমেন্দ্র মফঃস্বলের ভাড়াবাড়ির পেছন দিকের মাঠপুকুর পেরিয়ে বাদাড়ে যখন শেয়ালরা গান শুরু করে...তখন ঐ শেয়াল ডাকছে বললেই টাবু

বিছানায় উঠে বালিশ নিয়ে শুয়ে আঙুল চুষতে চুষতে বলে...বাবা আমি পেণ্টুল খুলব না...প্যান্ট নিয়ে তবে শেয়াল পালিয়ে যাবে হ্যাঁ...বাবা প্যান্টপরা শেয়ালের গল্পটা বলবে...

গল্পটা হেমেন্দ্র বছর দুই আগে চৈত্র অমাবস্যায় পেয়েছিলেন। আগের অফিসের সামন্তবাবু জবরদস্তি তার বাড়ির অকাল কালীপুজোয় ধরে নিয়ে গিয়েছিলেন। অনিচ্ছায় আজকাল মানুষকে কতকিছুই তো করতে হয়। হেমেন্দ্র বাড়ি না ফিরে কালীপুজোয় গিয়েছিল...এ গল্পের শিরোনাম অবশ্যই শৃগালের বস্ত্র। মধ্যরাত পেরিয়ে গেছে ঘন্টা দুই আগে...আরতির সময় হৃষ্টপুষ্ট পুরোহিত বললেন সামন্তবাবু কালী মহাদেবের তো সবই আছে...কিন্তু শৃগালের...

সামন্ত বললেন...কী

শৃগালের বস্ত্র লাগবে...

বলেননি তো আগে...এখন কোথায় পাব...মূল্য ধরে নিন...

একটা বিশেষ কারণে আপনি এই পুজো শুরু করেছেন...এর কোন খুঁত আমি চাইনা...অবিনাশের তো ফর্দে লেখার কথা শৃগালের বস্ত্র...লেখেনি?—পুরোহিত বললেন ফর্দে নেই...সামন্তর বেশ রাগী গলা...এত রাতে এখন কি করব...দক্ষিণায় ধরে নিন

...তা কি হয়...

কিছুক্ষণ নানা মত বিনিময়। তর্কাতর্কি...কথার মারপ্যাঁচ। সামন্তবাবুর বড়ছেলে পুরোহিতকে বলল—জেঠু কালকেই আমি একটা P_3 জাঙ্গিয়া কিনেছি—পরিনি...আপনার শেয়ালের হবে...

—হবে না কেন হ'তেই হবে...বাবা আমার শেয়ালের নয়...মায়ের শেয়াল বল...ওভাবে বলতে আছে...মা কালীর শৃগাল বলে কথা...কত সাইজ বাবা?

আটত্রিশ...হবে না? হেমেন্দ্র স্পষ্ট দেখেছিলেন জেঠির আড়াল নিয়ে সামন্তর ছেলে হাসছে...

পুরোহিত মশাই দু'মুহূর্ত ভাবেন...বলেন হবেনা কেন—খুব হবে...কোমর খুব মোটা নয়...

সামন্তর বড়ছেলের পাতলা প্লাস্টিকের মোড়কে নতুন সবুজ রঙের জাঙ্গিয়াটা পুরোহিত হাতে নিতেই কে একজন বলে উঠল ঠাকুরমশাই জাঙ্গিয়াটা আপনার শেয়ালটাকে পরাতেই হবে...কুমোররা অসুরকে যেভাবে জামাকাপড় পরিয়ে দেয় সেভাবে...

পুরোহিত বলছে...পুজোয় ব্যাঘাত করিবেন না...

হেমেন্দ্রর মনে হচ্ছিল সভ্যতার, সৌজন্যের, মনুষ্যত্বের আবরণ মানুষ যখন দ্রুত খসিয়ে ফেলছে...বলতে কি একদম বিবস্ত্র হয়ে যাচ্ছে...তখন শয়তান রক্তচোষা শেয়াল লজ্জা ঢাকতে বস্ত্র চাইছে...ভেরি গুড। প্লিজ মেক এ নোট অব ইট...

হেমেন্দ্রর কেন এমন হয়। সে কি স্রোতের বাইরে। মাথার ভেতর জলকল্লোল...কেন এই বিদ্যুৎক্ষরণ...অস্থির পদচারণা...সে কি সত্যি তবে...ঘোর লাগা হেমেন্দ্র হাঁটতে হাঁটতে কলকাতার রেলস্টেশন সংলগ্ন বড়রাস্তার এক গলিমুখে মন্ত্রমুগ্ধের মত দাঁড়িয়ে পড়েন। তার কলকাতা বাসের প্রথম যুগের আবাসগৃহ। কত সুখ-দুঃখের সাথী। মালিকানা হাতবদল হয়েছে। পুরোনো বাড়ির খোলনলচে পাল্টে বসতবাড়িটা 'উৎসব' নাম নিয়েছে। বাহাদুর! নতুন

আমদানি? বেরিয়ে এসে লোকটা চারদিকের বাতাস শুকে, চরাচর একদম শেয়ালের মত মেপে নিয়ে বলল...ঘর নেবেন নাকি দোতলায়? বাবু আসার আগে...অল্পেই পাবেন...একঘন্টায় আপনাদের কাজকাম শেষ হবে তো? দেড়শো থাক থাক একশো টাকায় করে দিব তবে। সঙ্গে আছে তো...হেঃ হেঃ ঠিক ধরেছি কোথায় দাঁড় করিয়ে এলেন তবে তাকে...প্লাটফর্মে?

হেমেন্দ্রর টালমাটাল অবস্থা, ঘোর ভেঙ্গে যেন বলেন কি বললে আর একবার...হেমেন্দ্র হাত তুলে চড় মারতে যাচ্ছিলেন...পিঠে একটা খ্যাঁচ ধরল...হাতটা কাঁপতে শুরু করল...তুমি তুমি...ভে...বে...ছ কি এ বাড়িতে কতকাল...

ভাগ্যিস হা রে রে করে আলতাফ, ফুলমণিরা নেমে এসেছিল। ফুলমণির হাতে ধরা ব্রাশ সে রঙের মিস্ত্রি...ওপরে রঙ হচ্ছে। কাঠের মিস্ত্রি আলতাফ বুড়ো হয়ে গেছে...সে চিৎকার করে বলল বাহাদুর তোর জিভ ছিড়ে নেব...কাকে কি বলছিস আমাদের না হয় চালচুলো নেই...কিছু মনে করবেন না সার...ইতনা গন্ধা আদমি আমাদের বলেছে...বাবু নেই...একটা ঘর তোরা নিয়ে নে...এক দো ঘন্টে...

(২)

ইন্দুভূষণ শব্দজব্দ করতে করতে মুখ ফিরিয়ে বলল হেমবাবু মূর্তি ভাঙ্গল ভাড়ুয়ারা কোথায় যেন? হেমেন্দ্র বেশ ছিলেন এতক্ষণ...বিশু ফুট কাটল এই বিদ্যেয় শব্দজব্দ?...তালিবান তালিবান এখন আপনার জাতভাই।

—এই তুমি চুপ কর তো...হেমবাবু স্টেটটার নাম কি?

হেমেন্দ্র বললেন বামিয়ান...তার চোখের সামনে অমনি ধেই ধেই করে সামন্তর জাঙ্গিয়া পরা শেয়ালটা নাচতে নাচতে উঠে এল...তখনই একটা গুহা থেকে জাতক গাথার শ্রেষ্ঠীরা শলাপরামর্শ করতে করতে এগিয়ে যাচ্ছিল—শেয়ালটা থমকে দাঁড়াল। শেয়ালটা সেই ক্লাস এইটের বয়েজ স্কুলের ম্যাজিকের মত তখন হঠাৎ ভ্যানিশ...শেয়ালের গর্তটা হয়ে গেল দস্যু অঙ্গুরিমালের গুহা...অঙ্গুরিমাল ছুটে আসছে...ছুটে আসছে...চোখ বুজে হাতের তেলোয় অফিসের টেব্‌লে মাথা নামিয়ে দিতে দিতে হেমেন্দ্র স্পষ্ট দেখলেন দস্যু অঙ্গুরিমাল মোল্লা মহম্মদ ওমরের কানে কানে কি বলছে...নেপথ্যের শব্দ, ধ্বনি এখন হেমেন্দ্রর কানে স্পষ্ট নয়...বিশু যেন বলছে ইন্দুদা হেমদাতো প্রতিবাদী মিছিলে হেঁটেছেন...আর মশাই আপনি...।

হেমেন্দ্রর আবার সেই পুরোনো কষ্টটা মাথায় থাবা বসাচ্ছে...তলিয়ে যাচ্ছে সে...ইন্দুভূষণ বিশুকে বলছেন পলিট্রিক্সের কি বোঝ তুমি ছোকরা...

বিশু বলছে ওটা পলিটিক্স...ইন্দুদা ট্রিক্স নয়।

খুউব বুঝি ইন্দু স্যার শুইনবেন...সকালে যে তেলেভাজা বিকেলে সে রাধাবল্লভি। ধরুন সন্ধ্যায় যে বেগুনি সকালে সে ফিস ওরলে...দিল্লি থেকে ফিরলে। সকালে যে সোজাসাপ্টা নির্বিরোধী বিকেলে সে মহা ঘোটপন্থী। এবেলা যে পালের ভেড়া বিকেলে সে বিদ্রোহী। সকালের প্রগতি ভায়া শেষ বিকেলে প্রতিক্রিয়ার ডান হাত। সকালে যে দাদার মুঠোয় বিকেলে

সে দিদির ভাই...আপনি শালা ইন্দুভূষণ হিন্দু নন...একানড়ে মোল্লা মহম্মদ ওমরের দোস্ত...

বিশু ভালো হচ্ছে না কিন্তু...

চন্দনা হাসি চাপতে চাপতে বলল...ছিঃ বিশুদা আপনি আবার ইন্দুদাকে...কত সিনিয়র...

তুমি আর তাল দিও না চন্দনা। অ্যাবডেক রহস্য আমি জানি—ইন্দুভূষণের গলায় অভিমান।

চন্দনা কিছু বুঝতে না পেরে ফ্যাল ফ্যাল করে তাকিয়ে থাকে।

বিশু হাসতে হাসতে বলল হাতিবাগানের চন্দনা পাখির জন্য অ্যাবডেক ড্রপ চেয়েছিলাম।

ইন্দুভূষণ চোখ মটকে বললেন...কোন চন্দনা পক্ষী তুমিই ভালো জানো...

বিশু নাচারের মত বলে ড্রপের আর দরকার নেই পাখিটা ফুড়ুৎ...

চন্দনার চোখ বড় করা অবাক দৃষ্টির দিকে ফিরে বিশু বলল ডাক্তারবাবুও পোর্ট্রেট আঁকাতে বাড়ি ডেকে নিয়ে কম জব্দ করেননি চন্দনা...বসে আছি বসে আছি কোত্থেকে একটা ল্যাপ ডগ নিয়ে এসে খাটে বসিয়ে দিয়ে বললেন...এরই পোর্ট্রেটের জন্য...

সবাই এমন হাসতে শুরু করল...এখনও হাসি আসে? মাথায় যন্ত্রণা বাড়ছিল হেমেন্দ্রর হাসি তো নয় হাসি তো নয় সশব্দে যেন কোন ইমারত টলে উঠল...ঝুরঝুর করে কিসব ভেঙ্গে পড়ছে। হেমেন্দ্র দেখেন পৃথিবীর উচ্চতম ভাস্কর্যের মূর্তি দুটি বিস্ফোরকে ভূলুণ্ঠিত। হেমেন্দ্রর চরাচর দুলছে—কোশলরাজ বিরূধক কপিলাবস্তুর হত্যাযজ্ঞ সমাপনান্তে সেই বাড়িটার সামনেই দাঁড়িয়েছেন...'উৎসব' গৃহের বাহাদুরের হাতে চাবি সে ঘর খুলে দিচ্ছে... হেমেন্দ্র বেশ বুঝতে পারেন ব্রাহ্মণ্যবাদের সেই পুরোনো পাপে আজ হিন্দুয়ানির ভড়ং। সেই প্রেতাত্মাই আজ গৈরিক ভূত...চওড়া কাঁধ খুজছে, কাঁধে চাপতে চাইছে।

'উৎসব প্রাঙ্গনে দাঁড়াতে গিয়েই এই বিপত্তি। পেছন পেছন লোকটা না এলে হেমেন্দ্রর কি আর এত সব দেখা হত। খুব একটা ঘোরের মধ্যে সে স্টেশনে এসেছিল, ট্রেনে উঠেছিল। অফিসের কেউ নয়। রাস্তার কেউ নয়। কেউ কিন্তু বুঝতে পারেনি লোকটা অসুস্থ। লোকটা সত্যি পড়ে যেতে পারে। সে সোজাই ছিল। সোজা হাঁটছিল। আসলে সত্যি সত্যি সোজা তো কেউ নেই। আছে? ব্যক্তিত্বের সংকটে, আত্মিক দৈন্যে ক্রমশ বেঁকে যাচ্ছে এই অবয়ব...কোশলরাজ ছুটে যাচ্ছেন অঙ্গুরিমালকে ছুঁতে অঙ্গুরিমাল ছুটে যাচ্ছে মোল্লা মহম্মদ ওমরকে ছুঁতে...মসজিদ ভাঙ্গছে...ভগবান বুদ্ধের অনুপম মূর্তি টুকরো টুকরো হয়ে যাচ্ছে হিংস্র ধর্মান্ধতায়। ধর্মযাজককে পুড়িয়ে মারা হচ্ছে...ট্রেনে আগুন লাগিয়ে দাঙ্গার পটভূমি তৈরি করা হচ্ছে...মানুষ মানুষকে পুড়িয়ে মারছে, কুপিয়ে মারছে...ধর্মঘাতকরা আড়াল থেকে বেরিয়ে রাজপথে উঠে পড়েছে...

পলাশলোচন ঠিকই বলেছেন যতই গায়ে সাবান দাও—চামড়ার তলায় মৌলবাদ...ধর্মান্ধ ঘাতকদের হাত ধরাধরি করেও কেউ তাই পরম ধর্মনিরপেক্ষ, চরম পরধর্মসহিষ্ণু...বুদ্ধকে ভাঙ্গো। বোধকে ভাঙ্গো। মনুষ্যত্বকে পদদলিত কর। টেনে হেঁচড়ে বিবস্ত্র কর সৌজন্যকে, পরহিত চিন্তাকে টেনে নামাও, পরমার্থ হবে। হয়??

দরজা খুলে বহু রাতে আঁৎকে উঠে স্ত্রী বললেন—একি তোমার কি হয়েছে?

বড় ছেলে বুঝল না বলে উঠল বাবা রবিঠাকুরের কপালটা ঠিক করতে পারছি না, করে দেবে...জানো বাবা...

রেবা তাঁকে ধরেন, ধরে চৌকাঠ পার করে ঘরে ঢোকান।—বাবাকে বিরক্ত কোর না বাবু...দেখছ না...

হেমেন্দ্রর যেন মনে পড়ে বড়র আজ বসে আঁকা ছিল...যেতে তো পারেননি...কোলকাতায় বড্ড দেরি করেছেন।

নেপথ্য থেকে ছেলে তাও বলে বাবা ফার্স্ট হয়েছি...জানো শেষমেশ আর রবিঠাকুরকে আঁকিনি...

কেন? কেন? বললাম যে, তোমাকে দেখিয়ে দিলাম। বড় বিষণ্ণ শোনায়, ক্লান্ত শোনায় গলা...রবিঠাকুরই তো বাবা আমাদের শ্রেষ্ঠ ঠাকুর...আমাদের স...ও..ব।

শেষ সময় স্যার যে বল্লেন ভগবান বুদ্ধকে আঁকো।

—খুব সোজা বাবা। চোখে মনি দিতে হয় না। মাথায় টোপর পরিয়ে গোল্লা গোল্লা স্যার নীচে লিখে দিয়েছেন ধ্বংসের বিরুদ্ধে...

জল হাতে নিতে গিয়ে, জল খেতে গিয়ে সত্যিই সত্তার সংকট। পড়ে যেতে যেতে কোনক্রমে সামলালেন।

হেমেন্দ্রর মৃত্যুর কুশীনগর। পেছনের মাঠ ছাড়িয়ে বাড়ির উল্টোদিকে ওটা তো পুকুর নয় আর, আজ ওটা হিরণ্যবতী নদী। হেমেন্দ্র কি রামাভার স্তূপও দেখতে পেলেন? হেমেন্দ্রর ছোট ছেলের ভাল নাম আনন্দ। টাবু না ডেকে হেমেন্দ্র বললেন, গৌতমের শেষ অনুরোধের মত বললেন...আনন্দ হিরণ্যবতী নদী থেকে একটু জল...

টাবু কিছু বুঝতে পারেনি...সে বলল বাবা শেয়ালটা কি আসবে...প্যান্টপরা শেয়ালটা...

তলিয়ে যেতে যেতে হেমেন্দ্র দেখলেন পি-থ্রি জাঙ্গিয়া পরা সেই শেয়ালটাকে...মুখে রক্তের দাগ...কাঠকয়লা হয়ে যাওয়া ট্রেনের কম্পার্টমেন্ট থেকে লাফিয়ে নেমে...দাঙ্গাবাজদের সঙ্গেই শান্তি মিছিলে...

বুকের ভেতর সব কেমন গোলমাল হয়ে গেল হেমেন্দ্রর মাথা একদিকে হেলে পড়তেই রেবা কেঁদে উঠলেন...টেলিফোনের দিকে ছুটে গেলেন ডাক্তারকে ফোনে ধরবেন বলে...দেরি হয়ে গেছে...

ভূমিপুত্রের নির্বাস

অজয় চট্টোপাধ্যায়

পটে চা ভিজছে। অতসী কাপে চা ঢালতে ঢালতে মুখ না তুলে মুখ খুলল।

—সকাল সন্ধে বছর বছর অফিস ঘসটে তাহলে কী করলে।

প্রখ্যাত আমলা দৃষ্টি খুইয়ে বলরাম বোকা বোকা চোখে তাকায়।—কী করার ছিল।

—সফলতার শিকে ছিঁড়তে মাঠ ফাঁকা পড়ে থাকে না। ঠাসাঠাসি ভিড়। দীর্ঘ লাইন। ইঁদুর দৌড়ে নিজেকে সেঁটে দিতে হবে। মিত্রবাবুকে দেখে শিক্ষা নাও।

প্রসন্ন সকাল। চায়ের আসর। দিনের গোড়ায় মেজাজ ফুরফুরে থাকে। বলরাম লঘু গলায় বলে,—জয়ের রিলে রেসে আমি নেই। তার চেয়ে ছুটে যাব কারবালা প্রান্তরে। গাইব ইনটারন্যাশনাল 'জাগো পরাজয় বন্দী' ভারতবাসী।

—আশ্চর্য। সবকিছু নিয়ে ইয়ার্কি। থোক কয়েকটা বছর শ্রেণী-হিংসার পথে হেঁটেছ। অথচ ইনটারন্যাশনাল নিয়ে মজা করছ। কী যে তোমাদের ধাত। বুঝি না।

—বোঝ না বলেই তো তোমায় সম্বর্ধনা দিতে ইচ্ছে করে। বসাব না-কি ঘরোয়া সভা। তারিফ ছলে রঙ্গ করছে। অতসীর চোখ ড্যাবড্যাবে হয়। ঠোঁট উল্টে শুধোয়। ঠিক ধরতে পারছি না সাধুবাদ না তোষামোদ। প্রশংসা আমি উপভোগ করি। তোষামোদে গা গুলোয়।

—আরে না না সত্যি আই এপ্রিসিয়েট ইউ। রবীন্দ্রনাথ জীবনানন্দ মানিক সতীনাথ ফুকো মার্কস হেগেল প্রমোশন বস মজুরী মুনাফা শ্রম বিচ্ছিন্নতা—আমাদের কত কী আছে। বিষয় নিয়ে ব্যক্তি নিয়ে কাঁটাছেঁড়া করি। জ্ঞান আসে না। বোধ নষ্ট হয়। রস পাই না। তৃপ্তি ভো কাট্টা। তিক্ততা বাড়ে। বন্ধুত্ব আলগা হয়। অতসী চূড়ান্ত উত্থান করে তার গ্রীবা। বলে,—আফসোসের শৌখিনতা। মুদ্রাদোষের বিষণ্ণতা।

—জীবনানন্দ ঝাড়ছ।

—ইয়ার্কি নয়। সাত বছরের মধ্যে মিত্রবাবু সল্ট লেকে জমি কেনা বাড়ি করা সব সেরে ফেলল। তোমরা সেম ব্যাচের। অথচ তুমি ভাড়াটে হয়ে পচ্ছ। প্রতিযোগিতার বাজারে মাটি কামড়ে পড়ে থাকতে হয়। সফলতা কি এমনি আসে। মগডাল থেকে পাড়তে হয়। অতসী দেখল বলরাম কেমন হয়ে যাচ্ছে। ঘোর ঘোর। ওর এই এমনি করেই যায় যদি দিন যাক না, গড়িমসি ভাবে ঘা দিতে হবে। চাপ-ই হচ্ছে ওষুধ। গরমে রাখতে হবে। তবে যদি জাগে। বলরামকে তাতায় অতসী।—রগড়ে রগড়ে যেটুকু উঠেছ ভাবছ ঢের উঁচুতে আছ। আত্মতুষ্টির ঘোর, হবে না। রক্তে বইছে শূদ্র বীজ। কথায় আছে; ঘি দিয়া ভাজ নিমের পাতা,/তবু না যায় তার জাতের তিতা— । রোষ উগরায় অতসী। ক্ষোভ প্রকাশের ক্ষণে অতসীর মধ্যচল্লিশ প্রচুর মাই যুগল কাঁপল। তা নজর করে বলরামের মনে এলো আজ মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহ। অর্থাৎ রোমান্স গড়ার রাত।

বলরাম কলহ এড়ায়। অতসী গলগল করে বিদ্বেষ ঢালছে। জংলা কখন পোষ না-

মানে,/সদা মন তার কেওড়াবনে।

অবশ্য মাঝে বলরামের ঈষৎ প্ররোচনা ছিল। ও বলেছিল যা পেয়েছি। পাচ্ছি। তা খাট করো কেন।

প্রতিক্রিয়া হিসেবে অতসী রুদ্র রূপ ঝলসায়। এ সেই রূপ—বলরামের কাছে প্রতিপন্ন হয় যে রূপ ভালবাসা দিয়ে ঘৃণা দিয়ে নাড়াচাড়া করার উপযোগী। বলরামের বুকে চাবুক পড়ল। মুখে এক পোচ কালি ছিটিয়ে দিল অতসী।

—আর্বান সোসাইটি আর্বান লাইফ ওসবে তোমার চাহিদা নেই। বলরাম উদাস হয়। তার মন এই পরিবেশ থেকে উড়ে যায় অন্য এক প্রেক্ষিতে।

নেই। নেই। নেই-এর রাজত্বে সুন্দর ঘাস আছে। উপবন আছে। বিন্যস্ত আদল সংরক্ষণে নিযুক্ত আছে ওড়িয়া মালি। ওরা কাজ করে। সবুজ বাগিচা পাকদণ্ডীর মত বেড় দিয়ে মোজাইক চত্বর। গাছের গুঁড়িতে বাঁধান বেদি। কংক্রিটের নকল গুঁড়িও আছে। আর আছে অনেকটা অন্তর অন্তর লোহার পায়া দেওয়া কাঠের বেঞ্চি। পশু-পাখির বসতি এবং মলমূত্র খালাসের আস্তানা হিসেবে যেন ব্যবহৃত না হয় তার জন্য প্রহরায় আছে মজুর। বিহারী। ওরা কাজ করে। ফলে গোটা অঞ্চল ঝকঝকে তকতকে। বিশ্রামের প্রেরণা আসে। পরিপাটি আয়োজন। হলে কী, বিবিধ দৃষ্টিকোণ থেকে পার্কটা নাগরিক পরিষেবা থেকে বঞ্চিত। উপেক্ষার বলি। মধ্য দুপুরের এই পার্ক উপেক্ষিতের ভারে আচ্ছন্ন।

এমন পার্ক। বড় নিঃসঙ্গ প্রেমার্থী সংকলন নেই। স্বাস্থ্যবিলাসী অমনিবাস নেই। বিনোদন সন্ধানী কল্লোল নেই। অথৈ শান্ততার প্রেক্ষিতে বেঞ্চের লোহার পিঠে হেলান দিয়ে অতসী তিরিশ, বলেছিল,—ভেবে দেখলুম তোমার সঙ্গে পরকীয়াই আদর্শ সম্পর্ক। টেনে হেঁচড়ে বিয়ে অবধি নিয়ে যাওয়া বোকামি।

বলরাম চমকে ওঠে।—সে কী। জোট বাঁধব বলে তোড়জোর শুরু করলাম। ঠিক হল বন্দরের কাল আর নয়। আর মুসাফির নয়। এবার পাততাড়ি গুটিয়ে ঘরকন্নার দিকে চলো হে—। এখন কেঁচে গণ্ডুষ। পালটি খাচ্ছ। পারো বটে।

অতসী থ। ঘাসের শীষে দাঁত কাটছে।

বোঝাপড়ার ভিত শক্ত। গোছগাছের দিক থেকে স্বনির্ভর। অন্দর-বার গোটা পরিস্থিতি বাগে। নীড় প্রেম প্রবল। এমন সন্ধিকালে একী ক্যাকড়া! বলরাম হতবিহ্বল।

নীরবতা মোচন করে অতসী কবরে শেষ পেরেক ঠুকছে। —নিজের সঙ্গে নিজে অনেক তর্ক করেছি। আবিষ্কার করলুম আমার দিক থেকে ভালবাসার অন্য কেন্দ্র আছে। তোমাকে ভালবাসার চেয়ে যার ধার আরো শক্তিশালী। সতীনের ছায়ায় মাখামাখি হয়ে তিষ্ঠোতে পারবো না। আমায় তুমি দয়া করো—।

বলরাম হাল ছাড়ে না। খড়কুটোর আশ্রয়ে ভাসতে চায় এই বলে,—বড় আশায় ছিলাম এবার গাঁটছড়া বাঁধব। লাভ করব স্থায়ী স্থিতি স্থায়ী শান্তি। আশ্রয়।

অতসী বাধা দেয়। হাস্কি গলায় বলে—দ্যাখ স্থিতি বল শান্তি বল আশ্রয় বল কেউ কাউকে দিতে পারে না। ওসব অতিকথন। যার চারা মোহে। এমন যে নাটোরের বনলতা সেন—সেও শান্তি দিতে পেরেছিল মাত্র দুদণ্ড।

গ্রহণগ্রস্ত সূর্যের মত বলরামের মুখ পাণ্ডুর। ধাঁধার ধূম্রজালে চিন্তা আলুথালু। কাঁদকাঁদ মুখে বলে,—কিছুই স্পষ্ট হচ্ছে না অতসী। খোলসা করো।

অতসী অনর্গল হয়।—থেকে থেকে মনে হয় তোমার প্রতি আমার আসক্তি একমুখী নয়। ওত পেতে আছে আর এক অংশীদার। তোমার চেয়েও যার প্রতি আমার টান আরো এক ধাপ উঁচু।

—কে সে। আর্তি উথলোয় বলরামের প্রশ্নে।

বলরাম খাবি খাচ্ছে দেখে অতসীর মায়া হয়। ভেবেছিল আরো খেলাবে। খেলাল না। ছিন্ন করল রহস্য। ঘোষণা করল।—তার নাম আলস্য। তোমার সঙ্গতার চেয়েও আমার কাছে প্রিয় আলস্য উপভোগ। সংসার মানেই ঘরকন্না। ঘরকন্না মানেই রাঁধাবাড়া খাওয়া। বাচ্চা পালন। গৃহস্থালী মানেই বিপণন কেন্দ্র। বিস্তর আয়োজন। চাহিদা জোগান নিয়ে কানামাছি খেলা।

বলরামের বুক হাল্কা হয়। অনুভব করে কথা কাটাকুটির এই সফরী বেশ মনোজ্ঞ। দুপুর চিত্রের রোদে মুখ ঝলমল করে।—ধরতাই বুলি আওড়াচ্ছ। পুতুল নাচের ইতিকথা থেকে ঝাড়া।

—তোমার কাণ্ডই ঐ। উদোর পিণ্ডি বুদোর ঘাড়ে চাপান।

অপ্রতিভ বলরাম। একদিনের না কামান খরখরে গালে হাত বোলায়। দোনামনা স্বরে শুধোয়।—রেফারেন্স ভুল হচ্ছে।

—তা নয়তো কি। পুতুল নাচের ইতিকথা নয় মশাই। দিবারাত্রির কাব্য থেকে ঝাড়ছি। স্বস্তিতে বলরামের মুখ প্রসন্ন হয়। তৃপ্ত স্বরে বলে,—তাই বল। উৎস তো এক। মানিক বাঁড়ুজ্যে। যাই বলো ধার করা বুলি ছেড়ে উপলব্ধির চর্চা যে কবে করবে। ঠেস। অতসীও আক্রমণাত্মক খেলে।—কোট করলে মহাভারত কিছু অশুদ্ধ হয় না। আমরাই তো কাঁচা মাল। এইসব মালমশলা জোগাড় করে বোধ ও বুদ্ধির রসে জারিয়ে লেখকরা চরিত্র বানায়। গড় ও বিশেষ চরিত্র গড়ে। বাজারে আসে। মুদ্রিত কাঠামোতে আমরা আমাদের খুঁজি। খুঁজে পেলে লেখাটা উতরোয়। এই যোগাযোগটা হয় বলেই সাহিত্য পাঠে এতো রস। আমি পড়ি। তুমি পড়। সে পড়ে।—কথা হচ্ছে সাইকোলজি এবং সেক্সোলজি নিয়ে মানিকবাবুর যে ক্লিনিকাল টেস্ট—পড়ার সময় মনে হয় তা অনবদ্য। মজা হচ্ছে বাইরের খোলা হাওয়ায় এলে মাথা গুলোয়। মনে হয় বাস্তবে চরিত্রগুলোর খোঁজ নেই। খুঁজে খুঁজে সন্ধান না পেয়ে অবসাদ আসে। মনে হয় সমাজ থেকে উঠে আসা নয় লেখকের অন্তর্লোকেই চরিত্রের বসবাস।

বলরামের আপত্তি কুলোর বাতাসে উড়িয়ে দেয় অতসী। যুক্তি ফরোয়ার্ড করে। —শিল্পের ধর্ম আনন্দদান। মনোরঞ্জন নয়। শিল্পীকে তাই খেলার জিনিস না বানিয়ে নিজেকে খেলতে হয়। আসলে পড়ে পাওয়া কিছু ধাঁচ কিছু চেনা পরিবেশ কিছু গড় অভিজ্ঞতা মাথায় ঠাসা আছে। জটিল এবং বিরল অভিজ্ঞতা যে মাথায় ঢুকবে জুড়ে বসবে কোনও বাতাবরণ নেই। অথচ শিল্পকলার রস আস্বাদনে উপভোগের মোদ্দা সর্ত হচ্ছে ঃ Suspension of disbelief.

যুক্তিতে কে এগিয়ে কে পিছিয়ে সে তর্ক বাঁজা । ধর্তব্য হচ্ছে : অতসী ছিল বুদ্ধিবাদী।

আজ যুক্তিচর্চা প্রবাসে। টিকে আছে আফসোস সর্বস্বতা। ও কেন এটা পেল। আমি কেন পেলুম না। পড়শী কন্টকী। শুধু তাই নয় বোধের খাল বেয়ে এদ্দুর পার হয়ে এসে এখন কিনা জাত তোলে।

শেকড় টেনে ছিন্নভিন্ন করছে। তাতে কি। এর চেয়েও নিষ্ঠুর অপমান বারবার সহ্য করতে হয়েছে। সর্বশেষে গত সন্ধ্যা। বস কৃষ্ণান দশটার ফ্লাইট ধরবেন। দরকারি কাগজপত্র তাঁর হাতে তুলে দিতে হবে। তিনি সেগুলো ব্রীফকেসে পুরে সল্টলেকের বাড়িতে যাবেন। চেঞ্জ...ডিনার...এয়ারপোর্ট...। প্রতিটি কাজের জন্য বরাদ্দ সময় হু হু করে অবক্ষয় হচ্ছে। বিষম তাড়ায় কৃষ্ণানের প্রাণ গৃহগত।

উত্তীর্ণ গোধূলিতে জন্মভূমি পঃ বাংলা যখন উদাসী হাওয়ায় আন্দোলিত তার জাতপাত সংঘাতে দারিদ্র-বৈভব বিভাজনে নিরক্ষরতা—বৈদগ্ধ্যের অদ্ভুত গদ্যময় বৈপরীত্যের পূর্ণ অবয়ব নিয়ে—

বলরাম দেখল কৃষ্ণান রাগে ফাটলেন।—ওয়ার্থলেস। ইউ ব্লাডি বেঙ্গলি—।

বলরামের ইচ্ছে হয় শুয়োরের বাচ্চাকে পেড়ে ফালা ফালা করে খেরোয় খাতায় ঢুকে রাখা বোঝপড়া চুকিয়ে দি।

কিন্তু কিছুই করে না বলরাম। মাথাটা তার নুয়ে আসে :

আরো অন্ধকার দাও, আরো আরো আরো।
যত পারো শর্বরী আমার
দাও, দাও, অতলে নামার
অপূর্ব সুযোগ...।

সব সওয়া যায়। সওয়া যায় না ভেতরের আক্রমণ। বাহ্যমনের তলদেশে চেতনার যে অন্য এক স্রোত বয় তার পরিচয় পেয়ে বলরাম কাতর।

।। ২ ।।

গুণে বশীভূত মানুষের মন-বলো না মিথ্যা আমার কাছে;
সেই বস্তুই তাহাকে টানিছে, যেখানে যাহার মনটি আছে।
সার নাই যার, তাও হরে মন, সারবান পেলে নয়ন রোজে;
দেখ না মুক্তা ছাড়িয়া শবর, বনে বনে শুধু গুঞ্জা খোঁজে।

—সমর্ন।

বাতাসের প্রকৃতি এমন যে শোণিতে শোণিতে রিক্ততার একপ্রকার কষ্টের শূন্য অনুভবে বুকটা কুরকুর করে। পীড়া ঠেকা দিতে বলরাম সিগারেট ধরায়। ধোঁয়ার অলস রিং-এ চোখ রাখতে সহসা বলরামের চোখ থমকে যায়। একটা মশা গালকর্ষণে রত। ঠাঁই বড় অস্থির। এই এইখানে পরক্ষণে অন্য কোনখানে। বলরামও ঠ্যাটা। যেতে নাহি দিব। ফটাস শব্দ হল। থাপ্পড়ে বধ হল মশা।

উপন্যাস পাঠে মগ্ন। বুকে বালিস পাছা ওথলান কাঠাম চঞ্চল হয়। খর দৃষ্টি। ঝাঁঝাল স্বরে বলে,—মারলে কেন?

বলরাম পাঞ্জা মেলে ধরে। অনেকটা জায়গা জুড়ে রক্তের ছোপ। সেদিকে তাক করে বলে,—রক্তশোষক। খালি মাদী চামড়ার দিকে ছোঁক ছোঁক। দিয়েছি আহ্লাদ ঘুচিয়ে, নাক সিটকে চোখ মটকায় অতসী। পাঠের ঘোর ছিন্ন। অতসী বই মুড়ে সরিয়ে রাখে। শরীর আলগা করে। ভাঁজ ফেলে ফেলে আয়েসী মুদ্রায় চাঙ্গা হয়। ভারী শরীর গুছিয়ে জাঁক করে বসে অতসী। বসেই খেদ করে।—সন্তু তোমার ভাই। ওকে প্রতিষ্ঠা করবে। পুঁজি ঢালবে। ওর ভালমন্দ দেখবে। আমার কিছু বলার নেই। তা বলে ভাই গোঁ ধরল আর তুমি ষাট হাজার প্যাকেজ ডিলে রাজি হয়ে গেলে। সামন্ত কোচিং কি চাকরির চাষ করে! চাকরি তো বসে আছে মগডালে। পাড়তে পারবে?

প্রত্যয়ী জবাব দেয় বলরাম।—পারবে গো পারবে। দেশে এখন গর্ভসঞ্চার চলছে। যখন বিয়োবে গান্ধারীর গো-হারা হার ঠেকায় কে। ভারতবর্ষে সাত লক্ষ পাঁচ হাজার গ্রাম আছে। প্রত্যেক গ্রামে অন্তত একটি নলকূপ এবং একটি কম্পুটার প্রশিক্ষণ সেন্টার বসানর লক্ষ্যমাত্রা ঠিক করেছে সরকার। শত শত লক্ষ লক্ষ কোটি কোটি কম্পুটার ছড়িয়ে যাবে স্কুল কলেজ রেঁস্তোরা দোকানে। ব্যাঙ্ক এল আই সি ডাক তার রেল সার্ভিস সেন্টারে। হাজার হাজার লাখ লাখ কোটি কোটি চালক চাই। কী বুঝলে?

এফেক্ট উপেক্ষার। অতসী পাছা ঘুরিয়ে বসল।—সাত মন তেল পুড়বে। রাধা নাচবে না। দাতব্য করার ইচ্ছে করো। মচ্ছব মেটাতে আমার সংসারটা না ছারখার হয়।

আত্মপক্ষ সমর্থনে অতসীকে থামায় বলরাম। ব্যাখ্যায় বিশদ হয়।—আসলে এটা আমলাদের দুর্দশা। বিচ্ছিরি পরিবেশের ধকল সামলে তেতে খাক হয়ে বাড়ি ফিরে যত রাগ ঝাড়ে বাড়িতে। মেজাজটা হয়ে থাকে চৈত্রের খড়। দাবি ঠেকালেই দাউ দাউ করে জ্বলে ওঠে। তখনই হিসেব চাগাড় দেয়। আয়ের উৎস এক। ব্যয়ের বিস্ফোরণ বহুমুখী।

ঠেস। বউ যে জোগাড়ে নয় তা নিয়ে খোঁচা। অতসী বলল,—রোজগেরে বউ না পেয়ে তুমি যে ক্ষুব্ধ তা জানি। কিন্তু আমি যা তা জেনে বুঝেই নিয়েছ। এখন কেন আফসোস!

তর্কের ধর্ম অপরকে জব্দ করা। বলরাম তর্কের ধর্ম পালন করে। গলা চড়ায়। —স্ত্রীকে অফিসজীবী হতে হবে আমি তা বলতে চাইনি। বলতে চেয়েছি স্ত্রী মানে সহধর্মিণী। ধর্ম মানে বৃত্তি। তোমার বৃত্তি যে এক হতে হবে তার কোনও মানে নেই। দৃষ্টান্ত অন্য অফিসারদের স্ত্রীরা। তারা ক্লাবে যায়। পার্টিতে যায়। কেউ গায়। কেউ নাচে। অনেকেই নাচতে বা গাইতে কোনটাই জানে না। কথা বলতে জানে। হাবভাব জানে। ভোলাতে জানে। সুযোগ বুঝে সেটাই কাজে লাগায় বসদের তাক করে। স্বামীর প্রয়োজনটা বাগায়।

যায় কোথায়। চকিতে আমলা ঘরণীর খানদান যায় চুলোয়। তেড়ে আসে।—ছি ছি স্বামী হয়ে স্ত্রীকে বলছ রাতপরীদের মত ছলাকলা শিখতে। বাঁকা কোমরে হাত রাখে। সংহার আদলে। পোটোপাড়ার মহিলা স্বরূপিনী। শরীরী খাঁজ উদ্ধত।

রাগ হওয়া সত্ত্বেও মূর্খ বিক্ষোভে বলরাম ফাটে না, গোপন বীজ আজ মাসের দোসরা। অর্থাৎ ঝুঁকি বিরহ পর্ব। একাকার ভোগ ভোগ ইসারা উপেক্ষা করে কোন কালিদাস।

অতএব রক্ষণাত্মক খেলল।—চাকরি আছে। দাদনকারীরা ওত পেতে আছে। ঘুরঘুর করছে খদ্দের টানতে—লোন ঢালতে। যন্ত্রসুখ আমদানি হবেই।

রণসজ্জার দাপাদাপিতে অতসীর মুখশ্রী উগ্র। সন্ত্রাস ঝুড়ি চাপা দিতে বলরাম উদ্যত। নির্ঘাত অস্ত্র ছাড়ে। শব্দের বাণ। মর্মভেদী খবর। খবর পড়ছে বলরাম।—এমন ঝগড়াঝাটি শুরু হয়ে গেল বলি বলি করেও খবরটা পাড়তে পারছি না। ফল বেরিয়েছে। সাত জন সিনিওরকে টপকে আমার প্রমোশন হয়েছে।

পরিবেশ মোড় নেয়। তথ্যের তুকতাক। অতসীর উদ্যত ফণা তন্দ্রালস। অবাক দৃষ্টি বিস্তার করে শুধোয়,—তুমি কি গো। এমন খবরটা চেপে রাখতে পারলে। গুরুজী ঠিকই বলেন ধর্মের কল বাতাসে নড়ে। সবই গুরুর কৃপা। বলে অতসী কপালে জোড়হাত ঠেকায়।

ধর্মের কল বাতাসে নড়ে না। বাতাসে ধোয়া তুলসীও ওড়ে না। তুমি তো জান না অতসীরানী আমার সফলতা অনেক বক্র খেলা সূক্ষ্ম ফাউলটাউল—যা নাকি সফলতার স্বরলিপি সেসব প্রয়োগের ফসল।

বস্তুতান্ত্রিক আকর্ষণে অতসী নিকটতম। ভাসন্ত মুখ। আদরের নৈবেদ্য। বলরাম প্রত্যক্ষ করল প্রসাধন বিরহ মুখশ্রীতে সময়ের থাবা প্রকট। কলঙ্কের আঁক। তা হোক। ব্যবহার যোগ্যতা অনবদ্য।

একদিকে টান অন্যদিকে অন্য এক ধরনের অনীহার দ্বন্দ্বমূলক ক্ষণ। এমন এক কষ্টের সন্ধিক্ষণে বলরামের উপলব্ধি হয় ধর্মাধর্ম জাতপাত নিরিখে সংখ্যালঘু-গুরুর যে বিচার পদ্ধতি, বিভাজন—তা মূলত ভ্রম। অপভ্রষ্ট ইতিহাস চেতনা। আসলে ভাবুক চরিত্র মাত্রই কোনও না কোনও স্তরে সংখ্যালঘু।

স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে দানা বাঁধছে সমৃদ্ধ ঘোর। ঘোর ছিন্ন হয় পুতুলের জাঁকজমকপূর্ণ হাজিরায়। ভীষণ তড়বড়ে। হাঁফ ছেড়ে প্রশ্ন তোলে,—আমরা কবে স্টার্ট দিচ্ছি বাপী।

আত্মজা পুতুল বিংশতি। সর্বাঙ্গে লেপটে আছে মেঘ-রোদের বিষণ্ণ উচ্ছলতা। মায়ের দৃষ্টি শাসন পাত্তা না দিয়ে লক্ষ করল বাবা থ। বুঝল বাবার কাছে ব্যাপারটা ডার্কে। বুঝেই এস্তে দৃষ্টি ফেলল মায়ের মুখে।—মা বাপীকে বলনি ঠাম্মা ইল। ভষ্ম দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে অতসী। মুখে উচ্চবাচ্য নেই। ভাবখানা স্বর্গের যেমন সিঁড়ি নেই মেয়ের কথার তেমনি উত্তর নেই।

হতবিহ্বল বলরাম অতসীর দৃষ্টি থেকে পাঠ নেয় খবরাখবরে কাঁচি চলছে। বলরামের জিজ্ঞাসু দৃষ্টি তাক করে পুতুল হাট করে রহস্য।—কদিন আগে কাকামণি ফোন করেছিল। ঠাম্মা ইল। খবরটা প্রচার করে খুশিতে হাততালি দেয়।—কী মজা! নদীর পার।—আমকাঠালের বাগান—কয়েদবেলমাখা—দাদাভাই দিদিবোনেদের নিয়ে হুল্লোড়। আঃ—ধারাভাষ্য থামিয়ে দেয় অতসী।—আহা মজার কি ছিরি। বাড়ি বাড়ি টো টো। চকাস চকাস কয়েতবেল চোষা, বন বাদাড়ে ধেই ধেই, পুকুরঘাটে প্যাচাল। মাথাভর্তি উকুন, বুকে সর্দি, গায়ে চামড়া রোগ—তবে না ষোল কলা পূর্ণ। ন্যাস্টি তপসিলি আদিখ্যেতা।

—তুমি যতই লক্ষ্মণগণ্ডী আঁকো দাবায়ে রাখতে পারবে না। আমি যাব। যাবই যাব।

জেদী মেয়ে। শাসন কব্জে পাবে না, পুতুলের যা স্বভাব, আগুপিছু ভেবে অতসী চুপ মেরে যায়। কথা কাটাকাটিতে স্থগিতাদেশ। স্তব্ধতায় খাক খাক হচ্ছে ক্ষণ। বাহুল্য অবসর ভরাট করতে শরীরে মোচড় দেয় অতসী। দু হাত তুলে মাথার পেছনে আনে। বিভঙ্গে মাছের

আকৃতি আসে। দ্রষ্টব্য হয় উদম বগল। ব্রা বিযুক্ত আলগা জামায় বুক ব্যাপক হয়। ভলাপচুয়াস আবেদন।

বলরাম চোখ সরাবে কি স্থির রাখবে সন্ধিক্ষণে অতসী ত্রস্ত হয়। হেঁসেলে কিছু একটা ধরে গেছে। গন্ধ নাকে আসতে চকিতে গা ঢাকা দেয় হেঁসেলে। হেঁসেল সামলে ফিরেও আসে চটজলদি। সমগ্র অবয়বে রাঁধুনির ছাপ। ভ্যাপসা গরমে সেদ্ধ হচ্ছিল, ঘামজর্জর ত্বক শুকতে পাখার নব ঘুরিয়ে চরম বেগে ছেড়ে দেয়।

হাঁকুপাঁকু মাকে উদ্দেশ করে পুতুল আবদারে ঝুলোঝুলি করে।—তুমিও চলো না মা। দারুণ জমবে।

চোখের ওপর ভর করে নরক দর্শনের ছবি। আতঙ্কগ্রস্ত চোখ কপালে তোলে অতসী। বলে,—আমি? উঃ মাগো—। শিরশিরে গা ঝাপটা দেয় যেন গায়ে কাঁটা ফুটছে।—কাঁচা টয়লেট, দরমাঘেরা বাথরুম। কুয়োতলায় বাসনমাজা। লম্ফ জ্বেলে রান্না, তোলা উনুন। হ্যারিকেন আলোয় পিড়িতে বসে পঙক্তি ভোজ। মশামাছির কিলবিল। অবিমৃষ্য গ্রামীণ জীবনের ফিরিস্তি ছড়িয়ে রি রি গায়ে মাথা ঝামটায় অতসী।

স্বভাব ধর্মে পুতুল ছটফটে এবং স্ববশ। প্রতিবাদে মুখর হয়।—যাবে না যাবে না। তোমার মর্জি। অপবাদ ছিটোচ্ছ কেন। তুমি বেশ ভালই জান কাকুদের সেই অলক্ষ্মী দশা ঘুচে গেছে। সেফটি পায়খানা, ঘেরা পাকা পেচ্ছাবখানা, বিদ্যুত, ফ্যান, পাকা বাড়ি, গ্যাসে রান্না হয়। টি ভি আছে। কেবল নিয়েছে। ফ্রীজ আছে। পাম্পের জল। ফোন বসেছে। তোমার ঐ সব বিবর্ণ অভিজ্ঞতা ভরা থাক স্মৃতি সুধায়। বলে, পুনশ্চ করে,—কাকা কি আর সেই কাকামণি আছে। ভাবছো মাল ঠোঙায় ভরে খদ্দেরকে দিচ্ছে। ভুলে যাও। দাদুর করা সেই মুদিখানার ভোল পালটে গেছে। বাসস্ট্যাণ্ডের গা ঘেঁসে একটা হোসিয়ারী হয়েছে। সে কাকা আর নেই। শুধু ধনী নয় মানীও বটে। অঞ্চল প্রধান।

—থাম। তোকে আর ওদের হয়ে গাওনা গাইতে হবে না। আহা ভাষার কি ছিরি। তখন থেকে পায়খানা পেচ্ছাবখানা করে যাচ্ছিস। টয়লেট ইউরিনাল বলতে জিভে কি ফোস্কা পড়ে? কাঁড়ি কাঁড়ি টাকা ঢেলে নিজের সখ আহ্লাদ জলাঞ্জলি দিয়ে টানা হ্যাপা পুইয়ে নামী ইংলিস মিডিয়াম পড়ান বৃথা। ছাইতে ঘি যোগান দেওয়া। হবে না। ধাত পেয়েছে বাপের। হাটুয়া নদী, হাট না গেলে মন করে ছটফটি।

ঠুকছে। পুতুলও পাল্টা দাবড়ায়।—মা কৈশোর বঞ্চনার খেদ যে কী তুমি বুঝবে না। কাকুর বাড়ি মানেই কৈশোর জীবন উপভোগ। মস্ত সুযোগ। আমি লুটেপুটে ভোগ করতে চাই। তোমার মনে জং ধরেছে। তুম বুডঢা বন গিয়া। ইউ হ্যাভ লস্ট।

জল তাড়নায় পুতুল ঘর ছাড়তেই অতসী গাঁক গাঁক করে।—দেখলে মেয়ের চোপা। দু দিন বাদে যে মেয়ে বিয়ের মণ্ডপে বসবে তার কথার কি ছিরি। এই চোপা নিয়ে সংসার করবে। বউ পোড়ানি শাশুড়ির কি আকাল চলছে। যার জন্য নিজের সাধ আহ্লাদ সব গোল্লায় দিলাম—সেই কিনা শাসায়। বেইমান—।

যেতে যেতে পুতুল শুনতে পায়। থমকায়। দ্বিধা ঝেড়ে ফের ঘরে ফিরল। অতসীর ঠোঁট আর ফাঁক হওয়ার অবসর না দিয়ে ঝাঁঝিয়ে উঠল।—ভুল ধারণা আঁকড়ে আছ মা।

স্নেহ প্রীতি ভরণ পোষণ আত্মবঞ্চনা যাই বলো না কেন একটা স্তর ডিঙোলে বাড়াবাড়ি করলে তা আর বাৎসল্য বা পরার্থ থাকে না। সন্তান তখন কমোডিটি হয়ে যায়। পজেস মোহ দানা বাঁধে। সন্তানের জন্য আত্মসুখের বিলোপ ওসব ছেঁদো তত্ত্ব। বৈরাগ্যের প্রচ্ছদ আর কিছুই নয় অহং-এর রকমফের। মনোবিকলন। তুমি আমার জন্য অনেক করেছ। মানছি। আবার এটাও সত্যি যে প্রথমদিকে তুমি ছিলে বধূত্বে আন্তরিক। ক্রমে মাতৃত্বই হল তোমার সার্বিক চরিত্র। তোমার যাবতীয় দাতব্য তারই সুদসমেত জরিমানা।

অন্তর্গত আলোড়নে পুতুল স্তম্ভিত। প্রকাশ অপ্রকাশের দ্বন্দ্বে বিভোর। অবশেষে দ্বিধার অবসান, ঘোর ছিন্ন। ক্ষিপ্র পায়ে এগিয়ে আসে পুতুল। মায়ের বুকে তর্জনি ঠেকিয়ে বিষ ঢালে,—বিয়ে? বিয়ে আমি করব না পস্টাপস্টি তা বলে দিচ্ছি।

হতবিহ্বল অতসীর চোখে চোখ রেখে সরলার্থ করে,—বিকজ ইউ ইউ দ্য কজ। কিছুটা বিশ্লেষণে অনেকটা উপস্থাপনে বেশ স্বকীয়। ঐতিহ্যের ধারাবাহিকতার বিচারে, বিচ্ছিন্ন। বলরামের দৃষ্টিতে তারিফ। অতসীর প্রতিক্রিয়া হিংস্র। অগ্নিগর্ভ দৃষ্টিতে ধেয়ে যায়। সাংস্কৃতিক উপবীত খসায়। মেয়েকে দেওয়ালে ঠেসে ঝাঁকুনি দিতে দিতে তড়পায়।

—কী...ই যা করেছি সব নিজের দিকে তাকিয়ে! যার হাতে নাইন্সি খেলি পরলি তারই মুখে ঝাড়ু! বইয়ের কটা পাতা মুখস্থ করে বড় বড় বুলি।

গায়ে হাত। পুতুল তড়িতাহত। হতচকিত। বিরল ঘটনা। বিরল ঘটনা ফের ঘটল। দৃশ্য দূষণ সহ্য হল না। তেড়ে এল বলরাম। এ যাবত যা করেনি তাই করল। অতসীর চুল মুঠিতে চেপে দেওয়ালে ঠোকে।

—ছি ছি। তুমি গায়ে হাত তুললে। অতসী বিস্ময়ে নিনাদিত।

বলরাম অনুতপ্ত নয়। প্রত্যয়ী। হাত অবশ্য গুটিয়ে নেয়, বলে, —এই প্রথম কিন্তু শেষ নয়। মেয়ের গায়ে হাত উঠলে তোমার গায়েও হাত উঠবে। এতই যদি ক্রুট পোয়াতি হয়েছিলে কেন?

অতসীর আস্ত শরীর ফুঁসছে। কিছু একটা বিরাট ঘটার অপেক্ষা। ঘটল না। বহু নিতম্ব ধারক সোফায় ধপাস করে অতসী তার বিশাল পাছা ভর রাখল।

অতসী প্রস্তরীভূত। শোকগ্রস্ততাই কারণ নয়। বিস্ময়ে বিহ্বল। শিশুকাল ছাড় দিলে মেয়ের গায়ে হাত তুলল আজ প্রথম। বলরামও তার গায়ে হাত তুলল আজ প্রথম। ব্যক্তিগত দিক ছাপিয়ে যে জিজ্ঞাসায় ভেতরটা উথালপাথাল তা হচ্ছে : শিক্ষা রুচি ধৈর্যর বিপুল প্রস্তুতিতে গড়া যে সাংস্কৃতিক গঠন তেমন কোনও আঘাতে যে কোনও মুহূর্তে সেই সব মহার্ঘ নির্মাণ আলুথালু হয়ে যেতে পারে—কোনও সারকুলার জারি ছাড়াই। জীবন এমনই রসিক এবং ধৃষ্ট। সাংস্কৃতিক কাঠামোর কি আদৌ কোনও পোক্ত জমি নেই? রাগ বিদ্বেষ ছাপিয়ে অদ্ভুত এক প্রশ্ন অদ্ভুত এক বিপন্নতা অতসীকে আচ্ছন্ন করে।

ঘোর ছিন্ন হলে অতসী সংহার মূর্তি ধারণ করে।—মেয়ে আমার। আমার মেয়ের ভালমন্দ ভেবে যদি আমি আমার মেয়ের গায়ে হাত তুলি তাতে তোমার অত জ্বালা কিসের—।

ভঙ্গি উদ্ধত। যুক্তি বিন্যস্ত। বলরামের বুকে চাবুক পড়ল। আমার মেয়ে আমার মেয়ে বলে ওকি ঘোষণা করে চিহ্নিত করতে চাইছে আমি পুতুলের জনক নই। পালক। জনক

এবং পালক—উভয় শব্দের ব্যাখ্যাজাত প্রভেদ সম্পর্কে বলরাম বিস্ক। অতসীর এই তীক্ষ্ণ বোধ বিষণ্ণতা উসকে দেয়। হতে পারে পুতুল অতসীর গর্ভজাত এবং আমার ঔরসে নয়। কি এসে যায় তাতে। পুতুলও নিছক কারো মেয়ে নয়। এক স্বাধীন সত্তা। আমার আমার বলে সত্তাকে ধন হিসেবে আগলে রাখার মধ্য দিয়ে পুতুলের ব্যক্তিগত সত্তা কি কলংকিত হয়ে যায় না। সে কি হয়ে যায় না অপমানের অংশ!

অথচ অতসীর মনের গড়ন ছিল অন্যপ্রকার। আজ সে রূপান্তরিত। বলরাম স্মৃতিভারে আক্রান্ত। অতীত উথলে পড়ছে। সে এক বৈকালিক আসর। গোধূলি গগনে জমেছিল মেঘ। নীচে সবুজ তৃণভূমি। যার আশ্রয়ে ঝাঁক ঝাঁক যুগল বন্দীর প্রণয়-আসর। হৃদকমলে ঝড় বইছে বলরামের। ও প্রকাশ করল নিজেকে।—কোর্টের পাট চুকে গেছে। আর কেন মিছিমিছি অপেক্ষা। এক একটা রাত ক্ষয় হয় আর ভাবি একটা ভোগের রাত বিয়োগ হল। সয়! এসো জোট বাঁধি।

—এ্যাতো শিগ্রি। বাবার যে যোগাড় নেই। বিয়েতে তো কিছু দিতে হয়।

—আমায় চিনলে না অতসীদেবী। ওসব দেওয়া থোওয়ার আমি পেছন মারি। কিছু দিলেও পাতে নেব না।

—আমাকে দিলেও না। অতসী চোখ নিবিড় করে। লাস্য হয়।

—তোমাকে দিলে! ভাবা যায়! ইউ আর মাই লাভার। একবার দখলে পেলে শুধু পাতে নেব না খাবলে খাবলে চুষিকাঠি করে খাব।

রগড়ের মোড়ক। গুপ্ত লোভ উঁকি দিচ্ছে। অবদমনে ক্লিষ্ট মুখশ্রী। অতসী সংক্রামিত। ওর গঠনে উপচে পড়ে মায়াদয়া। গাল পেতে দেয়। উদ্ধত বুক বেড়ে দেয়। প্ররোচনামূলক ইসারা।

মাগনা মুনাফাখোর পুলিশ—তোলাবাজ দৌরাত্ম উড়ো খৈ। বলরাম হামলে পড়ে। গালে চুমু দিতে দিতে বিলাপ করে,—ইস আমি যদি রাবণ হতাম।

এক গাল সরিয়ে আর এক গাল পেতে দেওয়ার ফাঁকে অতসী শুধোয়,—ওমা! রাবণ হতে যাবে কেন!

—সেই রবীন্দ্রনাথের কলির মত ঃ প্রাণ ভরিয়ে তৃষা হরিয়ে/মোরে আরো আরো আরো দাও প্রাণ। তোমার ঐ প্রশস্ত গাল রসভরা ঠোঁটের সেবা নেওয়া কি এই একজোড়া ছোট ঠোঁটের সাধ্যে কুলোয়। যদি রাবণ হতাম দশ মুখে আদর করতাম। আশ মিটত।

—খুব রস দেখছি লঙ্কেশ্বরের। এদিকে রাত যে কত ঘন হয়েছে হঁস আছে! ফিরতে হবে না!

—রাখ তোমার রাত। দিন যায় রাত যায়। আমি বসে থাকি হায়। আউল এবং বিরহী বিভঙ্গ বলরামের। যেন অতসী বসে থাকুক অথবা উঠে যাক কিছু এসে যায় না। ও পার্কের আস্তানা থেকে উদ্বাস্তু হচ্ছে না।

কথার খেলায় একপ্রকার মজা আছে। রোমাঞ্চ আছে। অতসী হাড়ে হাড়ে আলোড়িত। হাস্কি স্বরে বলে,—আহা আমি যদি দুর্গা হতাম।

—হায় খোদা। তুমি আবার দুর্গা হতে যাবে কোন আক্কেলে। পরিবার পরিকল্পনার যুগে।

—শোন হাঁদারাম। যদি দুর্গা হতাম, দশটা হাত থাকত। দশ হাতে জড়িয়ে সোহাগ করতাম। আশ মিটত।

আস্কারার ফল্গু স্রোত। গ্রাহক হয়ে বলরাম ছোঁকছোঁক করছিল। আর গ্রাহক পরিষেবার অর্থ-এক্ষণে, ওর দর্শনের অ্যালফাবেটে শুধু সুখ। ত্বক চর্চার আস্বাদ।

প্রাণিত বলরাম অতসীর লাবণ্যময় নিত্বক আঁধারতীর্থে প্রবেশার্থী।

প্রচণ্ড প্রতিরোধ। উদ্যোগের জবাই। ট্র্যাজিক উপসংহার।—কী কচ্ছ। নিরালা হলে ঝোপ পেলেই চটকাচটকির ধান্ধা। ছি ওরম করে না লক্ষ্মীটি। নিজেকে কেমন কমোডিটি কমোডিটি লাগে।

মন্দ্র শাসন। প্রশ্রয় প্রবাসে। আপত্তি যে হৃদ্য প্রমাণ কাজে। নিজেকে অবরোধ করতে ধাক্কা দেয়। ধাক্কার প্রকৃতি নিষ্ঠুর।

চোট। চোট ছাপিয়ে বিষণ্ণতা। বিষণ্ণতা ছাপিয়ে এক অদ্ভুত বিস্ময় বলরামকে গ্রাস করে। আপন সত্তাকে পণ্য ভাবতে যে মেয়ের তীব্র ঘৃণা, শুধু অনুষঙ্গ নয়—কর্তার ইচ্ছায় কর্ম নয়, পণ্য বিযুক্ত চরিত্র সংরক্ষণে প্রকৃত আকুলিবিকুলি। নিছক "বিষয়" সত্তা যার কাছে জল-অচল। অস্পৃশ্য। ব্রাত্য। সেই অতসীর একী করুণ রূপান্তর। পরম্পরায় ছিন্নতা। ভাবা যায়!

অতসী এবং বলরাম একই ঘরে একলা। নিজ নিজ ভাবুকতার ভারে নিঃসঙ্গ। ওদিকে পাশের ঘরে বিছানায় উন্মূল পুতুল। ফুলে ফুলে কাঁপছে। অনুতাপে পুড়ছে। ছি, একী করল সে। এ যে আত্মঘাতী গোল। হাট করেছে বেশ করেছে। কিন্তু যা হাট করল তা যে ভুয়ো। মায়ের অন্তরে বুনে দিল ভ্রান্তির বীজ। মা নির্ঘাত ভাবল তার দাম্পত্য রিক্ততা প্রত্যক্ষ করেই মেয়ের বিয়ে বৈরাগ্য। অথচ আসল কারণ উলটো। মা যেভাবে প্রথম পক্ষের প্রেমিক—স্বামীকে বেমালুম ছেঁটে ফেলতে পারল তাতে নর-নারীর প্রেম প্রীতি ভালবাসার প্রতি নিষ্ঠা শ্রদ্ধা নষ্ট হয়ে যায়। ধারণা জন্মে সংসারের জাঁতাকালে প্রেমের অন্ত্যেষ্টি অমোঘ নিয়তি। প্রেমের এই পরাজয় প্রণয়ের এই সমাধি দুঃসহ। তার চেয়ে লিভ টুগেদার—সে ভি আচ্ছা। বিয়ে। নৈব নৈব চ।

অতসী-বলরাম-পুতুল প্রত্যেকেরই বাড়াবাড়ি হয়েছে। রণক্লান্তও বটে। অনিবার্য ফল থৈ থৈ স্তব্ধতার ব্যাপক তর্জনী। বলরাম চা খোর। সেটাও কারণ আবার পরিবেশ হাল্কা হোক সেটাও কারণ, বলরাম ভাব জমাতে তৎপর। চাহিদা তুলল—গলা শুকিয়ে সাহারা। চা হলে—।

এটি এন চ্যানেলে অতসীর দৃষ্টি নিবদ্ধ। পর্দায় পাহাড়ি উপত্যকার ছবি। মাধুরী ঘুরে ঘুরে গান গেয়ে গেয়ে নেচে নেচে ভেড়ার পাল ছড়াচ্ছে। পর্দায় ফুটে উঠেছে ধরাছোঁয়া পিচ্ছিলতার খেলা। অতসী পাঠ নিচ্ছে। চোখ সরাল না। আমল দিল না প্রস্তাব। মুখ ঝামটা দিল।

—বসে বসে ল্যাজ না নেড়ে করে খাও না।

পিপাসার অন্তর্ঘাত। বলরামের মুখ ব্যাজার হয়। নিবু নিবু আশার ক্ষণে এক ঝলক হাওয়া ঢোকে। পর্দা সরিয়ে পুতুল লম্বা গ্রীবা বাড়িয়ে দেয়। বলে,—ডিয়ার মামণি এ্যাণ্ড

বাপি, বোধ—অপেক্ষা ···। আমি চা করে আনছি।

—আশ্চর্য টেলিপ্যাথি। সেই যে কথা আছে না—, বলে মাথা চুলকোয়,—ঠিক সময়ে কিছুতেই কোটেশন মনে পড়ে না।

—মুখস্থ বিদ্যায় তুমি বরাবরই উইক বাপি। তেল দিতে স্মৃতি নিয়ে অযথা ট্যানাহ্যাচড়া কেন। চা পাবে লেকিন শর্ত আছে।

—কী শর্ত বলরাম উৎকণ্ঠায় উৎকর্ণ।

—আজ পাঠ হবে। মধুসূদন। বুড়ো শালিকের ঘাড়ে রোঁ। এবং কবিতা।

—বঙ্কিম রবীন্দ্রনাথ সুধীন্দ্রনাথ জীবনানন্দ ছাঁটাই করে মধুসূদনকে হাইজ্যাক করলি কেন?

—বাপি তোমার মাথায় কি কারফিউ। আজ না পঁচিশে জানুয়ারি।

—তো কি—। বলরাম বিস্ময়ে চোখ টানটান করে।

—আজ মধুসূদনের জন্মদিন।

—তাই নাকি। বেশ বেশ। তা কততম রে—।

—১৭৪ তম।

চা-এর লোভ, বাৎসল্য এবং মধুসূদন তর্পণ। তিনের মিশ্রিত পাক। বলরাম প্রভাবিত। বাবার ভোট পেয়েই পুতুল জয়ের পুলকে গলা ছাড়ল। —মাদুর নিয়ে আসছি। চা আসছে। টাও থাকবে। মাদুরে বসে অনুষ্ঠান হবে। জলপান হবে। বলে বাকি ভোট কাড়তে মায়ের কাছে যায়। ঠেলা দেয়। বলে,—মা তোমাকেও বসতে হবে। ছাড় নেই।

চা-টা এবং অনুষ্ঠানের আয়োজনে পুতুল ঘর ছাড়লে অতসীর মুখ চাপা কৌতুকে ঝিকিমিকি। কৌতুকের দমকে শরীর ওথলায়। স্তন বিভাজিকায় গণেশের লকেট দোলাচল। বলরাম শুধোয়।—মজা পাচ্ছ যে,

—বাপ বেটার যা ঐক্য দেখছি বৈদ্যরাও লজ্জা পাবে।

—এ্যাতো করে ধরছে। যোগ দাও।

অতসী নাক সিটকোয়।—একসময় অনেক করেছি। এখন ওসবে আস্থা নেই। বোর লাগে।

বলরাম ফোড়ন কাটে।—কীসে যে তোমার আস্থা। সব কিছুতেই আস্থা খুইয়ে বসে আছ।

—আস্থা আর থাকে! বিপ্লব গণতন্ত্র সন্ত্রাস মূল্যবোধ সবকিছু ছিন্নভিন্ন। বস্তুর দুর্দান্ত চিতা অনির্বাণ শূন্যের সৈকতে।

পুতুলের বগল থেকে গোটান মাদুর খসে যায়। তালি দিতে গিয়ে। করতালি দিতে দিতে পুতুল বলে,—সুধীন্দ্রনাথ থেকে ঝাড়ছ। যতই রাঁধুনিগিরিতে মজে থাক কবিতার হ্যাংওভার তোমার আজো কাটেনি।

—কবিতার বাতিক বড় সাংঘাতিক। রোগ বড় সামাজিক রে, একবার ধরলে আর রিফিউজি হয় না।

—তাই যদি তবে কবিতার আসর বয়কট কেন?

অতসী নিমরাজি। গররাজি ভাঙতে পুতুল ঝুলোঝুলি করে। —প্লীজ মা, যোগ দাও। দারুণ জমবে।

চাপাচাপি অথবা সুপ্ত প্রবণতায় ওসকানি; যাই হোক অতসী রাজি হয়। —বসছি বাবা বসছি। তার আগে গাটা ধুয়ে আসি। তোরা শুরু কর।

গরমে চিড়বিড় করছে গা। অতএব চলো যাই অবগাহনে। জল ডাকছে। অতসী চলিষ্ণু। নিশানা চানঘর।

চানঘরের নিভৃতে, অতসী একাকিনী। একলা ঘরে অতসীর প্রথমে মনে আসে শরীর-টাকে উত্তম ধোলাই জরুরি। ত্বকে এমনকি আলগা ময়লা জমার অবকাশ নেই। আসলে ময়সা নিকাশ মুখ্য নয়। মুখ্য হল ঝরঝরে হওয়া। স্নিগ্ধ হওয়া। ঈদৃশ তাড়নায় অতসী এ আমির ছদ্মবেশ মোচন করে। মুহূর্তে তন্তুজ ভূষণ ডাঁই পায়ের নীচে। লাথি দিয়ে স্তূপ হঠায় এক কোণে। চোখ ঘোরাতেই মুগ্ধতার পুনরাবৃত্ত। বলরামের প্রতি কৃতজ্ঞতা আসে। নিজস্ব আস্তানা গড়তে না পারুক পরের ছাদে গড়ে তোলা বাথরুমটা ভারী চমৎকার। দেখনদারি সুন্দর বন্দোবস্ত। ঢুকলেই চোখে আরাম আসে। মনে হয় এসেছি থাকব কিছুক্ষণ। বসনের ভার থেকে অতসী প্রায় মুক্ত। চ্যুত হতে বাকি আছে শুধু ব্রা। বুকের ওপর চিবুক ঠেকিয়ে ব্রার হুক খুলতে খুলতে অতসী গুণগুণ করে, এযে মোর আবরণ/ঘুচাতে কতক্ষণ! আয়নার মুখোমুখি আদি হয় অতসী। দ্রষ্টব্য হয় গঠন। লঘুগুরুর অমিত্রাক্ষর প্রবাহ। কলপের সেবায় ঘনকৃষ্ণ চুলের ঝোপ। তারই নীচ দিয়ে মুখ টুকি দেয়। এই মুখ নিয়ে ঠাম্মা ছড়া কাটত ঃ চুলের তলা দিয়ে আঁখি ঠারে, মনখানি কাড়ে। ভাবুক হলে মানুষ নিরালা খোঁজে, না-কি নির্জন হলেই মানুষ ভাবুক হয়ে ওঠে—কোন যুক্তি যে সুপ্রযুক্ত নির্ণয় করা কঠিন। কূট বিচার চুলোয় যাক। চিন্তায়-অবলোকনে অতসী, এক্ষণে বিভোর। বিরলে অতসীর কান্না আসে। এখন এই মুখ আবেদনশূন্য। অথচ সত্যি বলতে কি নিজের গঠন নিয়ে তার মুগ্ধতা বহতা। কিন্তু কি এসে যায় তাতে। ডাঁট এবং আফসোসের রসায়নে পুড়তে থাকে অতসী। মনোজ্ঞ ভেট...। তাতে কি। কী লাভ যদি সেবায় না লাগে। অফিসের কাজে-সফরে সফরে বলরাম কাবার করে দেয় রাতের পর রাত, কড়ে গোনা বরাদ্দ থাকে যে বকেয়া রজনীগুচ্ছ—তাও কি ব্যবহৃত হয় স্ত্রীচর্চায়! না। ক্লান্তি-টেনশন-উচ্চাশাজর্জর বলরাম বিছানা পেলে বড়ি গেলা ঘুমের দেশে চলে যায়—এই তার নিশিযাপন। এদিকে পড়ে পড়ে ভোগের রাত উপোস যায়। অথচ রোমান্সে অবগাহন করতে তার যে কোষে কোষে দহন-বিলাপ। পড়ে থাকা পত্নীত্ব, বঞ্চিত শরীরী আপ্লুতা—এর মধ্যে সে কি হয়ে যাচ্ছে না অপমানের অংশ। পরাজয় যার উৎসবীজ।

সন্দেহ এবং সংশয়ের ধাক্কায় হৃদপিণ্ড পাঁজর কেটে বেরিয়ে আসার জোগাড়। তাহলে কি...।

প্রথম পক্ষের স্বামী মুকুন্দ ছিল রাগলে চণ্ডাল। সবরে-অবরে গায়ে হাতও তুলত। ফোকটে পাওয়া ধনের মত শরীরটা ধামসাত। ওর দাম্পত্যের এ্যালফাবেটে যত্ন নিষ্ঠা সহযোগিতার ভূমিকা পাপোষ। শহরতলীর সেই গৃহস্থালী ছিল অশ্রুময় পরিষেবা। কর্তার সংসার। ব্যক্তি চেতনা—বোধের চর্চা—অনুভূতি ঈদৃশ প্রবৃত্তি যা নাকি মনের খোরাক—যার চাহিদায় সে বুভুক্ষা। এই যে ব্যাপ্ত অভাব বলরাম তা পূরণ করে। আমার মন কাড়ে। পেটে বাচ্চা সমেত ও আমাকে উদ্ধার করে। তখন রসিকতা হত, রগড় করে বলতাম, মানিলে বাচ্চা ফ্রী। ওকি

কম ফিচেল। পাল্টা রঙ্গ ছুঁড়ে বলত, ফাউ-এর লোভেই তোমাকে চাই। এ অবধি যথাযথ।

পরের ধাপ নিয়ে প্রশ্ন অতসীকে তোলপাড় করে। আমাকে অর্জন করতে বলরামের আগ্রহ কৌতুহল কাব্যময়তা এবং উদ্যোগ ছিল দৃষ্টান্তমূলক। অর্জন যেই হয়ে যায় সেই সব অনুভব বেপাত্তা। জয়ের মধ্যেই কি ঘাপটি মেরে থাকে পরাজয়ের বীজাণু। কে জানে। ও আমাকে দিয়েছে অনেক। তবু কিছুতেই ঝরে না মনের খটকা। অনেককিছু দিয়েছে। ইঙ্গিত ছিল আরো কিছু দেবার। দেয়নি। ভড়কি দিয়েছে। আমাকে নিয়েছে খণ্ড ভাবে। আমি কিন্তু অখণ্ড আত্মবিলোপে হাহাকারী।

সহসা অতসীর মনে হয় সে দাঁড়িয়ে আছে পোখরান আঙিনায়। অতসী স্বগোতক্তি করে। আমি তো আর আসক্তির বাণপ্রস্থ নেইনি। আবার আমি তো আর জন্তু নই যে পাল খেতে ছুটব। আমার এ্যাতো আছে পরিবেবা দেব গ্রাহক কই। চকিতে মনে চাড়া দেয় অদ্ভুত এক আকাঙ্ক্ষার বীজ। মেয়েকে দেখার অছিলায় সহসা মুকুন্দ কি এসে যেতে পারে না, যদি এসে যায় ও আহ্বান জানাবে এস দেবদাস। এস অতসীকুঞ্জে।

গায়ে কাঁটা দেয় অতসীর। ছি ছি। একী ভাবল সে। চিন্তার গতি আঁচ করে আতঙ্কে শিরশির তিরতির কাঁপে। চিন্তার ঝোঁক উড়িয়ে দিতে ভাবনা শাসন করে। ভজে বলরাম। পাল্টা মনঃসংযোগ। জপ। বলরাম তুমি বিনা মোর আর কেহ নাই। আয়নাকে ভেঙায় অতসী। আমার ভুবন তো আজ হল কাঙাল; কিছু তো নাই বাকি। ওগো নিঠুর, দেখতে পেলে তা কি। গাওয়া থামিয়ে অতসী ফিক করে হেসে ফেলল। হায় রবীন্দ্রনাথ। তিনি যদি জানতেন তাঁর গান বেশি করে গীত হয় চানঘরে। গান বরখাস্ত। অতসী ফের নিজেকে নিয়ে পড়ল। বলরামের কাছে তার এই যে আটপৌরে কদর বা অবমূল্য—এর মূলে কি গূঢ় কোনও তির্যকতা আছে। বলরামের অন্তঃস্থলে কি কোন গভীর গোপন লোভের বসতি ছিল। আশ্রিত ছিল আইবুড়ো—অক্ষত যোনিসঙ্গমের লোলুপতা। বঞ্চিত মনস্তত্ত্বের বশে ও কি আর্ত।

সন্দেহে অতসীর মন আনচান করে। খা খা অনুভবে হতবিহ্বল। বিহ্বলতা ছিন্ন হয়। দরজায় পুতুলের অসহিষ্ণু ধাক্কায়। এস্তে অতসী পরিপাটি হতে উদ্যত। জলকেলি হব হব, সোচ্চার তাগাদা।—মা বড্ড লেট করছো। শিগ্গি এসো।

।। ৩ ।।

আমার মা যখন মাটিতে মুখ থুবড়ে পড়ে আছ
আপনি তখন মস্কো বা মহেঞ্জোদাড়োয় তীর্থে বেরিয়েছ।
—বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

রটনার ধর্ম বাড়তি। যা রটে কিছুটা বটে জনরব মান্য করলে ধর্তব্য ঃ অনেক প্রসবিনীরা বড়-র প্রতি অতিশয় অবশ। যে আনুগত্য যুক্তির অধিক। মাতৃতান্ত্রিক স্বভাব। বলরামের মা যোগমায়া দেবী এই জোটের। বলরামকে নিয়ে তার বাতিকগ্রস্ততা দর্প এমন স্তরে যা কুটুম-পড়শিদের ঠাট্টা পরিহাসের উপাদান। এটা মায়ের দিক। বলরামের দিক থেকেও মায়ের প্রতি টান যা হিসেবের নয়ছয়। টানের উৎস চাহিদা। প্রৌঢ়ত্বের সূত্রপাতেও বলরাম স্নেহ কাঙাল। কিন্তু ধাড়ী সে, সুতরাং এহেন প্রবৃত্তির কোথাও আশ্রয় নেই। বিচ্ছিন্ন দ্বীপ মা।

মায়ের কাছে "খোকা" সদস্যপদ আজীবন টেঁকসই।

খবর এসেছে মা অসুস্থ। ঢাকে কাঠি পড়েছে। বলরাম শুনতে পাচ্ছে সুদূরের আহ্বান। সাড়া না দিয়ে থাকা কি যায়!

পেড়োর নামে পুতুলের অন্তর্গতে ধেই ধেই শুরু হয়। ভোর হতেই সাজ সাজ রব। সে তৈরি। জানে লাভ নেই তবু বায়না করে,—তুমিও চলো না মা।

শ্বশুর ভিটে স্মরণে আসতেই অতসীর চোখে ভর করে কারবালার প্রান্তর। শীত এসে শরীর এঁটে ধরে অতসীর। শীতের বশ থেকে নিজেকে বিচ্ছিন্ন করে বনসাই চুলে ঝড় তোলে। মাথা ঝাপটায়। দৃষ্টিপাতে বুনে দেয় জবাব।

জবাব নয়। সংকল্প। বিষয়টা আর চটকায় না পুতুল। প্রসাধিত পুতুল বলরামের দ্রষ্টব্য হয়। তাঁতের শাড়ি, ববছাঁট চুল, নাক ছ্যাদা, নাকে নাকছাবি। পারে বটে। একাল সেকাল সব কালেই ঝোঁক। বহুত্ববাদী। এই পৌষমেলা করে শান্তিনিকেতন থেকে আজ ফিরল। কাল চল্ল মা পিসির সঙ্গে তারাপীঠ। "অগ্রগতির অস্ত্র যুক্তিবাদ"—নিয়ে যুব করছে। আবার ফি শুক্রবার সন্তোষী মা করছে। বাউল-কীর্তন-ডিসকো-জীবনমুখী সকলকে নিয়ে একান্নবর্তিতা। অর্থাৎ ধর্মে আছি জিরাফে আছি। বেশ লাগে কিন্তু। বেল বটস, মিনিস্কার্ট, ম্যাক্সি, স্লাকস-টপ, শালোয়ার-কামিজ-এর পাশাপাশি শাড়ি টিপ-নাকছাবি-শাঁখাসিঁদুর জীবনের যা কিছু ধন কিছুই না ফেলে প্রশ্রয় দেয়। পূর্বসূরীরা এতটা পারত না। তারা ছিল একেলে আর সেকেলে স্পষ্ট বিভাজনে বিভক্ত। পুতলরা ধন্য। চরণতলে টুপি খুলতে বাধ্যতা আসে।

অতসীর চোখেও মুগ্ধতা। সুন্দর হয়ে ফুটছে পুতুল। ফুটবে না! কার মেয়ে! মুকুন্দ বড় বোদা ছিল কিন্তু স্বাস্থ্য ছিল অনবদ্য। শ্রীও ছিল চোখ টাটান। তারই রক্তবীজ বহন করছে মেয়ে। সুন্দরী তো হবেই। ভাগ্যিস বলরামের ঔরসে গর্ভধারণ করিনি। শূদ্রবীজের উত্তরাধিকার পেলে কী যে ফলন হত—ভাবতেই গা শিরশির করে অতসীর। ছেলেমেয়ের রূপ যদি পাড়া-পড়শির দৃষ্টি না কাড়ে—কী সার্থকতা বিয়োবার! প্রসব মানে সৃজন। না-কি গর্ভসঞ্চারের যোগ্যতা কেবল খালাসে!

অতসীর তন্ময়তার অবসরে বলরাম চুলে কিরি কাটতে থাকে—আর ভাবে একে খর্ব তায় যদি টাক থাকত। কী কেলো যে হত। ভাগ্যিস মাথাভর্তি চুল। একগুচ্ছও উদ্বাস্তু হচ্ছে না। স্রেফ কালো সাদায় রূপান্তরিত হচ্ছে। হোমিও-হাকিমি-টোটকা-এ্যালাপাথিসমূহ চিকিৎসা-শাস্ত্র রোয়া হচ্ছে। ফল গোল্লা। ডিফেন্স ভাঙচুর। শীর্ষ কাঠাম কাশফুল বাগিচা।

বাবার দিকে চোখ পড়তে পুতুল তড়বড় করে। ক্ষিপ্র পায়ে এগিয়ে আসে। চকিতে বেঢপ অনার্য মাথাটা টেনে নেয় বুকে। ঘাঁটা চুল বিন্যাস করে দেয়। তুষ্ট হয়ে পা বাড়ায়। তাক চটি এবং রাস্তা। দরজা ডিঙোবে ঘাড় ফেরায়।—মা আসছি। কটা দিন মোর পায়ের চিহ্ন পড়বে না এই বাটে। কটা দিন তুমি রজনীকান্তকে কোল দাও।

নৃত্যের ছন্দে ফাটা গোড়ালি জাগিয়ে পুতুল উধাও।

পুতুল ঘরছাড়া। নিভৃতি। শুধু তুমি আছ আমি আছি। ঘোর ঘোর। মায়া কাটিয়ে বলরাম বার হব হব অতসী এক খিলি পান বাড়িয়ে দেয়। বলরাম পান নিতে নিতে রগড় করে ঃ

পান দিলে সুপারী লাগে

আরো লাগে চুন
গুঁসিয়া গুঁসিয়া জ্বালে
পীরিতের আগুন।
অতসী কটাক্ষ করে। —ঢং

বলরাম হাঁটছে। পাশে পুতুল। ছুটির সকাল। কৃষিজাত পণ্যে ঝকমক করছে বাজার। কোনও কোনও ব্যাপারী সবজি ধুয়ে মুছে আঁটি করে বিক্রি করছে। কেউ কেউ আরো চালাক। সবজিতে মাটির আস্তর দিয়ে সবজি এবং বোঁটা ও পাতাসমেত ফল বিক্রি করছে। এই ঠাট বাড়িতি আকর্ষণ। বাড়তি মুনাফা জোগায়। উবু হয়ে ক্রেতারা বেগুন টিপে ঢেঁড়সের ডগা ভেঙে লাউয়ের খোলে নখ খুঁটে যাচাই করছে কচি কিনা টাটকা কিনা।

বলরামের চোখ টানে এক ব্যাপারী। ঝুড়িতে কলা সাজিয়ে কুণ্ঠিত প্রতীক্ষায়। পাকা সবরি কলা। কলা মায়ের খুব প্রিয়। কিনব কি কিনব না ইতস্তত করছে—ব্যাপারী প্রলুব্ধ করল। হেঁকে,—দাদু নিন না সেলে দিচ্ছি। কুড়িতে ডজন।

বলরাম ছিটকে সরে আসে। দাদা না বলিস কাকা জেঠুর ধাপগুলো কি লোপাট করে দিলি হারামজাদা। দাদা থেকে টপকে সরাসরি দাদুতে। ক্রমবিকাশ বলে কিছু থাকবে না। ঠ্যাটা সেও কম না। অফেলে খেলছে। যে দাদু বলবে তাকেই বয়কট। সামলা।

কলা বয়কট। অগত্যা মিস্টি পেস্ট্রির প্যাকেট জুটের থালেতে পুরে পুতুলকে ধরায়। দূর থেকে আসা খালি ট্যাক্সির আভাস নজরে আসা মাত্র গোড়ালিতে ভর দিয়ে ঈষৎ কাত হয় বলরাম। হাত তুলে হাত দেখায়। দরজা না খুলে জানালায় মুখ বাড়ায় ড্রাইভার। —যায়েগা কাঁহা? উত্তরে—হাওড়া স্টেশন। শুনে গতি স্তব্ধ।—বৈঠে।

হাওড়া স্টেশন। সি টি সি-র দরজা খোলা। সামনের দিকের জানালার সব সিট ভর্তি। হয় গতরে নয় রুমাল ব্যাগ ইত্যাদিতে দখলিকৃত। পেছনের দিকটা খালি। তাই সই। তবু তো জানালার ধার। পুতুল একটা ধার, পরের রো-র আর একটা ধার বলরাম দখল নেয়। গড়িমসি করে বাস ছাড়ল। বাস ছাড়তেই চোখে মুখে চুলে ঝাপটা দেয় বাউল বাতাস। থেকে থেকে ঢুল আসে। ঢুল চটকায়। কখন চোখ মুদে কখন চোখ ছড়িয়ে পার হয়ে যায় পথ। বাস থেকে নেমেই টুরিস্টরা যেমন করে থাকে বলরাম এবং পুতুল তাই করল। ঢাউস ব্যাগ মাটিতে রেখে কোমরে হাত রেখে বলরাম আড়মোড়া ভাঙে। শরীরের জং ছাড়ায়। পুতুল ঘাঁটা চুলে চিরুনি চালায়। চোখে সানগ্লাস আঁটে। বাসস্টপের ঘিঞ্জি পরিবেশ ডিঙিয়ে ফাঁকা জায়গায় এসে চারপাশে তাকাতে থাকে। যে পুতুল—বাচালতার খ্যাতি অখ্যাতি যার চরিত্রে মাখামাখি, যে পুতুল বাবার সঙ্গ পেলে আবোলতাবোল হয়—সেও চুপচাপ।

কচকচিতে প্রেক্ষিত লেবড়ে যায়—এ বিষয়ে সচেতন হতে বলরামও বাকরহিত। অভিব্যক্তিতে ঝরছে গানের ভাষা ঃ এলেম নতুন দেশে। ভর করে কিন্তু খসে না। সুন্দর স্তব্ধতা বিরাজ করে।

রিক্সা না নিয়ে হাঁটতে থাকল জোট। হাঁটতে হাঁটতে একসময় বাড়ির কাছাকাছি হয়। ভোল পালটে গেছে। আকারে এবং প্রকারে বাড়ির চেহারা অনেক উন্নত। তবে আগে ছক করে এক ক্ষেপে গড়লে যে আদল আসে তা নয়। ঘর উঠেছে পর পর। ক্রমপ্রসারী। বোঝা

যায় যখন যেমন অর্থ জুটেছে তখন তেমন উঠেছে ঘর। হাতটান হওয়ায় কোনও দিকে রং কোনও অংশে আস্তর বাকি। অনেকগুলি কাচ্চাবাচ্চা খেলছে ছোটাছুটি করছে। কিন্তু তেমন কলরব নেই। ওরা এ বাড়ির সন্দেহ নেই। কিন্তু কে যে কার সনাক্ত করতে পারে না বলরাম। কিছু চেনা কিছু আবছা চেনা কিছু অচেনা পড়শি ঢুকছে বের হচ্ছে। নিঃশব্দ পদচারণ। সকলেই আহত ভূমিকায় ঘুরঘুর করছে। ব্যথিত দৃষ্টির ঢেউ উপেক্ষা করে আরো অন্দরে ঢুকতে পুরোটা স্বচ্ছ হয়। বুকটা ছ্যাৎ করে। মুখ থেকে ছিটকোয় জিজ্ঞাসা।

—কখন?

—পরশু। সকাল আটটায়।

হৃদপিণ্ড ছিঁড়ে যাচ্ছে। বলরামের মনে হয় ও দাঁড়িয়ে আছে পোখরান ভূখণ্ডে। অভিমানের বশ থেকে সামলে বিমূঢ় প্রশ্ন তোলে।—আমাকে জানালি না যে—।

উত্তর নেই। উপস্থিত জটলা টাল খায়। অদ্ভুত স্তব্ধতায় খানখান হচ্ছে পরিবেশ। অবশেষে মুখ খোলে শিবু।—আমার কোনও দোষ নেই দাদা। মৃত্যুকালে মা গোঁ ধরল। সকলকে জড়ো করে শপথ করিয়ে নিল তোমার অনেক দায়িত্ব তুমি ব্যস্ত লোক। শ্রাদ্ধের আগে তোমায় যেন খবর না দি—বলতে বলতে চোখ কচলায়। কান্নায় তার গলা অবরুদ্ধ হয়ে আসে। পুনরায় দুঃসহ স্তব্ধতা। এ ওর প্রতি মুখ চাওয়াচুয়ি করছে। এমনিতে সেজবউ রমলা মুখচোরা প্রকৃতির। কিন্তু সেই প্রথম মুখ খোলে। খোলসা করে রহস্য।—দাদা মায়ের ডাকে ছেলে বউ সকলে এককাট্টা হলে মা কথা আদায় করে নিয়েছেন যার সারমর্ম হল ঃ মেজদাই মাকে জীবনভর অন্নজল যুগিয়েছেন। মেজদাই যেন তাকে মুখাগ্নি করেন। এবং শ্রাদ্ধে প্রথম অন্নজল দান করেন। মায়ের শেষ ইচ্ছে অমান্য করতে পারিনি। পরিবেশ অনেক হাল্কা হয়েছে। মেজবউ লতা ধাতস্থ। সে এগিয়ে আসে। রমলার ফাঁক হওয়া ঠোঁট আর অবসর না দিয়ে ব্যাখ্যায় প্রবৃত্ত হয়।—আমরা অবশ্য ঠিক করেছি মায়ের জবানবন্দী আস্ত রক্ষা করব না। খানিকটা কাটছাঁট করব। মুখাগ্নি ও করবে। কিন্তু শ্রাদ্ধের অন্নজল দেবেন আপনি। মায়ের শেষ ইচ্ছে পালন করব আধাআধি। পণ্টু বিকেলে যাচ্ছিল আপনাকে আনতে।

বলরাম মূর্তির মত স্থির। মাথাটা ঈষৎ ঝুলে। মা যে এমন অভিমানী ছিলেন জানা ছিল না। এই মুহূর্তে বোধোদয় হল। তার বুক ঠেলে কান্না উথলে আসে। প্রশ্ন প্রতিপ্রশ্নে জর্জর হয় অর্ন্তভূমি ঃ মা তুমিও আমায় একঘরে করলে। তাহলে আমার স্বভূমি কোথায়!

উদ্বাস্তু হাহাকারে বিদীর্ণ হতে থাকে বলরাম।

শবাধারে জ্যোৎস্না

লীনা গঙ্গোপাধ্যায়

এখনও পশ্চিম আকাশে শুকতারা জ্বলজ্বল করছে। মাঠ-প্রান্তর থেকে ধানখেত ছুঁয়ে আসা জলীয় বাতাসে ধিকিধিকি জ্বলতে থাকা মালসার আগুন নিভে গেছে খানিক আগে। তালি মারা ছেঁড়া তোশক এবং ছেঁড়া-খোড়া কাঁথা-কানি বিছানো ফকির মানুষের বিছানা থেকে উঠে আসা কেমন এক আঁশটে বাস এই বাতাসের সঙ্গে মিশে যায়। ফুলজান, ফকির মানুষের শেষ বয়সের বিবি, মেলা থেকে কুড়িয়ে পাওয়া বিবি এবং লালন, সেই কোনকালে আকালের: বছর কাদের বাড়ির কচি ছেলে নদীতে ভেসে গিয়েছিল, ফকির নদীপাড় ধরে হেঁটে যাচ্ছিলেন, তখন অপরাহ্ণের ম্লান আলো ছড়িয়ে পড়েছে পৃথিবীর বুকে, জলে জঙ্গলে আকাশে, মানুষে। ফকির মানুষ হন হন হেঁটে যাচ্ছিলেন তার মুশকিল আসানের লম্ফ নিয়ে, গ্রামের পর গ্রাম পার হয়ে হয়ে গৃহস্থের বাড়ি বাড়ি আল্লার দোয়া পৌঁছে দিতে। চলমান মানুষটি ওই অপরাহ্ণে একটি জটলা দেখে দাঁড়িয়ে পড়লেন। নদীতে জল নিতে আসা গ্রামের মেয়ে-বউ এবং বয়সী মানুষরা যে শিশুটিকে চিহ্নিত করতে না পেরে অসহায় দৃষ্টিবিনিময় করছিল কেবল পরস্পরের প্রতি এবং আপাত-নিঃসাড় হাত-পা মেলে শুয়ে থাকা শিশুটির আদপেই চোখ মেলে দুনিয়াকে দেখার সম্ভাবনা আছে কি-না এ বিষয়ে সংশয়ে পড়েছিল, তখন সেই ঘোর অপরাহ্ণে, পৃথিবী যখন এক মায়াবী আলোক-বলয়ে আচ্ছন্ন হয়ে উঠছিল, ক্রমশ, সেই সময়ে ফকির মানুষের প্রয়োজনীয় শুশ্রূষায় শিশুটি নড়ে চড়ে উঠল। মালিকানা বিষয়ে সুস্থ নিষ্পত্তি না হওয়ায় অতঃপর ফকির মানুষ, সে যাত্রা আল্লা-রসুলের দোয়া পৌঁছনো স্থগিত রেখে শিশুটিকে সঙ্গে করে নিজের গ্রামে, নিজের মাজার সংলগ্ন এক কামরার বাড়িটিতে ফিরে এলেন। সেই থেকেই এই ঘর, এই উঠোন, এই মাজার, এই ফেলে ছড়িয়ে রাখা মাজারের পেছনদিকের জমিটুকু যে জমিতে নানান আগাছার সঙ্গে দু-একটি সুগন্ধি ফুলের গাছ, যেমন হাস্নুহানা, কামিনী এবং প্রয়োজনীয় কিছু বৃক্ষ যথা তাল, নারকেল, জারুল, তেঁতুল এদের মধ্যেই বেড়ে উঠেছে সে। ফকির যার নামকরণ করেছেন লালন।

তালি-মারা ছেঁড়া তোশক এবং ছেঁড়া-খোঁড়া কাঁথা-কানি বিছানো শয্যাটিতে ফকির মানুষ আশ্রয় নিয়েছেন আজ মাসখানেক হয়ে গেল। বছরের নানা ঋতুতে মাঝে মাঝেই মানুষটা যেমন কালো আলখাল্লা গায়ে জড়িয়ে ঝোলা ভরতি তাগা-তাবিজ মাদুলি এবং মুশকিল আসানের লম্ফটি নিয়ে বেরিয়ে পড়েন, এবারও তেমনি। ফিরে এলেন শ্রাবণের ঘোর বর্ষার সন্ধ্যায়। বৃষ্টির মোটা মোটা সাদা দানায় মাঠ-ঘাট ঝাপসা হয়ে উঠছিল। খেত মাঠে মুনিশদের ছুটোছুটি, গরু-বাছুরের ডাক, কচি-বাচ্চাকে এবং বাড়ির পোষা ছাগল ছানাটিকে খুঁজতে আসা নারীকণ্ঠ জীবনের এইসব কোলাহলের মধ্যে ফিরে এলেন ফকির মানুষ, আশরীর বৃষ্টি দুটি রক্তবর্ণ চক্ষু এবং শরীরময় তাপ নিয়ে।

যুবতী বিবি ফুলজান মাজারে মোম জ্বালাতে গিয়েছিল তখন। আর লালন। বাড়ির পুবদিকে তার নিজের হাতে তৈরি করা একচালার বারান্দায় বসে বাঁশিতে সুর তুলছিল। ফকির মানুষ ঠকঠক কাঁপছিলেন শীতে। তাঁর দুটি হাত বুকে জড়ো করা। শীতার্ত তিনি ফুলজানের নাম ধরে ডাক পাঠালেন। বাইরের প্রবল বৃষ্টিতে এই ডাক খুচরো পয়সার মতো ঠনঠন ধ্বনিতে বেজে ওঠে। ফুলজান দ্রুত ঘরে এসে মানুষটাকে শুকনো কাপড় দেয়। শুকনো গামছায় গা-হাত-পা মাথা মুছিয়ে দেয়। অতঃপর এক বাটি গরম চা পান করে ফকির তার পালিত পুত্রের বাঁশির সুর বুকের মধ্যে নিয়ে সেই যে এই বিছানাটি আশ্রয় করলেন, আর উঠে দাঁড়ালেন না। এমনকি ধীরে ধীরে তার উঠে বসা, শোলোক বলা নামাজ পড়া এবং সংসার সম্পর্কিত তার প্রিয় মানুষ দুটির সঙ্গে সাধারণ টুকিটাকি কথা চলানোও বন্ধ হয়ে গেল। ফুলজান আর লালন দুজনেই রাত জাগে। দুজনেই নিতান্ত দায়সারা ভাবে তাদের রোজকার কাজ সারে। এ বিষয়ে দুজনেই অতিমাত্রায় সতর্ক কারণ, একজনের অনুপস্থিতিতে পাছে ফকির মানুষ অন্য জনকেই তার শেষ সময়ের জমিয়ে রাখা কথা কটি বলে যান, এই আশঙ্কাতেই দুজনের-ই নাওয়া-খাওয়ার সময়টুকু দিনে দিনে সংক্ষিপ্ত হয়ে উঠতে লাগল।

অথচ ফকির মানুষের চোখে, মনের ভিতরে দিনে দিনে দিনরাতের ভাগগুলি ক্রমশ অস্বচ্ছ হয়ে উঠছে। মাঝরাত ভোরবেলা, বিকেল অথবা সন্ধে এমনকি মেঘলা দুপুর এসবই তার একরকম মনে হয়। তার চোখ জুড়ে মগজ জুড়ে কেবল একটা আবছা আন্ধার, কালা আন্ধার, দলাপাকানো আন্ধার গড়িয়ে গড়িয়ে চলে।

কাল দুপুর থেকে আর একবারের জন্যও চোখ খোলেননি ফকির মানুষ। মাঝে মধ্যে নিঃশ্বাসের সঙ্গে সঙ্গে গলা এবং বুক থেকে ঘড়ঘড় শব্দ উঠে এসেছে কেবল, তাতেই বোঝা গেছে মানুষটার এখনও জ্ঞান আছে। ফকির মানুষের শীতল হয়ে আসা হাত পাগুলি ফুলজান কাল বিকেল থেকেই সেঁকে দিচ্ছে। এই জন্য মাঝে মাঝেই মালশাতে আগুন উসকে দিতে হয়েছে তাকে। যদিও শেষ পর্যন্ত এই ভোররাতে আর ধরে রাখা যায়নি আগুনটুকু। কাল মাঝরাতে বৃষ্টি ধোয়া ফিকে জোছনা উঠেছিল। সেই জোছনা ঘরের মাটিতে শুয়ে থাকা ফকির মানুষের আবছা মুখে এবং শীর্ণ শরীরখানায় এসে পড়েছিল। তার সাদা দাড়িতে ওই আলো এমন ভাবে পড়েছিল যেন খানিক কুয়াশা জমেছিল মনে হয়।

এখন পুব আকাশ থেকে স্বপ্নের মতো ক্ষীণ, মৃদু অথচ শ্লথগতি আলো এসে রাতের ফিকে আঁধার কাটিয়ে দিচ্ছে আস্তে আস্তে। লালন একপাশে উঠে গিয়ে অজু সেরে তার আসন বিছিয়ে ফজরের নামাজ পড়তে শুরু করেছে। এই নিভৃত সময়টিতে ফুলজান মুখের কাছে মুখ নামিয়ে মৃদু কণ্ঠে ফিসফিসিয়ে জিগগেস করে, আপনে কথা কন না ক্যান? কি কষ্ট হয়? ও মানুষ ও ফকির মানুষ। আমারে কন না! এতগুলি কথার উত্তরে এবং লালনের রাতজাগা ভারি গলার নামাজের উত্তরেও ফকির মানুষের মুদ্রিত দুটি চোখে কেবল দুটি ফোঁটা জল ফুটে ওঠে। ওই মানুষ তখন মরে তার দীর্ঘনিশ্বাসটি ফুলজান বিবির কাছে গচ্ছিত রেখে ঘরের বাইরে পা দিয়েছেন। অমনি বিশাল বিলেন মাঠ, তার আলো আঁধারি হাঁকে হাতছানি দেয়। আকাশের হাজার নক্ষত্র তাঁকে হাতছানি দেয় বিলের গায়ের গাছগুলির মাথায়

মাথায় খেলা করা গাঙশালিকেরা তাঁকে হাতছানি দেয়। টুপটাপ বৃষ্টি পড়ছে আবার। গাছপালা ভিজছে মাটি ভিজছে, ফকির মানুষ ভিজছেন। তার বসন আলগা হচ্ছে। এ যাবৎ পৃথিবী বাসকালের সমস্ত গিঁট একটি একটি করে খুলে যাচ্ছে এখন। এ যাবৎকালের যাবতীয় সঞ্চয় যা কিছু সুখের, যা কিছু প্রিয়, তার ঘরের মানুষ, নদীর পাড়ে পাড়ে শহুরে গঞ্জে বসবাসকরা মানুষ, তার প্রিয় বয়্যাৎ, প্রিয় শোলোক, প্রিয় বৃক্ষসকল, মোমজ্বলা মাজার এই সমস্ত গিঁট একটি একটি করে খুলে যেতে থাকে।

ফকির মানুষের চারপাশের কুয়াশার জাল কেটে যাচ্ছে এখন। এক নরম স্নিগ্ধ অথচ উজ্জ্বল আলো, যে আলো তিনি পৃথিবীর বুকে জ্বলতে দেখেননি কখনও। এই রকম এক আলোক-বলয়ে প্রবেশ করছেন তিনি। ওই বলয় পার হতে পারলেই যেন এক মঞ্জিলে পৌঁছনো যাবে। যে মঞ্জিলে পাহারা দেয় এক পাখি। ফকির মানুষ ভাবেন পৃথিবীর সকল মানুষকেই কি বাস শেষে আসতে হয় এই মঞ্জিলে? এই পাখির কাছে?

ফুলজান এই শ্লথগতি আলোয় সবে ভোর ফোটা জলরং আলোয় ফকির মানুষের ইন্তেকাল দেখছে।

এখনও প্রত্যুষের ঝিরঝিরে বিশুদ্ধ বাতাসের মতো লালনের আজানের সুর পাক খাচ্ছে এ ঘরে। বাইরে গাছে গাছে পাখি ডাকছে দুটি একটি। ফকির মানুষের মাথাটি এখন একপাশে হেলানো। শরীর শীতল। মুখে প্রশান্তি। মুদ্রিত দুটি চোখের চামড়া মসৃণ। ফুলজান তার মানুষের বুকে কান পাতে। নিস্পন্দ নিথর। মানুষটার শরীরে আর কোনও তরঙ্গ নেই। শব্দহীন নিঃসাড় এই মানুষের জন্য ফুলজানের বুকের ভেতর থেকে প্রবল চিৎকার উঠে আসে এইসময়ে। সেই চিৎকারে লালনের নামাজের সুর ছলকে যায়। ফকিরের উঠোনে খাঁচায় পোরা মুরগিগুলো ছটফট করে ওঠে।

এই মুহূর্ত কয়েক আগে অথবা এই মাত্র-ই ইন্তেকাল হয়ে গেল ফকির মানুষের।

একটু বেলা হতেই কথাটি গাঁয়ে গাঁয়ে ছড়িয়ে পড়ে। বড় ভালবাসার মানুষ ছিলেন, বড় আপনার জন ছিলেন যে মানুষটা সকলের। তাই, একটু বেলা হতেই ফকির মানুষের উঠোন ভেঙে পড়ে লোকে। মানুষগুলো শুকনো মুখে দাঁড়িয়ে থাকে। তাদের গলার ভেতর থেকে গুনগুন শব্দ ওঠে। কেউ কেউ হাতের তালুতে চোখ মোছে। কোনও তিনকাল পেরনো বুড়ো বিলাপ করে ওঠে। তার বিলাপে একটানা ঘ্যানঘ্যানানি ছাড়া কোনও শব্দ এবং তার অর্থ পরিষ্কার হয় না। বয়সী একজনের মনে এইসময় পুরনো দিনের স্মৃতি জাগে—সেবার খরা হয়েলো খুব। মাঠে ধান নি, ঘরে খাবার নি, আকাশ যেন জ্বলতি লেগেছে। এইরকম এক বইকেলে এক নতুন মানুষ এলেন গাঁয়ে। মাথায় টুপি, গায়ে কালো আলখাল্লা, কাঁধে ঝোলা। আমি ত্যাখন খেতমাঠ থেকে ফিরতিছি। হাঁ দেখো। মানুষডা মাঠের মাঝ-মদ্দিখানে মূর্তির মতন দাঁইড়ে পড়লেন। মুখখানি আকাশমুখো। হাত দুখানি উপরে তোলা। আজান পড়েছে তখন বড় মসজিদি। ওই মানুষ অমনি দাঁইড়ে নামাজ দিলেন। আমুও দাঁইড়ে পল্লাম। নামাজ শেষ হলি আলাপ-সালাপ, গপ-সপ হল। মানুষডার আস্তেনা নেই। থাকতি চান তিনি আমাগের গেরামে। বড় কত্তার বাড়ির মজলিশে কথাডা পাড়লম। বেবস্তা হলো এই

মাজারে। ঝোপ জঙ্গল সাফা করি গাঁয়ের সকলে মিলি ঘর বেঁধি দেলাম। গাঁয়ে একজন পীরমানুষ থাকা কত সুবিধে। সেই থে রয়ি গেলেন তিনি। আমাদের শোকে দুঃখে বটগাছের মতো আছছাড়া হয়ে।

বেলা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে লালনের সঙ্গে কেউ কেউ হাতে হাত লাগিয়ে ফকির মানুষকে উঠানে এনে শুইয়েছে। অন্যেরা মাজারের পেছনদিককার বাগানটায় গর্ত খুঁড়ছে। ফকির মানুষের কবর হবে ওইখানে ওই হাসনুহানা গাছটার নিচে। দেবাংশী তেঁতুলগাছের ছায়ায়। লালন ফকির মানুষের দাফনের জোগাড়ে ব্যস্ত।

ফুলজান ফকির মানুষের শয্যা আঁকড়ে চুপচাপ বসে আছে একটা বাতিল মানুষের মতো। মাত্রই বছর কয়েক আগে বারাসাতে সত্যপীরের মেলায় ফকির মানুষের সঙ্গে ফুলজানের মায়ের আলাপ হয়। অবোরা দুঃখী মানুষটার দুঃখ থেকে মনে কষ্ট হওয়ায় তার মিনতি ফেরাতে পারেননি। বিধবার বড় হয়ে ওঠা মেয়েটিকে নিকা করে সঙ্গে নিয়ে আসেন মানুষটা। গ্রাম পথ দিয়ে যখন ফকির মানুষের পেছন পেছন একগলা ঘোমটায় মুখ থেকে হেঁটে আসছিল ফুলজান। হাতে ছোট একটি পদ্মছাপ টিনের সুটকেশ। যাতে প্রাকবিবাহ জীবনের যাবতীয় সঞ্চয়। তিন সেট কাঁচের চুড়ি একটি ভাঙা আয়না। দুটি অক্ষত শাড়ি। মায়ের হাতে বোনা একটি কাঁথা আর-ও কি সব টুকিটাকি, তখন সন্ধে গাঢ় হয়ে রাতের ভেতর ঢুকে গিয়েছিল। জোছনা নেমেছিল বিলের ওপর। বিলেন মাঠে ফটফট করছিল জোছনা। ফকির মানুষের কালো আলখাল্লায় বুকসমান সাদা দাড়িতে জোছনা পড়ে মানুষটাকে অমন মায়াবী, দেখাচ্ছিল তার পেছন পেছন মৃদু শব্দে হাঁটছিল ফুলজান। আকাশে কিছু নক্ষত্র জ্বলছিল। সামনে ফসলভরা মাঠ। কিছু আগে গরম জিলিপি কিনে দিয়েছেন ফকির মানুষ। তার স্বাদ এই সবকিছু মিলে ফুলজানের বুকের ভেতর কোড়া পাখির ডাক—ডুব ডুব। এই মানুষের কণ্ঠে গান বাজে। সে মেলায় শুনেছে, এই মানুষখানা উঁচু নাম্বা। পীরমানুষ। সকলের শ্রদ্ধা ভক্তির মানুষ। এই বাউল মানুষ তার শরীরেও বেজে উঠবেন। এইরকম এক সুখ সম্ভাবনায় ফুলজান অকস্মাৎ ফকিরের আলখাল্লাটিতে টান দেয়। মানুষ তার পিছন ফিরে তাকান। চোখ দুটিতে যেন হাসি জমে থাকে। বৃষ্টি শেষের জোছনার মতো। মানুষটির চোখের তারায় রহস্য—ভয় লাগে নাকি বিবির আমার?

আলখাল্লা ছেড়ে দিয়ে মাথা নিচু করে ফের হাঁটা শুরু করে ফুলজান। মানুষটা তার জীবনের কথা বলছেন তখন। লালনের কথা। চারপাশে কীটপতঙ্গের শব্দ। ভয়ঙ্কর সাদা জ্যোছনায় এই সময় কয়েকজন মানুষকে আগু পিছু আসতে দেখা যায়। তারা কুশল জানায়—আচ্ছালাম আলেকুম। আড় চোখে ফুলজানের দিকে চায়। সঙ্গে সঙ্গে আসে। ফকির মানুষ দাড়ির ভাঁজে মৃদু মদু হাসতে হাসতে কথা কন—নিয়ে আলাম এট্টা দুঃখী মানুষরে আপনেগো গেরামে। আমি আর থাকি কয়দিন। আপনেরা-ই দ্যাখবেন। শুনবেন। রহস্য পরিষ্কার হয় না। তাদের নিজস্ব মানুষ। কিংবদন্তীর মতো মানুষ। তিনি তার সুখ দুঃখের ভাগিদার হতে আবার কাকে নিয়ে এলেন নতুন করে?

সেদিনও এই উঠোনে মানুষের জমায়েত হয়েছিল। মাজারে মোম জ্বালিয়ে ফকির

মানুষের ফেরার অপেক্ষায় থাকা লালনের বাঁশিতে নকশি কাঁথার মতো সুর ফুটে ফুটে উঠছিল। ঘরের ভেতর বেড়ার ফাঁক দিয়ে চোখ চালিয়ে দেখতে পেয়েছিল ফুলজান, মানুষটা তার আল্লারসুল হয়ে উঠছেন কেমন। ওই জমায়েতের সব কথা, সব ফিসফাস স্তব্ধ হয়ে যাচ্ছে, চুপ মেরে যাচ্ছে তার মানুষের গলার স্বরে—এয়েছেন এক অজান মানুষ। দুঃখী বড়ো। অবোরা বড়ো। তাঁরে যে ঠাঁই দিতি হয় বাপসকল। আল্লার দুনিয়ায় যার যেহেনে চাল মাপা হুজুরের নিরদেশ অমান্যি করবে কেডা, এঁর মা কলেন, মেয়ে সোমত্ত হয়িছে। বাপ নি। আমি চোখ বুজলি দেকপে কেডা, চারিদিকে দুষ্টু লোক। আপনি যদি গ্গরহন করেন...

মানুষগুলি আস্তে আস্তে মাথা নাড়ে। এই এক মানুষ তাদের দু-চোখে আশার প্রদীপটি জ্বালিয়ে রাখেন। খোয়াব দেখলেও ছুটে আসা এই মানুষেরই কাছে। মাটিতে আঁক কেটে খোয়াবের মানে অথবা সংকেত জেনে যাওয়া, এসব তো দীনদুনিয়ার মালিকের কাছের মানুষ না হলে হয় না।

রাত পার হলে জমায়েত ভাঙে। অভিভূত মানুষগুলির মগজে ফকির মানুষের কথা কী এক নেশা হয়ে চারিয়ে যায়। তারা ঘন রাতে কুয়াশার চাদর গায়ে মুড়ি দিয়ে মাথার ভেতর ফকিরের কথার বোল দোতারার টুংটুং-এর মতো বাজাতে বাজাতে চলে যায় নিজের নিজের ঘর গেরস্তিতে।

ঘরে ভাত ফুটছে। ফুটন্ত ভাতের গন্ধে ফুলজানের খিদে চাগাড় দিয়ে ওঠে।

ফকির মানুষ দাওয়ায় বসে আছেন এখনও। তার গলায় কী যে সুর খেলা করে। বাইরে চাঁদের আলোয় বসে হুঁকা টানছেন ফকির। উঠোনজুড়ে লালন হেঁটে বেড়াচ্ছে। একটাও কথা কয়নি সে এ পর্যন্ত বাপের সঙ্গে। এবার ফকির ডাকেন—ও বাপজান, খাবা চলো।

লালন ক্রুদ্ধ চোখে তাকায়। উত্তর দেয় না। ফকির ঘরে আসেন। খাওয়ার জায়গা করেন। ফের ডাকেন—ও বাপজান। বাপজান আমার। লালন ঘরে আসে। বসে না। ফকির বলেন—মানুষডারে যে তোমার ভরসায় নিয়ে আলাম বাপ। তা বাদে আমি নানান জায়গায় ঘুরি বেড়াই। তুমি একা থাকো। একটু ভাত-পানি এগুয়ে দেয় কে তুমারে। এ তোমারে খাতির করে চলবেনে।

লালন খেতে বসে। মুসুরির ডাল আলু সেদ্ধ, বেগুন ভাজা আর সঙ্গে গরম ধোঁয়া ওঠা ভাত। যেন জিয়ারতের খাবার। ফুলজান গ্রাস তুলতে ভয় পায়। সেই শঙ্কা তার সারা শরীরে ছড়িয়ে পড়ে। সে পর্যায়ক্রমে একবার পাতের ভাতের দিকে একবার লালনের দিকে তাকায়।

এতক্ষণ জমতে থাকা বিষাদ ক্রোধ অভিমান এই ঘরে-ও বুঝি ঘন হয়ে উঠছিল ক্রমশ। শেষ পর্যন্ত ফকির মানুষেরই কণ্ঠে মুক্তি হয় তার—

এক অজান মানুষ এসছে দেশে—তারে চিনতে হয়
তারে চিনতে হয় তারে জানতে হয়।
শরীয়তের বেনা যত জানে না তা শরীয়তে
জানা যাবে মারেফাতে, যদি মনের বিকার যায়।

লালন তার কাঁথা-বালিশ জড়িয়ে ঘর থেকে বার হয়ে গেল। আজ থেকে এ ঘরে শয্যা নেই আর। বাপ-ছেলের এতকালের শয্যাটি আজ ফকির মানুষ নিজে বিচ্ছিন্ন করেছেন। ফুলজান জানলার গায়ে হেলান দিয়ে আড়ষ্ট দাঁড়িয়ে। বড় চাঁদ আকাশে। সাদা জোছনায় ভাসছে মাঠ-ঘাট। গাছগুলি স্পষ্ট। ধানগাছের মাথায় সামান্য পাতলা কুয়াশা। ফুলজানের কান্না পায়। দু-চোখ ভরে জল আসে। আর তখনই বটগাছের মতো উঁচু লম্বা মানুষটা, এক বুক দাড়ির ভাঁজে হাসতে হাসতে ফুলজানের কাছে এগিয়ে আসেন—দ্যাখবেন, দুই চারিদিনে সব ঠিক হয়ি যাবে। এতগুলি বচ্ছর কেবল আমি আর বাপজান, বাপজান আর আমি, এই ঘরে এই বিছেনায়...তাইতি বড্ড পরাণটা পুড়তিছে। যুবতী মেয়েটি ওই লম্বা মানুষটার বুকের ভেতর মিশে যেতে যেতে শুনতে পায়—দ্যাখেন, দ্যাখেন আকাশে কত নক্ষত্র। ফুলের মতো ফুটে আছে জানি। পরাণে বেদনা হলি আকাশের দিকি চাইয়ে থাকবেন। মন খোলসা হয়ি যাবে। তখনই ফকিরমানুষের কথাকটি যেন লালনের বাঁশিতে প্রতিধ্বনি তোলে। মাঠে মাঠে বিলের জলে, আকাশে, ঘাসে ঘাসে সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ে একা হয়ে যাওয়া দুঃখী ছেলেটির বাঁশির সুর।

অথচ ফুলজানের পক্ষ থেকে প্রথম দিকে চেষ্টার ত্রুটি ছিল না। তাতে বরং ফল হয়েছে উলটো। প্রথম দিনের ক্রুদ্ধ দৃষ্টির সঙ্গে পরবর্তীতে মিশেছে ঘৃণা। লালন তাকে আহ্বান করে বড়লোকের বিটি বলে। সেই আহ্বানে মিশে যায় বিদ্রূপ উপেক্ষা অপমান। অথচ দিনে দিনে বাপের সঙ্গে সম্পর্ক তার প্রায় স্বাভাবিক। নিয়মমাফিক। বাপ যখন তার ঝোলাঝুলি নিয়ে অনেকদিনের জন্য পথে বের হন, সংসারের উনকোটি চৌষট্টি কাজ সারতে সারতে ফুলজানের শরীর ভেঙে ভেঙে পড়ে, সে তখন শুনতে পায় ফকিরের উপদেশ—রাত-বিরেতে মানুষ আলি ফিরায়ে দিও না বাপ। দুঃসময়ে মানুষ দোয়াভিক্ষা চাইতে এলে দিও তাদের তাগা-তাবিজ। আর ইন্তেকালের মানুষ এলি মাজারে তার নামে আলো জ্বালবা।

এইসব কথা শেষে ফকির বেরিয়ে পড়েন মুশকিল আসানের লম্ফটি নিয়ে। কোন মেলায়, নদীর ঘাটে, অশথতলায়, নগরে, শহরে—কখনও গান গেয়ে ওঠেন জমায়েতের সামনে।

ফুলজান তখন দাওয়ায় চুলার সামনে বসে আগুনের আভায় ও ধোঁয়ায় তার এবং লালনের রান্না সারে। ওই আগুন আর ধোঁয়ায় তার মুখের চেহারা অন্যরকম দেখায়। দূরে বসে লালন বাঁশি বাজায়। ফুলজান আগুনের ওপরকার অন্ধকারের দিকে ঠায় তাকিয়ে থাকে। ওই বাঁশিতে যেন ফুল ফুটছে একটি একটি করে। কষ্ট-ফুল। ফুলজানের চোখে জল আসে।

কোনও কোনওদিন মহা উৎসাহে ফুলজান নতুন কিছু রান্না করে লালনকে সযত্ন পরিবেশন করে—আজ নতুন পদ রাঁধিছি। রোজ রোজ একঘেয়ে। খেয়ি দেখা হোক। কাচকলার বড়ার ঝাল। লালন হাই তুলে পাত্রটি একপাশে ঠেলে উঠে পড়ে।

অতএব এত প্রত্যাখ্যানের পর ফুলজান প্রত্যাহার করেছে নিজেকে। এখন সে গলা চড়ায়। লালনের জাগরণে এবং নিদ্রায়ও। মেঝেতে বসে খোলা দরজা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে তারার টিমটিমে আলোয় অকারণে গালিগালাজ করে লালনকে। লালন কখনও উপেক্ষা করে।

কখনও তাঁর বাঁশিটি নিয়ে চলে যায় মাজারের পেছনদিকের ঘন জঙ্গলে।

কেবল ফকিরের অসুখের একটি মাস মুর্হূতকালের জন্য চোখের বাইরে যেতে চায়নি কেউ কারও। অধিকারবোধের তীব্র দাবিটি কেউ ছাড়তে চায়নি একচুলও।

সকাল গড়িয়ে দুপুর নেমেছে। ফকিরের গোসল করানো, পোশাক পাল্টানো, খেজুর কাঁটায় হাত-পায়ের নখ পরিষ্কার করা শেষ। এখন কবরে শোয়ানো হবে তাকে। তাই উচ্চস্বরে জানেজা পড়ছে সকলে। ভোঁতা চোখে ফুলজান এসব দেখে। তাকে কেউ ডাকেনি। দেখতে দেখতে তার চোখ বুজে ঘুম নামে। সে ঘুমের ভেতর খোয়াব দেখে। ঘুমের ভেতর কথা কয়।

গাঁয়ের মানুষদের কথা, চলাচলের শব্দ একসময় চুপ মেরে যায়। তারা উঠোন ফাঁকা করে চলে যায় নিজের নিজের ঘরে। ক্ষুধার্ত ক্লান্ত ফুলজান ভূমিশয্যা ছেড়ে ওঠে। আর অমনি খিদে-তৃষ্ণা ছাড়া কী-এক-নেই তার বুক খামচে ধরে।

বর্ষার সন্ধে নামে ঝপ করে। গাছে গাছে ক্রমে অন্ধকার ঘন হয়। বিলেন মাঠের ওপর দিয়ে সারি সারি বক পাখা মেলে উড়ে যায়। ফুলজান ধীর পায়ে মাজারের দিকে হাঁটে। মাজারের বেদিতে মোম জ্বলছে। লালন বসে আছে মাজারের দাওয়ায়। উসকো-খুসকো চুল। ফোলা ফোলা চোখ মুখ। ফুলজানকে দেখে মুখ ঘোরায়। তবে কপালে আজ তার কুঞ্চন নেই। ফুলজান মাজার ছাড়িয়ে কবরখানার দিকে এগোয়। চারপাশে তাকায়। এই জমি জুড়ে কেবল কবর আর কবর। প্রতিটি কবর আলাদা করে চেনা কঠিন। বড়ো বড়ো ঘাস আর আগাছার নিচে মুখ থুবড়ে পড়ে আছে। শুধু এই হাস্নুহানার পাশে দেবাংশী তেঁতুলগাছের ছায়ায় কাঁচা গাঁথনির দাগ। তার ওপর চাঁদ-তারা আঁকা। ওরই নিচে শুয়ে আছেন ফকির-মানুষ। জোছনা উঠেছে আকাশে। বিলের জলীয় বাতাস এসে গায়ে লাগে ফুলজানের। শীত করে ওঠে তার। এইসময়ে পেছনে পায়ের শব্দ ওঠে। ঝিঁঝি পোকার ডাক, বিলের বাতাস, হাস্নুহানার সুবাসের ভেতর দিয়ে সেই শব্দ একটু একটু করে স্পষ্ট হয়, লালন। বাপের কবরে মোম জ্বালাচ্ছে। আর আগরবাতি। আলো জ্বালিয়ে দোয়া চায় সে—আসসালামু আলাকুম ইয়া আহলাল কুবরে, মিনাল মুসলিমিনা...বাতাসে ফুলজানের উসকোখুসকো তেলহীন চুলের খোঁপা ভেঙে ছড়িয়ে যায়। চোখেমুখে এসে লাগে। লালন মোনাজাতের জন্য ওপর পানে হাত তোলে। মোনাজাত শেষ হলে ফুলজানের সামনে এসে দাঁড়ায়।—আব্বা অসুখের সময় নারকেলের পিঠা খেত্তি চেয়েলো।

ফুলজান অবাক দুটি চোখ তুলে তাকায়। এই কথার কার্যকারণ খোঁজে সম্ভবত। লালন ফের বলে—তা তেনি খেত্তি পারলেন না। চালিশায় মিলাদ দিও। গাঁয়ের সকলরে খেত্তি বোলো।

ফকির-মানুষের কবর থেকে গোলাপজল ও আগরবাতির খুসবু এবং মোমবাতির গরম আলোর আভা ছড়িয়ে পড়ে তামাম গোরস্থান জুড়ে। এমন বেয়াদব বাতাস বইছে যে কোনও মুহূর্তে মোমের আলো নিভে যেতে পারে। লালন বাতিটা খানিকটা আড়াল দিয়ে দাঁড়ায়। গাছে গাছে ভুল করে কোনও কোনও পাখি ডেকে উঠছে। আর কেউ তার প্রতিধ্বনি করছে।

আকাশে ঘোলাটে একফালি চাঁদ। চুপচাপ দুটি মানুষ। নীরবতা ভেঙে ফুলজান কথা কয়—

—তুমি?

—আমি চলে যাচ্ছি।

—কনে?

—দেখি।

—কবে ফিরবা?

—ফেরার মন নাই।

—ক্যানো?

—তোমার ঘর, তোমার সোমসার আমি এর মদ্দি কেডা? যার সাথে সম্পক্ক ছেল তিনিই য্যাখন...

ফুলজান ঝংকার দিয়ে মুখ ফিরিয়ে নেয়। ফের যখন কথা বলে তখন তার গলায় বিষাদ—ও আমার পর রাগ পুষে রাখা হয়েছে। আমিই তালি যাই যেদিকি চোক যায়। গরীবির মেয়িরে মানুষডা দয়া করি আছছাড়া দেলেন। তা তিনি য্যাখন নেই...।

ফুলজান কথা শেষ করে না। লালনের দিকে চায়। লালন-ও তাকিয়ে আছে তারই দিকে। মনে মনে অবাক হয় লালন—মেয়িমানসের চোখের কানী য্যাখন পুরনো হয় ত্যাখন বুকে এরাম ধারা মোচড় দ্যায় নাকি পুরুষমানুষদের? সে আপন মনেই কথা কয়—হায় হায় আল্লারসুল। বড়লোকির বিটির চোখ দুখান আমাগের মেয়িদের লাখান লাগে ক্যান? কুনোদিন ঠাহর করি নাই আগে।

লালনের নীরবতার সুযোগে ফুলজান গুছিয়ে ওঠে। তার এই গোঙানি মাজার, গোরস্থান, গাছপালা, পাখপাখালি উজিয়ে যেন ভেসে যায় ধানখেত ছাড়িয়ে বিকেল মাঠ ছাড়িয়ে মায়াবিলের বুকে। ডুব খায়। ভেসে ওঠে। ফের ডুব খায়। ওই ভাসা-ডোবার গোঙানিতে স্তব্দ লালন। বিপর্যস্ত লালন দিশা না পেয়ে ফুলজানের কাছে ঘনিষ্ঠ ঝুঁকে দাঁড়ায়। ফুলজান দেখতে থাকে লালনকে। এই নিঠুর বে-দরদী পাষাণপারা মানুষ যখন বাঁশিতে তার কণ্ঠ-ফুল ফোটায়, সে ফুলের সুবাস, সে ফুলের অশ্রু ফুলজানের বুকের ভেতর পর্যন্ত সেঁধিয়ে যায়। ফুলজান অভিমানী হয়—ক্যামনধারা মানুষ তুমি? ও পুরুষ? শিশুকাল থেকে ফকির মানুষের সঙ্গ করলে, তার মায়াদয়া এট্টু পেতে নি?

ফুলজান কথা বলে। তার ঠোঁট নড়ে না। লালন কথা বলে। তার ঠোঁট নড়ে না। সাক্ষী থাকে গোরস্থান। সাক্ষী থাকে ফকির মানুষের চাঁদ-তারা আঁকা টাটকা কবর। সাক্ষী থাকে আকাশের ফিকে জোছনা।

পৃথিবীতে কিছু অকথিত কথা এই মুহূর্তে আপনা-আপনি জন্মহীন মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়ে।

সাপলুডো

পার্থপ্রতিম কুণ্ডু

এক.

বর্ষার দিন। সকাল থেকে সারাদিন অবিরাম বৃষ্টি। কোথাও বেরোতে পারেনি মণিমোহন। বঙ্গেশ্বরের সঙ্গে মুখোমুখি বসে সাপলুডো খেলছে। এ খেলা অবসরে এখনও ভালো লাগে মণিমোহনের। মণিমোহন বলে, 'এ খেলায় ফ্যানটাসির জগৎ গড়ে ওঠে। সারাদিন, সারা মুহূর্ত তো বাস্তবের কঠিন আঙিনায় মনগুলো ক্ষতবিক্ষত হয়ে যায়, তখন লেনিন রচনাবলি পড়ে আদর্শ ঝালিয়ে নিয়ে কিছুটা শান্তনা হয়তো পাওয়া যায় বটে, কিন্তু সবসময় তো পড়তে ভালো লাগে না, আর যখন পড়তে ভালো না-লাগে, তখনই শুরু করি সাপলুডো।'

সাপলুডো দুজনের খেলা। চল্লিশ বছরের ছোট কমরেড বঙ্গেশ্বরের সঙ্গে সাপলুডো খেলতে খেলতে মেতে ওঠে মণিমোহন। কখনও ছক্কা, কখনও পুট্। ছক্কা বা পুট্ এই সংখ্যা দেখে, আপাত বোঝার উপাই নেই, খেলার বিচারে কোনটা লাভজনক। ছক্কা বা ছয় প্রাপ্তি গাণিতিক হিসাবে নিশ্চয়ই বেশি, কিন্তু খেলার ফলাফলের নিরিখে দেখা যায় হয়তো পুট্ বা এক-ই অধিক লোভনীয়। অদ্ভুত এ খেলা। অধিক প্রাপ্তি পেয়েও অবনমন হতে পারে সাপের মুখে পড়ে, আবার কম প্রাপ্তিও অনেক সময় মই দিয়ে তরতর করে বেয়ে উর্দ্ধে আসীন হয় নির্দিষ্ট লক্ষ্য বা ঘুটি। এই খেলায় স্থিতাবস্থা বলে কিছু নেই। কখনও উত্থান কখনও পতন। এই উত্থান পতনের মধ্যেই এই খেলার রোমাঞ্চ লুকিয়ে আছে।

দুই.

যুগ বদলেছে। মণিমোহনের যুগ নয় এখন। একবিংশ শতাব্দির গোড়ায় হাইটেক কমপিউটরের যুগে মণিমোহন অচল। ক্রমাগত উত্থানের যুগেও মণিমোহন তাই বদলাতে পারে নি। পারেনি বললে ভুল হবে, বদলানোর চেষ্টা করেনি। চেষ্টা করলে যে সফল হতো, একথা জোর দিয়ে বলা যায় না।

তিন.

মণিমোহন খেলতে বসেছে। বঙ্গেশ্বর চাল দিচ্ছে। তিন পড়লে মই, দুই পড়লে সাপের মুখ। মণিমোহনের অবস্থান এখন চল্লিশে, আর বঙ্গেশ্বর পাঁচ-এ। আগের চালের প্রাক্‌মুহূর্তে বঙ্গেশ্বর ছিল উনননব্বুই। এক ছক্কা দুই পড়ে সাতানব্বুই-এ পৌছায়। কিন্তু সেখানে ছিল এক লম্বা সাপ। সাপের মুখে পড়ে তার এই বিশাল পতন পাঁচ-এ। মনটা খারাপ হয়ে যায় বঙ্গেশ্বরের। মণিমোহন মনে মনে এক ছক্কা পড়ার পর দুই-এর কামনাই করছিল, কারণ সাতানব্বুই-এর ঘর পেরিয়ে গেলে আর কোনো সাপ নেই, তাই ওটা পেরোলে যে কোনো মুহূর্তে পৌছে যেতে পারে একশ-র ঘরে। বঙ্গেশ্বরের জয় মণিমোহন মেনে নিতে পারে না।

যে জীবনে সব কিছু ত্যাগ করেছে, হেলায় উপেক্ষা করেছে অসংখ্য প্রাপ্তি, সেও একবার ঈশ্বরকে মনে মনে ডাকে বঙ্গেশ্বরের এক ছক্কা দুই-এর জন্য। এক ছক্কা দুই মানে সাপ। সাপ মানে পতন। বঙ্গেশ্বরের পতন। মানে বঙ্গেশ্বরের হার। মানে নিজের জয়। মণিমোহনের জয়। বঙ্গেশ্বরকে সে কিছুতেই জয়ী হতে দিতে চায় না, জয়ী হতে চায় নিজে, একক মণিমোহন নিজে। ছক্কার পর দুই পড়তেই মণিমোহন লাফিয়ে ওঠে। দুহাত তুলে জয়ের আনন্দ নেয়। এ জয় তার নিজের জয় নয়, বঙ্গেশ্বরের পরাজয় তার জয়। এবার আবার বঙ্গেশ্বরের চাল। মনে মনে বিড়বিড় করে চাল দেয় বঙ্গেশ্বর। না, দুই-তিন কিছুই নয়, পড়ল পাঁচ। পাঁচ থেকে হেঁটে হেঁটে দশ-এ। সেখানে না আছে মই, না আছে সাপ।

চার.

সারি সারি পতনের মধ্যে মণিমোহন হেঁটে যায়। দূর থেকে মণিমোহনের উত্থান চেনা যায় এ উত্থান মণিমোহনের মাথার টুপি, কাঁধের ব্যাগ। এ উত্থান মণিমোহনের লাঠি। মণিমোহন এখন বাহাত্তর। তবু বদলাতে পারেনি আগের অভ্যাস। মণিমোহনের লাঠি, হাতের লাঠি নয়, বেতের ছড়ি। রাত বেরাতে ঘরে ফেরা মণিমোহনের যুক্তি 'এ লাঠি কাউকে মারার জন্য নয়, রাস্তার কুকুর অথবা ছিঁচকে চোর এদের ভয় দেখানোর জন্য।' আর টুপি? মণিমোহনের উত্তর 'গ্রীষ্মের দাবদাহ, বর্ষার ঝিরিঝিরি বৃষ্টি কিম্বা প্রথম শীতের হিম থেকে বাঁচায় এই টুপি।' ব্যাগ কেন? কেউ প্রশ্ন করেনি। কারণ কমরেড মণিমোহনকে এই ব্যাগেই চেনা যায়।

পাঁচ

মণিমোহন চল্লিশে। মনে মনে 'পুট্' কামনা করে। তাহলে এক লাফে সাতাশি, আর বঙ্গেশ্বর বলে 'হয় 'চার' নয় 'এক ছক্কা তিন।' দুটোই সাপের মুখ, অর্থাৎ পতন। অর্থাৎ মণিমোহনের পতন।'

—'নিজের জন্য তুই বল, আমার কি পড়বে তুই বলছিস কেন?

—কেন আমার সময় তুমি করোনি, এক ছক্কা পড়ার পর 'দুই' মনে মনে কামনা করো নি?

—না।

—তাহলে সাতানব্বুই-এ পৌঁছে সাপের মুখে পড়ে পাঁচ-এ যখন এলাম, তোমার দুই হাত তুলে নৃত্য কিসের জন্য?

মণিমোহন লজ্জা পায়। নিজের কাঙ্খিত জয়-এর আকাঙ্খা অন্যের কাছে ধরা পড়ে লজ্জা পায় বাহাত্তর বছরের অকৃতদার সর্বত্যাগী কমিউনিস্ট মণিমোহন।

ছয়.

মণিমোহন পার্টির হোল টাইমার। ষাট বছর পর্যন্ত ভাতা নিয়েছে। তারপর রিটায়ার্ড কমরেড। মণিমোহনের যুক্তি, 'নেতা হলে, কাজ বেশি থাকতো, আরো কিছুদিন চালিয়ে যেতাম। আর মন্ত্রী হলে তো জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত পেতে বা নিতে অসুবিধা হত না, কিন্তু আমি

যে নেহাতই ক্যাডার। ষাট-এর পর আর পার্টির হোলটাইমার ভাতা নেওয়া সাজে না।

মণিমোহন অকৃতদার। তবু এক সন্তান জুটে গেছে মণিমোহনের। আ-শৈশব পিতৃ-মাতৃহীন এক অনাথ সন্তান। সন্তানের নাম রেখেছে বঙ্গেশ্বর। ৭১-এ পূর্ব বাংলায় শরণার্থীদের মধ্যে কাজ করতে গিয়ে লাভ করেছিল বছর দু-এর এক অনাথ। বাবা-মা দুজনেই ইয়াহিয়া খানের বর্বর আক্রমণে নিহত হয়েছেন। আর শেষমেষ শরণার্থীদের কোলে কোলে এসে হাজির হয়েছে শিবিরে। আর তখন কমরেড মণিমোহন যে কিসের ভরসায় তাকে বুকে তুলে নিয়েছিল তা বিধাতায় জানেন। অকৃতদার মণিমোহন কিন্তু বলে 'সব লেনিনেরই ইচ্ছে।'

সাত

চাল দেয় মণিমোহন। না কোনটাই মিলল না। তিন। সরাসরি হেঁটে তেতাল্লিশ। এবার বঙ্গেশ্বরের চাল। 'মা কালি আবার পাঁচ ফেল' বঙ্গেশ্বর মনে মনে বলে। পড়লোও পাঁচ। বঙ্গেশ্বর সোজা বাহাত্তরে দাঁড়িয়ে গেল। মণিমোহন এখনও পিছিয়ে। কোনো আরাধ্য দেবতা নেই মণিমোহনের। বঙ্গেশ্বরের বাহাত্তরে পৌছনো কেমন যে লোভী করে দিল, বাহাত্তর বছরের মণিমোহনকে। সেও আজ নিজের মনের অজান্তে মা লক্ষ্মীর নামে চাল দিল, পড়ল চার। সে মই বেয়ে উঠে অষ্টআশি। বঙ্গেশ্বর কেমন 'থ' হয়ে গেল। মনের বিষণ্ণতা নিয়ে চাল এবং পতন। বাহাত্তর থেকে সাতান্ন। মা চণ্ডীর নামে চাল এবং আবার মণিমোহনের উত্থান, অষ্টআশি থেকে ছিয়ানব্বুই। বঙ্গেশ্বরের মুখ দিয়ে কথা সরছে না। বঙ্গেশ্বরের আবার পতন। সাতান্ন থেকে আটচল্লিশ। আর মণিমোহন এখন অন্তিম প্রাপ্তির প্রাক্মুহূর্তে। এখন মাত্র পুট্, দুই, তিন, চার, এই চারটি সংখ্যাই কাজে লাগবে। অন্যগুলো বাতিল। পুট্ পড়লে সাতানব্বুই। অর্থাৎ বিরাট সাপের মুখ, বঙ্গেশ্বরে একবার যা হয়েছিল। আর চার পড়লে চরম প্রাপ্তি একশ।

আট

বঙ্গেশ্বর এখন বছর তিরিশের যুবক। মণিমোহন তার পিতা নয়, কমরেড। কমরেড মানে বন্ধু। মণিমোহন তার আদর্শ, তার প্রেরণা, তার শিক্ষক। তার লক্ষ্য। তার অন্তিম। মণিমোহন এক-কথায় তার সব। বঙ্গেশ্বরের পড়াশুনার মান সাধারণ। স্থানীয় কলেজ থেকে বি. এ. পাশ। বিদ্যার্জন তার লক্ষ্য নয়, লক্ষ্য মণিমোহন। মণিমোহনও তাকে তার নিজের আদর্শে অনুপ্রাণিত করতে চেয়েছে। বঙ্গেশ্বরও চেষ্টা করেছে যথাসাধ্য, তা পালন করতে।

মণিমোহন স্ব-পাক অন্নগ্রহণ করে। একবেলা। সকালে স্নান করে নিজের হাতে জামা ও ধুতি পরিস্কার করে, গরম ভাত ও যোগানমত আনুসাঙ্গিক খেয়ে সকাল ৯টার মধ্যে পার্টির কাজে বেরিয়ে পড়ে। সারাদিন সাধ্যমত দৌড় ঝাঁপ করে অধিক রাতে যখন বাড়ি ফেরে তখন চিড়ে, ছাতু, মুড়ি, ইত্যাদি ব্যতিরেক বিশেষ কিছুর আয়োজন করা সম্ভব হয় না। ফিরে বঙ্গেশ্বরের সঙ্গে কিছুক্ষণ কথা, তারপর পড়াশুনা, তারপর ঘুম।

নয়.

বঙ্গেশ্বরের এখন আটচল্লিশ আর মণিমোহনের ছিয়ানব্বুই। এবার বঙ্গেশ্বরের চাল, ঘরে

টাঙানো এঙ্গেলস্ এর ছবির দিকে তাকিয়ে চাল দিল বঙ্গেশ্বর। এবং আটচল্লিশ এক লাফে নব্বুই হয়ে গেল। এতক্ষণ সে নিস্পৃহ ছিল। খেলার প্রতিযোগিতায় ফিরে এসে আবার কেমন লোভী হয়ে গেল। লোভ এখন তার সর্বাংশ গ্রাস করছে। পিতার অধিক কমরেড মণিমোহনকে হারাতে তার লোভ হিংস্র হয়ে উঠেছে। মণিমোহনের চালে পুট, দুই, তিন, চার কোনটাই এল না। চাল বাতিল। অর্থাৎ স্থিতাবস্থা অর্থাৎ মণিমোহনের ছিয়ানব্বুই আর বঙ্গেশ্বরের নব্বুই। এঙ্গেলস এর পাশে ছিল মার্ক্স-এর ছবি। মার্ক্স-এর ছবির দিকে একটানা তাকিয়ে বিড়বিড় করে বললো, 'এক ছক্কা পুট বাদে যে কোনো কিছু'। এক ছক্কা পুটের অর্থ সাতানব্বুই অর্থাৎ সাপ যার এক ঘর আগে ছিয়ানব্বুই-এ মণিমোহন অপেক্ষা করছে। বঙ্গেশ্বরের চাল-এ পড়ল পাঁচ। অর্থাৎ পঁচানব্বুই। এখন বঙ্গেশ্বর মণিমোহনের ঘাড়ে নিঃশ্বাস ফেলছে। দুই কমরেডের ঘুঁটি পাশাপাশি এগিয়ে চলেছে, একজন ছিয়ানব্বুই, একজন পঁচানব্বুই, এবার মণিমোহনের চাল। বাইরের বৃষ্টি কখন থেমে গিয়ে রোদ উঠেছে, দুজনের কারও খেয়াল নেই।

দশ.

মণিমোহনের জীবনধারণ পদ্ধতিতে বঙ্গেশ্বরও রপ্ত হয়ে গেছে বহুদিন। সকালে মণিমোহনের সঙ্গে গরম ভাত খেয়ে নিজেও বেরিয়ে পড়ে যুব-ফ্রন্টের কাজে। মণিমোহন হোলটাইমারের ভাতা নেওয়া বন্ধ করার পর বঙ্গেশ্বর হয়েছে যুব ফ্রন্টের পার্টির হোলটাইমার। তারই প্রাপ্ত ভাতা থেকে মণিমোহনের দিনযাপন। হোলটাইমার হওয়ার পর আজকাল মণিমোহনের মত একটা টুপিও পড়তে শুরু করেছে বঙ্গেশ্বর। কাঁধে ব্যাগ নেওয়া অভ্যাসতো ছিলই। তারপর টুপি পড়া শুরু করলে দূর থেকে, বঙ্গেশ্বরকে অনেকটা জুনিয়র মণিমোহন মনে হয়। জুনিয়র এই কারণে, দূর থেকে সার্টপ্যান্ট পরা বঙ্গেশ্বরকে কখনই ধুতি-সার্ট পরা মণিমোহনের সঙ্গে গুলিয়ে ফেলা যাবে না।

এগারো.

খেলা আজকের মত স্থগিত করে দুজনে। আজই জেলা-কমিটির মিটিং। এলাকার বিধায়কের মৃত্যুতে আসন শূন্য। নতুন বিধায়কের জন্য নাম বাছাই করা হবে এ মিটিং-এ, পার্টির গোষ্ঠিগত সমীকরণে জেলাসম্পাদক নিজে প্রার্থীপদ চাইবেন। অন্যের প্রস্তাব মোতাবেক সেই নাম পাশ করাবে। রাজ্য নেতৃত্বও এই গোষ্ঠীকোন্দলকে সামাল দেওয়ার জন্য দুপক্ষেরই গ্রহণীয় এমন নাম প্রস্তাব করতে পারেন। এবং সেক্ষেত্রে মণিমোহনের নাম ওঠাটাও আশ্চর্যের নয়। মিটিং শুরু। যথারীতি পূর্ব পরিকল্পনামাফিক কমরেড আতাউর রহমান বলেন,

—আমাদের বিধায়কের পদ শূন্য। আগামী একমাসের মধ্যে উপ-নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে। তাই সমগ্র দিক বিবেচনা করে আমি আমাদের কমরেড সম্পাদকের নাম এই পদের জন্য প্রস্তাব করছি।

—আমরা এই প্রস্তাব সমর্থন করছি। উনিশ জনের জেলা সম্পাদক মণ্ডলীর এগারো জন সমস্বরে চেঁচিয়ে উঠলেন।

রাজ্যসম্পাদক মণ্ডলীর পক্ষে এই সভায় হাজির ছিলে বর্ষীয়ান কমরেড তরণী ঘোষ।

তিনি মণিমোহনকে চেনেন। একসময় একসঙ্গে জেলও খেটেছেন। এগারোজনের মধ্যে মণিমোহনকে না দেখে তিনি একটু বিস্মিত হলেন। কিন্তু মুখে কিছু বললেন না। কমরেড ঘোষ যথারীতি সভার নিয়ম মোতাবেক অন্যমত আহ্বান করলেন।

প্রথমেই বললেন বিরোধী গোষ্ঠী খ্যাত কমরেড মৃদঙ্গ হাজরা,

'কমরেড সম্পাদক জেলার দায়িত্বে আছেন। বিশাল এই জেলার দায়িত্বে থাকার পর বিধায়কের দায়িত্ব পালন করা তাঁর পক্ষে অসম্ভব। তাই আমরা চাই নতুন কোনো প্রার্থী।

সম্পাদক আর মুখ বুজে থাকতে পারলেন না। বললেন, কমরেড হাজরার আশঙ্কা সঠিক নয়। আর প্রয়োজন হলে তিনি জেলা সম্পাদকের পদ ছেড়ে দেবেন।

—তাহলে বিধায়কের পদ ছেড়ে অন্য কাউকে দায়িত্ব দেওয়া বাধা কোথায়?

যুৎসই উত্তর খুঁজে পেলেন না সমস্বরী এগারো জন। শেষে অসহায়ের মত বললেন, 'তাহলে ভোট হোক।' ভোটের মাধ্যমে যে বিশেষ কোন সুরাহা হবে না তা অঙ্কের হিসাবে কমরেড হাজরা জানতেন তাই তিনি ভোট এড়িয়ে অন্য কোন পন্থা খোঁজার জন্য বললেন— 'বরং, আসুন আমরা সকলেমিলে সর্বজন গ্রাহ্য এমন একজনের নাম সুপারিশ করি যিনি আমাদের সকলেরই নেতা বলে বিবেচিত হবেন।'

রাজ্যসম্পাদক মন্ডলীর পক্ষে কমরেড তরণী ঘোষ সঙ্গে সঙ্গে এই গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব এড়ানোর জন্য এই প্রস্তাব লুফে নিলেন বললেন, 'বলুন তেমন নাম থাকলে প্রস্তাব করুন।'

কমরেড হরেন অধিকারী বললেন, 'আপনারা সকলেই কমরেড মণিমোহনকে জানেন, তিনি আমাদের সকলের শ্রদ্ধেয়, আসুন সকলে মিলে আমরা তার নাম বিধায়কপদের জন্য রাজ্যসম্পাদকমণ্ডলীর কাছে সুপারিশ করি সর্বসম্মত ভাবে।'

কমরেড সম্পাদক ও তার আজ্ঞাবাহ সমস্বরকারী এগারো জন এই নামের জন্য প্রস্তুত ছিল না। এই নামের বিরোধীতা করার বিশেষ কোন যুক্তি নেই অথচ এই নাম মেনে নিলে তাদের গোষ্ঠীর পরাজয় বলেই বিবেচিত হবে, বিরোধীদের কাছে। অতএব তৃতীয় কোনো প্রার্থীর নাম সুপারিশ করা শ্রেয়, বিবেচনা করে কমরেড সম্পাদক বললেন, 'কমরেড মণিমোহন আমাদের শ্রদ্ধেয়, কিন্তু তার বয়সের কথা বিবেচনা করে আমরা তরুণ কোনো কমরেড-এর নাম এই পদের জন্য সভার নিকট ভাববার আবেদন জানাচ্ছি, তবে কমরেড মণিমোহন যদি চান...' জেলা সম্পাদকের কথাকে সমর্থন করে কমরেড হাজরা বললেন, 'কমরেড সম্পাদক ঠিকই বলেছেন, এক্ষেত্রে তরুণ কোনো কমরেডের নাম সুপারিশ করাই যুক্তিগ্রাহ্য হবে।' রাজ্য সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য কমরেড ঘোষ বললেন, 'তাহলে প্রস্তাব দিন জেলার উদীয়মান কোনো তরুণ কমরেড।' জেলা সম্পাদক বললেন, 'কমরেড বঙ্গেশ্বর আমাদের জেলার যুব সম্পাদক। দারুন উদ্যোগী কমরেড, তারনাম আমরা বিবেচনা করতে পারি।'

বঙ্গেশ্বরের নাম যে বিধায়ক পদে তার বিপরীতে আসতে পারে মণিমোহন কল্পনাও করতে পারেনি। প্রার্থীপদ নিয়ে সর্বজনগ্রাহ্য কোনো সিদ্ধান্তে পৌঁছতে না পেরে সেদিনের সভা মুলতবী করা হল। রাজ্যসম্পাদক মন্ডলীর সদস্য কমরেড ঘোষ ঘোষণা করলেন, আগামী কাল ঠিক বারোটায় আবার এই স্থগিত সভা শুরু হবে। আপনারা প্রত্যেকেই ভাবুন।

আপনাদের সকলের কাছে আমার অনুরোধ আপনার সময়মতো পৌছোন।

বারো.

প্রাথমিক ভাবে মণিমোহন তেমন রাজী ছিল না, কিন্তু বিপরীতে বঙ্গেশ্বরের নাম ওঠায় কেমন যেন ইচ্ছা প্রবল হয়ে উঠল। বঙ্গেশ্বরকে হারানো ইচ্ছা, যেমন সাপলুডোতে হয়েছিল আজই সকালে। তার মধ্যে যে কিছু প্রাপ্তির এমন তীব্র আকাংক্ষা লুকিয়েছিল, তা মণিমোহন সত্তর বছরের বোঝেনি, কিন্তু আজ সকালে বঙ্গেশ্বরের সঙ্গে সাপলুডো খেলতে বসে সে আকাঙ্খা উস্কে উঠেছে, উস্কে দিয়েছে বঙ্গেশ্বর।

বাড়ি ফিরতে ফিরতে মণিমোহনের রাত ১০টা বেজে গেল। বঙ্গেশ্বর ইতিপূর্বে বিধায়কের পদে তার নাম যে উত্থাপিত হয়েছে সে কথা জেনে গেছে কমরেড মারফৎ।

দুজনে মুখোমুখি বসে কেউ কারো সঙ্গে কথা শুরু করতে পারছে না। মণিমোহনই প্রথম কথা শুরু করে,—কিরে খাওয়া হয়েছে?

—না,

—খাবি না?

—হ্যাঁ।

—ঘরে কি আছে?

—তুমি তো জানো।

—যা আছে দুজনের হবে?

—হ্যাঁ।

—নিয়ে আয়।

—আমার খিদে নেই।

—কেন, অন্য কিছু খেয়েছিস?

—না।

—তবে?

—এমনি।

—এমনি মানে?

—তোমার খিদে থাকে, তুমি খাও।

—আমার ওপর রাগ করেছিস?

—না।

—জেলা সম্পাদকমণ্ডলী রিপোর্ট আগে ভাগে পেয়ে গেছিস বুঝি?

নিরুত্তর থাকে বঙ্গেশ্বর।

বঙ্গেশ্বর কিছু খায় না। মণিমোহন এক গ্লাস জল খেয়ে বঙ্গেশ্বরকে কাছে ডাকে।

—মন ভালো নেই?

—খারাপ হবে কেন?

—না এমনি বলছিলাম।

বঙ্গেশ্বর সাপলুডো নিয়ে আসে। সকালের স্থগিত খেলাটা খেলতে বসে।

'মনে আছে তো?' মণিমোহন বলে।

—মনে থাকবে না কেন? তোমার ছিয়ানব্বুই, আমার পঁচানব্বুই।

—ঠিক আছে, গুটিগুলো ঠিক ঠিক ঘরে রাখ। ছক্কাটা দে।

মণিমোহন এবার চাল দিতে যাবে, আর হেলা ফেলা করার উপায় নেই। বঙ্গেশ্বর তার ঘাড়ের কাছে নিশ্বাস ফেলছে। সকালে একবার মা লক্ষ্মীর নামে চাল দিয়ে তেতাল্লিশ থেকে অষ্টআশি তারপর মা চণ্ডীর নামে চাল দিয়ে অষ্টআশি থেকে ছিয়ানব্বুই। তারপর আর কাউকে স্মরণ করেনি। আর দরকার মাত্র চার। অথচ চালে পড়েছিল পাঁচ। চাল কাজে আসেনি অথচ সেই সুযোগে বঙ্গেশ্বর আটচল্লিশ থেকে নব্বুই, আর নব্বুই থেকে পঁচানব্বুই-এ পৌঁছোল।

এবার মণিমোহনের চাল। মণিমোহন ভাবে বঙ্গেশ্বর পরপর দুটি সফলতার নিহিত শক্তির কথা। বঙ্গেশ্বরের মা-কালী স্মরণে দশ থেকে বাহাত্তরে উত্তীর্ণ—মণিমোহনকে আরাধ্য আরাধনাতে আকৃষ্ট করেছিল এবং সেই পথে মা লক্ষ্মী ও মা চণ্ডীর কৃপায় তার এই ছিয়ানব্বুইএ উত্থান এবং তার এই উত্থানের সময় বঙ্গেশ্বর এরপর দুবারই পতন। বাহাত্তর থেকে সাতান্ন, সাতান্ন থেকে আটচল্লিশ। মা চণ্ডীর কৃপাধন্য হয়ে যেবার ছিয়ানব্বুই-এ পৌঁছল মণিমোহন, তখনই বঙ্গেশ্বরের ঘুরে দাঁড়ানো। এই চালের পিছনে তবে কি তার উদাস দৃষ্টিতে ছবির দিকে তাকানো, হঠাৎ মণিমোহনের মনে পড়ে। পরপর তিনটি ছবি এঙ্গেলস মার্কস ও লেনিন তবে কি পরপর দুটি চালে এঙ্গেলস ও মার্কসকে স্মরণ? তাদের আশীর্বাদ স্নাত হয়েই কি বঙ্গেশ্বরের এই উত্থান? তবে কি এবার সে লেনিনের ছবির দিকে তাকিয়ে চাল দেবে? চাল দেওয়ার প্রস্তুতি নেয় মণিমোহন, যে কোনো ভাবে তাকে চাল ফেলতে হবে। ছক্কাটিকে হাতের কারসাজি করে চাল দেওয়ার চেষ্টা করে। বঙ্গেশ্বর আপত্তি জানায়,

—ভাল করে নাড়িয়ে ফেলো। জোচ্চুরি কোরো না।'

কোনদিন তো এরকম হয় না, আজ কেন হচ্ছে। মণিমোহন ভাবে।

'জোচ্চুরি করছি কোথায়, এই দেখ ভালো ভাবে নাড়ালাম'।

জোচ্চুরি কথাটি মণিমোহনকে লজ্জা দেয়। তবু এ লজ্জা সে গায়ে মাখে না, জানে জিততে হলে এরকম ছোট খাটো কথায় রাগ করতে নেই। লক্ষ্য তার জয় অতএব যে কোনো মূল্যে জয় করায়ত্ব করতে পারলেই সবাই সব ভুলে যাবে, জয়ীকে মেনে নেবে। জয়ের পদ্ধতি নিয়ে কথা উঠবে না।

প্রাপ্তির প্রাকমুহূর্তে শেষ চাল দিতে প্রস্তুত মণিমোহন। নিজের জয়ের আনন্দ, অন্যকে হারানোর লোভ, অন্যর জয়ে ঈর্ষা, অনৈতিক কৌশল অবলম্বন, এতসব কিছুর সমন্বয়ে মণিমোহন এখন কমরেড-এর খোলস ছেড়ে অতি সাধারণ স্তরে নেমে আসে। সারাজীবনের ত্যাগী, সংযমী, কৃচ্ছসাধনকারী আদর্শবান কমরেড মণিমোহন জয়ের আনন্দে জয়ের লক্ষ্যে, জয়ের দ্বারপ্রান্তে যেন অল্প বিস্তর বিচ্যুত হয়। ত্রিশ বছরের বঙ্গেশ্বরের আদর্শ কমরেড মণিমোহনকে আজ যেন কেমন অন্যরকম লাগে, এ মণিমোহন তার পূর্ব পরিচিত নয়।

মুখাবয়ব

অনিশ্চয় চক্রবর্তী

আমাদের এই বাংলায়, শরতের সাহিত্য, মানে পুজো সংখ্যার লেখাগুলোর জন্য লেখকরা যখন প্রস্তুতি নেন, মনে মনে খুঁজে বেড়ান তাঁদের গল্প-উপন্যাস, খুঁজে বেড়ান মানুষ, দেশ-কাল-ইতিহাস-সমাজ-সংসারের ভেতর, খুঁজে বেড়ান চরিত্র, সেই সময়, বসন্তে-গ্রীষ্মে এবার আমি কিছুই খুঁজতে পারিনি, অনেকের মতোই। কেমন এক অক্ষম বিহ্বলতায় আমি বরং রোজ কাগজ খুলে, সাময়িকপত্রের পাতা উল্টে, টিভি-র চ্যানেলের পর চ্যানেল হাতড়ে খুঁজে বেড়াতাম, সেই সব মুখ ও শরীর, শুধুমাত্র অ-হিন্দু হওয়ার জন্য ভোটার-তালিকা ধরে ধরে যাদের হত্যা করা হচ্ছিল, ঘরবাড়ি লুট করে পুড়িয়ে দেওয়া হচ্ছিল গুজরাটের বিভিন্ন শহরে, আমেদাবাদে। প্রায় রোজই কোনও-না-কোনও দিক থেকে গুজরাট-বৃত্তান্ত ছাপা হত কাগজে, ছবি-সহ। আমি খুঁজে বেড়াতাম সেই সব মুখ, যারা 'জয় শ্রীরাম' বা 'জয় বজরং' ধ্বনি তুলে মানব-সভ্যতার ইতিহাসের ন্যক্কারজনক অপরাধগুলো করে যেত, গুজরাটের শহরে শহরে। যে হত্যালীলায় বৃদ্ধ, বৃদ্ধা, শিশু, গর্ভবতী নারী তো দূরের কথা গর্ভের অপরিণত সন্তানও রেহাই পায়নি, সেই লীলার নায়কদের আমি খুঁজে বেড়াতাম কেবলই। মনে হত, কেমন হয় এইসব নায়কদের মুখ, আমার জানা দরকার, জীবনেরই প্রয়োজনে, একবার বা দুবার দেখলে আমি অন্তত কিছুদিনের জন্যও তা মনে রাখতে পারব কিনা আদৌ, তা নিয়েও সংশয় ছিল আমার গভীর। ভাবতাম, ওই মুখ কি আর পাঁচটা সাধারণ মুখের মতো, নাকি কোথাও হিংস্রতা এসে অবধারিত উঁকি দিয়ে যায় অভিব্যক্তিতে, অভিজ্ঞ মানুষ ঠিক চিনে নিতে পারে সেই মুহূর্তটিকে। ভাবতাম, ওই মুখ কি শুধু গুজরাটে, আমেদাবাদে, ভাগলপুরে, মীরাটে, আলিগড়েই থাকে, উঁকি মারে আচম্বিতে, উঠে আসে টিভির পর্দায় অথবা পত্রপত্রিকার ছবিতে, নাকি আমাদের চারপাশেও এমনই অজ্ঞাত পরিচয়ে যে নিজেই চেনে না নিজেকে, একবার, শুধু একবার যদি কানে যায় ওই ধ্বনি, অথবা চোখে পড়ে ওই দৃশ্য, তবে তারও অভিব্যক্তি থেকে ঠিকরে বেরবে নারীঘাতী, শিশুঘাতী কোনও কুৎসিৎ বীভৎসা। এই মুখ আমি চিনব কী দিয়ে, যদি আমার পাড়ায়, পরিচিতে, পরিবার, পরিজনের মধ্যেও আত্মগোপন করে থাকে, মোক্ষম ওই মুহূর্তটির আগে আমি কি তাকে চিনতেই পারব না, যদি থাকে আমার নিজেরই ভিতর, অজ্ঞান্তে, যদি চিনতে, জানতে না পারি আদৌ তাকে, তবে কী দিয়ে গড়ে তুলব আমার সতর্কতা আর নিরাপত্তা আর চেতনের বলয়? কী করে করব আত্মরক্ষা? গৃহবাহন বা স্বজনকে বাঁচাব কোন পথে, কী উপায়ে?

ঝলক দেখাত টিভির বিভিন্ন নিউজ চ্যানেলে, দূরে পুড়ছে গাড়ি, বাড়ি থেকে উঠছে অনর্গল ধোঁয়া, কালো হয়ে যাচ্ছে ভারতবর্ষের আকাশ, আর ধাবমান নিরাপত্তাকর্মী ও ফুটপাতে থাকা মানুষজনের ওপর কোনও কোনও নিশ্চিন্ত ছাদ থেকে উড়ে আসছে আক্রমণের পাথর।

যে হাত ছুঁড়ছে ওই পাথর, তার, তাদের কৌতুকঘন মুখটা আমি বারবার দেখতাম। না হলে আমার স্মৃতিশক্তিকে যে অহেতুক পরীক্ষায় ফেলে দিতে হয়। যাতে পরবর্তীতে দেখামাত্র চিনে নিতে পারি ওই মুখ, ওই বিভঙ্গ, শরীরের, আক্রমণের, তাই দেখতাম। স্মৃতি নিয়ে আত্মবিশ্বাসী এখন হওয়াই যায়, এখনই তো আমাকে এমন কোনও পরিস্থিতিতে পড়তে হচ্ছে না যেখানে যে কোনও মুহূর্তে ঘনিয়ে উঠতে পারে প্রশ্ন, এই মুখটাই সেই মুখ কিনা, যা আমি দেখেছি বারংবার, টিভির খবরে, কাগজের পাতায়।

ওই মুখগুলির খোঁজ আমি করে যাচ্ছিলাম, ব্যাহতিহীন, বিরতিহীন, আমারই আত্মরক্ষার প্রয়োজনে। জীবনের অস্তিত্বই যদি না থাকে, তবে শিল্পের খোঁজ করবে কে, সমঝদারই বা জুটবে কোন ভূগোল থেকে? গুজরাটে কোনও শারদ-সাহিত্য নেই, রেহাই জুটেছে ওখানকার কবি, গল্পকার, প্রচ্ছদশিল্পীদের। নাহলে হয়তো দেখা যেত, সমস্ত শারদ সংখ্যা, সব কবিতা, গল্প, উপন্যাস জুড়ে ওই মুখটাই খণ্ডে খণ্ডে জুড়ে একটাই আশ্চর্য মুখ হয়ে উঠেছে, আমার জন্মভূমির, ভারতবর্ষের।

খুঁজতে খুঁজতে আমি কী পেয়েছি, তা এখন গৌণ, তবে শরৎ-এর ছোটগল্পের মুখ তো আর টিভি-র পর্দা থেকে, কাগজের পাতা থেকে পাওয়া যায় না, না পেলে আমি লিখব কী নিয়ে, বাকি সব গল্পের মুখগুলি তো গেছে হারিয়ে, যা খুঁজে পেয়েছিলাম জীবনের চারপাশ থেকে। হাওড়াতে গিয়েও যখন তেমন কিছুই পাওয়া গেল না, যার কোনও একটারও শরীরের সঙ্গে গুজরাটের মুখ, অথবা মুখের সঙ্গে গুজরাটের শরীর আমি জুড়ে দিতে পারি, সংশয়মুখর, শিল্পের জোড়, আর হয়ে ওঠে আমার এই শরৎ-এর গল্পগুলি, বা তার মধ্যে অন্তত একটাও, তখন, ঠিক তখনই পেয়ে গেলাম একটা নয়, দুটো নয়, একের পর এক আশ্চর্য মুখ। আমার খোঁজার না হলেও, অপেক্ষার সার্থকতা, শিল্পের কী ভবিতব্য তা আমি জানি না, আপাতত সেই জীবনের কথা তো হোক, যে জীবন ঝিলমের, বুড়িগঙ্গার, শীতলক্ষ্যার। মানুষেরও সাথে যার হয়ে যায় দেখা।

বিভাষীয় এক দৈনিকের প্রথম পাতায় ছাপা হয়েছিল ছবিটা। দুটি মুখ, মা ও মেয়ের। একটা মুখে যুদ্ধজয়ের তৃপ্তি ও প্রত্যয়, আর একটা মুখে অপার বিস্ময়। একটায় রক্তক্ষরণের ম্লানতা ছাপিয়ে গহন এক উজ্জ্বলতা, অন্যটায় রহস্যের উন্মোচনে অপেক্ষমান জিজ্ঞাসা। মায়ের নাম শাহনাজ, মেয়ের নাম মবিন। জম্মু জেলের বাইরে তোলা ছবি পাঠিয়েছে পি টি আই। কাগজের আরও সব খবরের উত্তেজনা, গ্লানি, অবসাদ, কৌতূহল সরিয়ে প্রথম পাতার ওই খবর আর ছবিতেই স্থির হয়ে যাই আমি।

মা, শাহনাজ আখতার কওসর, ১৯৯৫ সালের ৫ অক্টোবর, পাক-অধিকৃত কাশ্মীরের একটি পাহাড়ী গ্রামের বাড়ি থেকে বেরিয়ে পড়েছিল পথে। স্বামী, শ্বশুর, শাশুড়ির গঞ্জনা আর অত্যাচারের জ্বালা আর যন্ত্রণা থেকে মুক্তি পেতে পথ ছাড়া আর কেউ বুঝি সঙ্গী ছিল না শাহনাজের। কিন্তু পথ মানে তো পাহাড়ী পথ, যে পথের বাঁকে বাঁকে লুকিয়ে থাকে সেনাবাহিনীর বুভুক্ষু জওয়ানের দল, সীমান্তরক্ষার, অধিকাররক্ষার চেয়েও ইন্দ্রিয়ের তৃপ্তিকে যারা যে কোনও সময়েই এগিয়ে রাখতে পারে, কাজ হিসেবে। শাহনাজ তো জানত

তার গ্রামের পরিবেশ, সীমান্তের আবহাওয়া, রক্ষীদের উষ্ণতার উৎসে। শাহ্নাজ বাঁচতেই চায়নি আর, ঝাঁপ দিয়েছিল ঝিলম নদীতে। কিন্তু নদী, যার এক পাড়ে ভারতবর্ষ, অন্য পাড়ে অধিকৃত কাশ্মীর, মানে পাকিস্তান, তার স্রোতের গভীরে ক্ষণিকের জন্যও টেনে নেয়নি শাহ্নাজকে। রাতের গভীরে জন্ম নেওয়া আত্মহননের বাসনাকে এক অদ্ভুত উদাসীনতায়, ঝিলম পৌঁছে দিয়েছিল এপারে, ভারতবর্ষে, শাহ্নাজের মরণযাত্রা গতিপথ বদলে চলে এসেছিল জীবনের দিকে। সকালে ভারতীয় সীমান্তরক্ষী বাহিনী গ্রেপ্তার করে শাহ্নাজকে, অবৈধ অনুপ্রবেশকারী হিসেবে, ঝিলমের পাড় থেকে। স্বামী মহম্মদ ইউনুস জানতেও পারল না তার খাঁচা থেকে বন্দি শাহ্নাজ পালিয়ে গিয়ে কখন আরও গভীর কোনও অন্ধকার খাঁচার ভিতর চালান হয়ে গেল কীভাবে। ১৫ নভেম্বর শাহ্নাজের এক বছরের জেল হয়, সঙ্গে পাঁচশ টাকা জরিমানা।

জম্মু সেন্ট্রাল জেল থেকে শাহ্নাজকে পুঞ্চের ডিস্ট্রিক্ট জেলে পাঠিয়ে দেওয়া হয় পরের বছর ২৮ জানুয়ারি। জীবনে সন তারিখের সত্যিই কোনও তাৎপর্য আছে কিনা জানি না, শাহ্নাজ নিজে সন তারিখ মনে রাখতে পারে বা বোঝে কিনা তাও জানি না, কিন্তু ব্যক্তিজীবনের ইতিহাসের কী অপার মহিমা, পরের বছর অক্টোবরের ৬ তারিখে শাহ্নাজ জন্ম দেয় মবিনের। কী করে হল শাহ্নাজের গর্ভসঞ্চার? পুঞ্চ ডিস্ট্রিক্ট জেলের ওয়ার্ডেন মহম্মদউদ্দিন শাহ্নাজের নিঃসঙ্গতাকে, কারান্তরালের একাকিত্বকে মর্যাদা দিয়েছিল। কোনও ভালবাসা থেকে নয়, ইন্দ্রিয়ের সুগভীর তৃপ্তিতে মহম্মদউদ্দিন ধর্ষণ করেছিল শাহ্নাজকে। বারে বারে, কারাবাসের মেয়াদ বেড়ে গেছে শাহ্নাজের, কেউই তাকে মুক্তি দেওয়ার সাহস দেখাতে পারেননি, কোনও বিচারপতি। সীমান্তের ওপারের মরণ এপারে জীবন হয়ে বেঁচে থাকে, ওপারের মুক্তি এপারের কারাগারে অনিশ্চিত বন্দিত্বে বদলে যায়, ওপারে নিগ্রহ, নির্যাতনময় বিবাহ এপারে ধর্ষণে এসে ঠেকে।

একবছর ৩ আগস্ট শাহ্নাজ ছাড়া পায় জেল থেকে, সঙ্গে পাঁচ বছরের মবিন। আবার কোন বন্দিত্বে গিয়ে ঠেকবে তার জীবন, কে বলতে পারে। তবে বিচারপতি বলেছেন, শাহ্নাজকে এভাবে বছরের পর বছর জেলে আটকে রাখার পেছনে কোনও মানবিক সত্তা বা মন কাজ করেনি আদৌ। স্রেফ অভ্যাস বা প্রথা থেকেই তার কারাবাসের মেয়াদ কেবলই বাড়িয়ে যাওয়া হয়েছে। ওই দুই বিচারপতি, তেজিন্দার সিং দোয়াবিয়া এবং সুরেশকুমার গুপ্তা জানিয়েছেন, শাহ্নাজের মেয়ে মবিন ভারতীয় নাগরিক। ওইটুকু মেয়ের বেড়ে ওঠার স্বার্থেই শাহ্নাজকে থাকতে দিতে হবে ভারতে। সরকার যেন অবিলম্বে ৩ লাখ টাকা ক্ষতিপূরণ দেয় মবিনকে। না, বিচারপতিরা বিশ্বাস করেননি মা শাহ্নাজকেও। বলেছেন, ওই টাকা মবিনের নামে আমানত হিসেবে থাকবে ব্যাঙ্কে। যতদিন মবিন ভারতে থাকতে চায়, যতদিন পাকিস্তানের সরকার শাহ্নাজকে দেশে ফিরিয়ে নিতে না চায়, দুজনেই থাকবে ভারতে। সরকার তাদের থাকার নিরাপদ জায়গা দেয় যেন, এখনই।

ধর্ষণের কী মহিমা, শাহ্নাজ মাতৃত্ব অনুভব করল, অপত্যের স্বাদ, স্বাভাবিক জীবন পেল। উকিল অসীম সাহনি মামলা লড়েছেন শাহ্নাজের হয়ে। বলেছেন, মবিন তো বিনা

দোষে জেলে কাটাল জীবনের প্রথম পাঁচটা বছর। সূর্য কাকে বলে জানে না সে। চাঁদ তো চেনেই না। আলু আর পেঁয়াজ দেখছে জীবনে প্রথমবার, জেল থেকে বেরিয়ে, জম্মুর বাজারে। দেখছে গাড়ি, উঁচু উঁচু বাড়ি, রাস্তার ঝলমলে আলো। সে শুধু চেনে অন্ধকার। অসীম নিজের বাড়িতে নিয়ে গেছেন মা আর মেয়েকে। অসীমের বাড়িতে পৌঁছে মবিন জীবনে প্রথম দেখল রান্নাঘর, খোঁজ নিয়েছে, কোনটা কী। জানতে চেয়েছে, আলু আর পেঁয়াজ দেখিয়ে, ওগুলো খায়, না মাথায় দেয়। খেলে, স্বাদ কেমন, ঝাল না মিষ্টি। মুক্তি কাকে বলে, খোলা আকাশ, অবাধ দৌড়, লাফিয়ে বেড়ানো, জানে না মবিন। সে লাফাচ্ছে, দৌড়চ্ছে, চিৎকার করছে। চারপাশের জীবন দেখে মবিন যেন হারিয়েই ফেলেছে নিজেকে, এমন উচ্ছ্বাস তার। প্রতিটি মুহূর্ত দিয়ে মবিন অনুভব করছে মুক্তি। বাজারে নিয়ে গিয়েছিলেন, নিজের গাড়িতে করে, মবিনকে, অসীম। সেখানে মবিন অনেক মিষ্টি কিনেছে, গাড়ির জানলা দিয়ে কেবলই দেখেছে খোলা আকাশ আর রাস্তার মুক্ত, স্বাধীন মানুষজন।

শাহনাজ জানিয়ে দিয়েছে, আর কখনও সে যাবে না পাকিস্তানে, ঝিলমের ওপারে। মেয়েকে বড় করার কাজেই সে নিজের জীবনকে ব্যস্ত রাখতে চায়। মবিন আর শাহনাজের কথা পড়তে পড়তে, কতটুকুই বা সময়, আমার মনে পড়ে যাচ্ছিল ঝামেলা বিবির কথা। শাহনাজের তো ঝিলম পার হওয়ার বৃত্তান্ত। ঝামেলা বিবি পার হয়েছে কয়েক হাজার মাইল পথ, কখনও জলে, কখনও ডাঙায়। শাহনাজের তো দুটো দেশের ভেতর থাকা-না-থাকা, যাওয়া-না-যাওয়া, ঝামেলা বিবির জীবনের ইতিহাস আর ভূগোল ছড়ানো তিনটে দেশের মাটিতে। যে তিনটে দেশ, আসলে একটাই দেশ, আমাদের উপমহাদেশ।

সতের বছর আগে দেখা ঝামেলা বিবির মুখটা আমার আবছা মনে পড়ে, তখন তো আর মুখের খোঁজ ছিল না জীবনে। মুখ মনে না পড়লেও, ইতিহাস মনে পড়ে স্পষ্ট। এক একটা মুখের আড়ালে এমন ইতিহাস থাকে, ঘনঘোর, সে মুখ ভুলে গেলেও ইতিহাস কিছুতেই ফিকে হয় না মন থেকে। ইতিহাসের টানেই চলে আসে ধূসর মুখ। ঝামেলা বিবির সেই মুখ ছিল শাহনাজের চেয়েও কঠিন, বয়স্ক, ক্ষতবিক্ষত। শাহনাজকে দেখলাম খবরের কাগজের রঙিন ছবিতে, ঝামেলা বিবিকে দেখেছিলাম চাক্ষুষ। আসানসোলের চেলিডাঙায়, মসজিদের পাশে একটা বাড়িতে। রান্না করত ঝামেলা বিবি, ওই বাড়িতে, আসল নাম কমলা। পাশের বাড়ির পরিচারিকার কাজ ছেড়ে দিয়ে ইরেকসন কোম্পানির ঠিকা শ্রমিকদের ঘরে রান্নার কাজ করত।

কোথায় শুরু ঝামেলার জীবন? আয়ুব খাঁর আমলে আদমজি জুটমিলে দাঙ্গা হয়েছিল। সে দাঙ্গার প্রতিপক্ষ হিন্দু আর মুসলমান নয়, বাঙালি-বিহারী। কমলার তখন সাত-আট বছর বয়স হয়তো বা। তার স্মৃতির শুরু। গ্রামগঞ্জের চারদিকেই ওই দাঙ্গার আগুন। শীতলক্ষ্যার জলে ভেসে যায় দাঙ্গায় নিহতের লাশ। কমলাদের বাড়ি ছিল রূপগঞ্জ থানার মোটরঘাট মুড়া-পাড়ায়। কোথাও যেতে হলে ডোঙা ছাড়া উপায় নেই। বাবার কথা কমলার কিছুই মনে ছিল না। মামাবাড়িতেই জীবন কাটত অবহেলায়, অযত্নে। মা যেত পীরের পুজো দিতে, মামা যেত সোনাকান্দাইলের মেলায়। কমলা ঘুরে বেড়াত গাঙে গাঙে, বিলে বিলে। সবাই

বলত, গাঙে যাস না, ডুবে মরবি। না-ও যদি মরিস, মা এসে পেটাবে কিন্তু। তবু, ঘরে কেউ না থাকলে কি আর খাল-বিল ছাড়া অন্য কোথাও ভাল লাগে? কমলা গিয়ে নামত গাঙের জলে, যতক্ষণ না মাটি আবার তাকে টানত, ততক্ষণ, ততক্ষণ।

'গাঙের বাঁকে ইস্টিমারে হুইশল মারে, ইস্টিমার আইলে যে কী ফুর্তি অয় কি আর কমু। ইস্টিমারের লগে পাল্লা দিয়া ঢেউয়ের ডগায় দোল যে খায় নাই হ্যারে কইয়া কি বুঝামু। পানিতে আমার লগে কেও পারত না। পানিতে ঝমাঝমাঝম ঝাঁপাইয়া রোগজ্বালা ভাল অইত। পানি মোরে বাঁচায়, আর পানিই চোবায় আমারে। আইজও মুই হাতরাই অথৈ জীবনদরিয়ার পানিতে। খোদায় জানে কবে পামু মাটি।' কমলার আত্মকথন।

স্টিমারের এক প্রান্তের দড়ি সবার আগে ধরেছিল কিশোরী কমলা। তখনই, ওপর থেকে কেউ তার ঘন কালো চুলের গোছা ধরে টেনে নিয়েছিল স্টিমারের ভেতর। সে এক সেনা। স্টিমারে কাটল কয়েকদিন, কান্নার, চিৎকার, কান্নাকাটি, অনশন, কিছুতেই কিছু হল না। নিজের নিয়তি বুঝতে পেরে কমলা শান্ত হওয়ার পর সেনাবাহিনীর লোকজন তাকে খাবার, বিশ্রাম, যত্ন-ভালবাসা দিয়েই রেখেছিল। স্টিমার গিয়ে তারপর পৌঁছল চট্টগ্রাম। যে টেনে তুলেছিল জল থেকে, চুল ধরে, সে-ই নিয়ে গেল নিজের গ্রামের বাড়িতে, কমলাকে। মিলেশ্বরী থানার ইছাগালি গেরাম। ডাকঘর আগৈরাট।

রফিক মিয়াঁর ঘরে তার আর এক বিবি, কমলাকে নিয়ে তার সঙ্গে ঝগড়া, অশান্তি। চাকরি ছেড়ে কমলাকে নিয়ে রফিক রওনা দিল করাচি। যাত্রাপথেই কমলার নাম বদলে গেল, হল ঝামেলা বিবি। নামকরণ, রফিকেরই। চট্টগ্রাম থেকে করাচি, জলপথে। হেইও দেখলাম পানি, কালাপানি। হেইরে আল্লা, পানির আর শ্যাষ বুঝি নাই পৃথিবীর পর। হেওকি শুধু কালাপানি? হরেক রং তার, লাল, নীল, সবুজ, আসমানি। পলকে পলকে রং বদলায় জলের, জীবনের, সূর্য ওঠে, সূর্য ডোবে, জলের মেজাজ, মন বদলে বদলে যায়।

করাচিতে গিয়ে মাঙ্গালি রোডের বাঙালি বস্তি। খাওয়ার ব্যবস্থা নেই, রোজগার নেই, টাকা নেই। সারাদিন বাইরে বাইরে ঘুরে রোজগারের চেষ্টা করে রফিক। ঝামেলা রান্না-সংসার সামলায়। পাড়া-পড়শির সঙ্গে কথা বলে। কথা বলতে গিয়ে দেখে ভাষা বুঝতে পারছে না কেউ। শেষে ইশারা-ইঙ্গিতে দিন কাটাতে কাটাতে উর্দু ভাষা একদিন বলতে আর বুঝতে শিখে গেল ঝামেলা। বাংলার মেয়ে প্রায় ভুলেই গেল বাংলাভাষার ব্যবহার, না শুনতে শুনতে, না বলতে বলতে।

একদিন ঝামেলার স্বামী কাজ পেল, লাহোরের সেলিমা কোম্পানির সিল্ক মিলে। সিল্কের শাড়িতে জরির ডিজাইন, ফুল-ফল-লতা-পাতা-পরী-নারী। কাজ পেল ঝামেলাও। মেয়েদের মজুরি কম, খাটনি বেশি, মেয়েদের কাজে কারও আপত্তিও নেই। নারী-পুরুষ সবাই একসঙ্গে কাজ করে। দুজনের রোজগারে সংসার ভরে উঠল সাধে-আহ্লাদে-সন্তানে। এক ছেলে মনির, আর নতুন করে গর্ভবতী ঝামেলা। শুরু হল বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ। ইয়াহিয়া আর ভুট্টো শেষ চেষ্টা করে যাচ্ছেন পূর্ব পাকিস্তানকে ধরে রাখতে। ঢাকা, চট্টগ্রাম, রাজশাহী, সিলেট সব জায়গা থেকে গোলমালের খবর গিয়ে পৌঁছচ্ছে লাহোরে, ঝামেলা বিবির কাছে।

লাহোরেও শুরু হল বাঙালি-পাঞ্জাবি দাঙ্গা। বাঙালিদের সব বস্তি পুড়ে ছাই। লেগে গেল ভারত-পাকিস্তান যুদ্ধ। নিষ্প্রদীপ লাহোরে সন্ধের পর পথে বেরতে পারে না কেউ, ঝামেলার জীবনের নতুন অভিজ্ঞতা। মানুষ পালাচ্ছে ঘরবাড়ি ছেড়ে। রাতারাতি লাহোর থেকে করাচি চলে গেল রফিক, সঙ্গে ঝামেলা বিবি, মনির। ভুট্টো ধুরন্ধর রাজনীতিক, বললেন, পাকিস্তানে কেউ যেন বাঙালিদের গায়ে হাত না দেয়। দিলে পাকিস্তানের ক্ষতি, হিন্দুদের লাভ। প্রাণে বাঁচল ঝামেলা বিবি, শুধু বাঁচলই না, দ্বিতীয় সন্তানের জন্ম দিল লাহোর থেকে করাচি পৌঁছবার কয়েকদিনের মধ্যেই। মুনিরের ভাই হারুণ।

কিন্তু কাজ হল না ভুট্টোর কথায়, লুকিয়ে চুরিয়ে আক্রমণ, আগুন লাগানো, লুট, খুন হতেই লাগল। পশ্চিমের মাটিতে বিপদের কালো ছায়া নিশ্চিত টের পেয়ে একদিন ঘটি, বাটি, ঘর, সংসার জলের দামে বিক্রি করে দুই ছেলে নিয়ে প্লেনে চেপে বসল রফিক, সঙ্গে ঝামেলা বিবি। গন্তব্য, ঢাকা। তেজগাঁও বিমানবন্দরে রাত নটায় পৌঁছল বিমান। এত ফাঁকা ঢাকা শহর, ভাবাই যায় না। মানুষজনই যেন নেই কোথাও। চারদিক অন্ধকার, সেই অন্ধকার ভেঙে দিচ্ছে গুলি, বোমা, কান্না, চিৎকারের শব্দ। কিছুটা এগিয়ে পাওয়া গেল দুটো রিকশা। দুই ছেলেকে নিয়ে সামনেরটায় ওঠে ঝামেলা, মালপত্র নিয়ে পেছনেরটায় ওঠে দুই ছেলের বাপ রফিক। প্রথম রিকশা দ্রুত চলে, এগিয়ে যায় অনেক, মালপত্রের ভার সামলে দ্বিতীয় রিকশা পড়ে যায় পেছনে। যেতে হবে কমলাপুর স্টেশন। কে কোথায় কীভাবে আছে, কিছুই তখন জানবার উপায় নেই। বাপ-মার নিশ্চিত বাড়িতেই গিয়ে উঠতে চেয়েছিল ঝামেলা, সেই মুড়াপাড়ায়।

কমলাপুর স্টেশনে দুই ছেলে নিয়ে বসে থাকে ঝামেলা। দ্বিতীয় রিকশা আর আসে না তো আসেই না, মালপত্র, মুনির-হারুণের বাবা, কারুরই দেখা নেই। দীর্ঘ অপেক্ষার পর মিলিটারির পোশাক পরা মানুষগুলোর কাছে জানতে চেয়েছিল ঝামেলা। ঘটনার, মানুষটার বিবরণ দিয়েছিল সে। তখন তারা একজন আর একজনের দিকে তাকায়, ফিসফিস কথা বলে নিজেরা, কেউ এদিক ওদিক ঘুরে আসে বারদুয়েক। তারপর যে পথ দিয়ে রিকশায় এসেছে ঝামেলারা, সেই পথেই আবার ঝামেলাকে নিয়ে যায়। গাঢ়, নিকষ অন্ধকারের ভেতর, শাজাহানপুর খালের পাশে, এক ঝোপের মধ্যে টর্চের আলো ফেলে, সেদিকে দেখিয়ে একজন মিলিটারি জানতে চেয়েছিল, দেখেন তো, চিনতে পারেন কিনা।

নিচের দিকে মাথা, পা ওপরের দিকে, পেট চিরে দুভাগ মুনির, হারুণের বাবা রফিক মিয়াঁর। এক রিকশা বোঝাই মালপত্র সব উধাও। মালপত্রের জন্যই নাকি মানুষটাকে মেরে ফেলেছে ওইভাবে। চোখে দেখলেও যা বিশ্বাস করা যায় না। মিলিটারির লোকজনই থানা-হাসপাতাল-গোরস্থানে দৌড়াদৌড়ি করল। বেশ কিছুদিন মিলিটারি ব্যারাকে থাকতেও দিল। দুই ছেলের কে কোথায় কীভাবে দিন কাটাচ্ছে, তা দেখার মতো মনের অবস্থাও ছিল না ঝামেলার। ততদিনে স্বাধীন বাংলাদেশ। শেখ মুজিবের কাছে ঝামেলাকে নিয়ে গেল একদিন, মিলিটারির লোকজনই। সেখানে, কেঁদে কেঁদে নিজের দুর্ভাগ্যের কথা শোনায় ঝামেলা। শুনে মুজিব জবাব দিলেন, তোমার মতো দশ লাখ বিধবা বোন আছে বাংলাদেশে আমার। কাকে

কোথায় রাখি, কী দিই, বলতে কি পারবে তুমি?

জীবনে কখন, কোথায়, কার কাছে, কেন পায় আদর, ভালবাসা, যত্ন আর কখন, কোথায় কার কাছে কেন নিজেকে অনাকাঙ্ক্ষিত, অবাঞ্ছিত ঠেকে, ঝামেলার আর তা জানা হয়নি, বোঝাও হয়নি। শেখ মুজিবের জবাব শুনে শহর আর গ্রামে গ্রামে ঘুরে দিন কাটতে থাকে ঝামেলার। মাঠে চাষের কাজ, ঢেঁকির কাজ, বাংলায় কথা বলতে পারা, সবই যেন পুনর্বাসিত হল ঝামেলার জীবনে। শেষে মিলিটারির লোকজনদের পরিত্যক্ত এক ব্যারাকে গিয়ে ওঠে ঝামেলা। বাড়ি বাড়ি ধান-চাল-চিড়ে-মুড়ির কাজ জুটে যায়। বড় ছেলে মুনির কোথায় থাকে কখন ফেরে, কে জানে, শোনা যায় সে ছেলে ট্রাকের খালাসির কাজ জুটিয়ে নিয়েছে। দুধের গন্ধের জায়গা নেয় তেল, মবিলের গন্ধ। ঝামেলা একদিন ছোট ছেলেকে বলে, চল যাই পশ্চিমে। সেলিমা কোম্পানির সিল্ক কারখানার বড়বাবু চট্টগ্রামের লোক, আমাদের ফেরাবেন না কিছুতেই। মুনির জবাব দিয়েছিল, আমি কোথাও যাব না এই দেশ ছেড়ে। যেতে হয় তুমি যাও। হায়, কোনটা যে কার দেশ আসলে, তা কি নিজেও জানত ঝামেলা, যে বোঝাবে ছেলেকে? তার মনে তো তখন আশ্রয়, মানুষ, মানুষের মুখ। চট্টগ্রামের জাবির সাহেব একবার তো তাদের বাঁচার সুযোগ দিয়েছিল লাহোরের মাটিতে, গেলে আবার দেবে, ঝামেলা প্রত্যয়ী। তার তো কোনও দেশ নেই, সীমান্ত নেই, রাষ্ট্র নেই, পাহারা নেই মানুষ আছে। ভরসা করার মতো মানুষ, মানুষের স্মৃতি, মানুষের মুখের কথা।

ট্রাকের সঙ্গে ঘোরে মুনির, রাতের পর রাত। বাড়ি ফেরে না। অন্যলোকের কাছে ছেলের খবর পান। ছেলে যায় যশোর, খুলনা, রাজশাহী, বগুড়া। বড় ছেলের ওপর রাগ করে ছোট ছেলেকে নিয়ে বাড়ি থেকে বেরয় ঝামেলা। সীমান্ত পেরয়, যে পারাপারে না লাগে পাসপোর্ট, না ভিসা। শিয়ালদা স্টেশন অবধি চলে আসে অবাধ। ঝামেলার যেন সীমান্তচেতনাই নেই, এমনই এই উপমহাদেশ তার কাছে। পশ্চিমের গাড়িতে উঠে ঘুমিয়ে পড়ে। শেষে ছেলের ধাক্কাধাক্কিতে ভাঙে ঘুম। মা, দেখ, কোন দ্যাশে আইলাম, মাথার ওপর কলের চাকা, লালমাটি। চারধারে কয়লা আর কয়লা, ওরে কয়লা রে, য্যান পাহাড়। নেমে পড়ে ঝামেলা, ট্রেন থেকে। নামতেই চেকার, রেল পুলিস। বাঁচতে দৌড় শুরু করে ঝামেলা, পেছনে তার ছেলে। অনেকটা দৌড়ে অসহায় বসে পড়ে রেললাইনের ওপর। কাঁদতে থাকে, অনন্ত আকাশের দিকে চেয়ে। সারা শরীর আর মনে যেন আমরণের ক্লান্তি আর অবসাদ, অথচ কোথাও কোনও আশ্রয় নেই তার, না মানুষ, না মাটি। অনেকক্ষণ পর শুনতে পায় আজানের ধ্বনি। ছেলে বলে, কান্দিস না মা, ওই আজান দেয়, আমাগো লোগও আছে এহানে। উপবীতধারী ব্রাহ্মণ নারায়ণ চক্রবর্তীর কন্যা কমলার কাছে কবে, কী করে আজানের ধ্বনি হয়ে যায় স্বজনের ধ্বনি, আশ্রয়-সংকেত, কে বলে দেবে সেকথা? সেই অবিশ্বাস্যের আছে কোন ব্যাখ্যা?

ওই ধ্বনি লক্ষ করে হাঁটতে শুরু করে ঝামেলা, বেলা শেষ হয়ে আসছে। মসজিদের কাছে গিয়ে লোকজনকে বলে নিজের দুঃখের কথা। সেখানে তখন দাঁড়িয়েছিলেন এক বৃদ্ধ। ঝামেলার কাছে জানতে চান তিনি, কোথায় বাড়ি ছিল ঝামেলার। ঝামেলা জবাব দেয়। আর সেই জবাব শুনে বৃদ্ধের উত্তর, ঝামেলার মুখের কথা শুনেই তিনি নাকি বুঝতে পেরেছেন,

তাঁরই দেশের মানুষ ঝামেলা। রাতটা তিনি নিজের বাড়িতেই থাকতে দেন ঝামেলা আর তার ছেলেকে। পরের দিন কাজ যোগাড় করে দেন দু-একটা বাড়িতে। বলেন, একটু থিতু হয়ে ঝামেলাই ঠিক করুক কোথায় যাবে, কী করবে।

বড় ছেলের কোনও খোঁজ ছিল না কারও কাছে। ট্রাকের খালাসির কাজ করতে করতে ট্রাকের তলাতেই চাপা পড়ে মরে গেল নাকি, সে আশঙ্কায় আবার নিজের দেশে ফিরতে চেয়েছিল ঝামেলা। যদি দেশে ফিরে ছেলের খোঁজ পাওয়া যায়। পাকিস্তানে ফিরে গিয়ে জাকির সাহেবের কাছে আশ্রয় পেতে চেয়েছিল যে, সে আসানসোলের মসজিদ পাড়ায় বসে হাহাকার করে, মুনির নাই, মুনিরের খবর নাই, মুনিরের আব্বা নাই, খোদায় জানে কোথায় গিয়ে ঠেকবে এই জীবন। সেই হাহাকার ভরা মুখটা দেখেছিলাম সতের বছর আগে, আসানসোলে।

শাহনাজের মুখের ছবি দেখে কেন আমার মনে পড়ে গেল ঝামেলা বিবির কথা, আমি নিজেও জানি না, স্মৃতির কি কোনও বিজ্ঞান আছে, অথবা ভূগোল, অথবা ইতিহাস? ঝামেলা বিবি, মানে কমলা চক্রবর্তীর মুখ তো আমার এতদিন মনে পড়েনি, কিছুতেই না। মুখের খোঁজে অস্থির মুহূর্তেও না। একটা মুখ, কী আশ্চর্য, মনে পড়িয়ে দিল, অবধারিত, সতের বছর আগে দেখা আর একটা মুখ, তার অভিব্যক্তি, তার জীবন-বৃত্তান্ত, তার হাহাকার। আমি যদি এখানেই আমার এই অদ্ভুত প্রাপ্তির ছেদ টেনে দিতে পারতাম, মামুলি একটা-দুটো উপলব্ধির কথা লিখে, যাতে গভীরতার ভঙ্গিমাটুকু থাকবে মিশে, তাহলে এই কাহিনী হয়তো আমি শুরুই করতাম না। অন্য কিছু লিখতে চাইতাম, এবার শরতে শুধুই যে গুজরাট থেকে চরিত্ররা উঠে আসবে বাংলাসাহিত্যে, তা নিশ্চয়ই নয়, থাকবে আরও অনেক বড়, বিস্তৃত, গভীর জীবনকথা। আমিও তেমন কিছুই লিখতাম।

কী লিখব, এই ভাবনায় যখন দিন কাটছে, গড়িয়াহাট উড়ালপুলের নিচে দাঁড়িয়ে কাজ দেখছিলাম, আকাশের দিকে মুখ করে, একদিন। রং হচ্ছে, উড়ালপুলের নিচের অংশ। দেখতে দেখতে সিগারেট ধরাবার জন্য দেশলাই বার করি, এক অচেনা মুখ এসে আগুন চায় আমার কাছে। শ্রাবণের দুপুরের এলোমেলো হাওয়ায় আমি দু-দুখানা কাঠি জ্বালিয়েও সে আগুন ধরে রাখতে না পেরে হেসে ফেলি। দেশলাই তুলে দিই তার হাতে, মলিন রংমাখা গেঞ্জি। প্যান্টে রঙের দাগ, পেটানো শরীর, লালিত্যহীন একটি মুখ তার। আমার হাসিটা দেখে, সে চকিতে আত্মগোপন করে যেন, কয়েক লহমার জন্য, তারপর প্রশ্ন করে, 'দাদা, আপনি কখনও আসানসোলে ছিলেন?'

'হ্যাঁ, কেন বলুন তো? জানলেন কী করে?' আমার অপ্রস্তুত জবাব, প্রশ্নোত্তরে মেশা, কিছুটা ভাল লাগাও, যাক, আমার শহর তাহলে আমায় গড়ে দিয়েছে অন্তত এইটুকু পরিচয়।

'আপনি কলেজে পড়তেন, আপনাকে দেখেছি চেলিডাঙার বাড়িতে। আমার মার সঙ্গে অনেক কথাবার্তা হয়েছিল আপনার।'

'আপনাকে তো চিনতে পারছি না। কে আপনার মা?'

'আমার নাম হারুণ। আমার মা ঝামেলা বিবি। তখন ছোট ছিলাম, আট-দশ বছর বয়সে।

আপনি ইরেকসনের লেবারদের মেসে আসতেন। ওই টিভি টাওয়ারওয়ালা মেসে।'

'আমায় চিনলে কী করে?'

'আপনার হাসিটা দেখে। একটু মোটা হয়েছেন, তখন সরু ছিলেন।'

আমার মনে পড়ে হারুণের কথা, তখন সারাদিন খেলে বেড়াত। আমায় মনে রেখেছে, ওর মা ঝামেলা বিবিকে একদিন কাঁদতে দেখেছিল আমার সামনে বসে, হয়তো মায়ের ওই কান্নার অনুষঙ্গেই সে চিনতে পেরেছে আমাকে, স্মৃতির কি সত্যিই কোনও ইতিহাস বা ভূগোল আছে, অথবা বিজ্ঞান?

'ঝামেলা বিবি কোথায়? তোমার মা?'

'মা তো চলে গেল বাংলাদেশে। আটকাতে পারলাম না। মুনির, মুনির করে দাদার খোঁজ করতেই চলে গেছে আজ সাত বছর প্রায়।'

'খবর পাওনি কোনও? তুমি যাওনি?'

'না, কোনও খবরাখবর পাইনি। আমি যাওয়ার সাহস পেলাম না দাদা। এদেশে তাও কিছু কাজকর্ম আছে, ওখানে গিয়ে যদি খেতে না পাই? এখন বর্ডার যা হয়েছে, যদি ফিরতে না পারি?'

'তাই বলে মার খোঁজ করবে না?'

'কিছুই তো চিনি না, জানি না। কোথায় খুঁজব? মাকে খুঁজব না দাদাকে? শেষে নিজেই হয়তো হারিয়ে যাব।'

'এখানে কোথায় থাকো?'

'তিলজলায়। এই ফ্লাইওভারের কাজ করছি, অনেকদিন চলবে কাজ। তারপর আবার কোথাও পাঠাবে কোম্পানি।'

এত সহজে এত বিচিত্র জীবনের কথা কখনও বলতে শুনিনি কাউকে, আমি কেমন অসহায় হয়ে পড়ছিলাম, এই খড়কুটোর মতো ভেসে চলা জীবনের দিকে তাকিয়ে, হারুণের দিকে চোখ তুলে তাকাতে পারছিলাম না। হারুণের মুখটা মনে থাকত কি আমার? আবার দেখা হলে কি চিনতে পারব, যদি ঠিক পরদিনই দেখা হয়, তাও? অথচ ও সতের বছর পরেও চিনেছে আমায়। পাকিস্তানে জন্মে, বাংলাদেশে বাবার মর্মান্তিক মৃত্যু পেরিয়ে ফের পাকিস্তানে যাবে বলে সীমান্ত পেরিয়ে এসে শিয়ালদা থেকে মার সঙ্গে ট্রেনে চেপেছিল একদিন। আসানসোলে ট্রেন থেকে নেমে পড়ে বিভ্রান্তিতে, আশায়। দাদার খোঁজে মা আবার চলে গেছে বাংলাদেশে, হারুণ এদেশেই। মাঠে, প্রান্তরে, রাজপথে তার জীবিকা ছেড়ে যেতে পারেনি সে। এই দেশ থেকে কে তাকে তাড়াবে? ভারত, পাকিস্তান না বাংলাদেশ, কোনটা তার দেশ, কেনই বা, অন্য দুটো কেন নয়, কেন তিনটেই নয়, কে জবাব দেবে? আমি গুজরাটের খবর দেখা বন্ধ করে দিই, হারুণকে পেয়ে। এই মুখটাই যে আমি খুঁজছিলাম, তা কেন আমি আগে বুঝিনি? মবিনের বিস্ময়ভরা মুখের পাশে হারুণের কঠিন মুখটা, আমার কতদিন মনে থাকবে, কতদিন? 'জয় শ্রীরাম' আর 'জয় বজরং' ধ্বনির তীব্রতায় [illegible] নিহিত আছে, নাকি, মবিন, হারুণের আশ্চর্য কঠিন জীবন-বৃত্তান্তে, বলতে পারে [illegible] সেকথা?

মাটির দিকে

নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী

ভোর-রাত্তির থেকে যা শুরু হয়েছিল, সেই
বৃষ্টিধারা
যেই না একটু ধরেছে, অমনি যে যার
কোটর থেকে
মুখ বাড়াল পাখিরা।
সঙ্গে-সঙ্গেই যে তারা ডানা ছড়াল, তা নয়।
এক-আধ মিনিট উলুক-ঝুলুক করে
ব্যাপারটা একটু বুঝে নেবার চেষ্টা করল।
তারপর
এক্ষুনি যে আবার বৃষ্টি নামবে না, সেটা বুঝে নিয়ে
উড়াল দিল আকাশে।

আমি আমার জানলা থেকে ওদের
দেখছিলুম।
ঘাস ভিজে। গাছের পাতা থেকে এখনও
ফোঁটায়-ফোঁটায় জল ঝরছে।
তবে আকাশের মুখ আর তত ভার নয়।
কিন্তু আমার ডানা তো আমি
পুড়িয়ে ফেলেছি। তাই
আকাশ থেকে চোখ নামিয়ে আমি
মাটির দিকে তাকাই, আর
ঘর থেকে বেরিয়ে এসে বারান্দার রেলিং ধরে ঠায়
দাঁড়িয়ে থাকি।

হে সূর্য হে মোর বন্ধু

রাম বসু

হে সূর্য হে মোর বন্ধু জ্যোতির কনক পদ্মখানি
আমাকে দেখতে দাও পাকদণ্ডি ঊর্ধ্বরেখ পথ
অন্ধকার বড় ঘুপচি, আত্মসুখী, কামের কয়েদ
নাড়িচ্ছেদ না হলে, কি করে চিনবো আপনাকে?
কি করে জানবো অগ্নিই জ্ঞান, বার্তাবহ অন্তহীনতার।

খালপারে ঘুপচি ঘরে ঘৃণা হিংসা প্রেম
অশ্রাব্য ভাষায় ঝগড়াঝাটি খেয়োখেয়ি, একটু মমতা
দেশপ্রেমসিক্ত তাতার বাহিনী, ময়দানে চল
তারে ঝোলা লালচে বালবে ক্লাবের হুল্লোড়
মুখগুলো প্রহেলিকা আবার নোনতা উজ্জ্বলতা
কথাগুলো স্তনের মন্দিরে স্তব্ধ.
এক লহমার জন্যে সত্তার শিকড়ে যায় প্রেমিকমানব
কমনীয় হয়ে ওঠে ফণিমনসার গাছ
এই ভাবে চিরকাল চলে আলো আঁধারের
চোর চোর খেলা
টু দিয়ে যে পালালো, খোঁজ, তাকে খোঁজ।

হে সূর্য হে মোর বন্ধু, মানি
এ আমার বাঁচার বাস্তব
কিন্তু এখানেই যবনিকা? এখানেই ইতি?
তবে কেন সন্ধ্যার দীপ্তিতে আকাশের বড় বড় দ্বীপ
নিয়ত ডাকছে, শুনতে পাচ্ছি, তার পিছনেই
বৈশ্বানর।

অনায়ত্ত রয়ে গেছে কতকিছু মাটির তলায়, আকাশ-অঙ্গনে
সব কিছু জড়ানো পাকানো ধূমজ্যোতি কুহক আবর্ত
আরও কিছু থেকে যায় নিষ্ঠাবান সত্য অন্বেষণে
হয়তো বা স্ববিরোধীতায়,
কারণ আমি তো সমগ্র চাই, অল্পতে অরুচি

তাই আমি নক্ষত্রের পিছু পিছু হাঁটি সেমিনার
থেকে বেশ্যালয়ে
রহস্য মদির, স্বর্গীয় মাতাল রক্তকরবীর ডাল
জড়িয়ে হাওয়ার গলা উঁচু হয়ে দেখতে চাই
আমাকে ছাড়িয়ে
হে সূর্য হে মোর বন্ধু বহু বর্ণ আলোর আঁধারে
সুফলা মাটির ঘ্রাণ, ধ্বনি প্রতিধ্বনি
বিশ্বের ব্যাপ্তির সঙ্গে হেঁটে যাচ্ছে বুকের মাটিতে।

মাঝে মাঝে মনে হয় আমি দেখতে পাই
সূর্য, হে মোর বন্ধু, মন্ত্র, আদি শব্দ
সময়ের পরাজিত শিকড়ে বাকড়ে খেলা করছো তুমি
গ্লুকোমা পীড়িত চোখে আমি তাই-ই দেখি।

ওই যে তিনি চলেছেন

কৃষ্ণ ধর

ঘরবন্দি হয়ে থেকেছিলেন তিনি এতদিন
ছাড়া পেয়ে এখন বাইরে বেরিয়ে এসে
হাত-পা ছড়িয়ে দাঁড়ালেন খোলা আকাশের নিচে
কতদিন তিনি দেখেননি

আলমারির দরজাগুলো কমা সেমিকোলনের চাপে
একেবারে সেঁটে গিয়েছিল
অনেক টানাটানি করে খুলতেই বাতাস ঢুকল ফুসফুসে
অক্ষরের ছাপা পাতাগুলো সেই হাওয়ায়
হাততালি দিয়ে উঠল খুশিতে

চলো নিয়মে, আর কতদিন চলা যায়
সবারই এদিক-ওদিক ছুটোছুটি শুরু হল
এত হাওয়া, এত রোদ্দুর, ভাবা যায়?
মশাইদের মাথায় হাত কী দশা হবে মানুষটার
খোলা উঠোনে এলোমেলো হাওয়ায় যদি শরীর খারাপ হয়!

তাকিয়ে দেখে দিব্যি জ্যোছনায় পায়চারি করছেন
বললেন, একটু হাঁটব হে
হাঁটছেন তো হাঁটছেন, তাজ্জব আর কাকে বলে
ওর আনন্দ আর ধরে না
যেন নতুন বৌঠানের গলা শুনতে পেলেন

চরাচর প্লাবিত হয়ে যাচ্ছে মেঘভাঙা জ্যোছনায়
ভুবনডাঙা পার হয়ে ওই যে তিনি চলেছেন
কোথাও সুরুলের পরব লেগেছে
মাদল বাজছে নাচের তালে দ্রিদিম্-দ্রিম্, দ্রিদিম-দ্রিম্
যুবা বয়সের গানের বইটা হাতে করে তিনি একলা হাঁটছেন

হেঁটে তাঁর নাগাল পায় সাধ্য কার?

কবির 'চলন্ত কলিকাতা', নগরী তোমাকেই

সিদ্ধেশ্বর সেন

"রবীন্দ্র ব্যবসা নয় উত্তরাধিকার ভেঙে ভেঙে"
—(বিষ্ণু দে)

কবির "চলন্ত কলিকাতা", তোমাকেই বলি তবে—
যে-ইতিহাস চলেছেই
সূর্য-ঘড়ির সঙ্গেই চলে

শতাব্দী-শতাব্দীও উজিয়ে
পৌঁছে গিয়ে একুশ শতকে—

সে-ইতিহাসেই কেন কোপ, পরালে কলুষ, কেন
ইতিহাসহীনতায়,
কোন্ অপঘাতে—
অনৈতিহাসিকে, আত্ম-খণ্ডতাতে

শতাব্দীর যুক্তিবোধহীন মত্ততায়
অপরিণতের উট্‌কো মনের
রবীন্দ্র-জন্মনগরীর নামবদলও—স্থূল-অমর্যাদায়

জাতিরই স্ব-ভাবের অংশ, এ বঞ্চনার নয়,
কলিকাতা, ইতিহাস-নামে ফের
জানি, ফেরাবে তোমাকে

দেখি, এই দ্বন্দ্বময় আশা
রৌদ্রে-মেঘে বীজকম্প্র ভাষা
সময়ের বাঁকে—

(উত্তরাধিকার ভেঙে ভেঙে...
তবু রঙ্গে-ভরা মুনাফা-মেলায়
—লগ্নী নয়)

এ-যে উত্তরাধিকার
বেয়ে আসা
মরু-বিজয়ের আনে ভাষা—

কবিমনীষীর গানে-গানে
শিকড়ের টানে,
সংকোচেরই বিহ্বলতা মুছে ফেলে
সংকটেরই ত্রাণে—

শেষহীন বাইশে শ্রাবণে,
চিরনূতনের পঁচিশে বৈশাখে।

সংযোজন : পঞ্চদশ শতাব্দীর বিপ্রদাস পিপলাইয়ের 'মনসা বিজয়', ষোড়শ শতাব্দীর কবিকঙ্কন মুকুন্দের 'চণ্ডীমঙ্গল', ওই একই শতাব্দীতে রচিত আবুল ফজলের 'আইন-ই-আকবরী', ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী সাবর্ণ রায়চৌধুরীদের কাছ থেকে তিনখানি গ্রাম সুতানুটি-গোবিন্দপুর-কলিকাতা ইজারা নেওয়া, এমনকি স্বয়ং রবীন্দ্রনাথের 'চলন্ত কলিকাতা' বাক্যবন্ধ, সর্বত্রই 'কলিকাতা'র উল্লেখ। বাংলা আকাদেমির সভাপতি শ্রদ্ধেয় অন্নদাশঙ্কর রায়ও এই মত পোষণ করেন।

প্রকৃতির ভর্ৎসনা

সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়

শেখ সুলেমান একটা চড় মেরেছিল নীলোফারের ভাই, বাচ্চা মজনুকে
সাতজেলিয়া থেকে মোল্লাখালি যাবার খেয়া নৌকো
এমনই কুমড়ো গাদা যে সবাই সবার গা ঘেঁষে আছে
বেশি টালমাটাল হলেই উল্টে যাবে ভরা বর্ষার রায়মঙ্গলে।
শতকরা সাতষট্টি জন সুলেমানের এই বেয়াদপি
মেনে নেয়নি মনে মনে
কিন্তু শেখের বিরুদ্ধে কে মুখ খুলবে, সবাই চুপ
আর শতকরা একুশজন (হিসেব মিললো না, তাই না?
কিছু লোক তো সব সময়ই বাইরে থাকে)
সুলেমানের সমর্থনে হেসে উঠলো খলখলিয়ে
অবশ্য তারা সবাই জানে, পা মাড়িয়ে দেবার জন্য
মজনুকে চড় মারলেও
সুলেমানের আসল নজর ছিল নীলোফারের অপূর্ব দুটি
স্তনের ডৌলের দিকে
এ রূপ দেখলে ফেরেস্তাদেরও মতিভ্রম হতে পারে
কিন্তু মাছওয়ালি নীলোফার যে বড় বেশি সতীত্বের ছেনালি দেখায়।

একটা বাচ্চাকে চড় মারলে সে ঘটনা বেশিদূর গড়ায় না
খেয়ানৌকো ওপারে পৌঁছোয়, সবাই ভুলে যায়, শুধু মজনু
কুঁ কুঁ করে মৃদু মৃদু কাঁদে
নীলোফার একবার মাত্র রক্ত চোখের ঝলক দিয়েছে
সুলেমান সাহেবের দিকে
তারপর বেশ কিছুদিন আর যায় না সাতজেলিয়ার হাটে
মজনু কোথায় কেউ তার খবরও রাখে না।
শেখ সুলেমান ধর্মপ্রাণ মানুষ, রোজ পাঁচ ওখ্‌ত নামাজ পড়ে
তার চোরাই কাঠের ব্যবসা, তুচ্ছ ব্যাপার নিয়ে মাথা ঘামাবার
সময় নেই
তা ছাড়া কেউ মুরুব্বির পা মাড়িয়ে দিলে তাকে চড় মারায়
দোষ হবে কেন?
তবু শেখ সুলেমান হঠাৎ হঠাৎ দেখতে পায়

নীলোফারের উরু জড়িয়ে ধরা কিশোরটির কান্না ভরা মুখ
খেয়াঘাটের বটগাছটা হঠাৎ তাকে বলে, ছি ছি, সুলেমান
শীতকালের আকাশের বিদ্যুৎ তাকে বলে, ছি, ছি, সুলেমান
একটা লঞ্চের ভোঁ তাকে বলে, ছি ছি, সুলেমান
ফিনফিনে বাতাস তার কানে কানে বলে যায়, ছি ছি, সুলেমান
এ গ্রামের মানুষজন শেখ সুলেমানকে কিছু বলে না,
কিন্তু প্রকৃতি তাকে ছাড়েনি, অনবরত ভর্ৎসনা করে যায়
সুলেমান ক্ষমা চাইতে চায়, কিন্তু কোথায় নীলোফার, কোথায় মজনু
তারা আর দেখা দেবে না।

দুজন দুজনে

তরুণ সান্যাল

বর্ষা বাদলের এই বর্ষণ ও অন্ধকার
দুই-ই প্রতীক্ষার

যখন লু বালু ছড়াচ্ছিল একটা একটা ছুরি
মনে হয়েছে বর্ষা নেমে আসুক
যখন প্রবল রোদ চোখে সেঁধিয়ে উসকে দিয়েছে আঁধি
বলেছিলাম মেঘে মেঘে এসো অন্ধকার

তা দুই-ই এসেছে

আর আমি পা ছড়িয়ে বসে রয়েছি দু'ধাপ সিঁড়িতে
থৈ-থৈ রূপালি কূপি না পেরেক উল্টে দেওয়া ঝমঝম প্রবাহ
যেমন উঠোনে একটি দুটি ফেণা...কত ফেণা
ভেসে চলেছে বাইরে নর্দমায়

ভিজে যাচ্ছি ভিজে যাই
বর্ষাবাদলের এই বর্ষণ ও অন্ধকার,
দুই-ই ছিল কত প্রতীক্ষার

সেই যারা এসেছিল ঢের দিন বচ্ছর আগে
দু'ধারে দুলছিল বেণী দুটি চোখও ভ্রমর উড়াল
দু'চোখ আমারও একটু নীচু হলেই আঁচল সামলানো
দু উথানে দু'বার টানতোও
বয়সের দু'বিন্যাসে তারা

আজ কেন মনে হলো ওরা দুই-ই বৃষ্টি...অন্ধকার...
দাওয়ায় পা ছড়ানো ঐ বৃদ্ধটির গায়ে
শুধু দু'ফোঁটা জল

তুমি এসেছো ভাবছি এসেছো তো
কতদিন তোমার প্রতীক্ষা ছিল পাশে বোসো পা ছড়িয়ে সিঁড়িতে
আর ঠাণ্ডা হাতে ঘাড় ছোঁও
চুলের বিদ্যুৎ রেখা বিন্দু জলে কামিনী থোকায় ফুটে উঠুক।

অপ্রকাশিত

অমিতাভ দাশগুপ্ত

তার কি নাগাল পাওয়া যায়?
সে আজও ফেরার প্রয়াত কবির অপ্রকাশিত কবিতায়।
মৃত্যুর পর দেওয়ালে নতুন চুনকাম,
আমারই সঙ্গে ঘুরত-ফিরত, অথচ তাকে কি চিনতাম?
না কি উবে গেছে লালবাজারের কালো টর্চার সেলে,
যতদূর জানি সে-নাম ছিল না জনযুদ্ধের রোলে।

সারাবেলা ধরে আঁতিপাতি খুঁজি
তবু কি নাগাল পাওয়া যায়?
সে আজও ফেরার প্রয়াত কবির অপ্রকাশিত কবিতায়।

দলবেঁধে চরে বেড়ানো মেঘগুলো

হীরেন ভট্টাচার্য

ঘাঁট নামানো বুনো মহিষের মতো মেঘগুলো
দল বেঁধে আকাশে চরে বেড়াচ্ছে।
এখনই যেন আড়মোড়া দিয়ে কলসী-কলসী জলে ভিজিয়ে দেবে
রোয়া খেতের রোদ পিছলে-পড়া চওড়া পিঠ—

ভিজে ডুবে একাকার হবে তাল-তাল মেঠো শুকনো মাটি
আর আমার আদ্যিকালের লাঙলের ছটফট লোহার ভারী ফলা...

সময় অসময়

সমরেন্দ্র সেনগুপ্ত

ছোট থেকেই কেউ ডাকাত হবে বলে বড় হয় না।
যে-কোনো ঘাতক বালক বয়সে সুনিশ্চিত ফুল ভালবেসেছিল।
কেন কোনো কোনো মানুষ বড় হয়ে রাজনীতি পেলে
আর সহজ থাকে না
সেটাই বিস্ময়। মনস্তত্ত্ব আমাদের
কখনো কি স্বস্তি দিয়েছিল।
মা বাবার সঙ্গে আমরা বড় হই (আমরা বড় তারা বুড়ো)।
সমাজ তো আমাদের
পাত পেড়ে ভাত খেতে দেয়, ভাইফোঁটা দেয়, আকাশে মেঘের
উচ্চতা ও রঙ দেখে আজও আমরা বুঝে যাই শ্রাবণ না আশ্বিন,
সূর্য কখন ছোট করে দিন, সেই আবার গড়ে বড়দিন।
এই সব সমাহার যায় না সহজে বোঝা,
তারপর একদিন শুরু হয় নিজেকে প্রকৃত খোঁজা,
খুঁজতে খুঁজতে কেউ হঠাৎ হারিয়ে যায়,
কেউ কেউ হয়ে ওঠে ধর্মদাস খুনী
বারুদের বহ্নিব্যবহার শেষ অবধি তাকে খুশি
রাখবে কি—কি জানি?

এখন তাই মনে হয় শৈশবই প্রকৃত জীবন,
কোনো দেশ-ভাঙা বাসী বিশেষণ, সর্বনাম, রেফ্ তো তখন
জীবনের নির্মাণে আসে না, গ্রন্থ কি মানুষ পারে
নাকি মানুষই প্রয়োজনে গ্রন্থ বানায়, যার কালি ভেজা অন্ধকারে
জোনাকি বেড়াতে আসে, পরমায়ু নক্ষত্রে গিয়ে জড়ো হয়,
বড় হয়ে যাওয়া মানুষ টেবিলে বসে সেই ইতিবৃত্ত লেখে
তারপর মৃত্যু তাকে থামায় এক সময়।

সতর্কবার্তা

দিব্যেন্দু পালিত

এই যাত্রা শাড়ি পরে, সমূহ শালীন।
কিন্তু সতর্ক যেও, দিনকাল তত ভালো নয়—
যারা প্রতিবাদ করে তাদের জন্য এই নতুন আইন।

গ্রেফতারের আগে ওই আইনের রক্ষক প্রভুরা
সমস্ত শৃঙ্খলা ভেঙে টেনেহিঁচড়ে দেখবে তোমাকে
প্রকাশ্য দিবালোকে, যাতে ছবি ছাপা হয় খবর কাগজে।

হাতে অস্ত্র থাকলে ওরা স্বাদ-পাওয়া জন্তুই যেন বা
লক্ষ্য যা-কিছু হোক তারও আগে লক্ষ্যে ছুটে যায়,
যাতে স্নায়ু স্বস্তি পায়, রক্ত পায় বুনো আহ্লাদ।

বরং নগ্ন যাও, যাতে ওরা থমকিয়ে দ্যাখে
ওদেরই মাতৃরূপ, ভগ্নিরূপ, কন্যা কিংবা
প্রেমিকার রূপ।

বসুমতী
মণিভূষণ ভট্টাচার্য

যেহেতু কঠিন কিছু বলবো বলে এসেছি তোমার খুব কাছে—
ব্যস্ত হয়ে পড়েছিলে বন্ধ করতে দক্ষিণ জানালা,
কেন না বাতাস এসে মোমবাতি কেড়ে নেয়, পর্দার প্রান্তগুলো নাচে,
আমাদের কথা হবে শ্মশানের ধারে বসে, অস্থিতে উপচে পড়বে থালা।

তুমি কি দেখতে চাও, তুমি কি দেখাতে চাও মজ্জার ভিতরে ভ্রষ্ট
ভ্রান্তি আর দুষ্ট লোকাচার,
শুনতে পাওনি আজো সম্যক ঢেউয়ের চলাচল,
তোমাকে চূড়ায় রেখে, তোমাকে দুহাতে রেখে সহ্য করি ভার,
তোমার শরীর ঘিরে চুপ করে বসে আছে রাত্রির অবশ কোলাহল।

শিউলি শিশির দূর্বা—উপরে বিমল আস্তরণ
মাটি খুঁড়লে রক্তিম তপস্যা ছিঁড়ে বাটি বাটি রক্ত উঠে আসে,
তোমাকে আবার বলি—সমস্ত নিষেধ ভোলো, তুলে নাও সমস্ত বারণ
জ্বলুক একটি রাত সরল সুদীর্ঘ সর্বনাশে।

তোমাকে দেখাবো বলে সঞ্চিত কথার স্তূপে রেখেছি আগুন,
জামবনে বন্দী নিশি, বন্ধ করে দিয়ো না প্রবেশ,
হঠাৎ ধমনি ছিঁড়ে উল্কাবৃষ্টি এনে দেবে মুনিয়ার পাখা ভর্তি নুন,
কথার সমাপ্তি আছে, স্মৃতিও মৃত্তিকা ঢাকা শোণিতের নেই কোনো শেষ।

এখন সহজবোধ্য কিছু নেই
পবিত্র মুখোপাধ্যায়

এখন সহজবোধ্য কিছু নেই। তোমাকে আমার
বিচ্ছিন্ন দ্বীপের কোনো অজ্ঞাত প্রজাতি
বলে মনে হয়। তুমি
আমাকেও ভাবো হয়তো বা
সেরকমই।

আমাদের ভাষা
অজানা ভাষার কোনো অভিধান থেকে তুলে আনা
'শব্দ' হ'তে পারে; শুধু
শরীরী ভাষার অর্থ হয়তো বা
হাবেভাবে বুঝে নিই, বিনিময়ে
বাক্যবন্ধ নেই।

এরকম হয়ে যাবে বিংশ শতক ফুরোতেই
মনে হয়নি তো। তুমি
ভেবেছিলে নাকি।
চিরুণীতল্লাসী ক'রে একটি দ্রবণশীল গোটামানুষের
খোঁজ পাবো লাখো মানুষের ভিড়ে—ঠিক
এমন ভাবিনি। তবে
ক্ষয় কিছু এসেছিলো দ্রুত।

পণ্যজীবিতার যুগে স্বাচ্ছন্দ্যের সুবিধা প্রভূত;
হাত বাড়ালেই
মার্কারী চাঁদের জ্যোৎস্না অমাবস্যাতেও
এনে দিতে পারি এইখানে।

যদি চাই, ঈশ্বরের কাছাকাছি যে রয়েছে, প্রযুক্তির দানে
তার সঙ্গে সরাসরি কথা ব'লে
হ'তে পারি ঘুমে অচেতন।

এইসব সফলতা দিয়েছে কি মৃতপ্রায় মানববন্ধন
ফিরিয়ে আবার শূন্য হাতে?

এখন কাছের বন্ধু, প্রতিবেশি লাগাতার রয়েছি সংঘাতে;
শত শত বছরের অতিথিশালা যে হিমঘর
হয়ে গেছে; মাঠ-প্রান্তরের সীমানায়
কাঁটাতার বেড়া, দুইধারে
ভাড়াটে জহ্লাদ, দেশপ্রেমিক সৈনিক মুখোমুখি,
শরীরী ভাষায় ওরা কথা বলে।
হৃদয়ের ভাষা

অর্থ তার হারিয়েছে। একটি তদ্‌গত অর্থ তার
জানে ওরা—মারো কিংবা মরো।

যারা নিরাপদে আছি তারাও আতঙ্কে জড়োসড়ো—
কে কাকে চিহ্নিত ক'রে রেখেছে
অদৃশ্য খড়ি দিয়ে—
জানা নেই কারো, মুখে হাসি
মনে হয়—অনাবিল। কতোকাল আছি পাশাপাশি
এ বাড়ির লাউডগা ও বাড়ির চালায় লতিয়ে
গিয়েছে; শিশুরা মেখেছে ধুলো, ঝাঁপ
দিয়েছে নদীতে; ডিপটিউবয়েলের ধারে
সংসারের খানাখন্দ পেরোনোর কাহিনী বলেছে
প্রতিবেশিনীরা, কতোকাল ধরে
এই ভাবে।

ছাতিমগাছের মতো ছায়া ধ'রে একদিন
মানুষের পাশে এসে মানুষই দাঁড়াবে;
পাথর ফাটিয়ে মুশা এনে দেবে পিপাসার জল;
আমাদের সন্তানেরা? এই—
সুখস্বপ্ন দেখা হয়তো
তেমন সহজ নয় আজ।

মাইক্রোস্কোপে দেখা যাচ্ছে ক্রমবিলুপ্তির পথে
মানবসমাজ;
গোষ্ঠী থেকে জনগোষ্ঠী—চোখ
এর বেশি
দেখে না। ভুটভুটি চড়ে নদী পার হ'তে
যেটুকু সময়...টুকরো কথা...মাছরাঙা
পাখিদের উড়ে আসা,
ছোঁ মেরে শিকার তুলে নিয়ে
ফের উড়ে যাওয়া, এতো
ক্ষিপ্র আজ জীবনধারণ

বুঝে নিয়ে চলবার রীতি

ঠিক ক'রে নেমে যাওয়া যে যার গন্তব্যে। কারো আজ
পেছনের পথ ফিরে দেখার মতন
সময় এখন নেই আর।

তাব'লে বলছি না—আছে অন্ধকার, ভবিষ্যৎ ও অন্ধকার।
ইতিহাস জুড়ে নেই ভাঙনের ধারাবাহিকতা।
মৃত্যুর সাম্রাজ্য জুড়ে প্রাজ্ঞ নচিকেতা
ফিরে এসে বলে, শোনো হে মানুষ! আমি
জেনেছি মৃত্যুকে। তাকে জানা
অর্থহীন। শুধু
জীবনকে জানো।

যে শিশু তোবড়ানো থালা হাতে, তাকে আনো
ফুটপাত থেকে ঘরে, সে তোমারি শিশু
হয়ে ঘরে আলো দিতে পারে
যদি দাও পিতৃপরিচয়।

কেউই দেখে না, জানি—
আমাদের ঘিরে আছে সপ্তরথী,
ঘাতক সময়।

শান্তিপর্ব

সব্যসাচী দেব

আজ মনে নেই আর হাইওয়ের শেষে কোনো দিগন্ত ছিল কি!
মনে নেই এমনকী বৃষ্টির ঋতুতে ফোটা শিউলির কথাও;
আশ্চর্য নির্ভার নিয়ে জেগে আছি জেগে থাকি অযুত বৎসর—
উত্তরায়ণের পথে এভাবেই চলে যাওয়া—নিশ্চিত বিদায়।

পাঠশালা ভেঙে গেছে, শ্রুতলিপি ভেসে গেছে গাড়ুড়ের জলে;
গঙ্গার ঘোলাটে জলে মাছরাঙা উঁকি দেয় অভ্যাসের ভুলে।
আজ শুধু সারাদিন সংকীর্তনের দলে উঁচু গলা সাধা—

ময়দানে খোলা হাওয়া, ঘাসের উপর নামে অস্তগামী রোদ।

এরপর রাত্রি বুঝি এরপর নিরুদ্বেগ ফুলঝুরি জ্বালা।
কী আহ্লাদে দুই হাতে করতালি বেজে ওঠে, পর্দা নেমে আসে;
এখন ঘুমের নেশা, এখন নিরুপদ্রব স্বপ্নহীন ঋতু—
এখন চাঁদের আলো হাওয়া মেখে ঝরে থাক ক্লান্ত শরীরে।

আজ আর মনে নেই, কোথায় হাঁটার শুরু। শুধু আজ রাতে
কেউ যদি ফিরে আসে। তারাদের ফিস্‌ফিস্ ফেরায় স্মৃতিকে।

প্রত্যাশাপুরাণ

গণেশ বসু

তোমাদের কাছে ছিল বরাভয় হিরণ্যগর্ভের দিন প্রত্যাশাপুরাণ।
তোমাদের কাছে ছিল সুশ্রূষায় উত্তরণ, ঋতুবদলের
মাল্যবান মুখগুলি অন্তহীন যন্ত্রণার শেষে।

তোমাদের কাছে ছিল খরার ভিতর থেকে খুঁজে আনা বৃষ্টির বন্ধুতা
তোমাদের কাছে ছিল সকলের হয়ে এক সফল মিনতি 'ভালো থেকো'
চূর্ণ হোক অবরোধ, বিস্তারিত জেগে ওঠা পথের ইশারা।

তোমাদের কাছে ছিল ছাঁচভাঙা আরাধনা, শিকড়ের মুখে
ভিন্নতর দৃশ্যকল্প। কাঁটাতার সরে গেছে, প্রতিকার চেয়ে
বানভাসি দিনগুলি ফিরে আসে, ঘুরে ফিরে আসে।

এখন হিস্যায় যেন মুগ্ধবোধ ব্যাকরণ, ক্রোধ নেই, স্বপ্নও লোপাট
তামাম তারুণ্য থেকে, শিথিলতা পেয়ে বসে, গতানুগতিক
টিপ্পনীর ধারাভাষ্য, লাল ফিতে, কমিশন, পতনের সিঁড়ি।

এ কোথায় নিয়ে যাও, কোন্ অন্ধ কবন্ধের দেশে
মর্গের মাদল বাজে উচ্ছ্বাসের বরমুদ্রা শ্মশান উৎসব?

ধন্যবাদ

কালীকৃষ্ণ গুহ

মনে মনে তাদের সকলকেই ধন্যবাদ দিই আজ।

যারা সেই মাঠের ভয়াবহ অন্ধকারে এসে বসেছিল আর বলেছিল
'ওই তো কালপুরুষ, ওই লুব্ধক, ওই সপ্তর্ষি
ওই সেই চিরকালের প্রশ্নচিহ্ন—'

যারা নিচু গলায় প্রশ্ন করছিল আর যারা নিচু গলায় উত্তর দিচ্ছিল
'ওই সেই ধাবমান ব্যাধ আর তার পিছনে ওই ধাবমান কুকুর—
ওই অরুন্ধতী নক্ষত্র যেখানে বৃষ্টি হচ্ছে
ওই কৃত্তিকা, ওই ছায়াপথ—

যারা গান গেয়ে উঠেছিল 'আজ কত তারা তব আকাশে'

যে উচ্চারণ করেছিল এই মন্ত্র :
সে ভোলে ভুলুক কোটি মন্বন্তরে
আমি ভুলিব না আমি কভু ভুলিব না

ইমনে কেদারায় সুর লাগিয়ে অলৌকিক গান গেয়েছিল যে যুবক
নক্ষত্র উৎসবের নীরবতার ভিতর থেকে স্বগতোক্তিময় কথা বলেছিল যারা
যারা একটিও কথা বলতে পারেনি শেষ পর্যন্ত

তাদের প্রত্যেককেই মনে মনে ধন্যবাদ দিই আজ।

সেই অমাবস্যার রাত্রির পর—অনেক অনেক নীরবতার পর—
আজ পূর্ণিমা।

স্বপ্ন-বিষয়ক রিপোর্ট

রণজিৎ দাশ

স্বপ্নে কখনও পাঁচটি চরিত্র একসঙ্গে থাকে না।
স্বপ্নের ভিতরে বড়জোর চারজনের জায়গা হয়,
তার বেশি নয়।
তাদের মধ্যে আবার অর্ধেক চেনা, অর্ধেক অচেনা।
যদি চারজন থাকে, তাহলে দু'জন চেনা, দু'জন অচেনা;
যদি তিনজন থাকে, তাহলে দেড়জন চেনা, দেড়জন অচেনা...

স্বপ্ন ভিস্যুয়াল এবং রঙিন। তবে দৃশ্যহীন স্বপ্নও
হতে পারে। জন্মান্ধ মানুষ দেখে ধ্বনির,
গন্ধের, সুরের। 'দেখে' কথাটা ভুল হল, বলা উচিত,
জন্মান্ধ মানুষ স্বপ্ন শোনে, কিংবা শোঁকে। কিন্তু
আশ্চর্য এই যে, স্বপ্নের ভিতর জন্মান্ধের চোখের তারাও
সমান নড়ে-চড়ে...

শুধু নিজেকে নিয়ে স্বপ্ন হয় না, আবার
পাঁচজনকে নিয়েও কোনো স্বপ্ন হয় না।
দুরকমের মানুষ আছে পৃথিবীতে; একদল যারা
স্বপ্ন মনে রাখতে পারে; আরেকদল যারা
স্বপ্ন মনে রাখতে পারে না।
প্রথম দলের কারুর সঙ্গে এক বিছানায় শুতে নেই,
দ্বিতীয় দলের কারুর সঙ্গে একই গ্রহে থাকতে নেই...

স্বপ্নের বিষয়বস্তু কখনও ইন্দ্রিয়চেতনা থেকে আসে না।
স্বপ্নে যে পুরুষদের লিঙ্গোত্থান হয়, তার সঙ্গে
যৌনতার কোনো প্রত্যক্ষ সম্বন্ধ নেই।
তৃষ্ণার্ত মানুষ কখনও জল খাওয়ার স্বপ্ন দেখে না...

স্বপ্ন একধরণের জেনেটিক রিহার্সাল,
স্বপ্ন হচ্ছে মানুষের লড়াই, শিকার, পলায়ন
এবং যৌনসঙ্গমের মহড়া...

যে প্রায়ই স্বপ্ন দেখে যে সে ন্যাংটো অবস্থায়
রাস্তায় বেরিয়ে পড়েছে, কিছুদিন পরে
বাস্তবেও তার একই হাল হয়।
তার নগ্নতা ঢাকতে না পেরে পৃথিবীর
সমস্ত বস্ত্রশিল্প বন্ধ হয়ে যায়।
সে অগত্যা স্বপ্নের ভিতরে বাকি জীবন লুকিয়ে থাকে,
এবং প্রতীক্ষা করে
অন্তত একটা পাট-ভাঙা চাদরে-ঢাকা বিষণ্ণ মৃত্যুর...

বজ্রপাণি

অমিতাভ গুপ্ত

চায়ের টেবিল জুড়ে ঝরে-যাওয়া উদ্দেশ্যনিরত
অ্যাশট্রের মতো মুখছবি
দেখে দিব্যি বোঝা যায় কেউ কেউ প্রতিক্রিয়াশীল নয়
এতদিনে সবাই বিপ্লবী

আলাপের খণ্ডকাব্য কতবার কতভাবে করেছে অর্জন
অনুষঙ্গ এবং উপমা
যাকে নিয়ে বেঁচে আছে বাংলা কাব্য নাভিশ্বাসময়
মৃত্যুর আগে মৃদু ক্ষমা

হয়তো করেও যাবে যখন ছাঁকনির মতো দেরিদ্যাসাহেব
অন্য বিনির্মাণে
বলবেন চায়ের কাপের কাছে হামাগুড়ি দিয়ে চোখ ঠেরে
তর্কটির মানে

অথবা নতুনভাবে সমস্ত শ্রাবণঋতু ভরে যাবে আদিগন্ত
মেঘে ও উৎসবে
এবং আশ্বিন এসে খুলে দেবে সব চোরাকুঠুরির দুয়ার জানালা
তার আগে বজ্র জড়ো হবে

এমন হতেও পারে তখনই চায়ের কাপ সশব্দ নামিয়ে
টেবিল ছাড়িয়ে বাইরে এসে
দু'হাত মেলেছি। জানি, আমারও একদাশূন্য হাতে
ঝড়ের গভীরে বজ্র মেশে

একটুখানি ভালো হয়ে থাক

রত্নেশ্বর হাজরা

যার যেরকম ইচ্ছে সেরকমই থাক
শুধু ভালো থাক—শুধু
একটুখানি ভালো হয়ে থাক।
কেন তোর জামার আস্তিনে রাখবি ছোরা
কেন মারবি বল্লমে খুঁচিয়ে
কেন পড়বে বুলেটের খোল—চারদিকে ছড়িয়ে।
গোলপাতায় ছাওয়া ঘর আগুনে আক্রোশে পুড়ে যায়
ছাই ও সন্ত্রাস মাখা পড়ে থাকে ঢিবি—
তোর আঙুলের ছাপ চন্দনে না রেখে—কেন
রক্তে রেখে দিবি।
নীলকণ্ঠ এখনো তো তেমনি উড়ে যায়
শেষ বিকেলের বক এখনো নির্জন ঘরে ফেরে
চড়ুইয়ের চঞ্চল রোদ্দুর
এখনো তেমনি করে ডাকে চরাচরে—
ভালো থাক—একটুখানি ভালো হয়ে থাক
বুকের শব্দের মধ্যে রক্তের প্রবাহে মনে মনে
দ্যাখ্—একই স্বপ্ন এসে দাঁড়িয়েছে
ওদের উঠোনে আর তোদেরও উঠোনে—
এখনো টিনের চালে একই শিশিরের শব্দ হয়
জামরুল গাছের পাতা কুঁড়ির আনন্দে ভিজে থাকে।
যার জন্য আস্তিনের নীচে ছোরা লুকিয়ে রাখিস
তারও জন্মদিন হয়। তার মা-ও (তোর মা-র মতো)
একটু পায়েস করে রাখে—

উঠে গেছে সিঁড়ি

শান্তিকুমার ঘোষ

উঠে গেছে সিঁড়ি নবজাগরণের...
দেবপরীরা বিচরণ করে যেই স্বচ্ছ স্তরে।
তুঙ্গ উচ্চতা হ'তে যায় দেখা
চীন লণ্ঠন দুলিয়ে গ্রহ চলেছে শূন্য থেকে শূন্যে...
অনন্ত বিস্তার জুড়ে নৈঃশব্দ্য;
নিঃসঙ্গতার ভার বইছে অমর প্রাণ,
বুনে নিচ্ছে নব-নবীন ভাষা;
হঠছে রাহুর ছায়া...
সেই সঙ্গে এগিয়ে-যাওয়া
আলোর মণ্ডলে।

নির্জন কান্নার মতো

জিয়াদ আলী

ঘরবাড়ি পড়ে আছে ছায়া কিংবা কংকালের মতো
খাঁচা ছেড়ে পাখি চলে গেলে
যে কঠিন শূন্যতার হাহাকারে পরিচর্যা নষ্ট হয়ে যায়
সেই দৈন্যে দীর্ণ হতে হতে
কোনোমতে বেঁচে থাকা ঘাতকেরই নির্মম ছায়ায়।

নদী কি নদীর মতো থাকে না কি সঙ্গমের টান মরে গেলে
মাদল বাজায় যারা মধ্যরাতে বন্য উৎসবে
তারা সব মহুয়ায় ঘুমে অচেতন
কে কাকে শুশ্রূষা দেবে রূপসী জ্যোৎস্নায়
আযানের ভাষাগুলি ভোরের আগেই মরে যায়।

নির্জন কান্নার মতো দুএকটা গোলাপই শুধু
ফোটা ফোটা শিশির ঝরায়।

সুশান্ত বসুর দু'টি কবিতা

নৌকো ঝিমোয়

রোশনাইতে ধাঁধিয়ে যাচ্ছে চোখ
হরেকরকম ক্রোড়পতির খেলা,
মনের গায়ে জড়ানো নির্মোক—
হাঁক পাড়ে ওই সীতারামের মেলা।

বিপ্রতীপের মধ্যে ওড়া চিল
তাকিয়ে থাকে জলের-খরা মাঠে
অন্বেতে বাঁধা শ্যাম ও কূলের মিল
আড়াল-সুতোর নাচ জুড়েছে, ঘাটে

নৌকো ঝিমোয় স্বপ্ন-হারা চোখে।

তোমাকে

স্নান করেছি তোমার কান্তিনির্ঝরে
শুদ্ধসারঙ্গ উঠলো বেজে দিগন্তে
ভ্রান্তিমানের হিসেবনিকেশ উল্টিয়ে
ডাক পাঠালে চৈত্রদিনের পল্লবে।

ওষ্ঠে তোমার ঝিকিয়ে-ওঠা রোদ্দুরে
গান বেঁধেছে রঙিন অশোকমঞ্জরী
ধুলোউড়ির রাস্তা জুড়ে অন্তহীন
তোমার চলা মুহূর্ত লীন অনন্তে

আজও গাঁথা সময়হারা স্থাপত্যে।
সে সে স্নাতক তোমার কান্তিনির্ঝরের
প্রহর-জোড়া প্রেম ও ঘৃণার দ্বৈরথে
বাঁচার আলো পায় খুঁজে এই যুগান্তে।

রম্যরচনা

'রাজ'-মৎস্য

শ্রীপান্থ

বছর কয়েক আগের কথা। এই শহরেরই এক মধ্যবিত্ত বাড়িতে বৌভাতের নেমন্তন্ন রাখতে গিয়েছি। বাড়ি ভর্তি লোক। ছাদ ভর্তি টানা টেবিল আর বেঞ্চি। প্রতি টেবিলে পাঁচ ছয় জন নিমন্ত্রিত। মধ্যবিত্ত বাড়ি বলেছি বটে, কিন্তু ভিড় দেখে মনে হল রীতিমতো বড়লোকি ব্যাপার। শত শত আমন্ত্রিত। এ বাজারে এত মানুষকে যাঁরা এক সঙ্গে আপ্যায়ন করতে পারেন তাঁদের ছাপোষা মধ্যবিত্ত বলি কেমন করে? এ-কালের নব্যরীতি মাফিক উর্দিপরা ক্যাটারার-দের একজন হাতে হাতে যে ছাপানো 'মেনু'টি ধরিয়ে দিয়ে গেল তা দেখে চক্ষু চড়কগাছ। এত রকমের মাছ? দু'তিন রকম মাংসের প্রিপারেশন! যা হোক, নিয়ম মাফিক শুক্তোর বদলে প্লেটে প্রথমে নিবেদিত হল যে বস্তুটি সেটি তপ্সে ফ্রাই। —তপসে। আমার পাশে বসা ভদ্রলোক বলতে গেলে লাফিয়ে উঠলেন। —ইস, কতদিন তপ্সে মাছ চোখে দেখিনি। মাছটা হাতে নিয়ে তিনি তা ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখতে লাগলেন। আমি আড় চোখে দেখতে লাগলাম তাঁকে। মেনুতে দেখেছি, রুই আছে, চিংড়ি আছে, এমনকি রয়েছে ইলিশও। তবু তপ্সে নিয়ে কেন এই আদিখ্যেতা। যাহোক, ভদ্রলোক পর পর তিন খানা ফ্রাই উদরস্থ করে দ্বিতীয় পদে মনোনিবেশ করলেন। ততক্ষণে উল্টো দিকের বেঞ্চি থেকে আওয়াজ উঠল, —এই বাছা, এদিকে ফ্রাইটা একবার দেখিয়ে নেবে? বোঝা গেল তপ্সে ভক্ত একজন নন, আরও আছেন। জানি না, শেষ দিকে আমন্ত্রিতরা পাতে ফ্রাই পাবেন কিনা।

সেই থেকে আমার মাথায় ঘুরছে—তপসে, আর তপসে। বাঙালি ভদ্রলোকের এই তপ্সে প্রীতি কবে থেকে? আর তাঁদের তপসে খেতে শেখালেই বা কে? ব্যাপারটা ভেবে দেখবার মতো। কেননা, বাংলা প্রবাদ বলে—"শাকের মধ্যে পুঁই/মাছের মধ্যে রুই।" মৎস্য রসিক বাঙালির কাছে রুই মৎস্য রাজ। "কঙ্কাবতী"তে মাছেদের রানির ছবি দেখলেও কি তাই মনে হয় না? রুই ছাড়া আর কার মাথায় মানাবে ওই মুকুট! তাছাড়া, ইলিশ? ইলিশের জন্য প্রতি বছর মরশুমে যে মায়াকান্না শোনা যায় তার পর কেমন করে বলি ইলিশ বাঙালির কাছে দুয়োরানি? আর একটি বাংলা প্রবাদের কথা মনে পড়ে, "মাছের মধ্যে ইলিশ,/মানুষের মধ্যে পুলিশ।" (পাঠান্তরে—"নাঙের মধ্যে পুলিশ!") ইলিশকে বাঙালি পণ্ডিতরা উপাধি দিয়েছিলেন—"জিতপিযূষ।" এমনকি নিরামিশাষী বাঙালিরও নাকি জিভে জল এসে যায় ইলিশের নাম উচ্চারিত হলে। বৈষ্ণবদের ব্যঙ্গ করে মাছ-পাগল বাঙালি একটি শ্লোক রচনা করেছিলেন এক সময়,—'ইলিশোখলিশশ্চৈব ভেটকির্মদ্গুর এবচ/রোহিতো মৎস্যরাজেন্দ্রঃ পঞ্চমৎস্যা নিরামিষাঃ।" তার মানে ইলিশ, খলসে, ভেটকি, মাগুর ও রুই, এই পাঁচজাতের মাছ আমিষ নয়,—নিরামিশ। সুতরাং, নিরামিশভোজীরাও পরমানন্দে তা খেতে পারেন।

এই ইলিশ নিয়ে বাঙালি কলম্‌বাজরা কত কত শব্দই না খরচ করেছেন। বুদ্ধদেব বসু, সৈয়দ মুজতবা আলী, কমলকুমার মজুমদার থেকে শুরু করে কল্যানী দত্ত, অনেকেই ইলিশ বন্দনায় মুখর। এমনকি এই কলমচিও এক আধবার তাঁদের সঙ্গে গলা মেলাবার চেষ্টা করেছেন। সেই রুই আর ইলিশকে ভুলে মধ্যবিত্ত বাঙালি কিনা সামান্য তপ্‌সের কাছে নিবেদিত প্রাণ? ভাবনার মতো বিষয় বটে।

অনেক ভেবেচিন্তে বিস্তর ঘাটাঘাটি করে আমার সিদ্ধান্ত। তপ্‌সকে বাঙালির পাতে তুলে আনার পেছনে রয়েছেন "মেকলের এদেশি সন্তানরা"। আর তাঁদের তপস্বীমন্ত্রে দীক্ষিত করেছেন যাঁরা বঙ্গসন্তানদের শেক্সপিয়ার-মিলটন, মিল-বেন্থামদের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিয়েছেন সেই ইংরেজ প্রভুরাই। তবে কি তপ্‌সে এদেশের জলের সোনালি শস্য নয়? তা হবে কেন? তপ্‌সে আমাদের দেশেরই মাছ। মোটেই তা বিলেত থেকে আমদানি করা নয়। বিদেশি প্রাচ্য বিদ্যাসন্ধানীরা ভারতীয়দের সূত্র ধরেই ভারতের প্রাচীন ইতিহাসের নানা গুপ্ত রত্ন উদ্ধার করেছেন তেমনই গঙ্গার গভীর জল থেকে তপস্বীকে তুলে এনে আমাদের সামনে প্রতিষ্ঠিত করে বলেছেন, বৎস্যগণ, প্রণিপাত কর। সেই থেকে তপসে ইংরেজি শিক্ষিত মধ্যবিত্ত বাঙালির প্রিয়-মৎস্য। এই ছোট্ট মাছটি আসলে "রাজ মৎস্য।" ঔপনিবেশিক আমলের একটি স্মারক।

ব্যাপারটা একটু বিশদ করা দরকার। বাংলা মঙ্গলকাব্যে হেঁসেলে হেঁসেলে কত না মৎস্য রন্ধনের কাহিনী। মনে পড়ে "অন্নদামঙ্গলের" কথা,—"নিরামিষ তেইশ রান্ধিলা অনায়াসে। /আরম্ভিলা বিবিধ রন্ধন মৎস্য মাসে।।/কাতলা ভেকুট কই ঝাল ভাজা ঝোল।/ঝাল ঝোল ভাজা রান্ধে চিতল ফলই।।/কই মাগুরের ঝোল ভিন্ন ভাজে বই।/মায়া সোনা খড়কীর ঝোল ভাজা সার।/চিংড়ীর ঝালা বাগা অমৃতের তার।।/কঠা রান্ধি রান্ধে রুই কাতলার মুড়া।/তিত দিয়া পচা মাছে রান্ধিলেক গুঁড়া।।/আম্র দিয়া শোল মাছে ঝোল চচ্চড়ী।/আড়ি রান্ধে আদা রসে দিয়া ফুলবড়ী।।"... কিন্তু কোথায় ইলিশ? বরিশালের কবি বিজয়গুপ্তের "মনসা-মঙ্গলে"ও ইলিশের আঁশটুকু পর্যন্ত নেই। একমাত্র ইলিশের উল্লেখ দেখেছিলাম ঢাকার রামসুন্দর বসাক মশাইয়ের শিশুপাঠ্য "বাল্যশিক্ষা"য়। সেখানে মাছের যে তালিকাটি রয়েছে তাতে ইলিশ কেন, এমনকি তপ্‌সে পর্যন্ত হাজির।—"রুহিত, মাগুর, পাবদা, তপসী, চিতল, ভেটন, বাউস, কই, জিউল, কাতলা, ইলিশ, খলিশা, বাইম..." ইত্যাদি। লক্ষণীয় ইলিশ সেখানে হাজির হলেও উপস্থিতি তার প্রথম সারিতে নয়। প্রথম সারিতে বরং রয়েছে তপ্‌সে। কিন্তু ব্যস, ওই পর্যন্ত। বাংলাদেশের বন্ধুদের কাছে শুনেছি তপসে কখনও সখনো বর্ষাকালে চট্টগ্রাম এলাকায় পাওয়া যায় বটে, কিন্তু তাকে কিছুতেই জনপ্রিয় বলা যাবে না। তপসে. অতএব নিশ্চিন্ত মনে ধরে নেওয়া যায় তপসে একান্তভাবে উনিশ শতকে তথাকথিত নবজাগরণের কেন্দ্র কলকাতার মাছ। বাঙালরা রসিকতা করে বলতে পারেন—"ক্যালকেশিয়ান।"

এই তল্লাটে সাহেবদের প্রিয় মাছ ছিল ভেটকি আর চিংড়ি। ভেটকিকে ওঁরা বলতেন ভেকটি। অনেকে যেমন বাক্সকে, বাস্‌ক, রিকশাকে রিশকা বলেন, ঠিক সেই ব্যাপার। যা হোক, মাছের মধ্যে কলকাতায় সেদিন ওঁদের কাছে প্রিয়তম—তপসে। ইলিশের রাজ্যে

রাজধানী বসালেও ইলিশকে ওঁরা মোটে চিনতে বা বুঝতে পারেননি। তাঁরা যেন কিছুতেই ভেবে পাচ্ছিলেন না, রূপোর মতো চকচকে ঝকঝকে এটা ঠিক কোন্ জাতের মাছ। বিশ্বের তাবৎ ভ্রমণকারীরাই অন্যদেশে গিয়ে নতুন যা দেখেন তা বোঝার চেষ্টা করেন স্বদেশে-দেখা অভিজ্ঞতার নিরিখে। বস্তুত তাঁরা স্বদেশকে বিদেশে দেখতে পেলেই যার পর না খুশি। সুতরাং, ইলিশকে দেখে শুনে একজন ইংরেজ বহুদর্শীর মতো সিদ্ধান্ত জানালেন, গ্রীষ্মে লণ্ডনের বাজারে 'স্যাড' নামে যে মাছটি বিক্রি হয় বাংলার ইলিশ হুবহু তা-ই। আর এক সাহেব ১৮১০ সালে জানাচ্ছেন, 'হিল্‌সা' অথবা 'স্যাবস ফিস' আসলে 'ম্যাকারেল' এবং 'স্যামন' মাছের মাঝামাঝি এক জাতের মাছ। আর একজন তুলনামূলক মৎস্যতত্ত্বের মধ্যে না গিয়ে সরাসরি রায় দিয়েছেন ইলিশ আসলে "আমাদের স্যামন"। নামে কিবা আসে যায়,—সাহেবদেরই কথা। আসলে সাহেব-মেমরা ইলিশের রূপ রস স্বাদ গন্ধ থেকে বঞ্চিত ছিলেন বলেই নাম নিয়ে এই জল্পনা। মনে হয় ইলিশের কণ্টক বাহুল্য তাঁদের রসনাকে সংযত রেখেছে। না হলে কে জানে, আজ হয়তো চিংড়ির মতো ইলিশ পশ্চিমযাত্রী সাজত। বুঝিবা বাঙালি বোমাবাজদের চেয়েও সাহেব-মেমদের বেশি ভড়কে দিয়েছিল জলচর এই বাংলার ইলিশ, তা-ই রক্ষে। আমি অনেক ঘাটাঘাটি করে মাত্র দু'জন মেমসাহেবের সন্ধান পেয়েছি যাঁরা ছিলেন এ-ব্যাপারে অকুতোভয়। তাঁদের একজন বাংলার গভর্নর কেসি সাহেবের ধর্মপত্নী লেডি কেসি। বেশ কয়েক বছর আগে কলকাতা বেড়াতে এসে তিনি স্মৃতিমন্থন করতে গিয়ে বলেছিলেন কলকাতায় দুটি বস্তুর স্বাদ এখনও তাঁর জিভে লেগে আছে। তার একটি হল বাংলার সুগন্ধী চাল। আর দ্বিতীয়টি বাংলার ইলিশ। অপর এক ভদ্রমহিলার স্মৃতিকথায় পড়েছিলাম তাঁর ইলিশের মস্তিষ্ক চর্বনের সুস্বাদু বর্ণনা। এই মেয়েটি আমেরিকায় একজন ওড়িয়া যুবকের প্রেমে পড়েছিলেন। বিয়ের পর নববধূকে নিয়ে ওড়িশায় যাওয়ার আগে ভদ্রলোক কয়েকদিন কলকাতায় ছিলেন। মেমসাহেবের সাময়িক আস্তানা ছিল তখন বিজ্ঞানী জগদীশচন্দ্র বসু ও লেডি অবলা বসুর বাড়িতে। সেখানেই একদিন তাঁর পাতে পড়েছিল ইলিশের মুড়ো। লিখেছেন—অপূর্ব। এমন বস্তু আগে কখনও খাইনি। উল্লেখ থাকে দু'জনের কেউ-ই খাঁটি ইংরেজ ললনা নন, প্রথম জন অষ্ট্রেলিয়ার কন্যা, আর দ্বিতীয়জন সুইজারল্যাণ্ডের মেয়ে। ফলে, তাঁদের রসনা ছিল স্বভাবতই ঔপনিবেশিক জড়তাহীন, কণ্টকভয়শূন্য।

ইলিশের এই হাল। অন্যদিকে তপসে নিয়ে সে কী মাতামাতি। বাঙালি কবি ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তর "এণ্ডাওয়ালা তপ্স্যামাছ" কিংবা ইলবার্ট বিল উপলক্ষে হেমচন্দ্রের সাহেবদের কাছে বাঙালির মহিমা কীর্তন শুনলে মনে হয় তপসে যেন আমাদের কত কালের আদরের ধন। হেমচন্দ্র লিখেছেন—কী না দিয়েছি আমরা তোমাদের?—"দেখাইল বাড়ী গাড়ী জুড়ী বাছাবাছা।/'ম্যাঙ্গো ফিস' আকন্দের মনোহর খাঁচা।।" গুপ্তকবি তো সাগর মন্থনের সঙ্গে তপসে মাছের সম্পর্ক স্থাপন করে তাকে প্রায় পৌরাণিক মর্যাদা দিয়েছেন।—'অমৃত-ভক্ষণে তাই এরূপ প্রকার।/সুমধুর আস্বাদন হয়েছে তোমার।।/এমন অমৃত ফল ফলিয়াছে জলে।/সাহেবেরা মুখে তাই ম্যাঙ্গোফিস্ বলে।।" ঘটনা এই আমাদের কবিরা সরব হওয়ার অনেক আগেই সাহেব মেমরা তপসের তপস্যায় কায়ো মন নিবেদন করেছিলেন। সেটা

স্বাভাবিক। কারণ, ইলিশ যদি রজতশুভ্র, তপসে তবে সুবর্ণ-কান্তি। কবির কথায়—কষিত-কনককান্তি। রুপোর চেয়ে সোনার আকর্ষণ বেশি বই কি। দ্বিতীয়ত, ইলিশের তুলনায় তপসে ক্ষুদ্রকায়, সন্ন্যাসীর মতো শ্মশ্রুগুম্ফ শোভিত, শান্ত ও সুকোমল। তার নিরীহ শরীরে প্রতিরোধের লেশমাত্র নেই। তপসে অল্পায়াসে বিদেশি রসনার আধিপত্য স্বীকার করে নেয়, তাহার চরিত্রে জাতি বৈরিতার লেশ মাত্র নেই। স্বভাবতই পরদেশি ঔপনিবেশিকদের কাছে তপসে আনুগত্যের প্রতীক। তাকে দেখলে মনে হয় রাজতোষই তার একমাত্র লক্ষ্য। বস্তুত, সত্যি বলতে কী, কিছু কিছু আমের নাম যেমন 'বাদশা-ভোগ,' 'বেগম-পছন্দ'। কিংবা 'রানি-পছন্দ', তেমনই তপসেকেও অনায়াসে বলা যেত—'সাহেব-পছন্দ', কিংবা 'বিবি পছন্দ!' কে জানে, আমের মরশুমে শহরের সুরসিক মেছুনিরা (স্মরণীয় হুতোম প্যাঁচা) কলাপাতায় সোনালি তপসে ছড়িয়ে দিয়ে হয়তো হাঁক দিত—'রাজা-পছন্দ'। কিংবা—"সাহেব পছন্দ!—সাহেব পছন্দ!"

"হবসন-জবসন"-এ দেখি সুদূর ১৭৮১ সালেই কলকাতার সাহেবরা বসে গেছেন টেবিলে তপসে-ফ্রাই সাজিয়ে। সে-বছর ফেব্রুয়ারি মাসে হিকির "বেঙ্গল গেজেট"-এ প্রকাশিত একটি বিজ্ঞপ্তিতে বলা হচ্ছে : আগামী মঙ্গলবার বোর্ড অব ট্রাস্টিজ শহরের নিউ টেভার্নে মিলিত হয়ে সাবস্ক্রাইবার বা গ্রাহকদের সুবিধার্থে ম্যাঙ্গো-ফিস উপভোগ করবেন। সেই সঙ্গে বিশেষ কার্যাবলীও আলোচিত হবে। বোর্ডের সর্বোচ্চ সভাধিপতি স্যার জ্যাকব ভাইনার কাঁটায় কাঁটায় দুপুর বারোটায় আসন গ্রহণ করবেন।

হিকি তাঁর কাগজে হেস্টিংস, ইম্পে সমেত তাবড় তাবড় কর্তাব্যক্তিদের হামেশাই আক্রমণ করতেন। অনেক সময় তা করতেন তাঁদের ছদ্মনামের মোড়কে সাজিয়ে তীক্ষ্ণ ব্যঙ্গ-বিদ্রুপের শরাঘাতে। এই ভোজের আসরটি কোনও বিশেষ কর্তৃপক্ষের অলস, অর্থহীন মধ্যাহ্ন বিলাসের চিত্ররচনা কিনা সেটা স্পষ্ট নয়। তবে আমাদের এই আলোচনায় তাৎপর্যপূর্ণ খবর একটাই, অষ্টাদশ শতকের শেষ দিকেই তপসে মাছ সাহেবদের কাছে শুধু পরিচিত নয়, রীতিমত উপভোগ্য বিলাসদ্রব্য। টেভার্নে তাকে ঘিরে বন্ধুদের দিব্যি জমে উঠছে ভোজের আসর। কোথায় তখন আমাদের গুপ্তকবি? কোথায়ই বা হেমচন্দ্র?

ঈশ্বর গুপ্ত যখন লিখেছেন—"ডিস ভোরে কিস লয় মিস বাবা যত/পিস করে মুখে দিয়ে কিস খায় কত।।/তাদের পবিত্র পেটে তুমি কর বাস।/এই কয় মাস আর নাহি খায় মাস।।" কিংবা "তোমার অধরে ধরি বাড়ে কত সুখ।/মাঝে মাঝে সেরির গেলাসে দেয় মুখ।।/বেচিলর যারা তারা প্রসাদের তরে।/রান্নাঘরে ধন্না দিয়ে আয়োজন করে।।" ততদিনে ভাগীরথী দিয়ে অনেক জল গড়িয়ে গেছে। টন টন তপসে উদরস্থ করে ফেলেছেন সাহেব-বিবিরা। গুপ্তকবি যতই বলুন না কেন যে ওঁরা বাঙালির মতো রান্না জানেন না, ("বাঙ্গালীর মত তারা রন্ধন না জানে।/আধসিদ্ধ করি শুধু টেবিলেতে আনে।।/মসলার গন্ধ গায়ে কিছু নাই।/অঙ্গে করে আলিঙ্গন কমলিনী রাই।।"), তবু সাধ কিন্তু তাঁর সাহেবদের টেবিলে বসেই তপসে আস্বাদন,—"হায়রে নিদয় বিধি ধিক ধিক তোরে।/কি হেতু বেলাক হিঁদু করেছিস মোরে।।/গোরা হলে হোরা মেরে চড়ে মনোরথে।/টেবিলে যেতেম খেতে

ডেভিলের মতে।।/প্রেমানন্দে পিস করি সুখে খায় মিস্।।/বলিহারি যাই তোরে ওরে ম্যাঙ্গোফিস।।" ইত্যাদি।

লক্ষণীয়, তপসের এই প্রশস্তি বিশুদ্ধ বাঙালি মতে নয়, তার সঙ্গে যুক্ত হয়েছে ইংরেজের তপসে বন্দনাও। মাছটি সাহেব-পছন্দ, বিবি-পছন্দ, সুতরাং, বাবু-পছন্দই বা হবে না কেন? তাই বলছিলাম সাহেবরা আমাদের শকুন্তলাকে অনুবাদ করেই ক্ষান্ত হননি, বাঙালিকে তপসেতে দীক্ষিত করেছেন।

এই দীক্ষা শুরু হয়েছিল অষ্টাদশ শতকেই। ধাপে ধাপে এই আপাত অকিঞ্চিৎকর মাছটির খ্যাতি এবং খাতির যেমন ইংরেজি টোলায় বেড়ে চলে, সঙ্গে সঙ্গে পাল্লা দিয়ে সমাদর তার বাড়তে থাকে বাঙালির হেঁসেলেও। ১৮০৫ সালে রবার্ডিন নামে এক সাহেব লেখেন,—ভারতে আমরা মোটামুটি ভাল মাছই পেয়ে থাকি। এখানে ঝিনুক আছে, হোয়াইটিং আছে, মুলেট, পমফ্রেট আছে। তাছাড়া আছে স্থানীয় জল হাওয়ায় লভ্য রকমারি মাছ। কিন্তু এখানে সব চেয়ে স্বাদু বলে গণ্য ম্যাঙ্গোফিস নামে ছোট্ট একটি মাছ। তার গন্ধও অপূর্ব। কিন্তু যে নদীতে জোয়ার ভাটা খেলে না সেখানে এই মাছ মিলে না। ফলে ব্রহ্মপুত্র এলাকায় আমরা এই মাছটি থেকে বঞ্চিত। তাই সাহেবের মনে খেদ।

১৮২০ সালে ওয়াল্টার হ্যামিল্টন লিখছেন, কলকাতায় রীতিমত এক বিলাস সামগ্রী ম্যাঙ্গোফিস। আমের মরশুমে মিলে বলেই তার এই নাম। এর স্বাদ ও সৌরভের কাছে আর সব মাছ তুচ্ছ। স্থানীয় লোকেরা মাছটিকে বলে তপস্বী মাছ। ইউরোপিয়ানরা তাকে নিজেদের করে নিয়ে বলে তপসে। এক ধরনের সন্ন্যাসীর সঙ্গে ওদের কিছুটা মিল আছে। সাধুরা দাড়ি গোঁফ রাখে, ওদেরও গোঁফ আছে। তাছাড়া, ঘোর বর্ষায় সাধুদের যেমন পথে ঘাটে দেখা যায় না, ওরাও তেমনই তখন হারিয়ে যায়।

১৮২২ সালে আর এক রসিক জানাচ্ছেন, কলকাতা তার তপসে-মচ্ছির জন্য বিখ্যাত। এপ্রিল মাসে কাঁচা আমের সঙ্গে সঙ্গে তাদের আবির্ভাব। "ম্যাঙ্গোজ অ্যাণ্ড ফিস্ মিট অব নেসেসিটি।" কাঁচা আম দিয়ে তার রান্নারও চল আছে। উৎসাহী সাহেবরা গঙ্গার ঘাটে নৌকো থেকে ঝুড়ি ভর্তি মাছ ঘরে নিয়ে আসেন। দাম টাকায় কুড়িটি মাছ। খানসামারা অবশ্য বাজার থেকে এনে বলে টাকায় পাঁচটা করে কিনতে হল। অনেকে দল বেঁধে নৌকো করে চলে যান ফলতা এবং বজবজের দিকে। দেশে যেমন 'হোয়াইট-বেইট' পার্টি জমে উঠে, এখানে তপসে ঘিরেও তাই। সন্দেহ নেই তপসে চমৎকার মাছ। প্রাতরাশে স্মোকড তপসের তুলনা হয় না।

এই তপসে রসিক বিখ্যাত ভ্রমণকারী ফেনি পার্কস, যিনি রাজা রামমোহন রায়ের বাড়িতেও নেমন্তন্ন খেয়েছেন। এবার আর. জি. ওয়ালেস নামে আর একজনের জবানবন্দি শোনা যাক। ইনি কলকাতা এসেছিলেন ১৮২৩ সালে। তিনি লিখছেন,—বোধহয় হুগলি নদীর ম্যাঙ্গোফিসের মতো উপাদেয় আর কিছু এই দুনিয়ায় নেই। মাছটি দেখতে যেমন প্রীতিপ্রদ, তেমনই রসনায়ও অতুলনীয়। এই মাছে আমের সৌরভ। মাছটি আমাদের ট্রাউট মাছের মতোই বর্ণে ও স্বাদের এক আশ্চর্য সমন্বয়। তার পাখনাও সুন্দর, তার তুলনা নেই। বছরে

মাত্র দু'মাস এই মাছ ঝাঁকে ঝাঁকে ধরা পড়ে এবং টেবিলে সদাড়ি গোঁফ পরিবেশিত হয়।...একজন তো বলেন, এই মাছের জন্য পনের হাজার মাইল দীর্ঘ সমুদ্রযাত্রাও তুচ্ছ। —আহ্ ম্যাঙ্গো ফিস!—আহ্ ম্যাঙ্গোফিস! তিনি বারবার তার নাম উচ্চারণ করতে লাগলেন। তারপর বললেন—শুধু এই ম্যাঙ্গোফিসের জন্যই আমার ভারত আগমন সার্থক! বুঝুন তা হলে! ভাস্কো ডা গামা গোলমরিচ আর মসলার গন্ধ পেয়ে 'হাঁউ মাউ কাঁউ' বলে সাত সমুদ্র তেরো নদী পার হয়ে ছুটে এসেছিলেন কালিকটে। এই ভদ্রলোকের পাগলামি দেখে মনে হয় না কি তপসে মাছের গন্ধও বদর বদর করে সাগরে ডিঙ্গি ভাসিয়ে বসতে পারতেন পশ্চিমের অভিযাত্রীরা?

১৮২৭-২৮ সালে মিসেস ফেনটন লিখছেন—আমরা যথেষ্ট ভোজনবিলাসী নই। তা না হলে হয়তো স্রেফ এই ম্যাঙ্গোফিসের জন্য বজবজেই থেকে যেতাম। কলকাতার অনেক পুরানো বাসিন্দাই বজবজে ছুটে আসেন এই ম্যাঙ্গোফিসের সন্ধানে।...

১৮৩৫ সালে "ওরিয়েন্টাল অ্যানুয়েল" নামে একটি বার্ষিকী লিখছে—কলকাতার সবচেয়ে সেরা বিলাস ম্যাঙ্গোফিস। একমাত্র আমের মরশুমেই তা মিলে। স্বাদে সৌরভে তার তুল্য কোনও মাছ গোটা ইউরোপেও খুঁজে পাওয়া যাবে না!

১৮৫৭ সালে, মহাবিদ্রোহের সেই আগুনের মধ্যেও শুনি ম্যাঙ্গোফিসের তারিফ। সে বছর মন্টগোমারি মার্টিন লিখছেন,—ভারতে জলজ সম্পদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ কলকাতার ম্যাঙ্গোফিস। হ্যাঁ, আমে যখন রঙ ধরে তখনই নদীতে তার আবির্ভাব।

দৃষ্টান্ত আর বাড়াব না। সেকালে ইংরেজি-নবিশ বাঙালি বাবুদের মধ্যে একটি রীতি প্রচলিত ছিল। তাঁরা কর্মজীবনে এবং উমেদারি করে সাহেবদের কাছ থেকে যত লিখিত তারিফ কুড়াতে পেরেছেন তা ছাপিয়ে ফেলে চামড়ায় বাঁধাই করে আত্মীয় বন্ধুদের মধ্যে বিতরণ করতেন। পরিবারের পরবর্তী প্রজন্মও দু'এক পুরুষ সেই "টেস্টিমোনিয়েলস" সংগ্রহ ভাঙ্গিয়ে দিব্যি বংশের ইজ্জতের ধ্বজা উড়িয়ে রাখার চেষ্টা করতেন। তপসে মাছের কিন্তু এইসব সাহেবি প্রশংসাপত্রে দেখিয়ে বেড়াবার দরকার হয়নি। তার সুস্বাদ আর সুগন্ধের প্রচার হয়েছে তৎকালে মুখে মুখে। জেলে, মেছুনি, খানসামা বাবুর্চি, হোটেল রেস্তোঁরার মালিক এবং প্রতিবেশিকুল—পুরুষানুক্রমে পঞ্চমুখে শোনা গেছে তপসের রূপ গুণের বর্ণনা। সাহেব কুঠির বাবুর্চিখানার সেই ভাজামাছের গন্ধই ধীরে ধীরে পৌঁছেছে বাঙালি বাবুদের নাসিকায়। তা না হলে যে-মাছ বাংলার সাহিত্যে, লোককথায়, লোকগাথায় সম্পূর্ণ অনুপস্থিত সেই মাছ এই একুশ শতকে বিয়ের ভোজে বাঙালির পাতে আলোড়ন সৃষ্টি করল কেমন করে।' এই যে, 'এদিকে একটা!—এদিকে একটা' রব সে/কী দৈববাণী? এই আকুলতা কি স্বপ্নলভ্য?

উপসংহারে আবার স্মরণ করি গুপ্তকবিকে। তিনি লিখেছেন,—"তোমার তুলনা নহে কোটিকল্পতরু।/লঘু হয়ে হও তুমি সকলের গুরু।।/সর্ব ঠাঁই আদর অমান্য নাই কভু।/শুদ্ধ সত্ত্ব ঠিক যেন খড়দার প্রভু।।/নিরাকার নিত্যানন্দ বীজ অবতার।/নিত্য খেলে নিত্যানন্দ লাভ হয় তার।।/খেতে যদি নাই পাই মুখে লই নাম।/প্রণাম তোমার পদে সহস্র প্রণাম।।"

মধ্য-ভিক্টোরীয় হিন্দু : ভাঙা আয়নায় ছড়ানো মুখ

স্বপন মজুমদার

'ভারতেশ্বরী' মহারানী ভিক্টোরিয়ার (১৮১৯-১৯০১) মৃত্যুর দশ বৎসর পরে, ১৯১১-য়, যে-বছর ইংরেজ-শাসিত ভারতবর্ষের রাজধানী কলকাতা থেকে স্থানান্তরিত হ'ল দিল্লিতে, কলকাতার উপকণ্ঠে মজিলপুর থেকে প্রকাশিত হয়েছিল হারাণচন্দ্র রক্ষিতের 'ভিক্টোরীয়-যুগে বাঙ্গালা-সাহিত্য' নামে একটি বই।

এরও এক দশক পরে, ১৯২১-এ, রাঁচি থেকে সুকুমার হালদার প্রকাশ করেছিলেন তাঁর পিতৃদেব, নিষ্ঠাবান্ ব্রাহ্ম সংস্কারক ও কর্তব্যপরায়ণ সরকারি কর্মী, রাখালদাস হালদারের (১৮৩২-৮৭) জীবনালেখ্য, *A Mid-Victotian Hindu*।

লক্ষ করবার মতো, ভিক্টোরিয়ার মৃত্যুর পরেও, স্থান-কাল-পাত্রের ভিন্নতা সত্ত্বেও, ঔপনিবেশিক ভারতবর্ষের এই পূর্বপ্রদেশেও একটি সময়পর্বকে ভিক্টোরিয়ার নামাঙ্কিত ক'রে পরিচয় দেওয়ার প্রবণতা কোন বিচ্ছিন্ন ঘটনা ছিল না।

কিন্তু কী ছিল এই মনোভঙ্গির অন্তর্গূঢ় কারণ? শুধুই ঔপনিবেশিক প্রভুদের রাজনৈতিক ইতিহাসের যুগবিভাগ অনুযায়ী উপনিবেশের যুগপরিচয় দেওয়ার চেষ্টা? নাকি দুই দূরস্থিত ও আপাত কার্যকারণবিহীন সমান্তর মানসতার গভীরে ছিল অলক্ষিত কোন অন্বয়ী যোগসূত্র?

২

ঐতিহাসিকেরা ভিক্টোরিয়ার শাসনকালকে তিনটি প্রায় সমান কালপর্বে বিভক্ত ক'রে দেখেছেন : ১৮৩৭ থেকে ১৮৫৮, ১৮৫৯ থেকে ১৮৮০ ও ১৮৮১ থেকে ১৯০১। ভিক্টোরিয়া যখন রানী হলেন (১৮৩৭), ভারতবর্ষ তখন চালিত হচ্ছে ১৮৩৩-এর সনদ অনুযায়ী। মাত্র দু-বছর আগেই (১৮৩৫) বিচার আর শিক্ষার মাধ্যম হিশেবে ইংরেজির প্রবর্তন করেছেন লর্ড ম্যাকলে আর চার্লস্ মেট্‌কাফ্ ঘোষণা করেছেন মুদ্রাযন্ত্রের স্বাধীনতা। কিন্তু প্রায় বিরতিহীন কয়েকটি খণ্ডযুদ্ধ আর নানাধরনের দমনব্যবস্থা ধীরে-ধীরে যে-অসন্তোষ ধূমায়িত ক'রে তুলেছিল, তারই অনিবার্য প্রকাশ হ'ল সিপাহি বিদ্রোহে (১৮৫৭)। অবশ্য এরই মধ্যে পত্তন হ'ল রেলপথ আর টেলিগ্রাফ সংযোগব্যবস্থা (১৮৫৩-৫৪), দেশের মুখ্য তিনটি নগরে প্রতিষ্ঠিত হ'ল বিশ্ববিদ্যালয় (১৮৫৭)। এই পটভূমিতেই, সিপাহি বিদ্রোহের অব্যবহিত প্রতিক্রিয়ায় বা পরিণতিতে, ১৮৫৮-র রাজন্য ঘোষণায় ভারত সরকার আইন বিধিবদ্ধ ক'রে ভিক্টোরিয়া তুলে নিলেন ভারতশাসনভার। ইংলণ্ডেশ্বরীর শাসনকালের প্রথম ও দ্বিতীয় পর্বের গ্রন্থি রচিত হ'ল এই ঘটনায়।

ভিক্টোরিয়ার শাসনকালের মধ্যপর্ব উদ্বেল হয়ে উঠেছিল ঔপনিবেশিক প্রশ্নে।[১] প্রথম পর্বের সংরক্ষিত বাণিজ্যনীতি বর্জন ক'রে মুক্ত বাণিজ্যের পথ অবারিত ক'রে দিতে চাইছিলেন

তাঁরা ভারত উপমহাদেশে—যদিও ঔপনিবেশিক নীতি আর তার প্রয়োগে দ্বিচারিতাও লক্ষ করেছিলেন অনেকে। যুদ্ধবিগ্রহের মাধ্যমে উপনিবেশের সীমা প্রসারকে সাম্রাজ্যবাদী মনোভাবেরই প্রকাশ মনে করছিলেন তাঁরা; মুক্ত বাণিজ্যকেও তাঁদের মনে হচ্ছিল ঔপনিবেশিক অধিকার বিস্তারেরই অন্যতর অছিলা। কার্যত ম্যানচেস্টার. গোষ্ঠির সাম্রাজ্যবাদী প্রসার-বিরোধী চিন্তাধারা বর্জিতই হ'ল দ্বিতীয় পর্বে পৌঁছে, যদিও প্রকাশ্য বিজ্ঞপ্তি বা ভাষণে সুপরিকল্পিতভাবেই ঘোষিত হচ্ছিল শুভানুধ্যায়ীর মনোভাব। ১৮৫৮-র ঘোষণাপত্রের মুসাবিদা করেছিলেন যে ডার্বির আর্ল, তাঁকে মহারানী স্বয়ং পরামর্শ দিয়েছিলেন :[২]

> ...it is a female Sovereign who speaks to more than 100,000,000 of Eastern people on assuming the direct Government over them...Such a docuemnt should breathe feelings of generosity, benevolence, and religious feeling, pointing out the privileges which the Indians will receive in being placed on an equality with the subjects of the British Crown and the propsperity following in the train of civilisation.

এই দায়িত্ববোধই তফাৎ ক'রে দিয়েছিল কোম্পানির 'নবোব' আর ভিক্টোরীয় 'অভিভাবক'দের ব্যবহারে আর স্বভাবে। ঐতিহাসিক জর্জ ট্রেভেলিয়ন *Competition Wallah*-য় লিখেছিলেন :[৩]

> The earliest settlers were indolent, dissipated, grasping, almost Orientals in their way of life and almost heathens in the matter of religion. But each generation of their successors is more simple, more hardy, more Christian than the last.

কিন্তু এর মধ্যেও দুর্লক্ষ্য ছিল না ঔপনিবেশিক শ্রেয়োমন্যতা। 'বেশি খ্রিস্টান' বলতে ধর্মনিষ্ঠ বা ধর্মপ্রাণ বা আচারনিষ্ঠ খ্রিস্টান সম্ভবত বোঝাতে চান নি ট্রেভেলিয়ন, সে-যুগের প্রবণতা অনুযায়ী কয়েকটি সৎ আদর্শকেই মনে করেছিলেন যথার্থ খ্রিস্টানের ধর্ম। ট্রেভেলিয়নের মতো চিন্তাশীল ভাবুক নন, ব্রিটিশ সেনাপতি জন য্যাকবও—যাঁর নাম থেকে য্যাকবাবাদ শহরের নাম—মনে করতেন, অধীন প্রজাবর্গের কাছে শাসকসম্প্রদায়ের দায় আছে ব্যক্তিগত নৈতিকতার মান রক্ষা করার :[৪]

> ...let no accept our true position of a dominant race. So, placed, let us establish our rule by setting before them a high example, by making them feel the value of truth and honesty, and by raising their moral and intellectual powers.

হিতব্রত আর কর্তব্য এইভাবে মিলিয়ে দেওয়ার চেষ্টা হ'ল এই পর্বে। ব্যক্তিগত স্তর পর্যন্ত এই মনোভাব পৌঁছতে পেরেছিল, কারণ রাষ্ট্রীয় স্তরেও অপ্রকাশ ছিল না এই পরিবর্তনের প্রত্যয়। মহারাণীর ঘোষণাতেই ছিল : [২]

> In their prosperity will be our strength, in their contentment our security, and in their gratitude our best reward.

শুধু প্রতাপশালী ব'লে নয়, 'আমরা' ও 'তোমরা'র যে সাংস্কৃতিক বিপ্রতীপতা তৈরি

হয়ে উঠছিল ভিক্টোরীয় যুগে, ম্যাথু আর্নল্ডের *Culture and Anarchy* যার বর্তিকা, তারই বিকৃতস্বর প্রতিধ্বনি যেন শোনা গেল এই উপনিবেশে, অবশ্যই ভিন্নতর পটভূমিতে। প্রজন্ম ব্যবধানের সংকট বহুগুণিত হয়ে প্রকাশ পেল প্রবীণ ও নবীন—বৃদ্ধ হিন্দু ও নব্যবঙ্গ, দেশজ আর ইংরেজি শিক্ষায় শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মধ্যে; সেকাল দেখল তার 'অপর' একালকে :*

We	They
Sober and calm	headstrong and precipitate
deliberate and firm	rash and fickle
polite and wise	unruly and lavish
weigh well before execution	act in suppression of thought
consistent and reasonable	unauthorised and groundless
patriotic and tolerant	self-interested and irascible
economical and mild	extravagant and boisterous
enduring and humble	fretful and audacious
modest and subordinate	conceiled and hot
dispassionate and assuaged	furious and polemical
magnanimous and noble spirited	revengeful and quarrelsome
candid and sincere	crooked and giddy
act in unison with principles	abide by no principle
have faith in God and Providence	have no faith in religious doctrines.

নব্যবঙ্গ যখন প্রবীণ হ'ল, প্রজন্ম ব্যবধানে বিশেষ গোত্রান্তর দেখা গেল না, শুধুমাত্র যেন ভূমিকাবদল হ'ল প্রধান অভিনেতাদের। ন্যায়-নীতির কোন রাজনৈতিক বা অর্থনৈতিক মাত্রায় নয়, ধর্ম আর বিবেকের এক সন্তর্পণ সর্বসমতা আবিষ্কারের মধ্যে নিষ্কৃতি খুঁজলেন যেন ততদিনে অনতিনবীন নব্যবঙ্গ। মধ্য-ভিক্টোরীয় বাঙালির চিন্তায় সেই জটিলতা বিভ্রান্তি আর স্ববিরোধ সবথেকে বেশি প্রকাশ পেল প্রতীচ্য শিক্ষায় শিক্ষিত সমাজ-সংস্কারক প্রতিষ্ঠান-সংগঠক এবং বিশেষভাবে ধর্মসম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত বিদ্বজ্জনের মধ্যে। রাখালদাস তাঁদের প্রধানতমদের মধ্যে না-হ'লেও অন্যতম বিশ্বস্ত প্রতিভূ।[৭]

৩

রাখালদাস ব্রাহ্মধর্ম গ্রহণ করেছিলেন। কিন্তু ব্রাহ্মণবংশে জন্মের অভিমান ত্যাগ করতে পারেন নি। সামবেদীয় কৌথুম শাখায় শাণ্ডিল্য গোত্রে তাঁর জন্ম। অন্যদিকে জীবিকাসূত্রে তাঁরা অভিজাত। মুসলমান নবাবদের দেওয়া খেতাব 'হাওলাদার' থেকে হালদার উপাধির নিষ্পত্তি, বিশ্বাস করতেন তিনি। তাঁর বংশের পূর্বজেরা আলোকপ্রাপ্ত, কোম্পানির আদিপর্ব থেকেই সাহেব মনিবদের কাছে কাজ করেছেন; সেই সুবাদে বাংলার বাইরেও ছড়িয়ে পড়েছেন তাঁর স্বজনবর্গের অনেকেই। তাঁদের পীর আলি সংযোগের কথাও বলেন রাখালদাস, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গেই মনে করিয়ে দেন, অনুরূপ যোগাযোগ ছিল জোড়াসাঁকোর ঠাকুর পরিবারেরও। অর্থাৎ দেশের অগ্রণী সমাজে তাঁদের ঠাঁই।

রাখালদাসের পিতৃদেব বেচারাম ছিলেন বাংলা-বিহার-ওড়িশার পূর্ত বিভাগের সুপারিন্টেডেন্ট। তখনকার দিনের নব্যধনীদের মতো তিনিও জনকল্যাণে অর্থ ব্যয় করেছেন অকাতরে। তাঁর জন্মভূমি জগদ্দলে ভাগীরথী নদীর তীরে স্নানের ঘাটটি তিনিই নির্মাণ করিয়ে দেন। তাঁর প্রতি প্রসন্ন সাহেব মনিবেরা কার্যকালে আঘাত পাওয়ায় বেচারামের জন্য প্রতি মাসে পঞ্চাশ টাকা বিশেষ প্রতিবন্ধী ভাতার ব্যবস্থা করেন। বলা বাহুল্য, তখন অবসরভাতার প্রচলন হয় নি এ-দেশে। রাখালদাস অকপটে এই বৃত্তান্ত জানিয়েছেন আমাদের। কিন্তু সংশয় না-হোক্, তাঁর মনে কোন প্রশ্নও জাগে নি, এই অর্থভাগ্য অথবা কর্তৃপক্ষের পক্ষপাত তাঁর পিতৃদেব অর্জন করেছিলেন কীভাবে।

নিজের বিষয়ে রাখালদাস কম স্বচ্ছ নন তাঁর দিনলিপিতে। প্রায় ভক্ত খ্রিস্টানদের মতো অন্যায় স্বীকার ক'রে যেন এক 'স্বীকারোক্তি' লিখতে চেয়েছিলেন তিনি। কৈশোরেই ধর্মসন্ধানে বেরিয়ে যে মিথ্যার আশ্রয় নিয়েছিলেন, গোপন করেন নি রাখালদাস। তখন তাঁর বয়স মাত্র ১৬, বিয়ে হয়েছে তিন মাস, তিনি ঘর ছেড়ে বেরিয়ে পড়েছিলেন বৈদিক ধর্মপ্রচারক হওয়ার উদ্দেশ্যে। পরিচিত একজনকে মিথ্যা ব'লে টাকা ধার নিয়েছিলেন তার কাছ থেকে; প্রাতরাশ সংগ্রহের জন্য মিথ্যা পরিচয় দিয়েছিলেন আরেকজনের কাছে। শেষ পর্যন্ত ফিরে এসেছিলেন সংকল্প বিসর্জন দিয়ে।

তাঁর এই অস্থির ধর্মবিশ্বাসের সময়, হিন্দুধর্মের সপক্ষে প্রবন্ধ লিখেছিলেন "ছদ্ম-খ্রিস্টধর্ম" বিষয়ে। দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের কাছে জগদ্দলে ব্রাহ্মধর্মের শাখা-সমাজ প্রতিষ্ঠার অনুরোধ নিয়ে যখন তিনি গিয়েছিলেন, তখন সবে কৈশোর-যৌবনের সন্ধিক্ষণে পৌঁছেছেন রাখালদাস। পুত্রের কথায় বহির্বাটির একটি ঘর এই কারণে ব্যবহার করতে দিতে সম্মত হয়েছিলেন তাঁর পিতৃদেব। ১৮৫২-র জুলাই মাসে জগদ্দলে শাখা-সমাজ প্রতিষ্ঠা করলেন দেবেন্দ্রনাথ। এর তিন মাসের মধ্যেই ধর্মান্তরিত হলেন রাখালদাস। নবধর্মের প্রচারে তখন এতটাই বিপ্লবী তিনি যে দেবেন্দ্রনাথের কাছে অনুমতি চেয়েছিলেন হিন্দু সমাজের সঙ্গে সবরকম আদানপ্রদান ছিন্ন করতে।

কিন্তু তখনও উপবীত ত্যাগ করেন নি রাখালদাস। ১৮৫৪-য় একবার উদ্যোগ নিয়েও সফল হতে পারেন নি। নিজের অপারগতার কথা লিখেছেন কারণ ব্যাখ্যা ক'রে :[৮]

> I am still as sincere a Brahmo as ever, since I have embraced the Holy Religion. But in one thing, I humbly confess I have done wrong, and that is by re-taking the thread. It was impossible for me not to have done so,—it was impracticable to have acted in an obstinate manner when I saw the breast of my old father over-flowing with tears,—and when I heard him say that his only hope in his old age was now lost. ...Although my father is now of a different opinion, yet he had said that I could have done anything according to my will except throwing away the *Paita* and I have publicly declared that if I retake the *Paita* it would be only to please my father. However, I have retaken and will keep that petty thing for my father's

sake.

এখানেও আত্মপক্ষ সমর্থনে তিনি ব্রাহ্ম ঠাকুরবাড়িতে উপনয়ন সংস্কার প্রচলনের তুলনা দিয়েছেন। এরই মধ্যে আবার হিন্দুদের সঙ্গে সম্পর্কচ্ছেদের প্রস্তাব এসেছে ব্রাহ্মসমাজে। প্রস্তাবক দেবেন্দ্রনাথ, প্রবল সমর্থন রাখালদাসের। সেবারে অক্ষয়কুমার দত্তের মতো বিচক্ষণ বিবেচকের বাধায় সিদ্ধান্তে পরিণত হতে পারে নি সে-প্রস্তাব। অন্যদিকে, নীতির প্রশ্নে অনমনীয় মনে হয় রাখালদাসকে। জ্ঞান প্রকাশিকা সভার নাম পরিবর্তন ক'রে ভবানীপুর ব্রাহ্মসমাজে পরিণত করা এবং সেই অনুযায়ী ন্যাসপত্রের সংশোধন-প্রস্তাবের পেছনে ছিল সমাজের ভেতরের আদর্শগত সংঘাত। সভায় এই সিদ্ধান্ত সংখ্যাগরিষ্ঠের অনুমোদন পাওয়া অসম্ভব মনে হওয়ায়, রাখালদাস লিখেছেন :[৮]

> Babu Devendra...whispered into my ear, enquiring whether the meeting was announced in the public newspapers in the regular way. The object of the enquiry was that if the meeting had not been properly announced, another meeting must be called, and in the interim several members of the Calcutta Brahmo Samaj might be introduced as members, and so the number of members advocating the name Brahmo Samaj might nearly equal the Bhawanipur members.

রাখালদাস মহর্ষির ছলনার পথ মেনে উদ্দেশ্য চরিতার্থ করতে চান নি। ভিক্টোরীয় আদর্শে, বাগ্মিতা দিয়ে উপস্থিত সভ্যদের মত পরিবর্তন করাতে পেরেছিলেন। গ্লাডস্টোনিয় এই পদ্ধতি প্রয়োগ ক'রে বহু সমস্যারই গ্রহণযোগ্য সমাধান সম্ভব করতে পারতেন রাখালদাস।

ভবানীপুর ব্রাহ্মসমাজের মতোই খিদিরপুর ব্রাহ্মসমাজ প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রেও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিলেন রাখালদাস। তাঁরই উৎসাহে ব্রাহ্মধর্ম বিষয়ক ও ব্রাহ্ম লেখকদের লিখিত বা সংকলিত পাঠ্যপুস্তক প্রচলিত হয়েছিল বিভিন্ন বিদ্যালয়ে।

৪

ভিক্টোরীয় যুগের প্রথম পর্বে ইংরেজি শিক্ষিত তরুণ সম্প্রদায় আকৃষ্ট হয়েছিলেন রাজনীতি আর সওদাগরিতে। রাজনীতিচর্চা শেষ পর্যন্ত সাংবাদিকতা আর সম্পাদকীয়তায় চরিতার্থ হয়ে থেমেছিল; কিন্তু বাণিজ্যে অনেকেই সাফল্য পেয়েছিলেন আশাতীত। তেইশ বছর বয়সেই রাখালদাস বুঝেছিলেন, বাণিজ্য তাঁর জীবিকা হওয়া সম্ভব নয়, তাই এই বৃত্তিতে আর শ্রম ও সময় ব্যয় করতে চাননি তিনি। রাজনীতি বিষয়ে মনে হয়, তিনি সাবধানী ও সুপরিকল্পিত নীরবতা রক্ষা করতে পছন্দ করতেন। মূলত তাঁর প্রাত্যহিক দিনলিপি-নির্ভর এই তথ্যবহুল জীবনীতে লুধিয়ানায় তাঁর এক আত্মীয়কে ১৮৫৬-র জুনে লেখা একটি চিঠিতে ধরা পড়ে সমকালীন ঘটনাবলি বিষয়ে তাঁর তীক্ষ্ণ পর্যবেক্ষণ :[১০]

> His Majesty Wajid Ali Shah is now residing with us Bengalis. His intentions cannot be easily fathomed. Does he intend to repair, for the recovery of his kingdom, to England, the nursery of refind vices?

It would be quite foolish. Is there any difference of opinion between Dalhousie and the Court of Directors on the subject? The British Government were contemplating for a long time the annexation of Oudh, before, I believe, the appointment of Lord Dalhousie to the Government of India had been dreamed of.

ব্রাহ্মসমাজের সংস্কারক্ষেত্রের বাইরে বিশেষ পা দেন নি রাখালদাস। কিন্তু বিধবাবিবাহের অনুষ্ঠানে যোগ দিয়েছেন সাগ্রহে, আনন্দ প্রকাশ করেছেন সমাজ-প্রগতিতে। তবে তাঁর আবেগের সঙ্গে কর্মের সত্য যোগ ঘটেছিল বাংলা ভাষার প্রয়োগ-প্রসারের প্রশ্নে। উনবিংশ শতাব্দীর পঞ্চাশ দশকের প্রায় মাঝামাঝি পর্যন্ত ব্রাহ্মসমাজের উপাসনায় সংস্কৃত ভাষা ব্যবহারই ছিল অবিকল্প বিধি। অধিকাংশ শ্রোতার পক্ষেই এ-ভাষা ছিল দুর্বোধ্য। ব্রাহ্ম উপদেশনা বাংলায় প্রচলনের ক্ষেত্রে রাখালদাস ছিলেন অন্যতম প্রধান উদ্‌যোক্তা। দেশজ আর পাশ্চাত্য শিক্ষা সাধারণ বাঙালির জীবনে যে ঘনিয়ে তুলছে এক অলঙ্ঘ্য ব্যবধান, সে-বিষয়ে বেদনাদায়কভাবে সচেতন ছিলেন তিনি। জানতেন, ইংরেজি-শিক্ষিত সম্প্রদায় বাংলা পড়া অপ্রয়োজনীয় মনে করেন; তার দেশীয় শিক্ষায় যাঁদের মন গড়া, কোন নতুন চিন্তাকে—তা যথেষ্ট যুক্তিগ্রাহ্য হ'লেও—তাঁরা মেনে নিতে প্রস্তুত নন। এই মনের গঠনই আমূল সংস্কার করতে চেয়েছিলেন রাখালদাস, যদিও তাঁর স্বজাতীয়ের সঙ্গে পত্রবিনিময়ে অথবা দিনলিপিতে ইংরেজি ব্যবহারের অভ্যাস পরিবর্তন করতে পারেন নি। বাংলা লেখায় জড়তা বা আত্মবিশ্বাসের অভাব যে তাঁর ছিল না, তার প্রমাণ বাংলা সংবাদ-সাময়িকপত্রে প্রকাশিত তাঁর ভাবনামূলক রচনা।

স্বভাবের এই স্ববিরোধকে কোন মনঃসমীক্ষক মনে করতে পারেন তাঁর চরিত্রে সততা ও নীতির অভাব, কেউ-বা এর মধ্যে খুঁজে পেতে পারেন জনদরদী সুযোগসন্ধানীর প্রতারক মুখোশ। কারও মনে হতে পারে, যুক্তির তুলনায় আবেগের দ্বারাই তিনি পরিচালিত হন অথবা ঘটমান ইতিহাসকে তটস্থ বিশ্লেষণের মেধারই অভাব ছিল রাখালদাসের। ১৮৫৫ সালে দেবেন্দ্রনাথকে লেখা খোলা চিঠি তাঁর বিষয়ে এমন-সব সংশয় দূর করার পক্ষে যথেষ্ট :[১১]

To the question,—what kind of men the present Brahmos are?—my reply is that with a few exceptions they are not generally such as they should be. Indeed, this is the case with all men in the world; but as the pretensions of the Brahmos are somewhat higher than those of the ordinary run of the mankind, they are under the obligation to practise more virtue, to be more religious than common men are. ...Generally, the Brahmos are neither better nor worse than ordinary superstitions men. The same inclination to petty vices, the same fondness for bad company may be observable in both. Why are the Brahmos (with a few exceptions) not better men? Because they are taught, or at least they think they are taught, only to disbelieve what the mass of the Hindus believe to be true. There they rest, and advance no more. How could then we expect them to be men of morals?

To appear well in the eyes of the world is their sole aim. They carry very little for the well-being of the internal man. ...In almost ninety-nine cases out of a hndred we see that people understand Brahmoism to be merely non-idolism. Their moral affections are neglected while their understnding is addressed. They receive religions instruction in a negative manner. It is for this reason they do not become religious men. The truth is we have no good religious teaches. It cannot be doubted that such men are essentially necessary for success in the propagation of religion.

প্রায় ষাট বছর পরে সুকুমার রায় ও প্রশান্তচন্দ্র মহলানবিশের নেতৃত্বে তরুণ ব্রাহ্ম আন্দোলনের পূর্বাভাস যেন পাওয়া যায় রাখালদাসের এই বিশ্লেষণাত্মক সমালোচনায়।

৫

ঔপনিবেশিক সমাজে সফলতা লাভ করতে হ'লে শাসক-সম্প্রদায়ের কোন গণ্যমান্য ব্যক্তির পৃষ্ঠপোষণা ছিল অবশ্যপূরণীয় শর্ত যেন। এমনকি রামমোহনের কোন-কোন বিরোধী তাঁর বিষয়ে এমন সন্দেহ প্রকাশ করতে দ্বিধা করেন নি। রাখালদাস বিষয়েও এমন সংশয়ের অবকাশ আছে। ১৮৫৫-য় আমেরিকান ইউনিটারিয়ান মিশনরি রেভারেণ্ড সি. এইচ. এ. ডাল্‌-এর সঙ্গে পরিচয় তাঁর জীবনধারাই যেন পাল্টে দিল। ধর্মপ্রচারের কাজে ডাল্‌-কে সহায়তা করতেন তিনি। মনে হয়, স্বতন্ত্র প্রাতিষ্ঠানিকতার তুলনায় এক সমন্বয়মার্গী ঈশ্বর উপাসনার পথ সন্ধান করেছিলেন তখন রাখালদাস। ১৮৫৬-র জুলাই মাসে ডাল্‌-কে লিখছেন তিনি :[১২]

I believe that as there is one God so there is but one religion. Vedaism, Buddhism, Judaism, Christianity, Matammadanism and even Paganism are the various forms of it. In other words, the essence of all the existing and would-be religions in the world is the True Religion—Deism, Theism, or Brahmaism.

অনুমান করা যায়, ১৮৫৫ নাগাদ তাঁর মানসজগতেও পরিবর্তনের সূচনা হয়। ধর্মবিস্তারের উদগ্র উৎসাহ যেন ক'মে আসতে থাকে তখন থেকে। থিওডোর পার্কারের চিন্তাধারার প্রভাবে রামচন্দ্র বা যীশুখ্রিস্টের জীবনে আরোপিত অলৌকিক আখ্যানগুলি সর্বৈব অবিশ্বাস্য ব'লে তখন বর্জন করতে পারছেন তিনি। রামমোহন ও একেশ্বরবাদের প্রতি ডাল্‌-এর সংক্রামক শ্রদ্ধায় রাখালদাসও রাজার ধর্মভাবনার প্রতি অনুরক্ত হয়ে উঠছেন ক্রমশ। রাজার রচনার পুনঃপ্রকাশ ও তাঁর খ্যাতির পুনরাবিষ্কারে স্বদেশে ও বিদেশে পুরোধার ভূমিকা গ্রহণ করেছেন তখন থেকেই।

চিন্তায় যখন তাঁকে মনে হয়েছে মুক্তমতি, সামাজিক আচার-ব্যবহারে তখনও রক্ষণশীলতা অতিক্রম করতে পারেন নি তিনি। ১৮৫৭-য় বাল্যবন্ধু অনঙ্গমোহন মিত্রকে প্রায় অমানবিক রূঢ়তায় তিনি লিখতে পেরেছিলেন :[১৩]

...whether I have courage enough to breakfast with you publicly. I beg to

say that that is out of the question. Attribute my seeming inconsistency to whatever motive you may. to me it is a sufficient consolation to feel that 'the principle of no caste' is not essential to salvation. I am for from advocating the system of caste. I wish it had ceased to exist with the fools who had invented it. But as long as I can not lose caste without giving offence to those who are dearest to me, I shall remain within the pale of Hinduism.

'হিন্দু পেট্রিয়টে'র সম্পাদক কৃষ্ণদাস পালের মতে,[১৪] রেভারেণ্ড ডাল্-এর 'secret hope' ছিল রাখালদাসকে ধর্মান্তরিত করা। সেই উদ্দেশ্যেই তাঁকে বিলেত নিয়ে গিয়েছিলেন ডাল্। তাঁর সে-বাসনা পূর্ণ হয় নি। কিন্তু ১৮৬১ থেকে ১৮৬৩ পর্যন্ত বিদেশবাস তাঁর প্রথাবদ্ধ মনের অনড় ধারণাগুলি ঈষৎ বিচলিত করতে পেরেছিল হয়তো-বা। মৃত্যুর পরে, ১৯০৩ সালে ঢাকা থেকে প্রকাশিত *English Diary of an Indian Student* বইতে সেই উন্মোচনের সামান্য ইঙ্গিত আছে যেন। প্রাথমিক উচ্ছ্বাসের পর স্বদেশ ও বিদেশের অভিজ্ঞতার তুলনা করতে গিয়ে একটু কি বিরক্ত-বিষণ্ণ হয়ে ওঠে তাঁর মন্তব্য? ইংল্যান্ডের প্রকৃতি নয়, 'their ideas of taste, ingenuity, industry and spirit of cooperation'[১৫] আর আমাদের মধ্যে তার অভাব, শুধু কর্মহীন বাক্সর্বস্বতা দু-দেশে মানুষের মধ্যে সমৃদ্ধিগত ব্যবধানের প্রধান কারণ ব'লে মনে হয়েছে রাখালদাসের।

ভারতবর্ষে ইংরেজ শাসনের প্রয়োজনীয়তা বিষয়ে যৌবন থেকেই দ্বিধাহীন ছিলেন রাখালদাস। ১৮৫৭-র বিদ্রোহী সিপাহীদের বিষয়ে অনুকম্পা থাকলেও তাঁর মনে হয়েছিল স্বরাজশাসনের যোগ্য এখনও হয়ে উঠি নি আমরা :[১৬]

> India is neither France nor England...without sacrificing Patriotism I wish its [ব্রিটিশ সরকারের/ইংরেজ শাসনের] continuance. A milleniuum must pass away before the natives of this country can be competent to told the news of their own Government.

আমাদের অপদার্থতার প্রতিশোধন যে পরাধীনতা দিয়ে হতে পারে না, সমকালীনদের অনেকের মতোই এ-বিষয়ে তাঁর চিন্তা অস্বচ্ছ ছিল। ইংল্যান্ড ভ্রমণের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার পরে ভারত-উদ্ধারে ইংরেজের ভূমিকা বিষয়ে তাঁর বিশ্বাস আরও বদ্ধমূল হয়েছে। তবে ঐতিহ্য ও উপনিবেশের সংঘাতের পরিপ্রেক্ষিতে তাঁর একটি উক্তির মধ্যে দূরদর্শিতার পরিচয় আছে নিশ্চিতভাবে :[১৭]

> I am, however, far from believing that the Europeans can do with us what they have done with the aborigines of America, i.e. extirpate my countrymen...The past history of India is on my side when I say that even with the power which steam and electricity lend to the Europeans they cannot root out the natives.

অন্যদিকে, সিপাহী বিদ্রোহকে যিনি সমর্থন করতে পারেন না, আমেরিকার স্বাধীনতা-যুদ্ধ তাঁর আন্তরিক অভিনন্দন লাভ করে। উমিচাঁদ ছদ্মনামে 'সোমপ্রকাশে' প্রকাশিত প্রবন্ধগুলিতে তাঁর ভূমিকা ঔপনিবেশিকতা-বিরোধী। তবে কি মনে করতে হবে, সাধারণভাবে

ঔপনিবেশিকতা রাখালদাসও সমর্থন করেন না; কিন্তু ইংরেজ শাসনকে ঔপনিবেশধর্মী মনে করেন নি তিনি সে-শাসনের সদর্থক উন্নয়নমূলক যোজনাগুলির জন্যই? নাকি ছদ্মনামের—নাম নির্বাচনের মধ্যে সচেতন কোন আত্মশ্লেষ ছিল কি?—আড়াল ছিল ব'লেই অকপট ও আন্তরিক হ'তে পেরেছিলেন তিনি?

অবিশ্বাস্য হ'লেও সত্যি, মধ্য-ভিক্টোরীয় যুগের ইংরেজি-শিক্ষিত বাঙালির অধিকাংশই ভারতের সঙ্গে ইংল্যান্ডের সংযোগকে মনে করেছিলেন দৈব-আদিষ্ট ও মঙ্গলময়। অসম্ভব নয়, ইংরেজ আগমনের অব্যবহিত পূর্বকালের রাজনৈতিক অনিশ্চয়তা ও সামাজিক বিশৃঙ্খলা, শাসন ও ধর্ম-ক্ষেত্রে সর্বসম্মত নেতৃত্বের অভাবে অন্তঃকলহ ও অন্তর্ঘাতের ব্যাপক প্রসার তখনও উজ্জ্বল ছিল সমাজমনে। কোম্পানির অবাধ মুনাফানীতির পর সরকারি অধিগ্রহণে আশ্বাসের বাণী মধ্য-ভিক্টোরীয় পর্বের সূচনা থেকেই আশাবাদী করেছিল মধ্যবিত্ত বাঙালিকে। রাখালদাস বিশ্বস্ত প্রতিনিধি ছিলেন এই যুগের :[১৮]

> The well-being of India and that of England are connected by the closest ties of mutual responsibility : the consciousness of which cannot fail to be deepened by every new friendly relation established between the citizens of the two lands.

হয়তো দৈব-উদ্ধারের আকাশকুসুম কল্পনা ছাড়া অন্য কোন বিকল্পও ছিল না তাঁদের সামনে। তার ইংরেজ শাসন থেকে মুক্তি যে তখনকার পরিস্থিতিতে অলীক, তা বোঝার মতো সুবুদ্ধির অভাব ছিল না নবশিক্ষিতদের। তাই কি আনুগত্য প্রকাশেরই বিচিত্র ভাষা ও ভঙ্গি আয়ত্ত করার চেষ্টা করছিলেন তাঁরা?[১৯]

> ...in England, on being asked by somebody who was our king and what sort of national flag we had. I had said 'His Majesty Victoria Bahadur, with our flag the Union Jack.

এ-কথা শুধু ব'লেই ক্ষান্ত হন নি রাখালদাস, তখনকার মানভূমের জেলাশাসক জন পিটার গ্রান্টকেও যে শুনিয়েছিলেন, এ-তথ্যও জানাতে ভুল করেন নি তিনি। অনুমান করাই যায়, কোন দীর্ঘশ্বাস ছিল না তাঁর পুনঃকথনে, বরং গৌরবেরই উচ্ছ্বাস ছিল এ-বয়ানে।

অন্যদিকেও অবশ্য নোঙর কেটে গিয়েছিল রাখালদাসের। যে-জ্ঞাতি-স্বজনের জন্য ব্যক্তিগত বিশ্বাসকে তুচ্ছ ক'রে সমাজ-সংস্কার মান্য ক'রে চলেছেন আজীবন, কালাপানি পার হওয়ার অপরাধে আত্মজনই সম্পর্ক ছিন্ন করেছিলেন তাঁর সঙ্গে। তাঁর স্বগ্রাম তাঁর কাছে হয়ে উঠেছিল বিভূঁই, ব্রাহ্মসমাজে অভ্যুত্থান হয়েছিল নতুন নেতৃবর্গের। নবধর্মকেও ত্রিধাবিভক্ত দেখে যেতে হ'ল তাঁকে। জীবিকায় অবশ্য উন্নতি হয়েছিল তাঁর। বিদ্যালয় পরিদর্শক থেকে স্পেশাল কমিশনার পদ পেয়েছিলেন তিনি। শেষ জীবনে আশ্রয় নিয়েছিলেন রাঁচির নতুন ব্রাহ্ম পত্তনে। কিন্তু সে-সমাজও দ্বৈপায়ন হয়ে থাকতে পারে নি। নব্যব্রাহ্ম ততদিনে কি পরিণত হয়েছেন বৃদ্ধ হিন্দুতে? মধ্য ভিক্টোরীয় বাঙালির তাই কি ছিল অনিবার্য পরিণতি, তার ভৃগু-নিদান?

৬

বিংশ শতাব্দীর ষাটের দশকে ক্যাম্‌ব্রিজ ঐতিহাসিক জন গ্যালাঘার ও রনাল্ড রবিনসন বিচ্ছিন্নতার যুগের ধারণা নিয়েই প্রশ্ন তুলেছিলেন। অলিভার ম্যাকডোনাহ্ আর ডি. সি. এম্. প্লাট বিরোধিতা করেছিলেন গ্যালাঘার-রবিনসন তত্ত্বের, কিন্তু ভিন্ন-ভিন্ন কারণে। প্রথম জনের মনে হয়েছিল মুক্ত বাণিজ্যের মধ্য দিয়ে 'informal empire' সৃষ্টির ধরণ অতি সরল ও শিথিল; ধর্ম বাণিজ্য আর রাজনীতির একলক্ষ্য অভিযান প্রায় অসম্ভব এক সমাপতন এবং এ-ক্ষেত্রে তেমন অঘটনের সম্ভাবনা ছিল না। প্লাট বাণিজ্যিক অনুপ্রবেশের মধ্যে রাজনৈতিক হস্তক্ষেপের আশঙ্কাকে স্বীকার করেন নি আদৌ।[২০]

কিন্তু ইতিহাস থেকে এমন অভিজ্ঞতাই সম্ভবত আমাদের বেশি হবে যেখানে দেখা যাবে, আইন বা বিধান-প্রণেতাদের অভিমত পথেই সর্বদা সমাজ চলে নি। বরং বাঁধ না-ভেঙেও বাঁধনকে অস্বীকার ক'রে সম্পূর্ণ অপ্রত্যাশিত পথে সঞ্চারিত হয় তার চলার বেগ। বিশেষত অসম ও সংস্কৃতি-সংকর উপনিবেশে এই প্রতিক্রিয়া এতই অভাবিত হতে পারে যে শুধুমাত্র প্রবর্তিত অনুশাসনের বিশ্লেষণে এমন কোন অন্তর্দেশীয় এবং/বা আন্তঃসংস্কৃতি সম্পর্ককে ব্যাখ্যা করা চলে না। অথবা ভূদেব-বঙ্কিম-বিবেকানন্দের মতো কালোত্তীর্ণ ব্যক্তির চিন্তাধারা আলোচনাও আমাদের কাছে সমগ্র ইতিহাসের কৌণিকতা বা বন্ধুরতা তুলে ধরে না। রাখালদাসের মতো মধ্যমানের দীর্ণচিত্ত অনতিকীর্তিমান্ মানুষের অসংখ্য বয়ানও তার সঙ্গে যুক্ত হওয়ার অপেক্ষা রাখে।

সময়ের ব্যবধানে যখন অস্পষ্ট হয়ে ক্রমে মুছে যায় প্রত্যক্ষ নখরক্তময় স্মৃতি, তখন ইতিহাসের অব্যুৎপত্তিক্রম নির্বাচন থেকে তত্ত্বরচনার চেষ্টায় থেকে যায় অব্যাপ্তিদোষ। কোম্পানি বা ক্রাউনের ভারত-দপ্তরে কোন্ উদ্দেশ্য থেকে গৃহীত হচ্ছে কোন্ প্রকল্প তার ক্ষীণতম ধারণাও সম্ভবত ছিল না উপনিবেশের চিন্তাশীলদের। অন্যদিকে, উপনিবেশিত সমাজের নিজস্ব টানাপোড়েন ও ঔপনিবেশিক প্রভুদের সঙ্গে সম্পর্কের আততি যে নিত্য ইতিহাস রচনা ক'রে যায় তার প্রণোদন ও প্রতিক্রিয়া প্রয়োগবিধানের পরম্পরার সঙ্গে মিলিয়ে না-পড়লে—তা তত্ত্বের মূল্যে হ'লেও—সম্পূর্ণ হবে না অতীতকে জানা।

না-হ'লে কেমন ক'রে ব্যাখ্যা করা যাবে, কোম্পানি ও ক্রাউন—দুই যুগেই ধর্ম বিষয়ে যখন দূরত্ব রক্ষা করাই ছিল শাসকীয় নীতি, তখন ব্রাহ্মধর্ম—যার অন্যতম প্রচারক ছিলেন রাখালদাস—নির্মিত হয়ে উঠছিল একইসঙ্গে হিন্দু ও খ্রিস্ট ধর্মের প্রতিষেধক ও সম্মানিত বিকল্প হিসেবে? মধ্য-ভিক্টোরীয় যুগ যে-বাতায়ন খুলে দিয়েছিল আমাদের কাছে, রনেসাঁস থেকে রোমান্টিসিজম্ পর্যন্ত কোন বর্ণান্তর তার মধ্যে কি লক্ষ করতে পেরেছিলাম আমরা?

এই পর্বে আমাদের চিন্তাচেতনার ইতিহাস আজও লেখা হচ্ছে ঔপনিবেশিক প্রভুদের নির্বাচিত রক্ষিত উপকরণের ওপর নির্ভর ক'রে। সামাজিক বিচারে রাখালদাস অবশ্যই নিম্নবর্গীয় ছিলেন না। কিন্তু মধ্য ভিক্টোরীয় পর্বে ঔপনিবেশিক উচ্চবর্গ বয়ানের সঙ্গে তাঁর বা তাঁর মতো অসংখ্য আত্মকথকের এজাহারের তুলনা ও সংশ্লেষে তাঁদের ভূমিকা হয়ে উঠতে পারে নিম্নবর্গীয়। আবার ভিন্ন কোন সামাজিক সমাবেশে তাঁর অবস্থানও হয়ে উঠতে

পারে অন্য বর্গীয়। অর্থাৎ উপনিবেশে বর্গের ধারণাও কি অনড় বা অপরিবর্তনীয়? এই অস্থির আপেক্ষিক মধ্য-ভিক্টোরীয় অবস্থানই রাখালদাস ও তাঁর সমবর্গীয়দের প্রতি আমাদের কৌতূহলী করে, যদিও তার ভবিতব্য কবির বচনে অমোঘ সত্য :

"অতএব, মন, তোর কলসি ও দড়ি আন্,
অতলে মারিস ডুব মিড্-ভিক্টোরিয়ান।"

সূত্র :

১. C. E. Eldridge, *Victorial Imperialism* (London 1978), pp 74-121.

২. N N. Ghosh, *England's Work in India* Calcutta 1924), p 8.

৩. London 1866, p 202.

৪. Lewis Pellyed. *The Views and Opinions of Brigadier-General John Jacob, C.B.* (London 1858), p 12.

৫. Christine Dobbin, *Basic Documents in the Development of Modern India & Pakistan 1835-1947* (London 1970), p 22.

৬. Old Hindu, *A Satirical Disquisition on the Manners and Customs of Young Bengal* (Calcutta 1860), p 21.

৭. রাখালদাসের সব উদ্ধৃতির আকর : Sukumar Haldar, *A Mid-Victorian Hindu* : a sketch of the life and times of Rakhal Das Haldar (Ranchi 1921).

৮. তদেব, পৃ 26-27.

৯. তদেব, পৃ 32.

১০. তদেব, পৃ 43-44.

১১. তদেব, পৃ 38-39.

১২. তদেব, পৃ 45-46.

১৩. তদেব, পৃ 53-54.

১৪. তদেব, পৃ 71.

১৫. তদেব, পৃ 78.

১৬. তদেব, পৃ 56.

১৭. তদেব, পৃ 132-33.

১৮. তদেব, পৃ 103.

১৯. তদেব, পৃ 171.

২০. দ্র Eldridge, প্রাগুক্ত।

২১. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, "আধুনিকা", 'প্রহাসিনী'। 'প্রবাসী', ১৩৪১ চৈত্র।

প্রয়াত কবির অপ্রকাশিত কবিতা

অপরাজিতা

অমিতাভ চট্টোপাধ্যায়

আমার রাতে চমকে ওঠে তোমার চোখের তারা—
অন্ধ আমার অমাবস্যার দৃশ্যে দীপাবলী।
যেমন, বন্ধ ডাকবাক্সোয় তোমার চিঠির সাড়া
পেলে উদ্ধার, ঘরদোরবার যায় সে জলাঞ্জলী।

সামনে দেখি সূর্যে আমার জগৎ জ্বলে নাকি!
উড়াল ডানায় পালকগুলি রোদের শব্দ-মাখা,
শব্দে আমার ভুল থাকে না—তাইতো পাকাপাকি
তোমার চোখে রজনীদিন এমন বেঁচে থাকা।

এই যে থাকা—বলতে শুধু, জীবনযাপন নয়...
যেদিন চোখে চোখ পড়েছে সেদিন থেকে জানি
ছড়িয়ে যাব ধুলোর মতো দূরের দিগ্বলয়,

তাই কবিতা আনতে গিয়ে তোমার কথা টানি।

গল্পটা মামুলি নয়

বাসুদেব দেব

শ্যামলা রঙের ছেলেটি তেমনি পেছনে পেছনে
চলেছে
কুড়িয়ে নেয় আমার ছায়া ফেলে দেওয়া মেট্রোর টিকিট
ঝরে পড়া কৃষ্ণচূড়া
তাকে এড়াবার জন্য ঢুকে পড়ি পানশালায়
ঠিক পেছনের টেবিলে টের পাই তেরছা চোখে
তাকিয়ে আছে আমার দিকে

ঢুকে পড়ি ঘুমের মধ্যে, বুঝতে পারি অবচেতনায়
আমার শিয়রে ঝুঁকে পড়েছে তার মেঘমুখ
দূর ট্রেনের টিকিট কাটতে গিয়ে জেনে যাই
আমার পাশের আসনটি কার
উৎসবের ভিড়ে চমকে ওঠে সেই চোখ যেন উটকো ক্যামেরার ফ্ল্যাস
রোগশয্যায় জানালার কাছে গাছের পাতায় কেঁপে ওঠে
তার অপেক্ষার ছায়া...

এমনি করে এই মামুলি গল্পটাকে
রহস্যময় করে রাখে সে
শেষ পাতাটি পর্যন্ত

ত্রাণশিবির থেকে

অরুণাভ দাশগুপ্ত

স্বাধীনতার প্রথম সূর্যের হিরন্ময় আলোয়
আসমুদ্র হিমাচল নন্দিত
বাতাসের অফুরান কুসুমোচ্ছ্বাসে
শৈশবের টালমাটাল পায়ে যেদিন
আমার প্রভাতফেরী শুরু হয়েছিল, জনগণেশের কণ্ঠে
'আমরা ঘুচাবো মা তোর দৈন্য, মানুষ আমরা নহি তো মেষ'...

মনে পড়ে
মাটির দেওয়া নির্বাসন মাথায় নিয়ে
আমার দুঃখিনী মা
তখন কুপার্স ক্যাম্পের লঙ্গরখানায়
নিশাবসানের অপেক্ষায় রত...

দেখতে দেখতে কত চন্দ্রভুক অমাবস্যা অতিক্রান্ত হ'ল
পাঁচ দশকের উজান পেরিয়ে নিঃশব্দ বিপ্লবে গড়ে উঠলো
আমাদের নানা অনুভবের শরীর,
আর সময়ের অপরিবর্তনীয় স্রোতে ভাসতে ভাসতে

চিরদুঃখিনী মা আমার আজও
এক ত্রাণশিবির থেকে আরেক ত্রাণশিবিরের দুঃসহ আঁধারে
মুখ ঢাকছেন লজ্জায়, ঘৃণায় নিষ্ফল কান্নায়, হাহাকারে...

কুপার্সের ত্রাণশিবিরে যার শুরু একে একে
জোড়হাটের বঙ্গাল খেদার দহন বেলায়,
জেহানাবাদের জাতপাতের অশনি সংকেতে,
ভূস্বর্গ-সন্ত্রাসের অন্তহীন দুঃস্বপ্নে,
গোধরা-আমেদাবাদের বিষবাষ্পে, নির্লজ্জ ধর্ষণে আগুনে পুড়তে পুড়তে
এক ত্রাণশিবির থেকে আরেক ত্রাণশিবিরে
আমার মায়ের সেই অসহায় পরিক্রমার
আজও শেষ হ'ল না।

প্রতীক্ষা

শ্যামসুন্দর দে

ডাকঘর থেকে কখন আসবে
রাজা কি লিখবে চিঠি
ঢং ঢং ঘণ্টা বেজে যায়
বয়ে যায় সময়ের ধারা
আকাশে রোদের আলো
সন্ধ্যার বিষণ্ণ ঘোমটায় মুছে যায়
স্তব্ধ পাখিদের কূজন-কাকলি
নীরব নিসর্গ
জোনাকির চকিতের আলো
শুরু হয় আর এক দিনের সূচনা!
কেটে যায় কত বেলা।

কোথায় সেই ডাকপিয়ন
আনবে যে চিঠি
ঘণ্টা বাজে ঢং ঢং
শুধু অধীর আগ্রহ
কখন আসবে চিঠি
অমলের!

দুঃখ তদন্ত

প্রণব চট্টোপাধ্যায়

এক এক প্রকারের দুঃখ
এলাকায় বটবৃক্ষ হয়ে
ছায়া রোদ্দুর হাতে দাঁড়িয়ে থাকে
ইচ্ছে করলেই পাশ কাটানো
যায় না।

খুব রোদ্দুরে পুড়ে গেলে
বৃষ্টি এসে দুঃখকে ভেজায়
তারপর ভিজে দুঃখ
টপটপ গলে গলে
মাটিতে মেশে।

তখন মাটিতে বিস্তর আলোড়ন
দুঃখ লাগা বৃষ্টির ফোটায়
রক্ত থাকে;
সেই রক্ত ভেজা মাটির নমুনা
সংসদে দেখানো হয়।

সেই নমুনা পরীক্ষাগারে
পাঠানো হয়; নিরপেক্ষ তদন্তের
আশ্বাস পেয়ে দুঃখরা পায়ে পায়ে
যে যার ঘরে ফিরে যায়।।

রাত কত হল

বিতোষ আচার্য

চাণ্ডচাণ্ড স্ফটিক ঘসে অস্বচ্ছ অক্ষিতে
সুস্থ করতে ভারি ইচ্ছে হত
ইচ্ছে হত, উঁচু নাকে দ্বন্দ্ব-দর্শনের ঝামা ঘসে

খোঁথা মুখ ভোঁতা করে দিতে
—যেন আর রা না কাড়ে...
চল্লিশে-পঞ্চাশে দিন ছেনে
যে স্বপ্ন ছড়াত তীব্র দাবানল হেন—
ইচ্ছে হত, যদি ফের উস্কে দেওয়া যেত...
—এত সব ইচ্ছের বহর খচ্চরের পিঠে তুলে
অবশেষে সেই যে হাঁটা শুরু
এক যুগ গড়াল...
ইতিমধ্যে নতুন শতক সুগন্ধী লেপাফা মুড়ে
নতুন বয়ান
ঘরে ঘরে বিলি করে গেছে

এখন সে একা থাকে, বিকেলে টিলায় উঠে—
সূর্যাস্ত দেখে না আর
...গুঁড়ি মেরে অন্ধকার আসে
নিরলস বেজে চলে ঝিঁঝির ঝাঁঝর
প্রশ্ন ওড়ে হাল্কা হাওয়ায়
—রাত কত হল।

যেন আবার

আশিস সান্যাল

কাল সারারাত
নিবিড় অন্ধকারের বুকে মাথা রেখে
আমি দেখছিলাম
জননী জন্মভূমি
ভারতবর্ষের এক করুণ মুখশ্রী।
তার সর্বাঙ্গে
রক্তের জমাট দাগ।

অথচ একদিন
আমি স্বপ্নে দেখতাম

তার চারদিকে
মানুষের অবিরল প্রতিধ্বনি।
সমস্ত প্রান্তরে
উদ্ভাসিত অজস্র গোলাপ।

কিন্তু আজ
অজগরের মতো এক হিংস্র অবিশ্বাস
আমাকে আহত করে
নিক্ষেপ করছে
এক অপরিসীম শূন্যতার মধ্যে।

হে আমার অনন্ত প্রাঞ্জল নীলাকাশ
জননী জন্মভূমি
হে নক্ষত্রনীলিম ভারতবর্ষ
আমাকে দেখাও
আবার এক উত্তরণের প্রতিচ্ছবি।
তোমার মমতা থেকে
যেন আবার প্রজ্বলিত করতে পারি
এক পবিত্র দীপশিখা।

কোনদিকে যাবো

অনন্ত দাশ

একই রাস্তা দিয়ে দু'দিকে যাওয়া যায় না
যেতে হবে সামনে অথবা পিছনে—

আমি যে রাস্তায় এতদিন হেঁটে এসেছি
তার একটাই মুখ
না-পাপ, না পুণ্য; না ধর্ম, না অধর্ম
না আস্তিক, না নাস্তিক
অদৃশ্য সেই রাস্তার মাঝখানে দাঁড়িয়ে
আমি ঘুরিয়ে যাচ্ছি কম্পাসের কাঁটা

না দক্ষিণ, না উত্তর;
পূব বা পশ্চিম
কোনো দিকেই যাওয়ার সঠিক নির্দেশ নেই

সাঁকোর উপরে
দুদিকের সমান ব্যবধানে দাঁড়িয়ে
আমি খুঁজে যাচ্ছি পারাপারের উপায়
উপরে আকাশের গম্বুজ
নীচে জল, বালি, নুড়ি ও পাথর

প্রতিদিন দৃশ্যপট পাল্টে যাচ্ছে
অদূরে রাস্তার বাঁকে
কাঁটাঝোপ, খুলির পাহাড়

আমি কোনদিকে যাবো।

সিংহাবলোকন

শুভ বসু

কতদিন চলে গেছে উদাসীন নিরম্নতায়,
কতদিন কত নক্ষত্রের খসে পড়া রেখা দেখে,
কতদিন কত কৃষ্ণচূড়ার হাসির প্রখর আভায়
সময়ের শেষ চরিতার্থতা সন্ধানে উন্মন!

সে সব মাতাল সন্ধানে মেতে আজীবনকাল
শেষের সেদিন যখন মূর্ত নির্বিকল্প আসন্ন সন্ধ্যায়,
তখনই হঠাৎ বোঝা যায় গূঢ় ফল্গুর টান
আজীবন টেনে রাখে আমাদের, তোমার চোখের
নিবিড় গভীর উৎসের দিকে, নির্বিকল্প গহন সে টান
আমাদের গূঢ় অস্তিত্বের সবখান জুড়ে লেগে থাকে, তার—
সুরটুকু শুধু গভীর রণনে পরম সমের দিকে ইঙ্গিতে ডাকে।

তুমি চাইলেই

নীরদ রায়

তুমি চাইলেই এখনি গুজরাটও হয়ে উঠবে একটা সম্প্রীতিময় পশ্চিমবঙ্গ
তুমি চাইলেই কাছে এসে দাঁড়াবে ছিঁড়ে যাওয়া সম্পর্ক ও বিশ্বাস
বৃষ্টি-ভেজা বৈশাখের একটা দিন বাঁশি বাজাতে থাকবে তোমার সামনে,
এমন নয় যে, সন্ধেবেলার দিকে প্রায়ই শিস্ন হয়ে ওঠা
তোমার কিছুই ভালো লাগছে না, এই জাতীয় মন খারাপগুলিও
হঠাৎ তোমাকে ছেড়ে চলে যাবে ডুয়ার্সের কোনো এক ঘন জঙ্গলের দিকে
আর এখন তুমি সান্ত্বনা পুরস্কার পাওয়ার মতো
চারপাশের সবাইকে ডেকে বলবে—ভালো আছি, ভালো আছি,
এমন নয় যে অনেকের যা হয় না, তুমি একটু হাসিমুখে হ্যাঁ বললেই
শনিবারের বিকেলের মধ্যেই পেয়ে যাবে সাফল্যের এক একটা রঙিন প্যাকেট,
ভুল করেও কোনোদিন খোঁজ নেননি চন্দননগরের যে ছোট মাসিমা
তিনিও জানাবেন তাঁর দুতিনটা বাড়ির মধ্যে তোমাকে দিতে চান একটি,
এই দশ বছরে একটা ভাঙা সাইকেলও তুমি কিনতে পারোনি কখনো
আজ তোমার এক মারোয়াড়ী বন্ধু তার এক বছরের পুরনো লাল মারুতিটা
তোমাকে দান করতে চায় বন্ধুত্বের নিদর্শন হিসেবে,
এসব ঘটনা ঘটে না কখনো, কিন্তু যদি ঘটে যায়—
সামনের সেই কর্কশ দিনগুলিকে, দুঃখ যন্ত্রণায় ফুলে ওঠা কান্নাগুলিকে
যদি কেউ উল্টে রাখেন শুধু হাততালি ও ধন্যবাদ দিয়েই নির্মিত
একটা উঁচু টেবিলের পাশের চেয়ারে যদি কেউ তোমাকে বসিয়ে রাখেন
সভাপতি কিংবা প্রধান অতিথি হিসেবে, তখন তোমাকে কেমন দেখাবে
জানতে ইচ্ছে করে, জানতে ইচ্ছে করে—!

জলশব্দ শুনি

আনন্দ ঘোষ হাজরা

এই সব মগ্ন ক্যানিয়ান, রিজ্, গ্রস্ত উপত্যকা
মধ্য অতলান্ত জুড়ে দুর্বহ অদৃশ্য বহমান
আগ্নেয়গিরিও মগ্ন এখানে আপাতস্থির সমুদ্রভূমিতে।

এরা সব খেলা করে কি চতুর খেলা!

আমরা বুঝি না কিছু শুধু দীর্ঘ খাঁড়ির ভিতরে
বেলা যায়; পরস্পর চোখেও দেখি না।
শব্দ নয়, শব্দহীনতায় ওরা ভাঙে আর গড়ে
অথবা কোথাও কোনো চোরাস্রোতে টানে নিরন্তর
আমরা এভাবে আরো দূরে যাই হয়তো বা কাছাকাছি আসি
অথচ কখনো কেউ পরস্পর তাকিয়ে দেখি না।

শব্দহীন এইসব নিরন্তর খেলা
কেবল বিক্ষত করে আমাদের বেদনায় বেদনায় জর্জরিত করে
খাঁড়ির ভিতরে তবু সন্ধ্যা হলে শব্দ শুনি প্রপাতের
জলশব্দ শুনি।

স্বস্তি হঠাৎ আসে

গোবিন্দ ভট্টাচার্য

দুবেলা নার্সিংহোমে হাঁটা
সে কি অভ্যাসের মধ্যে পড়ে
দেখা হলে কেমন আছেন
সে কি নেহাৎই ভদ্রতা

প্রত্যেক বছর ভূমিকম্প
প্রত্যেক বছর বন্যা
সে কি প্রকৃতির নিতান্ত খেয়াল
অথবা প্রথাগত পাশ ফিরে শোয়া

হঠাৎ হঠাৎ দেখা
হঠাৎ মৃত্যুর খবর
এ্যাকাডেমি জুড়ে প্রত্যহ কবিতা
হঠাৎ কখনো শোকসভা

তাপমাত্রা চড়তে চড়তে
সহসা তা নিম্নমুখী আজ
স্বস্তি হঠাৎ আসে
কালো মেঘে অস্বস্তি ঘনায়

এমন যে ঘনিষ্ঠ বসবাস
শ্বাস ফেললে দুলে ওঠে পাতা
তবুও নির্মম হতে হতে
এক একটি নির্লিপ্ত পাথর

আজকে পাহাড়চূড়া
কাল সমুদ্রের ষড়যন্ত্রী জল
কোথাও বিরুদ্ধতা নেই
ভারসাম্যে সুভদ্র প্রকৃতি

আমি শান্তির পতাকাবাহী
তবু ক্ষেপণাস্ত্রে পরাঙ্মুখ নই
নিজেকে নিজের করে দেখা
সে তো এক নন্দিত অভ্যাস।

এবং একটি কথোপকথন

উৎপলকুমার গুপ্ত

দেশের মুখ আজ কালো, দিনদিন ভিখিরিও বাড়ছে
চারদিকে বন্দুকের শব্দ
অথচ সবাই যে যার পথে হাঁটছে।

ভেসে আসছে শুধু বক্তৃতা আর বক্তৃতা
উত্তর-দক্ষিণ পূর্ব পশ্চিম সব বাঁধা পড়ে যাচ্ছে—
বক্তৃতা বলছে দেশটাকে মুড়ে দেওয়া যাবে সোনা দিয়ে,
দেশের মানুষ স্বপ্ন দেখবে সোনার
গল্প করবে সোনার

সোনা গড়িয়ে নদীর জলের মতো পৌঁছে যাবে ঘাটে ঘাটে
পরাণ মাঝির আর দুঃখ থাকবে না।

ঠিক এমন সময়ে বুলেটে ঝাঁঝরা হয়ে গেল বক্তৃতা
তার কষ বেয়ে রক্ত
স্বপ্ন বেয়ে রক্ত
গড়াতে গড়াতে চলে গেল সেইদিকে—

যেদিকে স্বপ্নের সোনার নদীর জল পৌঁছে গিয়েছিল ঘাটে ঘাটে
সেখানে মৃত্যুহীন সে স্বপ্নকে বলল, 'চলুন, ঘরে যাই,
আবার একদিন আসবেন।'

স্বপ্ন তার মুখের দিকে তাকিয়ে হাসল
বলল, 'সেই ভালো—
এখন আমাকে দুটো টাকা দিন, চা খাব।'

ক্রান্তিকাল এলে

রাণা চট্টোপাধ্যায়

ক্ষয়া পয়সার মতো চাঁদ উঠেছে
কলকাতার দূষণ আকাশে।
এ-সময় বাতিল ভালবাসা নিয়ে হাঁটি,
দেখি, ময়দানে বনবীথি ছাড়িয়ে দূরে
আলোর স্তম্ভে একা শুনশান বিদ্যাসাগর সেতু—
নিচে হুগলী নদীর কালো জলে
ফেরারী স্টিমার, সিটি বাজে।
মনখারাপের মতো ফিরে আসে
তিরিশ বছর আগের আমাদের কলকাতা।

ছাত্রবন্ধুরা যারা বলেছিল—ক্রান্তিকাল আসে
তারা নেই বন্দুকের নল শুধু অতীতের ঘাসে
পড়ে আছে সরোজ দত্ত হয়ে মুণ্ডহীন
আহ্লাদে সন্ত্রাসে।

হাঁটি একা রেড রোড ধরে
কৃষ্ণচূড়ার নিচে থোকা থোকা অন্ধকার
কালো ফুল, মাড়োয়ারী যুবকের হাতে ধরা
কলেজের মেয়ে, সন্ধ্যা হয়ে এলো
ফিরে যাবে দত্তপুকুরের দিকে
কিংবা নোদাখালি
পুলিশের জিপ দ্রুত চলে যায়
ভিক্টোরিয়া পেরিয়ে
মনখারাপের মত বাজে ব্যাঙের দোতরা।

ছাত্রবন্ধুরা যারা বলেছিল—ক্রান্তিকাল এলে
কলকাতা মুক্ত হবে বন্দুকের নলে,
কবে আর আসিবে ক্রান্তিকাল
ওপরে প্রতিমা-তিলোত্তমা ভেতরে আজিও সে
খড়ের কংকাল।

অতীত ভিজে যাচ্ছে

গৌরশংকর বন্দ্যোপাধ্যায়

যে মানুষটি দিনের পর দিন স্বপ্ন দেখে
তাকে সারাজীবনের বিষাদ স্পর্শ করে না
দুটি হাত অন্ধকারে মেলে
সারাদিনের তুচ্ছতা সরিয়ে রাখা কঠিন
জানালার ধারে ঘনিয়ে আসা মেঘ
চির অধিকার চেয়ে যদি ঘরে আসে
তাকে দুহাতে সরিয়ে দেবে এমন স্পর্ধা হবে না
কে থাকে অথবা কে যায়
তার সামান্য ছায়া যদি ঘরে থাকে
মনে হবে সমস্ত অতীত ভিজে আছে

কী অনির্দেশ পথ চলা আমাদের
মাঝে বিস্মিত হওয়ার মতো
স্বভাববিরোধী কিছু কথা

যে কথা কোনদিন পূর্ণতা পাবে না
পাথরের নিচে পড়ে থাকা বিবর্ণ রঙে মুছে যাবে
চারপাশে যে রুক্ষতা
তার ছবি অস্পষ্ট স্ফুলিঙ্গ হয়ে
বিষাদ স্বপ্নে আমাদের স্পর্শ করবে

বসে আছি হে

অপূর্ব কর

তোমাদের নিতে এসে বসে আছি প্ল্যাটফর্মে
কাল ভোরে তোমাদের আসবার কথা
তোমাদের কথা ভেবে ভেবে
আজ সারা রাত মন স্বপ্নময় কবিতার খাতা।

ঘড়ির কাঁটাতে চোখ
উসখুস দেখে চলি রাত্রির ফিকে হয় রঙ
নিশ্চিত প্রত্যয়ে জানি ছুটন্ত গাড়ি পার হয় মাঠঘাট
কাল ভোরে স্মিতহাস্যে দরজায় দাঁড়ানো তোমরা
থেকে যাওয়া রাত্রিভেদী গাড়ির হাঁটখোলা বন্ধ কপাট।

নিয়ে যাব তারপর যেখানে শূন্যঘর
কত কষ্ট ছোপ দেয়ালে মেঝেতে লেগে আছে
কেউ এসে একদিন সব অশ্রুজল
অসুখ সারিয়ে দেবে শুশ্রূষার হাতে
আশা স্বপ্নেরা ঝোলে কুলুঙ্গিতে
সারা ঘরে প্রতীক্ষার উন্মন বাতাস।

তোমরা এসো হা-হুতাশে
নীল স্বপ্ন নিয়ে নয় তচ্নছ বাগানে
কয়েক আঁজলা জল দাও মরা ঘাসে
অনেক তো ঝড়-ঝঞ্ঝা, ভুলের মাসুল দেওয়ার
ক্রান্তিপর্ব গেল, কাল ভোরে থৈ থৈ রোদের চাই
পূর্ণতা প্রকাশ।

কেন কলম

পঙ্কজ সাহা

কলম শোণিত ঝরাচ্ছে
এই মধ্যরাতে,
ক্রোধ নয়, অভিমান নয়,
প্রতিশোধ স্পৃহা কিংবা ঈর্ষাকাতরতা নয়,
তবু কলম আজ
বড়ো তেজী একরোখা,
শোণিত ঝরাচ্ছে সারারাত জুড়ে
পৃষ্ঠার পর পৃষ্ঠা অক্ষরে অক্ষরে

রাত্রিশেষে
আলোর ঝড় উঠলে
অক্ষর জলে ভেসে যাবো আমি।

বলেছিলাম

দাউদ হায়দার

সমস্ত আবর্ত থেকে ফিরো আসো, বলেছি কী?
—সে কথা বলিনি।

বলেছিলাম, আমাদের কালপর্বে যে-ভাঙন
উৎস কোথায় এই চণ্ড-সামাজিকতার?

আজকে যে-স্তরগুলি তৈরি হয়ে আছে,
আমরাই কী নির্মাণ করিনি ঘূর্ণিপাক?

শববাহকেরা এখন বৃত্তের ভিতরে ঘুরে বেড়াচ্ছে, আর
শ্মশানযাত্রীরা নদীর ঠিকানা ভুলে
দণ্ডকারণ্যের দিকে ধাবমান

দ্যাখো, ভূমিকে নির্ভূম করে ভূস্বামীরা আগুন দিচ্ছে চুল্লিতে

সব প্রতিরোধ ভেঙে গেলে
কোনো সূচনা, প্রবাহ থাকবে না তবে?

বলেছিলাম, বজ্রভরা দিনগুলি আবার ফিরে আসুক, স্রোতের
বিরুদ্ধে সমবেত দাঁড়াতে চাই

দংশন

নাসের হোসেন

বেশিদূর যাওয়ার দরকার ছিল না, তবু যেতে হল, সরেজমিনে দেখে
আসতে হল, মানুষের বুকে অমানুষের ঝাঁপিয়ে পড়ার সদ্যোজাত
ইতিহাস, তার পাতায় পাতায় রক্ত, পাড়ায় পাড়ায় রক্ত, এখানে
ওখানে পোড়া দংশন, এখানে ওখানে লেলিহান, ঘৃণা ছড়ানোর
পুস্তিকা, তার জোর এতখানি, জানা ছিল না তো, বিশ্বাস হয়নি তো,
এখন সেইসব অবিশ্বাসকে বিশ্বাস করতে হচ্ছে, বিশ্বাস করতে
বাধ্য হতে হচ্ছে, তবুও হাতে হাত, সমূহ পরিবার ছিন্নমস্তক হলেও
সে-বাড়ির শিশুটিকে কোলে নেবার লোকের অভাব কখনো ঘটে না
জঘন্যভাবে আহত ধর্ষিতা, যারা নিজের চোখে একে একে আত্মজনকে
হত্যা হতে দেখেছে, ধর্ষিতা হতে দেখেছে, এমনকী তাদেরও এখন
গণবিবাহে অরাজি হবার কারণ থাকে না, জীবন প্রবহমান থাকতে
চায় যতদূর সম্ভব, কিন্তু স্মৃতি থাকে, স্মৃতির প্রবল চাপ, আর
তাতেই মাঝেমাঝে মনে হয়, বাঁচা বা পাগল হয়ে বাঁচা সমান, হয়তো

অঘটনের আশায়

পার্থ রাহা

এখন আমাদের জন্য কিছু ঘটনা ঘটা প্রয়োজন
রাস্তার তুমুল চীৎকার
বুকের মধ্যে চমকে ওঠা অতীত
বজ্রপাতের শব্দ
কিছু একটা হলেই হত

কিন্তু তেমন কিছুই হল না
এতদিন যে মানুষগুলো হাজার মাইক নিয়ে
রিহার্সাল দিয়েছিল বিস্ফোরণের
আজ তারা
ফেস্টুনের রঙীন সুতোর মত হাওয়ায় হাওয়ায়
যারা কররেখায় বজ্রপাতের শব্দ তুলবে বলে
আমাদের একদিন বিছানা থেকে
টেনে তুলেছিল
মশারির ভিতর মশার সঙ্গে রাতভর লড়াই
লড়াই

রাত্রিশেষ
বন্ধ দরোজায় ঘা দিয়ে দিয়ে
সকাল হয়ে গেল
বৃষ্টি ঘেরা অন্ধ সকাল
স্যাঁতস্যাঁতে বাতাস রোদ্দুর সুদূর

এখনো অপেক্ষায় আছি
একটা ঠা-ঠা রোদ্দুরের দিনে
সবুজ ঘোড়ার সওয়ার আমি
আর কলকাতার পিচগলা রাস্তায়
বিশাল গ্রীবার উট হেঁটে চলে মর্মান্তিক উদাসীনতায়
সেদিনের শরতের সাদা মেঘ মুখ কালো করে
থমথমে আকাশটা
মাথায় ভেঙে পড়বে
সেদিন একটা অঘটন ঘটবেই ঘটবে।

ভানুমতীর ভারতবর্ষ

দীপেন রায়

মাথার ওপর শুধু আকাশ,
পাতায় দু-মুঠো ভাত,
আর এক টুকরো মাটির নাম
যদি হয় ভারতবর্ষ
তাহলে ভানুমতী তার কিছুই জানে না।
কেবল ঝলকায় মেঘ থেকে থেকে চকমকি টোলায়,
ঝড়ে মাথা নোয়ায় গাছ,
বৃষ্টির জল কখনো-সখনো ছোঁয় দিগন্ত-অবধি।

অরণ্যকে যতো কাছ থেকে পাই
ততো কাছে নয় মুঙ্গের অথবা কলকাতা
ভারতবর্ষ আরো কতদূর!

অনেক আগুন আছে ঝলসায়
কতক এখানে।

অনেকের অনেক রক্তক্ষরণের পর
অনেক দুঃখের দিন
অনেক কষ্টের অন্ধকার
অপঘাত
এখানে ওখানে কড়া নাড়ে রোজ।

এক জীবনে আমাদের অনেক সমুদ্র লাঞ্ছনা।

এত দিয়ে থুয়ে তবু
আমাদের ভানুমতীর ভারতবর্ষ
কোনদিকে
এর সদুত্তর আলোকসর্বস্বতা
দেয়নি এখনো...

উল্কিচিহ্ন

রমেন আচার্য

ডানা মেলা সমস্ত ভাবনাকে গ্রাস করে নিয়েছে যে
ঘন কালো আতঙ্কের ছায়া
সেখানে কি এবারও মৌসুমী ফুলের উৎসব?
শতপুষ্প আন্দোলিত করে
হাততালি দিয়ে উঠবে সবুজ পাতারা? নাকি
ওদের শরীরে এত রক্তবর্ণ দেখে
চমকে উঠবে গৃহহীন সন্ত্রস্ত মানুষ?

যারা মাটির দরজা ঠেলে এসেছিল পৃথিবী ভ্রমণে
তাদেরও শরীর যদি পুড়ে যায় দাঙ্গার আগুনে,
মানুষের পাপে।

'মানুষ' শব্দকে ঘষে তুলে
ভিন্ন এক উল্কিচিহ্ন এঁকে দেয় যারা
নারী শিশু বৃদ্ধের শরীরে
বিভৎস উল্লাসে,
তারা কি তাহলে
ধর্মচিহ্ন সেঁটে দেবে বহুবর্ণ ফুলেরও শরীরে?

যে ফুল এখনও গর্ভে, যে রয়েছে কুঁড়ির আড়ালে মুখ ঢেকে
যেন তারা মুখ তুলে
এই পোড়া পৃথিবী না দেখে।

সহবত

শ্যামল সেন

আমিই আমার আজীবন প্রভু; দেবতাবিহীন।
নিয়তি না-মানা জন্মের ক্ষণ
দোসর করেছে হিংস্র করাত
খেয়াল-খুশীতে রাত্রির অভিসম্পাত।

আকাল-রাঙানো অশনি তারিখ
দানাপানির বরাত দেয়নি ঠিক ঠিক
সহজপাঠের ছন্দ অথবা বালকবেলার ঝুমঝুমি
ক্যানভিক্ষায় চোখের কাজল নাম লিখেছিল মাতৃভূমি।

নাছোড় সংসার। ফুৎকারে দিল মন্ত্রপাঠ :
'আগুনের মুখে দাঁড়া এবার উজিয়ে নিয়ে চিতাকাঠ,
উদর পূরণে অন্নকূটের উৎসবে যা—
খা; আয়ুষ্মান ক্ষুধায় তুই যা-ইচ্ছে হয় খা।'

দীর্ঘ উড়ান। চালচিত্রে ভাসানের শেষে
শরণার্থীর দামাল দাপটে রুখু মূর্তির বেশে
প্রভুকে আমার হাতের খোয়াবে বন্দী করেছি আজ,
দেবতাবিহীন আমারই রচনা কিরাত সমাজ।

কুর্নিশ নয়, আমারই জেহাদে দখল আমার
করতালি দিয়ে ফিরিয়ে দিয়েছি চিরজন্মের মার।

প্রণাম

অনির্বাণ দত্ত

আকাশ থেকে ঝরছে শিশির, শিশিরে করি স্নান...
শিশিরে বাঁধি শব্দ-ধনুক, শিশিরে বাঁধি গান।

লাগে না হাতে শিশির তবু...জেগেছি সারারাত—
শূন্য দুটি করতলে—এ কোন্ সন্নিপাত!

ও ছায়াপথ, সাগর-নদী, শিশির-ধোয়া খোয়াই...
শূন্য আমার পাতায় কোথায় একটি ফোঁটা ছোঁয়াই?

ও মহাকাল, চিররহস্য মাটি—
তোমার বুকে প্রণাম রেখেই...তাই চিরকাল হাঁটি।

অব্যক্ত

অজিত বসু

ঘুম ভেঙে মনে হয়
জেগে কি আছি।
আবার কিসের জন্য জাগা?
দেখি রাত্রি ঘুম ভেঙে
আড়মোড়া ভাঙতে ভাঙতে
ঘোলাটে রহস্য থেকে
আবার মেলে ধরে জীবনের ঘরবাড়ী, কর্ম্ম, রাজ্যপাট।

এঁ কি আমার? এই ঘর, এই ঘুরতে ঘুরতে
কিছু একটা হ'য়ে-ওঠা,
সাফল্য বা অসাফল্য,
দুঃখ বা আনন্দ, উৎকণ্ঠা, সংশয়—
তারও ভিতরে জীবন যেন বহে যাচ্ছে
টানেলের ভিতর দিয়ে অন্ধকারে ট্রেনের মতন;
কতো ছবি, কত শোক বিচ্ছেদ,
তবু আনন্দ কখনো কখনো আমার মুখে
উজ্জ্বল আলোর মত হাসি মেলে ধরে,
মাঝে মাঝেই অস্পষ্ট হয়ে যায় এই বাঁচা,
এই খাঁচা মাঝে মাঝেই আক্ষেপে
জড়িয়ে ধরতে চায় দূর—বহুদূর, প্রান্তর ও আকাশ—

আমাকে অচেনা মনে হয়,
আর সঙ্গে সঙ্গে তার ছায়া এসে পড়ে
চলন্ত জীবনের মুখে—
আমি দেখি, যে-ছবি আঁকতে চেয়েছি
তার ভেতরে এসে গেছে অন্য কোনো ছবি,
ছবিটা বলতে বলতে থেমে গেছে,
আর বলছে না।
জানি না কী বলবার ছিল।...

বিশেষ নিবন্ধ

আরও পরিচয় আলোর সঙ্গে

তাপস সেন

বিশেষ নিবন্ধ

আরও পরিচয় আলোর সঙ্গে

তাপস সেন

একদিন সন্ধ্যেবেলা দিল্লী থেকে টেলিফোন এল। আমার মাষ্টারমশাই প্রতাপ সেন তলব করলেন দুদিনের মধ্যেই দিল্লী গিয়ে কথা বলতে হবে—বিস্তারিত সব সাক্ষাতেই বলবেন আনন্দ আর্টে ঝাবভালা সংস্থার সঙ্গে ছায়া দিয়ে নাকি কিসব করতে হবে। দিল্লী গিয়ে জানলাম ওই সংস্থা উত্তরপ্রদেশ সরকারের কৃষি বিভাগের জন্য একটি বিশেষ প্যাভিলিয়ন তৈরী করেছেন। সেদিনের উন্মুক্ত মেলার জমিতে তখনও 'প্রগতি ময়দান' নামকরণ হয়নি। শুনলাম উত্তরপ্রদেশে কৃষি দপ্তরের জন্য একটা বিরাট প্যাভিলিয়ন ওঁরা তৈরী করেছেন কিন্তু একজিবিশনের প্রধান সড়কের পাশেই দীর্ঘ দেয়ালটা ফাঁকা থেকে যাচ্ছে। ওঁদের মাথায় ঢুকেছে ওই দেয়ালে যদি আলোর কিছু কারসাজি করা যায়। আমি ওঁদের বৃত্তান্ত শুনলাম। সেই আলোচনায় প্রতাপ সেন ছাড়াও ছিলেন ঝাবভালা, আরজি আনন্দ ও শ্যাম বেনেগল মশাই। আমি ঠিক একদিন ভাবনাচিন্তা করে ওঁদের বললাম কৃষিকাজ সংক্রান্ত কিছু গ্রাফিক কাটআউট আর গাছপালা নৈসর্গিক বৈচিত্র্যের সঙ্গে আধুনিক ভারতের জীবনযাত্রার নানা প্রতীকি সাংকেতিক মডেল—প্লাইউড টিনের পাত এবং শক্ত তারের ছবি অর্থাৎ wire supplier-এর প্রয়োজন—কি আশ্চর্য, প্রতাপদা তিন-চার দিনের মধ্যেই নানা সাইজের উপকরণের নক্সা করে দিলেন। তার থেকেই আমার বাছাই করা বেশকিছু জিনিষকে ঘোরানোর জন্য বলবিয়ারিং মোটর বা হাতে ঘোরানোর নানা দিশি ফন্দিফিকির তৈরী হতে লাগল স্থানীয় কারিগর ও ছুতোর মিস্ত্রিদের সহায়তায়। তারপর আমার দিল্লীর সহযোগী শীতাংশু মুখার্জীকে নিয়ে এসব সাংকেতিক কাটআউট মডেলগুলোর জন্য ঐ ফাঁকা দেওয়ালের উল্টো দিকে লম্বালম্বি ভাবে একটি পাটাতন তৈরী করে তাতে নানা ধরণের আলো বসিয়ে ঐ ঘোরান মডেলগুলোর ছায়া নানা আকৃতি ও বিকৃতিতে ফাঁকা সাদা দেয়ালে দেখানো গেল। একটাই অসুবিধে হচ্ছিল, প্রদর্শনীর জন্য রাস্তার আলো এসে দেয়ালের ছায়াবাজীর খেলাটা একটু কমজোর করে দিচ্ছিল। আজ থেকে প্রায় পঞ্চাশ বছর আগের কথা—তখন সবটাই হাতে ঘোরানো নাড়ানো হত। কিছু পুলি বেল্ট ও বলবেয়ারিং হাতে ধরে ধরে নানা গতিতে ভঙ্গীতে আমার সেদিনের সহকারীরা চালাতো প্রত্যেক দিন সন্ধ্যেবেলা এবং এই কাজের তত্ত্বাবধান করবার জন্য বিশেষ ভাবে দায়িত্ব দিয়ে পাঠিয়েছিলাম দিল্লীতে আমার বন্ধু অভিনেতা বঙ্কিম ঘোষকে—সে সানন্দেই রাজী হয়ে গিয়েছিল একাজে। তখন ওর বোধহয় কাজকর্মও ছিল না—ঠিক মনেও নেই আমার রূপকারে ব্যাপিকা বিদায়-এ ঘনশ্যাম-এর সার্থক অভিনয় বোধহয় তারপরের কথা।

এই Up Pavilion হয়েছিল World Agricultural Fair উপলক্ষে একটি আন্তর্জাতিক প্রদর্শনী ক্ষেত্র হিসেবে দিল্লী পুরাণা কিল্লার পাশের প্রশস্ত উন্মুক্ত প্রান্তরে। পরে স্বাধীনতার

রজত জয়ন্তী বৎসরে প্রবর্তনা হল ট্রেড ফেয়ার অথরিটির 'প্রগতি ময়দান' সংক্ষেপে TFA. অবশ্য সম্প্রতি ওর নামও বদল হয়ে এখন ITPO মানে India Trade Promotion Organisation, আমার অবশ্য আগের নামটিই পছন্দ। নাম বদলের হুজুগে তো মাদ্রাজ হল চেন্নাই, বম্বে মুম্বই, ত্রিভান্দ্রাম তিরুবন্তপুরম এবং আমাদের ক্যালকাটা হয়েছে কোলকাতা।

থিয়েটারের বাইরে থিয়েটার অর্থাৎ ওখানে সূচনা, পরে ডাক পেলাম অশোকা হোটেলের বিরাট কনভেনশন হলের আলোক পরিকল্পনার জন্য। দিল্লীর চাণক্যপুরীর এক বিশাল অশোকা হোটেলে আসন্ন UNCTAD সম্মেলনের জন্যই বিশেষভাবে এই হলের প্রস্তাবের অন্যতম স্থপতি মিঃ জে. কে. চৌধুরীর আমন্ত্রণে গেলাম এবং সেখানে বেশ কিছুদিন কাটিয়ে কাজ শেষ করলাম। তখন আমার প্রধান সহকর্মী ছিল রবিন দাস যে প্রথমে বহুরূপীতে ছিল পরে লিট্‌ল থিয়েটার মিনার্ভা থিয়েটার অধিগ্রহণ করলে সে ওখানে প্রধান ইলেকট্রিসিয়ান হিসেবে কাজ করেছে। এ সময় অশোকা হোটেলে দীর্ঘকাল থাকা ও কাজ করার সময় ওখানকার সংস্কৃতি কর্তা মানে ITDC (India Tourism Development Corporation)-এর মিঃ এ. জে. যশপালের সঙ্গে খুব আলাপ হয়ে গেল।

দীর্ঘ প্রস্তুতির পর অবশেষে সেই হলে প্রথম অনুষ্ঠান UNCTAD (United Nations Trade Administration Develpment) অধিবেশন প্রথম সন্ধ্যায় সারা পৃথিবীর রাষ্ট্রপ্রধান ও প্রধানমন্ত্রীদের উপস্থিতি জমজমাট কনভেনশন হলে VVIPদের (তখনও হয়তো VIP কথাটা এত চালু হয়নি) ভিড়ে ঠাসা বিরাট হল, তার কার্পেটের তলা দিয়ে পাতা হয়েছে নানা ভাষায় অনুবাদের জন্য এরিয়াল। এরিয়াল আকাশেই হয় জানতাম, পায়ের তলায়ও কি এরিয়েল হতে পারে? যাই হোক ওই এরিয়ালের তার গেছে ডান পাশে দোতলা কাঁচ বসানো সারি সারি অনুবাদকের ঘরে সেখান থেকে ওঁরা বিভিন্ন ভাষায় তৎক্ষণাৎ অনুবাদ করে উপস্থিত প্রতিনিধিদের হেডফোনে চালান করবেন। এই এলাহী কাণ্ডকারখানা, প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল নেহেরুও এসে গিয়েছেন—হঠাৎ এক কাণ্ড! সব অন্ধকার—একদম টোটাল অন্ধকারে ডুবে গেল UNCTAD-র ঐতিহাসিক কনভেনশন হল—বিভ্রান্তি হট্টগোল এক মিনিট দু'মিনিট। তখন দেখতে পেলাম কিছু বৈদেশিক সাংবাদিকের হাতে ছিল ব্যাটারী চালিত সানগান (Sungun)। তাঁরা রিসার্চ হলের রাষ্ট্রপ্রধান ও কূটনৈতিক হোমড়াচোমড়াদের একটুখানি আলোকিত করলেন ঐ দুটি বিশেষ পোর্টেবেল হাতে ধরা আলোয় আজকের দিনের দূরদর্শন কিম্বা বিবিসি, সি এন এন, স্টার টিভি জন্মগ্রহণই করেনি। একটু পরে আবার আলো এল। তখন স্বস্তির হাঁফ ছাড়ছেন সবাই, কিন্তু আবার অন্ধকার—বেশ পরে বিদ্যুৎ এল এবং যথারীতি বিলম্বে অধিবেশনের সূচনা হোল। ঐ বিদেশী সাংবাদিকদের জোরালো আলোতে আমি দেখতে পাচ্ছিলাম সেকালের বিখ্যাত কার্টুনিস্ট শঙ্করের সকৌতুক হাসি, মনে হল আজকের এ দুর্বিপাক অন্ধকার হয়তো ওঁর পরের ছবির আভাস দেবে ওঁর ভবিষ্যতের ছবি Shape of Darkness আখ্যায়।

আমি দিল্লী ছেড়ে আসি ছেচল্লিশ সালে। তার আগে বেশ কিছুদিন নিউদিল্লী মুনিসিপাল কমিটির (NDMC) বিজলী বিভাগে চাকরী করেছি—বিদ্যুৎ বিভাগে প্রথম দিল্লীর আরউইন

হাসপাতালে কাজ সুরু করি SBA অর্থাৎ Swith Board Attendant -এর কাজ দিয়ে। তখন আমার বেতন ছিল মাসে ছাব্বিশ টাকা (বেসিক মাইনে ১৮্ আর ডিএ মানে ডিয়ারনেস আলাউয়েন্স দুর্মূল্যভাতা আট টাকা)। নতুন দিল্লী সমস্ত কিছুই তখন চলতো D. C.তে (Direct Currentএ)। তারজন্য সারা নতুন দিল্লীময় ছিল ইলেকট্রিক সাবস্টেশন, চলতি কথায় বিজলী ঘর সেখানে পেল্লায় পেল্লায় কনভার্টার দিয়ে হাইটেনশন (High Tension) মানে ৬৬০০ ভোল্টকে D.C.তে রূপান্তরিত করে ২৩০ ভোল্ট D. C.তে সারা নিউদিল্লীর অফিস বাজার ও সরকারী আবাসনে পাঠানো হত। আমি সেই ছোটবেলা থেকে দেখে আসছি আমাদের সারাজীবন নতুন দিল্লীর এগারো সিকান্দার প্লেস থেকে গোলমার্কেট বেয়ার্ডস্কেড তালকটোরা সর্বত্রই এই Direct কারেন্টের রাজত্ব। তখনও কোনদিন মাথা ঘামাইনি Direct কারেন্ট ও A.C. মানে অলটারনেট কারেন্টের পার্থক্য ও প্রয়োজন নিয়ে। যদিও যখন আরউইন হাসপাতালে চাকরীতে ঢুকলাম সেখানে কিন্তু ইলেক্ট্রিক ঘরে মিটার রিডিং করতে হত প্রতি ঘণ্টায়। সেখানে দুটো বৃহৎ ট্রান্সফরমার ছিল। আমার কাজও ছিল ওগুলো বদল করার। সেদিন কেন যে ভেবে দেখিনি ঐ ট্রান্সফরম দিয়ে যে বিদ্যুৎ সরবরাহ হচ্ছিল সেটা এই A. C. বিদ্যুৎ যার অনেক সুযোগ সুবিধে আছে। বিদ্যুৎ ও চুম্বকের পারস্পরিক সম্পর্কের ব্যাপার এটা। অনেকগুলো বিজলী ঘর ছাড়াও আর এক জাতীয় ব্যবস্থা ছিল কনট প্লেসের উপকণ্ঠে। সেটি হল বারখাম্বা রেক্টিফায়ার স্টেশন (Rectifier Station)। ওখানে ট্রান্সফর্মার কনভার্টার ছিল না। থাকত বিশাল বিশাল ভালভ-এর সমাবেশ, আজও সেটি আছে কিনা জানি না। আমি বেশী কাজ করেছি S. B. A-র থেকে প্রমোশন পেয়ে পাঁচ নম্বর বিজলী ঘরে (No 5 Electric Substation), যেটি ছিল মিন্টো রোড এলাকায়। ভারত সরকারের প্রেস ছিল সেখানেই। Tirkman Road-এ আমার কর্মস্থল। উঁচু পোস্টে যখন উঠলাম তখন মাইনে বাড়ল বোধহয় সব মিলিয়ে পঁচাত্তর আশী টাকা। মাসের শেষে NDMCর অফিসে যেটা যন্তরমন্তরের ঠিক উল্টোদিকে আজও সে বাড়ী আছে কিন্তু সেখানকার ছবি আবহাওয়া সবই বদলে গেছে। পাশেই ছিল নিউ দিল্লী YMCA যেখানে আমি কাজ করেছি এবং সেখানেই দেখেছি সেদিন ভারতীয় গণনাট্য সংঘের অনুষ্ঠান নাচ ও গান। বিনয় রায়ের নেতৃত্বে সেই দলে অনেকের মধ্যে ছিলেন বিনয়দার ছোট বোন রেবাদি, পরে রেবা রায়চৌধুরী হন। বিনয়দা, সে আমাদের পরম অনুপ্রেরণা তাঁর গান তাঁর সুর। পরে তো বিনয়দা কি করে মস্কো গিয়েছিলেন। সেদিনে মস্কো বেতারে বিনয়তার কণ্ঠ আমাদের অনুপ্রাণিত ও শিহরিত করত। পরে অবশ্য বিনয়দা দিল্লীর করোলবাগে বটুকদা (জ্যোতিরিন্দ্র মৈত্র)র সঙ্গে অনেক সাংস্কৃতিক কাজে মেতে গিয়েছিলেন। শেষ পর্যন্ত ওঁর জীবনাবসান ঘটল ওই মস্কোরই রাজপথে বাস চাপা পড়ে।

আরউইন হাসপাতালে চাকরী করার সময় কেন জানি না আমি দিল্লীর কাশ্মিরী গেটএ দিল্লী পলিটেকনিকে ভর্তি হলাম ইলেক্ট্রিক ইঞ্জিনিয়ারিং সার্টিফিকেট কোর্সে। তখন আমাদের দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের শেষ ভাগে ওখানকার পাথরের দেওয়ালওয়ালা বিরাট বিরাট ঘরে ক্লাস হত। ইভনিং ক্লাস। সন্ধ্যে ছটার থেকে রাত ন'টা পর্যন্ত নিয়মিত ক্লাস করেছি, চেষ্টা করেছি।

ক্লাসের শেষে আবার দিল্লী স্টেশনের ব্রিজ পেরিয়ে আসতাম বাড়ী ফিরে খেয়েদেয়ে যেতাম সাইকেলে আরউইন হাসপাতালের ডিউটি করতে রাত দশটা থেকে পরদিন সকাল আটটা পর্যন্ত। তার আবার আরেক কাজ। দিল্লী পলিটেকনিক থেকে জানানো হল প্রত্যেক ছাত্রকে আবশ্যিক ভাবে বারখাম্বা ওয়ার্কশপে অ্যাপ্রেন্টিসগিরি করতে হবে বোধহয় বেলা দশটা থেকে বিকেল চারটা পর্যন্ত। সেখানেও গিয়ে আমার পলিটেকনিক সহপাঠীদের সঙ্গে ফাইল নিয়ে উখো ঘষতাম আরো নানা ধরণের ঠোকাঠুকি করতাম। সেদিন বুঝিনি পরে ভেবে দেখেছি ওটা ছিল একরকম করে সেদিন War Effort জন্য কর্তৃপক্ষের ভাবনা ছাত্রদের তালিম বা অভ্যাস করানো যার অনেক ভাল দিকও আছে। একথায় মনে পড়ে বেভিন বয়েজদের কথা, বেভিন সাহেবের পরিকল্পনায় কিছু বিদ্রোহী তরুণ বা যুবকদের বিশেষ তালিমের জন্য বিলেতেই পাঠানো হত, এদেরই বোধহয় বলা হত বেভিন বয়। আমাদের পরিচিত কমলালয় সুইটস বেয়াল মার্কেটের বটুদাও এই বেভিন বয় ছিলেন, এখন কার কাছে যাচাই করব এইসব খবর। সেদিনের প্রায় সবাই আমাদের ছেড়ে একজিট দিয়েছেন চিরতরে।

থিয়েটারের বাইরে নয়, তবে থিয়েটার প্রসঙ্গে একটি উল্লেখযোগ্য খবর হল বম্বে থেকে ফিরেছি, চলচ্চিত্র জগতের সঙ্গে সামান্যই যুক্ত হতে পেরেছিলাম। শ্রদ্ধেয় ক্যামেরাম্যান দিলীপ গুপ্তের সহকারী হিসেবে আমাকে নিতে রাজী হয়েছিলেন, আমি তখন নিউ দিল্লী মুনিসিপালিটির চার্জ ছেড়ে দিয়েছি, এমন সময়ে অপ্রত্যাশিত ভাবে আমার সুযোগ এল CPWDর MES বিভাগে কাজ করার। ততদিনে আমার পলিটেকনিকের পড়া ছেড়েও দিলাম বিশেষ সুবিধে করতে পারলাম না।

এই নতুন কাজের জায়গা হল দিল্লী ক্যান্টনমেন্টের CPWDর বিজলী বিভাগে, ওখানে যেতে আমাদের সিকান্দার প্লেসের বাড়ী যেতে সাইকেলে প্রায় পঁয়তাল্লিশ মিনিট মত লাগতো, আমাদের বাড়ী থেকে মাইল সাত-আট দূরে। ওখানে গিয়ে পেলাম আমার ওপরওয়ালা সাবডিভিশনাল অফিসার মিঃ দিলবার হোসেনকে, আর আমার সহকর্মী যারা ছিলেন ফিরোজ খান, জিশান খান ও সিদ্দিকী আর এস ডিওর ওপরে ছিলেন ইলেকট্রিক্যাল এক্সিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ার মিঃ গ্রোভার, পাঞ্জাবী স্বল্পভাষী, পরবর্তীকালে পেয়েছিলাম শ্রীচক্রবর্তীকে। আর হঠাৎই পেয়ে গেলাম আমার ইস্কুল জীবনের সহপাঠী সব্যসাচী সেনকে। সব্যসাচীর আমার বেশ ভাব তো ছিলই, পরে জানতে পারলাম ওর মামা বম্বে টকীজের বিখ্যাত হিমাংশু রায়, অর্থাৎ দেবীকারাণী সাক্ষাত মামীমা। তাই ওকে সব সময় সাধতাম মামামামীকে আমার বা আমাদের জন্য একটু বলে দিতে। সেই সব্যসাচী পরে আমাদের বন্ধু প্রিয়রঞ্জন সেনের ছোটবোন চিত্রাকে বিয়ে করে। তখনও অবশ্য ওর বিয়ে হয়নি আমারও নয়। দিল্লী ক্যান্টনমেন্টে আমার কাজের এরিয়া ছিল নানা নামে, মসাওয়া লাইনস, খাইবার লাইনস এরকম কত নাম। খাইবার লাইন-এর ব্যাপারে আমার কাছে একটি অন্য ধরনের কাজ এল। ওটিকে নাকি বন্দী নিবাস করা হবে, তার আভ্যন্তরীণ ও সেই এলাকার চতুর্দিকে সৌরমিটার, লাইটিং-এর প্ল্যান ও কাজ করতে হবে। কৌতূহলী হয়ে গিয়ে দেখলাম খাইবার লাইনের ব্যারাকে আজাদ হিন্দ ফৌজের সব নেতারা। জেনারেল মোহন সিং, শাহনওয়াজ খান, ধীলন

সব্বাইকে ব্যারাকের বাইরে চারসাইডে আবিষ্কার করলাম। আলাপও করেছিলাম একটু আধটু। তখন সমস্ত দেশে এই আই এন এর বন্দীদের লালকেল্লায় বিচার নিয়ে সংবাদপত্রের শিরোনাম। ভুলাভাই দেশাই, জওহরলাল নেহেরু এঁদের হয়ে মামলা লড়ছেন ব্রিটিশের বিরুদ্ধে। আমার এই চাকুরী জীবনে আর একটি কথা। এ ক্যান্টনমেন্টে একটি বাংলো ছিল। রাস্তার নাম Wigman Road. শুনেছিলাম প্রখ্যাত পাহাড়ী সান্যালের দাদা ওই বাংলোতে থাকতেন। আমি যখন যাই আমার পিতৃদেবের সরকারী চাকরী থেকে অবসর নেওয়ার সময় এল, ভাবলাম ভালোই হল ঐ কোয়ার্টার তথা বাংলোটি যদি পাই বেশ হয়। আমার বাবার খুব বই পড়ার অভ্যাস ছিল, সঙ্গীত নিয়েও একটু চর্চা করেছেন, এস্রাজ যন্ত্রটি বাজাতেন। ওঁদের একটি কনসার্ট ক্লাব ছিল, অরোরা কনসার্ট ক্লাব। বাবা এ জি সি আর এই সাধারণ কেরাণীর কাজই করে গেলেন। তবে ওঁর কাছে পড়াশুনা তালিম নিয়ে অনেক সহকর্মী উচ্চতর উচ্চতম পদে উঠে যেতেন। বাবা কিন্তু সামান্য পদে থেকে এই বিপুল সংসারটি ধারদেনা করে চালিয়ে এসেছেন। সেই সংসারের বড় ছেলে হয়ে আমি কিছুই ঠিক করতে পারিনি, সাধারণ শিক্ষার জন্য আমাকে দিল্লী রামজাস কলেজেও ভর্তি করে দেওয়া হল। ক'দিন সাইকেল করে আনন্দ পর্বতে যেতে হত। দু'চার দিন কলেজে যেতে আমি হাঁপিয়ে উঠলাম। ছুঁতোনাতা করে কলেজ যাওয়া বন্ধ করে দিলাম। আমার বাবা ও মা কিন্তু এসব নীরবে মেনে নিতেন। সেই কৈশোর থেকেই আমার আকর্ষণ ছিল নিউ থিয়েটার্সের ছবি বম্বে টকীজের ছবি, আর ইস্কুলে পণ্ডিতজী বলে অত্যন্ত স্নেহশীল ফিরিওয়ালা আসতেন, তাঁর কাছ থেকে আমরা ক্যাডবেরী নেসলস-এর চকোলেট কিনতাম। উনিও আমাদের খুব প্রশ্রয় দিতেন।

ইস্কুল-জীবনে আমার দু'চারজন বিশেষ বন্ধু ছিল সহপাঠী প্রিয়রঞ্জন সেনগুপ্ত, কমলাকান্ত বসু, হিরণ্ময় দেব, সন্তোষ চৌধুরী, শিশির বিশ্বাস। এদের মধ্যে বোধহয় এখন সন্তোষ আর হিরণ্ময়ই বেঁচে আছে। ইস্কুল-জীবনে সক্রিয় রাজনীতি না করলেও কমলাকান্ত, সন্তোষ চ্যাটার্জীদের সঙ্গে ছাত্রসংঘ তৈরী করেছি। ইস্কুলের গণ্ডী পার হওয়ার আগেই আমাদের ড্রইং টিচার প্রতাপ সেন ও সুনীল রায়চৌধুরীদের নাট্যচর্চার সঙ্গে বন্ধুত্ব হয়ে গিয়েছিল।

দিল্লীর ক্যান্টনমেন্টের চাকরীর সময়ে আমার ছায়া নিয়ে আগ্রহ ও কৌতূহল বাড়তে থাকল, কারণ ততদিনে আমি উদয়শঙ্করের দিল্লীর রিগাল থিয়েটারে নাচ দেখেছিলাম, যার মধ্যে লেবার এণ্ড মেশিন আইটেমটি আমাকে মুগ্ধ করেছিল উপস্থাপনা সঙ্গীত সবকিছু মিলিয়ে। ততদিনে আমি দিল্লীর গণনাট্য সংঘের সঙ্গে যুক্ত হয়ে পড়েছি এবং বিশ্বনাথ মুখার্জী ও ইন্দু ঘোষের উদ্যোগে আমি গণনাট্য সংঘের সঙ্গে জড়িয়ে পড়েছি। ওঁদের আলোর কাজ করতে করতেই নিরঞ্জনদা (নিরঞ্জন সেনগুপ্ত)র সঙ্গে পরিচিত হলাম। আমরা তখন গান্ধী গ্রাউণ্ডে বাংলার দুর্ভিক্ষের ওপর একটি ছায়ানাট্যও করে ফেলি। তখন একদিন গণনাট্যের শিল্পীরা উদয়শঙ্করের সঙ্গে এক বিশেষ বৈঠকে সমবেত হলেন কার্জন রোডের আজ কস্তুরবা গান্ধী মার্গ লালা শ্রীরামের বাড়ীতে। সেদিনের দেখা ও পরে ওঁর আলমোড়া কেন্দ্রে 'রামলীলা' ছায়ানাট্যের কথা জেনে আরো আগ্রহী হলাম আলো তথা ছায়ার প্রয়োগে এবং প্রতাপদাকে প্রস্তাব দিলাম আমার প্রিয় পরশুরামের প্রেতলোক নিয়ে 'ভূষণ্ডীর মাঠে' ছায়ানাট্য' করার

কথা। আর আমার মনে তো যতীন সেনের আঁকা ছবিগুলোর আকর্ষণ ছিলই। প্রতাপদাও সোৎসাহে মেতে উঠলেন, আমার সঙ্গীসাথীরাও বিশেষ করে শিশির বিশ্বাস, সিধু ভট্টাচার্য কমলাকান্ত বসুরা। আমার একজন অতিপ্রিয় বন্ধু ছিল সরিৎ দাস, সে অসাধারণ পড়াশুনায়, অত্যন্ত ভাল ছেলে কিন্তু পৃথিবীর যাবতীয় ব্যাপারে জানতে পড়াশুনা এমন কি আমার রেডিও নিয়ে নাড়াচাড়া এবং বিদ্যেবুদ্ধিকেও খুব ভালভাবে দেখতো, ওর বাড়ীতে ডক্টরস লেনে আমার নামই হয়ে গিয়েছিল রেডিওয়ালা। সে যুগে অল ইণ্ডিয়া রেডিওর জন্মই হয়নি, সবে দিল্লী কেন্দ্র থেকে এক্সপেরিমেন্টস্ ব্রডকাস্টিং চালু হয়েছে। আর পাশের বাড়ীর সুধাংশু শেঠি ও সিকান্দার প্লেসের বিশ্বনাথ ব্যানার্জীর সাকরেদ হয়ে গেছি। ওঁদের মারফৎই আমার রেডিও ও কলকব্জার প্রতি আকর্ষণ। সেই যুগে কৃস্টাল রেডিও একটি জনপ্রিয় ব্যাপার। অতি সস্তায় একজোড়া হেডফোন, একটি ইনসুলেটেড তারের কয়েল, আর গ্যালেনার তৈরী কিনতেই পাওয়া যেত, তার প্রতি সহজ ব্যবস্থার মধ্যে ছিল ওই কৃস্টালকে স্পর্শ করাবার অতি সরল একটি ছোট্ট কাঠির মত উপকরণ। তার নামই ছিল Cat's Whisker, মানে বেড়ালের গোঁফ। এই সব নিয়ে আমি দিনরাত মত্ত ও ব্যস্ত থাকতাম। সুদূর কনট প্লেসের দুটি দোকান ছিল হার্ডওয়ার্ড রেডিও এবং কিটসন কোম্পানী। দুই দোকানের মালিকরা আমাকে একটু পছন্দও করতেন মনে হয় এবং ঐ সব জায়গা থেকে আমি মায়ের কাছে টাকা নিয়ে কিনে আনতাম রেডিওর ভাল্ভ আজকের ট্রান্সমিটার ও ইলেক্ট্রিক যুগে সব বাতিল, অবসলিট জিনিস। কিন্তু সেদিন কী আগ্রহ করে সাইকেলে কনট প্লেসে ও জিনিষ যত্ন করে ব্যবহার করেছি, তথাকথিত রেডিও লাউডস্পিকার দিয়ে ঘরে তৈরী রেডিও বানানোর সুখ্যাতি অর্জন করে পাড়ার বড়দের মহলেও।

চল্লিশের দশকের গোড়ার দিকে সাধনা বসু এলেন দিল্লীতে তাঁর নাচের অনুষ্ঠানের জন্য। রিগাল থিয়েটার যা দিল্লীর মতো জায়গায় একটি প্রশস্ত মঞ্চ ছিল; সেখানেই হবে, বিজ্ঞাপনে জেনেছিলাম, আর আমার রিগাল থিয়েটারের কর্তৃপক্ষের সঙ্গে একটু পরোক্ষ যোগাযোগ ছিল। সেই সুবাদে সাধনা বসু ও রিগালের কর্তারা আমাকে সাধনা বসুর নৃত্যের আলোক সম্পাতের দায়িত্ব দিলেন। আজ ভেবে দেখি তখন বোধহয় আমার বয়স সবে উনিশ-টুনিশই ছিল। এখন মনে হয় ওটা একটা দুঃসাহসের সঙ্গে করেছিলাম একটু বেপরোয়াভাবেই। আমার বন্ধুমহল তো বিশ্বাসই করেনি প্রথমে আমি করেছিলাম। এবং ওঁর নাচের একটি ছিল সাম্প্রতিক দুর্ভিক্ষের পটভূমিকায় 'ভুখ'। তাতে একটি ছায়ার দৃশ্য ছিল সারি ক্ষুধার্ত মানুষের মিছিল। আর আমার সম্পদের মধ্যে ছিল এক জোড়া অটোল্যাম্প। সেটি বোধহয় ইংরেজ আমলের কর্তারা বিদেশ থেকেই আনিয়ে ছিলেন, সেকালের সায়েবদের বিনোদনের উপকরণ হিসেবে। ওই অটোল্যাম্প দিয়ে তীব্র আলোর সহায়তায় ছায়া দৃশ্যগুলো কেমন নতুন একটা মাত্রা পেয়েছিল। সাধনা বসুও খুশী হয়েছিলেন, অবশ্য শেষ পর্যন্ত আমার বেশ কিছু টাকাও পাওনা ছিল যেটার অনেক চেষ্টা চরিত্র করে হাল ছেড়েও দিলাম।

আজ থেকে ঠিক পঞ্চাশ বছর, যখন আমি বহুরূপী, উৎপলদের এল টি জি, অনাদিপ্রসাদ প্রহ্লাদদাস বালকৃষ্ণ মেননদের সঙ্গে আলোর কাজ করি, কিছুটা নামটাম হল। একটা খবর

দিলেন দিল্লীর পুতুলদা (অনিল রায়চৌধুরী)। আমার বন্ধু সন্তোষ চৌধুরীর বড়ভাই এমনিতে পরিচিত সারদা উকীলের কৃতি ছাত্র পেন্টার হিসেবে। পুতুলদা মুষ্টিযুদ্ধও করে থাকতেন। তবে উনি নিজে উদ্যোগী হয়ে গড়ে তুলেছিলেন একটি সংস্থা All India Fine Arts & Crafts Society। তখনকার দিনে ইংরেজ বড়লাটদের ধরে উনি একটি ভাল জায়গা সংগ্রহ করেছিলেন এখনকার Old Mill Road (আজব ফিসার্স)। বলতে গেলে তালকটোরা রোডের প্রান্তে পার্লামেন্ট ভবন ও রেলভবন কৃষিভবনের ঠিক উল্টোদিকে ঐ জায়গাতে ছেচল্লিশ সালে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় আমেরিকানরা তৈরী করেছিল সারা নিউ দিল্লী জুড়ে এক ধরণের আধাপাকা অস্থায়ী বাড়ী যাকে বলা হত হাটমেন্ট (Hutment)। এই রকমেরই হাটমেন্টএ ছিল সেদিনের ওয়াভেল থিয়েটার। তা এই রফিমার্গে একটা বিরাট হাটমেন্টের অবস্থান ছিল, সেই জায়গায় একটি বাড়ী অনিল রায়চৌধুরীরা All India Fire Arts & Crafts Society (সংক্ষেপে আইফাক্‌স) জন্য সংগ্রহ করেছিলেন সেখানেই আমি দিল্লী ছাড়ার বছর অর্থাৎ ছেচল্লিশে দেখেছিলাম একটি প্রদর্শনী। নিকোলাস রোয়েরিকের আঁকা হিমালয়ে তুষারশ্রেণীর আলোছায়ার নানা সময়ে অপূর্ব সব ছবি, আমার মনে গভীর ছাপ ফেলেছিল এই সূর্যোদয়। চাঁদনী রাতে নানা সময়ের আলোকপাতে স্বপ্নলোকের জগত। আজো ভুলতে পারিনি সেই অনুভব।

আমার কাছে অনিল রায়চৌধুরী অনুরোধ করলেন এ হলের আলো ইত্যাদির জন্য কাজ করতে। তার সঙ্গে পাঠালেন বিলেতে স্ট্রাণ্ড ইলেক্‌ট্রিকের কাগজপত্র ক্যাটালগ ও ছবি। তারপর আমি দিল্লী থেকে পরিচিত হলাম মাদ্রাজের Crompton Grass-এর মিঃ বৈদ্যনাথনের সঙ্গে। ওঁরা স্ট্রাণ্ডের ভারতবর্ষীয় প্রতিনিধি। বৈদ্যনাথনের সঙ্গে তিপান্ন-চুয়ান্ন সালে আলোচনা করে আই ব্যাঙ্কের পরিকল্পনা বাস্তবায়িত হল ছাপ্পান্ন সালে। এই আইফ্যাকস হলই হল দিল্লী তথা সারা ভারতবর্ষের আধুনিকতম আলোর সরঞ্জাম সজ্জিত থিয়েটার। এ থিয়েটারের সূচনাকালে আমি আমার সহযোগীরা প্রায় দশ-বারো দিন অক্লান্ত পরিশ্রম করে তুললাম এবং পরে আইফ্যাক্‌স্ কর্তারা বিশেষতঃ অনিল রায়চৌধুরীর উদ্যোগে আইফ্যাকসের উদ্বোধন শম্ভু মিত্র নির্দেশিত বহুরূপীর রক্তকরবী নাটক দিয়ে। তার দু'বছর আগে নতুন দিল্লীরই সপ্রু হাউসে রক্তকরবী হয়েছে প্রথম সর্বভারতীয় নাট্যোৎসব, ভারতীয় নাট্য সংঘের ব্যবস্থপনায়। সেখানে বম্বের থিয়েটার ইউনিট ইব্রাহিম আলকাজীর পরিচালনায় ঈডিপাসরেক্স, দুর্গা খোটের মারাঠি নাটক 'পউ বন্দগী', দীনা গান্ধীর গুজরাটি মীনা গুজরী আরো কত নাট্য সমাবেশ হয়েছিল ওই সপ্রু হাউসের ছোট্ট কিন্তু নবনির্মিত প্রেক্ষাগৃহে। সবকিছু মিলিয়ে কিন্তু ওখানে শ্রেষ্ঠ প্রয়োগের সম্মান পেয়েছিল রক্তকরবীই। সেই রক্তকরবী এবারও আইফ্যাকসের Cartain Raiser বলে প্রভূত প্রশংসিত হয়েছিল।

এই আইফ্যাকস পরিচালনার ভার অর্থাৎ থিয়েটার স্টেজ আলো দেখাশোনার দায়িত্ব দিয়ে আমার প্রিয় সহকর্মী শীতাংশু মুখার্জিকে পাঠিয়েছিল এবং সীতাংশু দিল্লীর থিয়েটার তথা আইফ্যাকস-এর নাট্যাভিনয় রীতিমত বিস্ময়কর উন্নতি ও বিকাশের পরিচয় রাখল অল্পদিনের মধ্যে।

আজ দিল্লীতে অনেক মঞ্চ তৈরী হয়েছে। তার মধ্যে কোপার্নিকাস মার্গ-এ কামানী হল অন্যতম সেখানে শীতাংশু গোড়া থেকেই পরিকল্পনার সঙ্গে যুক্ত ছিল। পরেও কামানী হলের ম্যানেজারও হয়েছিল। আজ দিল্লী শহরে অনেক নতুন আধুনিক মঞ্চ তৈরী হয়ে গেছে—লিট্‌ল থিয়েটারের মঞ্চ থেকে এশিয়ান গেমস উপলক্ষে নতুন বিরাট থিয়েটার সিরিফোর্ট হল পর্যন্ত। এটির নির্মাণ পর্বে আমি ও শীতাংশু যুক্ত ছিলাম, যদিও ঐ থিয়েটার সব রকম বড় দেশী বিদেশী প্রযোজনার ব্যবহার হয়ে থাকে আজ। সেখানে শিল্পেরই প্রাধান্য বেশী এবং এখন ওর পরিচালনা ইন্টারফেস ব্রডকাস্টিং বিভাগের সরকারী খবরদারিতে।

স্বাধীনতার রজত জয়ন্তী উৎসব উপলক্ষে দিল্লীর প্রগতি ময়দানে অনেক কাণ্ডকারখানা হয়েছিল। সবচেয়ে প্রথমে আমার সঙ্গে কথা বললেন পশ্চিমবঙ্গ সরকারের নিযুক্ত সংস্থা। ওঁদের প্রাথকি আলোচনাও সম্পন্ন হল। পরে ক্রমে আমার কাছে আমার বন্ধু রণেন দত্তর কাছ থেকে এল শিপিং কর্পোরেশন ও স্টিল অথরিটির প্যাভিলিয়ন। কিন্তু সব থেকে বড়ো প্রস্তাব ও পরিকল্পনা এল সেই আনন্দ আস্তে ঝাকাল সংস্থা যার সঙ্গে শ্যাম বেনেগল ও প্রতাপ সেনও যুক্ত ছিলেন। এ মণ্ডপটি ওরা প্রায় তৈরী করেছিলেন সাঁচী স্তূপের মতো অর্ধগোলাকার তিনটি গোম্বুজের আকারে। প্রথমটিই প্রবেশ পথ সেখানে শ্যাম বেনেগল ভাবলেন মহাবিশ্বের গ্রহনক্ষত্র নীহারিকা ছায়াপথ ইত্যাদি নিয়ে বিজ্ঞানমনস্ক অন্ধকার একটি পরিবেশ। তার উপযুক্ত সঙ্গীতও রেকর্ড করেছিলেন বম্বের প্রখ্যাত বনরাজ ভাযিয়া। এই কৌতূহলোদ্দীপক কিন্তু কঠিন কাজের জন্য আমি শ্রীমতী সুমিত্রা চরতরামের শরণাপন্ন হলাম। তখন কামানী হল সবে তৈরী হয়েছে। সেই মঞ্চটি কয়েকটি দিন পরীক্ষা-নিরীক্ষা করতে পেয়েও গিয়েছিলাম। ওখানে শীতাংশু ও সহকর্মীদের নিয়ে আমার প্রাথমিক আজগুবি কতকগুলো কাণ্ডকারখানা করেছিলাম আর তারই ভিত্তিতে প্রগতি ময়দানে MMTCর প্যাভিলিয়নে ঢুকে অনেক কাজ সুরু করেছিলাম। প্রবেশপথের ঠিক পরই অন্ধকার গম্বুজের Space তারপর একটি ছোটখাটো সেতু (Bridge) তার নীচে অসংখ্য আয়না নানা আধারের নানা ভাবে সাজানো। ওপরে অন্ধকার গম্বুজের নানা ধরণের গ্রহনক্ষত্রের আলোছায়ার প্রক্ষেপণ দৃশ্য আর নীচের বালিতে সাজানো আয়নাগুলোতে তার বিচিত্র প্রতিফলন সবকিছু মিলিয়ে অন্ধকারে দর্শককে অন্য জগতে নিয়ে যেতে পারত কিছুক্ষণের জন্য। তারপর দ্বিতীয় ও তৃতীয় গোলার্ধে MMTCর বাণিজ্যিক প্রদর্শনী মডেল পর্ব ও স্লাইড। তখন সেদিনের কর্তৃপক্ষ ফিলিপসের জো জানসেন ও ভারতের বিখ্যাত স্থপতি ও শিল্পীদের একটি বিচারক গোষ্ঠি তৈরী করেছিলেন। তাঁদের প্রাথমিক ঘোষণায় ছিল Philips-এর তৈরী উপকরণ দিয়ে যাঁদের প্যাভিলিয়ন শ্রেষ্ঠ হবে তাঁদের বিশেষভাবে সম্মানিত ও পুরস্কৃত করা হবে। সে বিচারকদের রায়ে আমাদের MMTCই শ্রেষ্ঠ আলোক পরিকল্পনার সম্মান অর্জন করেছিল। যদিও আমাদের উপকরণের Philips-এ সরঞ্জাম অতি সামান্যই ছিল। প্রসঙ্গত বলে রাখি শ্যাম বেনেগল, প্রতাপ সেন আর শিল্পী সতীশ গুপ্ত MMTCর জন্য আরও পর পর কয়েক বছর ওঁরাই আলোক পরিকল্পনার সুবাদে শ্রেষ্ঠ নির্বাচিত হয়েছিলেন। আমার ছিল এই নতুন নতুন সৃষ্টির কাজের মুখ্য ভূমিকা। সে বছর প্রগতি ময়দানে আরও কয়েকটি প্যাভিলিয়ন

আমায় সামলাতে হয়েছিল কিন্তু শেষ মুহূর্তে পশ্চিমবঙ্গর কাজে আমাকে আর ডাকাও হয়নি। যদিও সে কারণে আমি সেকালের ৩ নম্বর হেইলী রোডে বঙ্গভবনে প্রায় দু'মাস ছিলাম। আজকের বঙ্গভবনের তুলনায় অনেক ছোট সাধাসিধে ছিল সে দোতলা বাড়ীটি। আমি দীর্ঘদিন সেখানে ছিলাম, আমার ঘরে একটি অস্থায়ী টেলিফোনও রাখতে হয়েছিল। আর আমার নিজের পশ্চিমবঙ্গ আমার প্রগতি ময়দানে দীর্ঘ তালিকা থেকে বাদ পড়ল আজ থেকে ঠিক তিরিশ বছর আগের কথা।

১৯৮২ সালে এশিয়ান গেমস উপলক্ষে দিল্লী সিরিফোর্ট অঞ্চলে দিল্লী ডেভেলপমেন্ট অথরিটির (DDA) ওপর দায়িত্ব হল গেমস ভিলেজ ও তৎসংলগ্ন এলাকায় বিরাট আধুনিক থিয়েটার গড়ে তোলার। সেই কাজে গোড়া থেকে সচদেব ও শীতাংশু ছিল। পরে আমাকেও ডেকে নেওয়া হল জরুরী তাগাদা পাঠিয়ে। শুনেছিলাম এটা নাকি রাজীব গান্ধীর উদ্যোগেই হয়েছিল। উনি তখন একজন সাংসদ আর ওঁর সমবয়স্ক অনেক ঘনিষ্ঠ বন্ধুরাও ওর সঙ্গী ছিলেন। আমি ওদের সদ্য তৈরী Task Force-এর সভ্য হয়ে গেলাম। এ উপলক্ষে অনেক পরীক্ষা-পর্যবেক্ষণের পর চূড়ান্ত হল, আলোর দেশী ও বিদেশী জিনিষপত্রের তালিকাও অর্ডার হয়ে গেল। আমিও দিল্লীর অশোকা হোটেলে পড়ে রইলুম কাজ শেষ করা ও গেমস-এর উদ্বোধন ও সারাদেশের থেকে আসা সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান সম্পন্ন করার জন্য।

সিরিফোর্ট থিয়েটারের লাইট নির্বাচনের সূত্রেই পেয়েছিলাম বম্বের কানারা লাইটিং-এর রমেশ শেনয়কে, সে বহু বছর আগে বম্বের Waslik Lighting-এর ডিন্সি ওয়াডিয়ার সঙ্গে সামান্য কাজ করতে, পরে ওয়াডিয়ার সাহায্যে ও নিজে উদ্যোগী হয়ে এই নিজস্ব প্রতিষ্ঠান Canara Lighting Industries গড়ে তোলে অন্য কয়েকজন সহযোগীকে নিয়ে। তার সঙ্গে আমি বম্বেতে গিয়ে দেখে এসেছি টাটার NCPA থিয়েটারের ওপরে তৈরী আলো সাজসরঞ্জাম। সত্যি সেগুলো একদম আন্তর্জাতিক মানের। সেই তখন থেকেই শেনয় আমার চেলা বনে গেল আক্ষরিক অর্থে। ১৯৮৩ সালে আমেদাবাদ থেকে আমন্ত্রণ পাই আসন্ন World Engineering Conferene-এ। একটি বিচিত্র প্রস্তাব আসে N. I. D (National Institute of Design, Ahmedabad)-র ওখানকার অধ্যাপক কুমার ব্যাসের কাছ থেকে।

NIDর সম্পর্কে আমি অনেক আগে থেকেই জানতাম। আমার বহুদিনের বন্ধু প্রয়াত রঘুনাথ গোস্বামী ও ওখানকার অন্যতম শিক্ষকশিল্পী দশরথ প্যাটেল আমার অনেককালের পরিচিত। NID সারাভারতেই একটি ব্যতিক্রমী প্রতিষ্ঠান। যেখানে Design সম্পর্কে অনেক বিষয়ই শেখানো হয় ছাত্র-ছাত্রীদের। কাঠের কাজ, টেক্সটাইল, অ্যানিমেশন শিল্প আরও কত যে বিভাগ এখানে আছে। সেই প্রতিষ্ঠান থেকে ডাক পেয়ে আমি রঘুনাথ গোস্বামীর সঙ্গে পরামর্শ করে NIC চলে গেলাম। অধ্যাপক কুমার ব্যাস আমাকে ওঁর চিন্তাভাবনা বলে বোঝালেন। এর আগামী সেপ্টেম্বরে দিল্লী প্রগতি ময়দানে এই বিশেষ প্রদর্শনীর উদ্বোধন হবে আন্তর্জাতিক শক্তি বিষয়ক সম্মেলন উপলক্ষে। রাতে আমি চিন্তাভাবনা করে আমার প্রাথমিক খসড়া কয়েকটি করে দিলাম সবাইকে। তার মধ্যে NIDর তদানীন্তন ডিরেক্টর অশেষ চ্যাটার্জীও ছিলেন। অবশ্য দশরথ প্যাটেল তখন NID ছেড়ে চলে গিয়েছিলেন। আমি তো

দশরথ প্যাটেল ছাড়া NID ভাবতেই পারি না।

ঠিক হল কিছুদিন পরেই আসব আমি আমার দলবল নিয়ে। NIDর প্রধান অফিসের পাশে একটি মাঝারী জায়গা নির্বাচন করলাম। নানারকম আলো ও শব্দ অ্যানিমেশন ফিল্মের প্রয়োগের পরীক্ষার পর একটা মাপজোক নিয়ে ফ্রেম পর্দা আলোর র‍্যাক নানা সাইজের স্ট্যাণ্ড ও কাঠের কাজের স্কেচও দিয়ে এসেছিলাম। ফিরতি পথে কানারার শেনয়-এর সঙ্গে একদিন সারা বম্বের দোকান কারখানা খোঁজ করে জিনিষপত্র বিচিত্র আয়না, স্বচ্ছ ও ঝাপসা ধোঁয়াটে কাচ রকমারী জিনিষ সংগ্রহ করলাম। ঘুরে ঘুরে অর্ডারও দেওয়া হয়েছিল। সেই দিনের তালিকা ও সব ফিরিস্তি আজও আমার কাছে রাখা আছে। IDর এ Energy Pavilion-এর জন্য লেখা লগবুকে লিখে রাখতাম স্কেচ ও ডিজাইনসহ যেমন লেখা আছে মলাটেই 9.6.83 to 17.9.83. 11.11.83 আর বম্বের সেই কেনাকাটার অভিযানে তালিকার তারিখ ছিল এগারোই জুন ১৯৮৩। এত গুছিয়ে আমি আর কোনওদিন করতে পেরেছি বলে মনে পড়ে না। NIDর কাজে আমার সঙ্গে সঙ্গীত অনুষঙ্গ সৃষ্টি করেছিলেন পুনের প্রখ্যাত ভাস্কর চন্দ্রাভারকর, শব্দ ও আলোর বিশেষ জটিল কাজ করেছিলেন Song & Drama Division-এর নরেশ বাজাজ। যাইহোক শেষ পর্যন্ত আমরা দিল্লী পৌঁছে গেলাম, কিন্তু হায় দিল্লীতে আমেদাবাদ ও বম্বের মালপত্র সড়ক পথে এসে পৌঁছতে অস্বাভাবিক দেরী হল। অনেকগুলো অলস দিন আমাদের বৃথা কাটল। ইতিমধ্যে প্রগতি ময়দানের Hall 7এ অনেক Student, দেখার গ্যালারী setup করে রেখেছি। শেষ পর্যন্ত সব জিনিষ ট্রাক করে হাজির হতে লাগল আমরাও সঙ্গে হাত লাগিয়ে কাজ সুরু করে দিলাম ওই বিচিত্র ureving Gallaeryর, সেই ছবি নক্সা ছাড়া কি করেই বা বোঝাই। এখনও ঐ Sketch আর নোটসগুলো দেখে উৎসাহিত হয়ে পড়ছি সেই কবে তিরাশি সালের কর্মব্যস্ত কাণ্ডকারখানার কথা ভেবে।

NIDর কাজের শেষদিন আমি আমার একান্ত অনুগত শেনয়কে একটি চেক দিলাম— সে কিছুতেই নেবে না বলে আমি যা শিখেছি জেনেছি তার দাম হয় না, অমূল্য। শেষে বাধ্য হল চেকটি নিতে বলল এ টাকা আমি খরচ করব না। এটি আমি বাঁধিয়ে রেখে দেবো। আমার এ পরম প্রাপ্তি।

কলকাতায় এত বছর আছি, সারা শহর জুড়ে তো কত কাজই করেছি, এমন কি পাঁচের দশকের সুরু কল্যাণীতে সদ্য গঠিত লোকরঞ্জন শাখার জন্য সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান 'মহাভারতী' ও 'যাত্রা হল সুরু' কাজ করি। অনেক দ্বিধা ও দোটানায় ছিলাম। কংগ্রেসের কাজ করব? শেষ পর্যন্ত আমার দুই দীর্ঘদিনের বন্ধু মৃণাল সেন ও নেপাল নাগ আমাকে রাজী করান যে পেশা হিসেবে এটা গ্রহণ করতে। তখন কল্যাণী তো ধূ ধূ মাঠ জলাজঙ্গল। ঐ নাট্য প্রচেষ্টার সঙ্গে যুক্ত ছিলেন মন্মথ রায়, পঙ্কজ মল্লিক জহর গাঙ্গুলী অনেকেই। তারপর অনেক বছর বাদে লবণ হ্রদ নামে এক বিশাল প্রান্ত। কংগ্রেসেরই কোন প্রকাশ্য অধিবেশনে কাজ করেছি বিনা দ্বিধায়—সেদিনের কল্যাণী ও সল্টলেক আজ তো জনপ্রিয় সম্ভ্রান্ত অভিজাত ঠিকানা। সেই সল্টলেকের পাশ দিয়ে কতবার দেখেছি নিকোপার্ক। কোনও দিনই মাথা ঘামাইনি ব্যাপারটা কী? তবে একবার নাট্যশোধ সংস্থানে সল্টলেকে যেতে নিকোপার্ক নিশানা হিসেবে

পেয়েছি। দু'বছর আগে ওদের পক্ষ থেকে একজন টেলিফোনে অনুরোধ করেন একবার যে ওঁদের নাকি কি একটা কাজ আছে। আমি যেতে রাজী হই। দেখি Nicco Park এক বিশাল জায়গা এতরকম ব্যাপার আছে এতরকম মজার Ride আছে জানতামই না। আমরা কেউই খবর রাখি না—খুব জনপ্রিয়, বড়দের ছোটদের খুব ভিড় হয়ে থাকে প্রতিদিনই। আমাকে ওঁরা দেখতে নিয়ে গেলেন। ওখানে একটি বিশেষ আকর্ষণ 'River Cave Ride' নদীগুহার যাত্রা প্রবেশ পথে কয়েকটি ছোট নৌকা আছে তাতে পাঁচ-সাতজন বসলে সেটি চলে যায় সামনে একটি অন্ধকার গুহার মধ্যে সেই সরু নদীর জলপথ দিয়ে—তারপর শুরু নানা শব্দের এফেক্ট সঙ্গে বিশেষ আলোর পরিকল্পনার মাঝে ছ'মিনিটে পথপরিক্রমা—বিচিত্র সব অনুভূতি। প্রথমেই একটি পরিবেশ, জুরাসিক যুগের আগ্নেয়গিরি। তারপর প্রাগৈতিহাসিক প্রাণী প্রায় জীবন্ত মডেল নড়া করছে, পরেই এসে যায় মিশরের প্রাচীন আবহাওয়া মমি টুটান খামেনের আকৃতি—আর একটু পরে দেখা যাবে এক গভীর জঙ্গলের পরিবেশ—তারপর একটি বিভীষিকার এলাকা Horror Chamber—শেষে আসে আগামী দিনে মহাকাশ যাত্রা রোবট আরও কত কি। সবই আলোছায়া ও ইলেক্ট্রিকের মায়া। প্রথম দর্শনে আমি তো অভিভূত। শুনলাম এখানে কর্তৃপক্ষ প্রায় বছর পাঁচেক আগেই এটি বানিয়েছেন এবং তখন আমার সাহায্য নেবার কথা ভেবেও সাহস করেননি। জানতে পারলাম বিলেতের একটি প্রতিষ্ঠান Black Pool প্রায় একশো পাঁচ বছরের প্রাচীন, তাঁরাই এটি তৈরী করেছেন। আমার প্রথম দর্শনের চমক ও বিস্ময় কাটিয়ে ওদের প্রয়োজনীয় পরিবর্তনের কথা জেনে কাজে নামলাম এবং আমার সঙ্গে সক্রিয় সহযোগিতা করেছেন পুণের এক বাঙালী ইলেক্ট্রনিক বিশেষজ্ঞ সি. কে. মুখার্জী। উনি বোধহয় প্রথমেও যুক্ত ছিলেন। যাইহোক ওঁর সঙ্গে নিকো পার্কের ইলেক্ট্রিসিয়ানদের সক্রিয় সহযোগিতায় এ রিভার কেভ রাইডে কিছু নতুনত্ব আনতে পেরেছিলাম। একাজে আমি সম্পূর্ণ সহায়তা পেয়েছি ওখানকার কর্মীমণ্ডলীর কাছে এবং বিশেষ করে আমার প্রধান সহকারী সুদীপ গাঙ্গুলীর থেকে। নিকো পার্ক যে এত বড়ো এত জনপ্রিয় কিছুই জানা ছিল না। আর রিভার কেভ রাইডটিই নাকি সবচেয়ে ভাল লাগার আকর্ষণের। একজনের টিকিট হল পঁচিশ টাকা যার থেকে দৈনিক আয় প্রায় এক লাখ টাকা। নিকো পার্ক ছাড়াও এর পাশে আছে নলবন সেটিও প্রথম দেখে হাঁ হয়েছিলাম। পরে ডঃ মঞ্জুশ্রী চাকী সরকার ও ডঃ পার্বতী সরকারকে জানাতে ওঁরা দেখে অবাক হয়েছিলেন।

এই নিকো পার্কের খবর দেখে আমার একজন ফোন করলেন এক আশ্চর্য কাজে এই কলকাতা শহরে আমার পার্ক স্ট্রিটের অফিস অদূরে তৈরী হয়ে সম্পূর্ণ হয়ে গেছে একটি বাড়ী সম্পূর্ণ কাঁচের ছ'তলা বাড়ী লিফ্‌ট, ক্যান্টিলিভার ছ'তলা পর্যন্ত। বারান্দা তাজ্জব কাণ্ড! আমাকে ওর আলোক পরিকল্পনা করে দিতে বলে একজন মিঃ রায়। ঠিক সত্যজিৎ রায়ের বিশপ লেফ্রয় রোডের কাছেই। উনি কিন্তু বঙ্গসন্তান নন, লাহোর থেকে এসেছেন। তারপর সন্ধ্যেবেলা দেখে অবাক হয়ে জানালাম এটা একটি চ্যালেঞ্জের কাজ-এর আমার পারিশ্রমিক অন্যান্য কথায় বলেন কিভাবে করবেন তাই বলুন আগে। আমার জবাব আমার চুক্তি করলে আমি ঐ স্বচ্ছ বাড়ীতে রাতের পর রাত কাজ করব, তারপর ঠিক কত টাকা লাগবে বলব।

তারপর কোনও সাড়া নেই। একদম চুপচাপ ভাবতে পারা যায় ফ্রান্স থেকে ইমপোর্ট করে কাঁচ আসছে, তাই দিয়ে তৈরীও হয়ে গেল আকাশছোঁয়া কাঁচের বাড়ী একটুকরো ইটও নেই। স্থপতি নাকি এ শহরের গোপাল মিত্র—যাঁর নাম শোনা আছে আমেরিকার ওয়ার্ল্ড ট্রেড সেন্টারের দৌলতে। এই রকমই আর একটি আমন্ত্রণ এল ক্যামাক স্ট্রিট ও পার্ক স্ট্রিট-এর সংযোগ স্থলে ন'তলার ওপরে একটি অতি আধুনিক বিনোদন কেন্দ্র হবে। দুটি বিশেষ লিফ্ট হুস করে একতলার থেকে সোজা উঠে যাবে সেই 9th floor-এর Magmusement সেন্টারে। ওঁদের আলোচনায় বিলেত থেকে দুবাই থেকে সব স্থপতি ডিজাইনাররা আমাকে বোঝালেন, সব শুনে বললাম আপনাদের প্রত্যাশা ও ভাবনাগুলো একটি কাগজে লিখে আমাকে জানিয়ে দিন আর আমার অফিসও আপনাদের এখান থেকে দুই ফার্লংও দূরে নয়। ব্যস তারপর প্রতিশ্রুত সোমবার চলে গেল। ঐ বিলেতের ও দুবাই-এর থেকে আসা বিশেষজ্ঞরাও সোমবার উড়ে ফিরে চলে গেলেন। আর কিছু জানি না।

গত বছরের শেষে আমার কাছে একটি দারুণ প্রস্তাব এল মহারাষ্ট্রের অজন্তা গুহার জন্য বিশেষ আলোক পরিকল্পনার। দিল্লী থেকে এক বঙ্গসন্তান প্রস্তাব নিয়ে এলেন। আমি ওঁদের জানিয়ে দিলাম আমার কন্ট্রাক্টরীর কাজ নয়, আমি পরিকল্পনা ডিজাইনার ও অ্যাডভাইসার হিসেবে কাজ করতে পারি, তবে তার জন্য প্রয়োজনীয় কাগজপত্র এই মর্মে দিয়ে দিলাম। ওঁরাও রাতারাতি বিমানে নাসিক ডিভিশনের CPWDকে জমা দেবেন বলে চলে গেলেন। আমিও খুব উৎফুল্ল, থিয়েটারের বাইরে প্রাচীন অজন্তা গুহার আলো এক চ্যালেঞ্জ। কিন্তু ডিসেম্বরের থেকে আজ এ বছরের শেষে ওঁদের কাছ থেকে সামান্য সৌজন্যমূলক খবরটুকুও পাইনি। আমি টেলিফোন করতে করতে হাল ছেড়ে দিয়েছি। শুনেছি অন্য কোন এজেন্সি এই কাজটি করেও দিয়েছে।

গত বৎসর আমাকে হলদিয়া উৎসবে কিছু করে দেবার জন্য লাইট সাউণ্ড প্রস্তাব নিয়ে এলেন সাংসদ লক্ষ্মণ শেঠের কাছ থেকে। ওঁদের প্রতিনিধি শ্রীমন্ত বসু এসে ওখানকার যে বর্ণনা দিলেন এবং হলদিয়া উৎসবের তারিখটি বলে দেওয়াতে আমি সোজা বলে দিলাম এটি লাইট সাউণ্ডের উপযুক্ত পরিবেশ নয় এবং একমাস দেড়মাসের মধ্যে এই প্রস্তুতি একেবারে অসম্ভব। উনি একটি সম্ভাব্য Scriptও নিয়ে এসেছিলেন সেইমতো। বিশেষ উৎসাহ পেলাম না। ওঁকে সোজাসুজি আমার অসম্মতি জানিয়ে দিলাম। উনি যখন উঠে চলে যাচ্ছেন তখন বললাম পরশু সকালে একবার আমাকে টেলিফোন করতে। উনি করেছিলেন। আমি বললাম যে জায়গাটি একটু দেখলে হয়তো কিছু ভাবতেও পারি। সেই মতো আমি সৌরভ দত্তকে নিয়ে তমলুক হলদিয়া চলে গেলাম। সৌরভের হাতে একটি ছোট ডিজিটাল ক্যামেরা ছিল সেটি একটি আশ্চর্য জিনিষ। প্রথমেই আমরা ভগ্ন তমলুক রাজবাড়ী ও মাতঙ্গিনী হাজরার ছবি বর্গভীমা মন্দির ও ক্ষুদিরামের আখড়ায় গেলাম। রক্ষিত বাড়ী—সেখানে ক্ষুদিরামের একটি মূর্তি আছে শহীদ ক্ষুদিরামের। মূর্তিটি এতই অন্ধকারে ছিল আমি বলেছিলাম ওতো ছবিই উঠবে না; সৌরভ (দুষ্টু) কিন্তু নাছোড়বান্দা সব ছবি নিল। তারপর আমরা হলদিয়ায় গিয়ে লক্ষ্মণ শেঠের সঙ্গে কিছু কথা বলে আরও কিছু কলকারখানার চিমনীর ছবি তুলে

ফিরলাম কলকাতায়। আমাদের পরে আবার যাবার কথা ছিল—ততক্ষণে আমরা সদ্য তুলে আনা ছবিগুলো দীপক দত্তর বাড়ীতে দেখলাম। ডিজিটাল ক্যামেরার ক্ষমতা টের পেলাম। অত অল্প আলোতে তমলুক রাজবাড়ী এমনকি ক্ষুদিরামের মূর্তিটি খুব ভাল এসেছে। আমরা আরও উৎসাহের সঙ্গে নির্দিষ্ট দিনের আগেই চলে গেলাম তমলুক তথা হলদিয়া বন্দর। ওঁদের সকলের সহযোগিতা সম্ভব করতে পেরে নানা ছায়াদৃশ্যের সঙ্গে ওই ভিডিও এডিট করে বারো মিনিটের আলোছায়া প্রোগ্রাম—ওঁরা আগে নামকরণ করেছিলেন 'বন্দর থেকে বন্দর' মানে প্রাচীন তমলুক বন্দরকে বর্তমানের আধুনিক হলদিয়া বন্দর। আমি সম্পূর্ণ eventটি দেখে নাম দিলাম 'বন্দরের আলোয়'। ওঁরাও খুশী হয়েছিলেন। সত্যি কথা বলছি হলদিয়া উৎসব যে এই স্পেলে হয় এত এত জনসমাবেশ হয় আমার ধারণাও ছিল না। সৌরভের ছবি তোলা সুরেশ দত্তর আমাকে যান্ত্রিক সহায়তা আর দেবাশিস বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গীত রেকর্ডিংএ ব্যাপারটা বেশ জমে গিয়েছিল এবং উপস্থাপনার জন্য হলদিয়া উৎসব কমিটি একটি বিশেষ ধরণের মঞ্চও তৈরী করে দিয়েছিলেন আমার নক্সা অনুযায়ী।

ইতিমধ্যে আমি আমার দীর্ঘ দিনের শ্রদ্ধেয় বন্ধুর সঙ্গে দুটি মনে রাখার মত কাজ করেছি দুটিই সরকারী Song & Drama Dimension-এ উদ্যমে। একটি হল রবীন্দ্রনাথের 'দেবতার গ্রাস' অবলম্বনে বীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্রের আবৃত্তি ভি. বালসারার সঙ্গীত ও শম্ভু ভট্টাচার্যের নৃত্য পরিকল্পনায়। এখানে আমরা ক'জন প্রাচীন মিলেছিলাম সরকারী বিভাগের উৎসাহী শ্রীমতী ভাস্বতী পালচৌধুরী ও নেপাল নাগের অক্লান্ত পরিশ্রম উৎসাহে। বাইরে সরকারী ডিপার্টমেন্ট এই মানের সৃজনশীল কাজ কখনই সম্ভব হত না। সমস্ত ব্যাপারটাই নাকি কাহিনীর ভাষা মঞ্চের প্রতীকী নৌকাযাত্রার আভাসে একটি স্মরণীয় প্রয়োগ। সম্প্রতি খালেদের ভাবনায় কুমার রায় আবার নতুন খসড়া করে দিলেন উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরীর 'গুপী গাইন বাঘা বাইন'। খালেদই চেয়েছিল এইটি সত্যজিৎ রায়ের সেই অপূর্ব সিনেমার আদল থেকে সম্পূর্ণ আলাদা হয়। কুমারের Script সেই দিক থেকে যেন সম্পূর্ণ স্বতন্ত্রই হয়েছে। আর ওই আধ ঘন্টার প্রয়োগের জন্য দু'মাস ধরে খেটে এই তিরাশী বছরের তরুণ খালেদ এক মাসের উপর নির্দিষ্ট মনে পোষাকমঞ্চ পরিকল্পনা রিহার্সাল দেওয়ানোর জন্য একটানা নিরবিচ্ছিন্ন কাজ করেছে মনপ্রাণ ঢেলে। শরীর ঠিক সুস্থ নয়, দৃষ্টিশক্তিরও বেশ অসুবিধে তা সত্বেও কেমন নিপুণ হাতে নানা রঙে গুপী, বাঘা, হাল্লার রাজা, শুণ্ডীর রাজা ও মজাদার ভূতেদের সুন্দর ডিজাইন করেছে। তৈরী হবার পর পরীক্ষা করে দেখেছে। তড়িৎ চৌধুরীর সঙ্গীত গুপীর গানে। সবকিছুতে সতর্ক, মন দিয়ে দেখলাম এই মানুষটিকে। সেই রক্তকরবীর থেকে আজ পর্যন্ত কত যে কাজ ওর সঙ্গে করেছি—মানুষ হিসেবেও একদম স্বতন্ত্র আমাদের সকলের থেকেই।

নতুনদের মধ্যে অনেকেই বেশ ভাল প্রয়োগ করছেন। তবে আমি আধা নবীন একজনের সঙ্গে কাজ করলাম—মেঘনাদ ভট্টাচার্য। তার সাম্প্রতিক বধ্যভূমে একটি টোটাল থিয়েটারের সার্থক উদাহরণ রেখেছে। নাচের ক্ষেত্রে অনেকেই কাজ করতে চেষ্টা করছেন নতুন ভাবনায় তারই মধ্যে অনীতা মল্লিক এবং সবশেষে মধুবনী চ্যাটার্জির কাজ উল্লেখযোগ্য। চিত্রাঙ্গদা

অবলম্বনে 'অন্য আমিতে'ও বেশ সাহসের পরিচয় দিচ্ছে।

অনেক না হওয়া ঘটনার কথা আগেই বলেছি, Non event! এবার শেষ করব। আজকের বিশ্বখ্যাত জগমোহন ডালমিয়া আমাকে কয়েক বছর আগে এখানে ইডেন উদ্যানে আসন্ন ক্রিকেট অনুষ্ঠানের জন্য ডাকেন। একজন এক্সপার্টকে বিদেশ থেকে (বোধহয় আমেরিকা) আমন্ত্রণ জানিয়েছেন ইডেনের উদ্বোধন অনুষ্ঠানে আধুনিক প্রযুক্তির লেসার (Laser) আলোর সাহায্যে চমকপ্রদ কিছু করার জন্য। আমি নির্দিষ্ট দিনে গেলাম। সেই সাহেবের সঙ্গে কথা বললাম। প্রাথমিক কিছু কথার পর ওঁকে জানালাম, ঐ আলোকসজ্জার বিশেষত্ব মনে রেখে পরদিন আমার বক্তব্য রাখব আলোর মায়াতে ভারতীয়ত্ব রাখার বিষয়ে। উনি বলেছিলেন ওঁর সময় হচ্ছে না, আমি তখন বলেছিলাম না হয় আমিই ওঁর সঙ্গে হোটেলে গিয়েই কথা বলব—তাতে উনি রাজী হলেন না—বললেন তখন ওঁর বিমান ধরার তাড়া থাকবে। অগত্যা কিছুই হল না। সাহেব এলেন দূর থেকে উড়ে, এত খরচপত্র, কিন্তু একদিনের মধ্যেই ফিরে চলে গেলেন। আমিও আর কোন খবর পাইনি। দু'বছর পরে আবার বিরাট ক্রিকেট সমারোহ আমি হায়দ্রাবাদে বসে টিভিতে দেখে হতাশই হয়েছিলাম। খবরের কাগজ পড়ে দেখলাম এবারের বিশেষ আলোকশিল্পী ইতালীর লুনেত্তা সাহেব, কিন্তু কি দুর্ভাগ্য আচমকা গঙ্গার হাওয়া এসে সবকিছু ওলোটপালোট করে পুরো আয়োজনটাই ভণ্ডুল করে দিল। ভাগ্যিস আমি এই কর্মকাণ্ডের সঙ্গে যুক্ত ছিলাম না, তবু অনুমান করি, এই আয়োজনে অনেক কিছু ভাবা হল কিন্তু ফল একেবারেই নৈরাশ্যে ভরা। আধুনিক প্রযুক্তিতে অনেক উপকরণ আজ হাতে এসেছে। ফোন পেজার ফ্যাক্স মোবাইল থেকে ওই ডিজিটাল ছোট্ট ক্যামেরা এবং সর্বশেষে জানলাম কম্পুটার সহযোগে L. C. D Projector অর্থাৎ লিকুইড ক্রিস্টাল ডিসপ্লে (Liquid Crystal Display) ছোট্ট এই যন্ত্রের কাজকর্ম সেদিন হাতে কলমে দেখলামও বটে। অবাক তো প্রতিদিন প্রতি মুহূর্তেই হচ্ছি। টিভির চ্যানেল বদলানোর জন্য ছোট্ট একটি হাতিয়ার রিমোট কন্ট্রোলটি দিয়ে ইচ্ছেমতো দিল্লী নিউ ইয়র্ক যা খুশী চ্যানেল বদলানো যায় টিভির যন্ত্রের থেকে দূরে বসে দশ-বারো হাত দূরত্বে থেকে টিভি পর্দা একটুও না ছুঁয়ে। সকলের কানে পথে ঘাটে বিমানে রয়েছে সেল ফোন। এইটুকু ছোট্ট একটি দেশলাই বাক্স যা সিগারেটের প্যাকেটের সঙ্গে তুলনীয় তার কি অসীম ক্ষমতা। সব কিছু হাতের নাগালে। সেই চল্লিশ বছর আগের ক্রিস্টাল হেডফোনও অতীত কাহিনী আজকে। আমাদেরও আধুনিক টেকনোলজিকে অন্য সবকিছুর সঙ্গে ব্যবহার করতেই হবে। চশমা মাইক্রোফোন ফিল্ম ভিডিও টিভি সমস্ত কিছুতেই আয়ত্ব করতে হবে, আর আমার মতো কৌতূহলী আগ্রহী মানুষের জন্য এমন একটি পরীক্ষা-নিরীক্ষার জন্য উপযুক্ত জায়গা চাই যাতে স্পটলাইট ডিমারের মতো ব্যবহার শ্রদ্ধেয় সতু সেন যা বাংলা তথা ভারতের মঞ্চে প্রথম সাহস করে প্রবর্তন করেছিলেন সেই তিরিশের দশকে কলকাতারই একটি থিয়েটারে মহানিশা নাটকে। সেই মহানিশার মঞ্চ আরও অনেক থিয়েটারের মতই আগুনে পুড়ে ছাই হয়ে গেল চোখের সামনে। তবু আমি আশাবাদী, সব অসুবিধে অভাব মেনে নিয়েই আমিও সতু সেনের দৃষ্টান্ত মনে রেখে কাজ করেছি গত শতাব্দীর অনেক বছর ধরে দিল্লী বম্বে আর এই কোলকাতায়।

গিরিগুহা হাসপাতাল

ইউয়ে ওয়েন (চীন)

অনুবাদ : অর্ধেন্দু বিশ্বাস

যখনই আমরা পুরানো কমরেডরা য়্যালোপিং গ্রামের কথা তুলতাম, তখনই গিরিগুহা হাসপাতালের ছবি আমাদের স্মৃতিতে জেগে উঠত। বৃদ্ধ থেকে ছোট্ট মেয়েটিকে পর্যন্ত যদি হিসেবের মধ্যে ধরা যায়, তবে সেই হাসপাতালের কর্মীসংখ্যা ছিল কয়েক শত। তবুও বলতে হয়, প্রকৃত কর্মীর সংখ্যা এখানে ছিল নিতান্তই কম। তার কারণ একমাত্র দল-সম্পাদক, সিস্টার সুয়ে-লিয়েনই ছিলেন সেখানে একাধারে 'ডাক্তার আর ওষুধের যোগানদার'। চিকিৎসার যন্ত্রপাতি আর চিকিৎসা পদ্ধতির কথাই যদি বল, তাহলে বলতে হয়—এসব ছিল একেবারেই প্রাথমিক স্তরের। আমাদের কমরেড বন্ধুরা এই কয়টি কথায় হাসপাতালের সামগ্রিক চিত্রটি তুলে ধরত :

'গুহাই আমাদের চিকিৎসা-গৃহ
পাথরকুচি আর পাথরের চাঁই আমাদের শয্যা,
লবণ-জল আমাদের বোরিক-অ্যাসিড,
ভোজ্য উদ্ভিদ আমাদের খাদ্য।'

উপযুক্ত শিক্ষিত চিকিৎসক, প্রকৃত ওষুধপত্র আর খাদ্যের অভাব—এই ছিল আমাদের হাসপাতালের অবস্থা। তবুও তাপিয়ে পার্বত্য অঞ্চলের তিন বছরের গেরিলা যুদ্ধের সময় এই হাসপাতালেই শত শত আহত আর অসুস্থ সৈনিককে চিকিৎসা করে সুস্থ করে তুলে পুনরায় তাদের যুদ্ধক্ষেত্রে পাঠিয়ে দেওয়া সম্ভব হয়েছিল।

১৯৩৪-এর শীতকালে আমাদের লাল ফৌজের উত্তর বাহিনীকে প্রতিহত করবার জন্য চিয়াং-কাইশেক তাঁর কয়েক ডজন সৈন্যবাহিনীকে পাঠিয়েছিলেন। এই অগ্রসরমান সৈন্য শত্রু-বাহিনীর ৭৩নং বিভাগটিকে ওয়েন-চিয়া নদীর তীর বরাবর দ্বিধাবিভক্ত করে ফেলবার জন্য আমাদের বাহিনীকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল। আমরা সমানে তিন দিন তিন রাত্রি ওদের সঙ্গে লড়াই করেছিলাম। এর ফলে শত্রুপক্ষ আর এক পাও এগিয়ে আসতে পারেনি। এই যুদ্ধে ডান পায়ের জঙ্ঘায় আমি চোট পাই। আরও পনেরো জন আহত সৈনিকের সঙ্গে আমাকেও য়্যালোপিং গ্রামে নিয়ে আসা হয়। আমরা সেখানে পৌছালে পর, সেখানকার 'শহর-কৃষক-সমিতি'র চেয়ারম্যান চাচা চিং-শ্যান্ আর স্থানীয় প্রতিরোধ-বাহিনীর সহনেত্রী সিস্টার সুয়ে-লিয়েন আমাদের দেখতে আসেন।

এখন এটা একটা মস্ত বড় চ্যালেঞ্জের দিকে গড়িয়ে যাচ্ছে বলে আমার ভয় হচ্ছে। চাচা চিং-শ্যান্ বললেন সিস্টার সুয়ে-লিয়েনকে।

ও তুমি কিছু চিন্তা করো না, উত্তরে চিং-শ্যান্‌কে বললেন সুয়ে-লিয়েন, যেমন করে হোক এর একটা ব্যবস্থা আমরা নিশ্চয়ই করব।

তারপর এক সময় চাচা চিং-শ্যান্ চলে গেলে, আমাদের ক্ষত পরিষ্কারের ব্যাপারে ভাতের ফ্যান তৈরি করবার জন্য বেশ হৈচৈ-এর সঙ্গে সিস্টার সুয়ে-লিয়েন জল ফোটাতে লাগলেন। অল্প সময়ের মধ্যেই তিনি বেশ দক্ষতার সঙ্গে অবস্থা আয়ত্তে এবং সব কিছুতে শৃংখলা ফিরিয়ে আনলেন। আমি এতে বিস্মিত হলাম না, কারণ, বাহিনীতে থাকতেই আমি শুনেছিলাম, সিস্টার সুয়ে-লিয়েন 'দেশরক্ষী-বাহিনী'র মোটেই একজন সাধারণ মহিলাকর্মী নন।

ঘণ্টা দুয়েকের একটু বেশি সময়ের মধ্যেই তিনি বোলোজন অসুস্থ ও আহত সৈনিকের জন্য খাবার আর হাত-পা ধোয়ার জন্য যথেষ্ট গরম জল তৈরি করে ফেললেন। আগুনের চুল্লীর ভেতর একখণ্ড পাইন কাঠ ঢোকাতে ঢোকাতে তিনি তাঁর ছড়িয়ে-পড়া চুলগুলি পেছনের দিকে ঠেলে দিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, তোমাদের মধ্যে চাও তাং-চেং কার নাম?

আমি বললাম, আমার নামই চাও তাং-চেং।

আমি তাঁর প্রশ্নের উত্তর দেবার সময়, তাঁকে বেশ ভালোভাবেই দেখে নিলাম। মাঝারি উচ্চতার প্রায় সাতাশ বছর বয়সের মহিলা; বড় বড় উজ্জ্বল দুটি চোখে বুদ্ধি আর দৃঢ় প্রত্যয়ের ছাপ।

তিনি আমার কাছে এগিয়ে এসে বললেন, তুমি তো একজন অভিজ্ঞ কমরেড, এখানে কিভাবে আমরা থাকব, এস, সে বিষয়ে তোমার সঙ্গে আলোচনা করা যাক।

আমি তাঁর কথায় সায় দিয়ে বললাম, তিনি যা ভালো বুঝেছেন, সেই ভাবেই আমরা চলব।

এখানকার অবস্থা খুবই খারাপ, তিনি বলতে লাগলেন, এখানে থাকতে তোমাদের খুবই অসুবিধা হবে। প্রত্যেক মুক্তিযোদ্ধার ঘরে দুজন করে থাকবার ব্যবস্থা করি না কেন, তাহলে আমাদের প্রয়োজনমত ঘরের সংকুলান হয়ে যাবে।

আমি তাঁর কথায় সায় দিয়ে বললাম, এতো খুব ভাল কথাই।

এই ব্যবস্থামত একজন আহত কমরেড—সবাই যাকে ডাকত 'ফ্যাটি' বলে—সে আর আমি সিস্টার সুয়ে-লিয়েনের ছোট্ট তিন খোপের ঘরটিতে আশ্রয় নিলাম।

সেই সময় ওষুধের অভাবটাই ছিল আমাদের বড় সমস্যা। কয়েক দিন পরে ওষুধের গাছ-গাছড়া সম্বন্ধে ভালোভাবে জানাশোনা আছে, এমন কয়েকজন বৃদ্ধ কৃষকের সঙ্গে আলোচনা করে সিস্টার সুয়ে-লিয়েন যথেষ্ট পরিমাণে ওষুধের গাছ-গাছড়া সংগ্রহ করে নিয়ে এলেন। এইগুলি তিনি এনেছিলেন ক্ষতের ব্যথা, শরীরের তাপ কমাবার এবং আরও কিছু চিকিৎসার কাজের জন্য। এই গাছ-গাছড়াগুলি সত্য সত্যই আমাদের চিকিৎসা-সংক্রান্ত অনেক সমস্যার সমাধান করে দিয়েছিল। কিন্তু আমার হাঁটুর ক্ষতের ক্ষেত্রে এর কোনোটিই কাজে লাগল না। হাঁটু ফুলতে ফুলতে শেষ পর্যন্ত বেলুনের মত হয়ে গেল।

একদিন সকালের খাবার খেয়ে আমাদের কিছু না বলেই সিস্টার সুয়ে-লিয়েন বেরিয়ে গেলেন। তারপর মারকিউরোক্রোমের একটা ছোট বোতল আর পচন নিবারক কিছু মলম

নিয়ে তিনি দুপুর নাগাদ ফিরে এলেন। আমি ভালোভাবেই জানতাম, এইগুলি একমাত্র শত্রুকবলিত এলাকা থেকেই সংগ্রহ করা হয়েছে; কিন্তু সে সব এলাকা তো এখন অবরোধ করে রাখা হয়েছে। এই সব জিনিস নিয়ে কাউকে অবরুদ্ধ এলাকা পার হতে দেখলেই তার মাথাটা আর আস্ত থাকবে না।

আমি তাই খানিকটা অবাক হয়েই বললাম, এ ব্যাপারে খুব বেশি ঝুঁকি নেওয়া হয়েছে কিন্তু।

তুমি কিছু ভেবো না, সিস্টার সুয়ে-লিয়েন ফিসফিস্ করে আমাকে বললেন, শত্রুরা কি সব জিনিসই দেখতে পায়?

আমি পরে চাচা চিং-শ্যানের কাছ থেকে সমস্ত ব্যাপারটা জেনেছিলাম :

সিস্টার সুয়ে-লিয়েন বাঁকে করে দু'ঝুড়ি কাঠ-কয়লা নিয়ে শত্রুকবলিত এলাকায় গিয়েছিলেন। সেখানে তিনি এই কাঠ-কয়লাগুলি বিক্রি করে সেই টাকায় তাঁর আত্মীয়াকে দিয়ে সেখানকার শহরের এক ওষুধের দোকান থেকে এই ওষুধগুলি কিনিয়ে আনান। তারপর একটা ঝুড়ির -খড়ের দড়িগুলি খুলে ফেলে ঝুড়ির বাঁশের খোলের মধ্যে ওষুধগুলি ভরে নিয়ে খড়ের দড়িগুলো দিয়ে আবার ঝুড়িটা বেঁধে নেন। এই অবস্থায় যখন তিনি শত্রু এলাকা পার হচ্ছিলেন, পাহারাওয়ালা দেখে, যে-মেয়েটি কাঠকয়লা নিয়ে ভেতরে গিয়েছিল, খালি ঝুড়ি দুটো নিয়ে সেই মেয়েটিই ফিরে এসেছে, তখন তাকে সন্দেহ না করেই এলাকা পার হতে দেয়।

একদিন মুক্তিযুদ্ধের প্রধান ঘাঁটি থেকে সিস্টারের কাছে কিছু নির্দেশ আসে। সেই নির্দেশে বলা হয়, কেউ একজন তাদের সঙ্গে বিশ্বাসহন্তার কাজ করেছে এবং এই জন্যই নিরাপত্তার কথা ভেবে যত তাড়াতাড়ি পারা যায়, আহত আর অসুস্থদের যেন অন্য কোনো আশ্রয়ে নিয়ে যাওয়া হয়। সেই দিন রাত্রেই চাচা চিং-শ্যান্ আর সিস্টার সুয়ে-লিয়েন সিস্টারের কুটিরের পেছনেই একটা গিরিগুহায় আমাদের নিয়ে এলেন। সেখানে সতর্কতামূলক ব্যবস্থা হিসেবে সিস্টার আর গ্রামের 'কৃষক সমিতি'র কর্মীরা আমাদের পাহারায় থাকলেন।

দুপুরের আগেই একশোরও বেশি কুয়োমিন্ট সৈন্য গ্রামটি আক্রমণ করে। ঘরের আসবাবপত্র ভেঙেচুরে আর অন্যান্য জিনিসপত্র এলোপাথাড়ি ছিটিয়ে ফেলে তারা তাদের অনুসন্ধান চালায়। তারপর তারা মুরগিগুলিকে ধরে আর শূকরগুলিকে টেনে-হিঁচড়ে টেনে নিয়ে যায়। জায়গাটিতে খুব গোলমাল হচ্ছিল, কিন্তু সে বিষয়ে তাদের কোনো হুঁশই ছিল না। প্রতিশোধের শেষ চিহ্ন হিসেবে গ্রাম ছেড়ে যাবার আগে তারা সিস্টার সুয়ে-লিয়েনের কুটিরটিকে আগুনে পুড়িয়ে ছাই করে দিয়ে যায়।

এ ব্যাপারে আমি এত বেশি ক্রুদ্ধ আর উত্তেজিত হয়ে পড়েছিলাম যে তক্ষুণি ছুটে গিয়ে খালি হাতেই দুশ্‌মনদের সঙ্গে লড়াই করতে চাইছিলাম আমরা। আমাদের মনের কথা জানতে পেরেই যেন সিস্টার সুয়ে-লিয়েন আমাদের শান্ত করেন। তিনি বললেন, মোটেই এইসব ভাববে না। দুশ্‌মনরা আমার কাঁচা বাড়িটাই পুড়িয়ে দিতে পারে, কিন্তু তারা কখনই

আমাদের মনের জোর আর বিপ্লবী প্রত্যয় কিংবা লালফৌজের সঙ্গে আমাদের দৃঢ় বন্ধন ও সম্পর্ক ধ্বংস করতে পারবে না।

তখন থেকেই গিরিগুহা হাসপাতালে আমাদের নতুন জীবন শুরু হল।

শত্রুপক্ষ যত বেশি আমাদের উপর অত্যাচার চালাতে লাগল, য়্যালোপিং গ্রামবাসীরা ততই বেশি করে আমাদের দেখাশোনা করতে লাগল। যখনই আমাদের খাদ্যের অভাব হত, তখনই তারা ছোট ছোট কলসিতে লুকিয়ে রাখা তাদের বীজ-শস্যগুলি আমাদের দিয়ে যেত; কখনও বা তারা সেগুলি পেষাই করে বড় বড় কেক তৈরি করে আমাদের গিরিগুহায় পাঠাতে লাগল। যখন তাদের বীজ-শস্যগুলি শেষ হয়ে গেল, তখন তারা পাহাড়ি অঞ্চলে গিয়ে মাটি খুঁড়ে ফার্ণগাছের মূলগুলি সংগ্রহ করে, সেগুলি পেষাই করে আমাদের দিয়ে যেতে লাগল। আর ওগুলির বাকি অংশ যা পড়ে থাকত, সেগুলি ওরা নিজেরা খেত।

একদিন প্রায় সত্তর বৎসর বয়সের এক দরিদ্র বৃদ্ধ কৃষক মুরগির স্যুপ নিয়ে আমাদের গুহায় প্রবেশ করল।

তোমাদের জন্য গরম স্যুপ নিয়ে এসেছি, কমরেড, সে বলল, এটুক ছাড়া ভালো খাবার বস্তু আমার কাছে আর কিছুই নেই। কুয়োমিন্টরা আমাদের সব কিছু কেড়ে নিয়েছে।

উদ্বেগের সঙ্গে আমি তাঁকে জিজ্ঞেস করলাম, শ্রদ্ধেয় কমরেড, ডিম দেবার জন্য যখন তোমার আর কোনো মুরগিই নেই। তাহলে এখন নুন সংগ্রহ করবে কি করে?

ওঃ, সে যা হয় কিছু একটা হবে, সে উত্তর দিল, এই সময় তোমাদের কথাই আমরা প্রথম ভাবি।

তার এই জবাব শুনে আবেগে একটা কথাও আমরা বলতে পারলাম না। ছলছল চোখে ওই বৃদ্ধটির প্রতি আমরা শুধু চেয়েই রইলাম।

এর কিছুদিন পরেই শত্রু-সৈন্যরা এই পাহাড়টাতেই অনুসন্ধান শুরু করল। জীবনের ঝুঁকি নিয়ে গ্রামবাসীরা আমাদের তাদের কাঁধে নিয়ে নিয়ে কাঁটা-ঝোপ মাড়িয়ে গুহা থেকে গুহায় ফিরতে লাগল।

আমার ঠিক মনে আছে—তখন আমরা সাতজন মাত্র সেই হাসপাতালে আছি। বাকি সকলকে চিকিৎসার পর ছেড়ে দেওয়া হয়েছে; তারা তাদের নিজ নিজ বাহিনীতে যোগ দিয়েছে। এই সময় বসন্তের প্রথমদিকে একদিন বিকেলে চাচা শ্যানের বারো বছরের একমাত্র কন্যা সিয়াও-লিন্ যখন আমাদের পাহারায় ছিল, তখন হঠাৎ সে অল্প দূরে পাহাড়তলিতে অস্পষ্ট হৈচৈ-এর শব্দ শুনতে পেল। একটুখানি নীচের দিকে গিয়ে ভীতসন্ত্রস্তভাবে সে দেখতে পেল, কুয়োমিন্টরা খুব ত্রস্তভাবে গোপন অনুসন্ধান চালাচ্ছে! সে ভালোভাবেই জানত, এখন আর ছুটে গিয়ে তার লালফৌজী চাচাদের সাবধান করা যাবে না; কেন না, ছুটতে শুরু করলেই শত্রুসৈন্যরা তার পেছনে তাড়া করবে। আবার চিৎকার করেও তাদের সাবধান করা যাবে না; তাহলে তারা তাদের গোপন আস্তানাটা জেনে ফেলবে।

এমন সময় কুয়োমিন্ট সৈন্যরা তাকে দেখে ফেলে আর চিৎকার করে বলে, এ মেয়েটা, তুমি এক পা-ও নড়বে না।

মেয়েটা তখন মরিয়া হয়ে একটা কিছু করতে চাইল। সে গিরিগুহার বিপরীত দিকে দৌড়তে দৌড়তে চিৎকার কতে লাগল—কুয়োমিন্টরা পাহাড়ে এসেছে, ওরা জোর খানাতল্লাসী চালাচ্ছে!

মেয়েটির এই চিৎকারে সৈন্যরা রেগে গিয়ে তাকে তাড়া করল। মেয়েটি খুব দৌড়তে পারত, তাই সৈন্যরা তার নাগাল পাবার আগেই দৌড়তে দৌড়তে সে সামনে একটা পাহাড়ি নদীর জলে ঝাঁপিয়ে পড়ল। সৈন্যরা যখন বুঝতে পারল ওকে আর ধরা যাবে না, তখন তারা ওকে লক্ষ্য করে গুলি ছুঁড়ল; দুটো গুলি গর্জে ওঠে, আর এতেই সিয়াও-লিনের কণ্ঠস্বর চিরদিনের জন্য স্তব্ধ হয়ে যায়।

রাত্রিবেলায় আমরা সিস্টার সুয়ে-লিয়েনকে চাচি শেনের বাড়িতে গিয়ে তাকে সান্ত্বনা দেওয়ার কথা বললাম, কিন্তু বিস্ময়ের সঙ্গে দেখলাম, তাঁর যাওয়ার আগেই চাচি শেন রোজকার মত আজকেও আমাদের জন্য ফার্ণমূলের গুঁড়ো দিয়ে তৈরি রুটি নিয়ে প্রায় টলতে টলতে হাসপাতালে এসে উপস্থিত হয়েছেন।

আমার আসতে দেরি হওয়ায় আমি খুব দুঃখিত, কমরেড, চাপা গলায় তিনি বললেন, নিশ্চয়ই তোমাদের খুব ক্ষুধা পেয়েছে?

"চাচি,..." আমরা আর কথা বলতে পারলাম না, সবাই কেঁদে ফেললাম।

চাচি তাঁর পোশাকের একটা প্রান্ত দিয়ে তাঁর দু'চোখ মুছে আমাদেরই সান্ত্বনা দিতে লাগলেন, তোমরা কেঁদ না, সাতটি প্রাণের জন্য একটি প্রাণ উৎসর্গের মত গৌরবের আর কি আছে, বল।

অল্পদিনের মধ্যেই গ্রীষ্মকাল এসে পড়ল। আমার একটা পা চিরতরে খোঁড়া হয়ে গিয়েছিল বলে, পার্টি আমাকে এখানে থেকে সিস্টার সুয়ে-লিয়েনের সহকারী হিসেবে হাসপাতালের কাজ চালিয়ে যেতে নির্দেশ দিয়েছিল। এই সময়টাতে লড়াইটা চরমে উঠেছিল। অল্প কিছুদিন পরে চাচা চিং-শ্যান্ আবার ফিরে এলেন আমাদের গিরিগুহা হাসপাতালে, সঙ্গে নিয়ে এলেন আঠাশ জন অসুস্থ আর আহত কমরেডকে।

তিনি সিস্টার সুয়ে-লিয়েনকে বললেন, তুমি কি নিশ্চিতভাবে এদের ভার নিতে পারবে?

নিশ্চয়ই, তাঁকে আশ্বস্ত করে সিস্টার বললেন, যদি দিনের বেলায় তেমন সময় না পাই, তাহলে রাত্রিতেই আমরা কাজ চালিয়ে যাবো।

চাচা চিং-শ্যান্ চলে যাবার আগে তাঁর হাতে একটা কাগজের চিরকুট দিয়ে গেলেন।

সিস্টার সুয়ে-লিয়েন প্রথম দিন আমাদের জন্য যে ব্যবস্থা করেছিলেন, নতুন রোগীদের জন্যও ওই একই ব্যবস্থা করলেন। তারপর তাঁর বিশৃংখল চুলগুলিকে মাথার পেছন দিকে বিন্যস্ত করে নিয়ে বললেন, এখানে হো শু-চিং নামে কে আছেন? একজন শ্মশ্রুধারী ব্যক্তি বললেন, আমি।

ঠিক আছে। তুমি আমার সঙ্গে চলে এস, আর কমরেড চেট,—তুমিও। তিনি আরও বললেন, চল, আমরা বাইরে গিয়ে কথা বলব। হো আর আমি—আমরা দুজনেই সিস্টারের সঙ্গে বাইরে বেরিয়ে এসে একটা পাইন গাছের ছায়ায় দাঁড়ালাম।

তখন তিনি আমাদের বললেন, আমরা তিনজন সদস্য এখানে একটি অস্থায়ী দল গড়তে চাই।

চাচা চিং-শ্যান্ যে চিরকুটটা সিস্টারের হাতে দিয়েছিলেন, সেটাতেই কমরেড হো শু-চিং-এর দলসদস্যতার কথা লেখা ছিল। দলসদস্যদের কথা চেপে যাওয়াতে সেই সময় দল খোলাখুলি ভাবে কাজ করতে পারছিলেন না। হো আর আমি—আমরা দুজনেই সিস্টার সুয়ে-লিয়েনকে সম্পাদক পদে নির্বাচিত করলাম। তিনি সেই পদ গ্রহণ করে বললেন, আমরা তিনজনেই কিন্তু দায়িত্ব ভাগ করে নেবো। একটু থেমে তিনি আবার বললেন, বর্তমানে অসুস্থ ও আহতের সংখ্যা অনেক বেড়ে গেছে, আর আবহাওয়াও বেশ উত্তপ্ত হয়ে উঠেছে; এই অবস্থায় একটিমাত্র গুহার মধ্যে সকলের একসঙ্গে থাকা স্বাস্থ্যকর হবে না। আমরা এদের দু'ভাগে দুটো গুহায় রাখব, তোমরা দুজনের প্রত্যেকে এক-একটা গুহার দায়িত্বে থাকবে।

অন্য সময় যা হয় একরকম চলে যেত, কিন্তু জুন মাসের দিকে এই গুহায় বাস করা ছিল রীতিমত কষ্টকর। বাইরের শত্রুর শাসানি তো আমাদের সহ্য করতে হতই, গুহার ভিতরেও আমাদের শত্রুর অভাব ছিল না। ভিতরের শত্রুরা হল জোঁক আর কালো মশা। যখনই বৃষ্টি হত, তখনই এই সব জোঁক পা বেয়ে ক্ষতের কাছে এসে রক্ত চুষতে আরম্ভ করত। রক্ত চোষা হয়ে গেলেই তারা মোটাসোটা কুণ্ডলী পাকিয়ে নীচে পড়ত, তারপর গলা বাড়িয়ে বাড়িয়ে বাইরে চলে যেত। রাত্রে সারা গুহার মধ্যে শব্দ করে উড়ত প্রায় আধ ইঞ্চি লম্বা আকারের অসংখ্য কালো-মশা। এগুলি শরীরের কোথাও কামড়ালে জায়গাটা ভীষণ চুলকাত আর যন্ত্রণা হত, আর সেখানটা একটা বড়সড় মুদ্রার মত ফুলে উঠত। ধোঁয়া দিয়ে সেগুলোকে আমরা তাড়াতেও পারতাম না, কারণ, সেই ধোঁয়া দেখে তাহলে শত্রুরা আমাদের হদিস পেয়ে যাবে। বহু কসরত করে দু-একটা মশা মারতে পারলেও বাকিগুলি সারা রাত ধরে ঝাঁক বেঁধে উড়তে থাকত। ফলে আহত কমরেডরা রাত্রে ভালোভাবে ঘুমাতেই পারত না। এসব দেখে সিস্টার সুয়ে-লিয়েন খুব দুঃখ পেতেন।

যেমন করে পারি, এই মশাগুলো থেকে আমাদের রেহাই পেতেই হবে, সিস্টার প্রায়ই এই কথা বলতেন।

আমি তখন তার জবাবে বলতাম, ঠিক কথা, কিন্তু কেমন করে?

আমার এই প্রশ্নের জবাবে তখন তিনি বলতেন, আমরা কিছু তালপাতা কেটে সেগুলো দিয়ে পাখা বানিয়ে তারই বাতাস দিয়ে মশাগুলোকে তাড়াব। রাত্রির প্রথম দিকটায় তুমি তোমার গুহায় পাখার বাতাস দেবে, আর রাত্রির শেষের দিকটায় হো-শু তার গুহায় এ কাজ করবে। আমরা এইভাবে কাজ আরম্ভ করলে দেখা গেল, তিনি নিজে রাত্রির প্রথম দিকটায় হো-শুর গুহায় আর রাত্রি শেষের দিকটায় আমার গুহায় পাখার বাতাস করে চলেছেন। প্রথমটায় আমরা তাঁর এই কাজের হদিশ পাইনি, কিন্তু কয়েকদিন পরে আমরা যখন লক্ষ করলাম, তাঁর চোখ-দুটো লাল টক্‌টকে হয়ে উঠেছে, তখন সন্দেহবশে একটু খোঁজ নিতেই ব্যাপারটা আমরা বুঝে ফেললাম। এতে আমরা খুবই বিভ্রান্ত হয়ে পড়ি।

আমি তখন তাঁকে জোরের সঙ্গে বলি, আর কক্ষণো তুমি এভাবে পাখা টানবে না।

কিন্তু কিছুতেই তিনি আমাদের কথা শুনতে চাইলেন না; এই বলে তর্ক জুড়ে দিলেন যে, যেহেতু তিনি সারা জীবন দুঃখ কষ্টের মধ্যেই বড় হয়ে উঠেছেন, তাই এই কাজটুকু তাঁর কাছে কোনো ব্যাপারই নয়।

এই কথা যখন চিং-শ্যানের কানে গেল, তখন তিনি পাহাড়ি জোঁক তাড়ানোর ব্যাপারে আমাদের জন্য নিয়ে এলেন তামাকে পাতা সেদ্ধ করা গরম জল। এই জলটা সত্যিই খুব কাজে দিয়েছিল। গুহার প্রবেশপথে এই গরম জল সামান্য মাত্র ছিটিয়ে দিতেই সেই পথে জোঁক আসা বন্ধ হল। যতদিন বৃষ্টি চলেছিল, ততদিন এই ভাবেই আমরা জোঁক তাড়িয়েছিলাম। আর মশা তাড়ানোর ব্যাপারে এরপর থেকে পাখা টানার জন্য প্রতি রাত্রেই গ্রাম থেকে এক একজন লোক আসত।

আমাদের নিজেদেরকে এই গ্রামবাসীদের পক্ষে বোঝা বলে মনে হওয়ায় তাদের আমি বলতাম, আমরা সুস্থ হয়ে উঠলে তোমরা একটু আরাম পাও।

আমার এই কথার জবাবে তাদের মধ্যে কেউ কেউ বলত, বাজে কথা ছাড়ো, একমাত্র আমাদের মত দরিদ্র লোকদের মুক্ত করবার জন্যেই তো কত বিপদ বরণ করে তোমরা এতদূর পর্যন্ত এসেছ; তার তুলনায় আমরা কিই বা করতে পারছি তোমাদের জন্য!

তাদের পরিকল্পনা ভেস্তে যাওয়ায় শত্রুপক্ষ আরও মরিয়া হয়ে উঠল। ১৯৩৫-এর আঠাশে অক্টোবর চাচা চিং-শ্যান্ এক বস্তা চাল কাঁধে নিয়ে আমাদের হাসপাতালে এলেন। তিনি অত্যন্ত রেগে গিয়ে বললেন, যত সব হারামজাদা! তোমাদের সঙ্গে আমাদের যোগাযোগটা কেটে দেবার জন্য হারামজাদারা উঠে পড়ে লেগেছে।

আমরা এখন তাহলে কোথায় যাই, কোথায়? আমি নিরুপায়ভাবে বললাম।

চাচা চিং-শ্যান্ হিংস্র ব্যঙ্গের সুরে বললেন, কোথায় আবার, একেবারে ওদের বন্দুকের নলের ডগায়!

হো-শু বললেন, ওদের কাজে বাধা দেবার জন্য জনগণকে কাজে লাগানো যায় না?

নাঃ, চাচা দৃঢ় প্রত্যয়ের স্বরে বললেন, আমাদের প্রায় প্রত্যেকের বাড়ি ঘরই ওরা পুড়িয়ে ছাই করে দিয়েছে! পার্টি ঠিক করেছে, আমরা যেন এখন অযথা চলাফেরা করে লোকক্ষয় না করি।

আমি চাচা চিং-শ্যানের মুখের দিকে তাকালাম, তারপর ঘাড় ঘুরিয়ে সিস্টার সুয়ে-লিয়েনের দিকে। দেখলাম, সিস্টার তাঁর দুই হাতের উপর চিবুক রেখে নীরবে বসে আছেন।

চালের বস্তাটা সিস্টারের হেপাজতে দিয়ে চাচা চিং-শ্যান বললেন, আমাদের সারা গ্রাম থেকে এইটুকু মাত্র যোগাড় করতে পেরেছি; যতদিন পর্যন্ত না শত্রুর এলাকায় আমরা স্থির হয়ে পরবর্তী কোনো পরিকল্পনা করতে পারছি, ততদিন তোমরা এই রসদেই কোনো রকমে চালিয়ে নাও।

এইসব চিন্তাভাবনা বন্ধ কর, সিস্টার সুয়ে-লিয়েন বললেন, প্রত্যেক সমস্যারই সমাধান খুঁজে বার করা যায়।

তখন শীতকাল, প্রচণ্ড ঠাণ্ডা, আর মাটিও বরফের তলায় ঢাকা পড়েছে। বড় বড় বরফের চাঁই পাহাড়ের ডগা থেকে আর গুহাগুলোর প্রবেশপথের মুখে ঝুলে আছে। কিছু কিছু বড় গাছের গুঁড়িতে লেগে থাকা শুকনো ফাঙ্গাস ছাড়া আর কোথাও কোনো উদ্ভিজ্জ খাদ্যের চিহ্নমাত্র নেই। শীতকালের জন্য সংরক্ষিত খাদ্য যা আছে, তাতে আমাদের তিরিশ জনের খুব জোর এক মাস চলতে পারে। আমরা খুব উদ্বিগ্ন হয়ে পড়লাম। দৈনন্দিন কাজের সময়টা ছাড়া বাকি সময়ে সিস্টার সুয়ে-লিয়েন খুব হাসি-খুশি স্বভাবের মেয়ে। কাজ করতে করতেই তিনি 'কৃষক-বিদ্রোহ'-এর গান গাইতেন, কিংবা অন্য কোনো গানের দুটো কলি গেয়ে উঠতেন, যেমন—'ভাবনা কিসের? ভাবনা নেই লাল-ফৌজ-ভাইয়েরা। তোমরা পাহাড়ে থাকলে কার কি যায় আসে...', এবং এরকম আরও অনেক গানের কলি। সময় সময় আমরাও তাঁর সঙ্গে গলা মেলাতাম। যখন আমরা আমাদের লড়াইয়ের গান গেয়ে গেয়ে ভবিষ্যতের স্বপ্ন দেখতাম, তখন বিঘ্ন-বিপদ, অসুবিধা অতিক্রম করে আমাদের আত্মবিশ্বাস ভীষণ, ভীষণ বেড়ে যেত।

আমাদের জন্য খাদ্য সরবরাহ হত খুবই কম। কিন্তু আমরা তাকে আমল দিতাম না; কারণ, সিস্টার সুয়ে-লিয়েন এ ব্যাপারে ছিলেন অত্যন্ত সতর্ক। তাছাড়া এই সামান্য উপকরণ দিয়ে এমন সুস্বাদু খাবার তিনি তৈরি করতেন, যা খেয়ে আমরা আমাদের সমস্ত দুঃখকষ্ট ভুলে যেতাম। তিনি প্রতি দিনই বেরিয়ে যেতেন আর সারাটা পাহাড় আঁতিপাঁতি করে খুঁজে নিয়ে আসতেন শুকনো ফাঙ্গাস্। ভাতের সঙ্গে এই ফাঙ্গাস মিশিয়ে তিনি এমন একটা খাবার তৈরি করতেন, যাকে আমরা বলতাম 'ছত্রাক-স্যুপ'। যদিও এতে তেল আর নুন থাকত না, তবুও এটা খেতে ছিল খুব সুস্বাদু।

যাইহোক, তারপর থেকেই সিস্টার সুয়ে-লিয়েনের বড় বড় উজ্জ্বল চোখ দুটো ক্রমেই কোটরগত হতে লাগল। আর মুখটা হতে লাগল আরও মলিন। আমরা আবিষ্কার করলাম, সিস্টার সুয়ে-লিয়েন কিছুই খান না, এমনকি এক ঢোক ছত্রাক-স্যুপও। সারা দিন-রাত্রে তাঁর তিনবারের খাবার ছিল দেবদারু গাছে ফাঙ্গাস।

হো শু-চিং আর আমার খুব ইচ্ছা ছিল যে তিনি কিছু স্যুপ খান, কিন্তু আমরা কেউ তাঁকে সে কথা বলতে পারলাম না। কারণ, আমরা জানতাম, তিনি সেই একই কথার পুনরাবৃত্তি করবেন। 'আমি দুঃখ-কষ্টের মধ্যে বড় হয়েছি, এসব আমার কাছে কিছুই নয়।'

এই সময় দু'সপ্তাহেরও বেশি সময় ধরে অবিরাম বরফ পড়তে লাগল। ফলে আবহাওয়া হয়ে উঠল প্রচণ্ড ঠাণ্ডা; কিন্তু এই ঠাণ্ডার মধ্যেও সিস্টার সুয়ে-লিয়েন শুধুমাত্র তাঁর সামরিক পোশাক পরেই থাকতেন। তাঁর একমাত্র আরামদায়ক তুলোর কোটটি তিনি জোর করে হো শু-চিংকে পরতে বাধ্য করেছিলেন।

হো ছিল তাঁর নিজের প্রদেশ গ্রুপের রাইফেল বাহিনীর স্কোয়াড নেতা। একটা লড়াইয়ে সে কুড়িজনেরও বেশি কুয়োমিন্ট সৈন্যকে মেরেছিল। শেষের দিকে একাধিক শত্রুসৈন্য তাকে ঘিরে ঘায়েল করে। সে তার বুকে প্রচণ্ড আঘাত পায়। যুদ্ধক্ষেত্রে আহতদের উদ্ধার করতে

এসে মুক্তিযোদ্ধারা তাকে দেখতে পায় এবং চিকিৎসার জন্য তাকে এই গিরিগুহা হাসপাতালে পাঠিয়ে দেয়। সাংঘাতিকভাবে জখম হলেও তাকে এখানে শুতে হত খড়ের মাদুরে, আর এ জন্য কখনও সে কোনো কথাও বলেনি কিংবা অভিযোগ জানায়নি। সে সব সময়ের জন্য তার সহযোগী কমরেডদের জন্য অন্তত এক চামচ খাবারও বাঁচানোর চেষ্টা করত। সিস্টার সুয়ে-লিয়েন যে তুলোর কোটটি তাকে দিয়েছিলেন, সেটার ভাগীদার অনেকেই ছিল। মূল্যবান এই কোটটি তিনি যার যেমন যতক্ষণের জন্য দরকার, সেই কমরেডকে সেটি ব্যবহার করতে দিয়ে খুব খুশি হতেন।

একদিন সিস্টার সু-লিয়েন হোকে জিজ্ঞেস করলেন, আচ্ছা, চাচা টিং-শ্যান্ কতদিন আগে আমাদের এখানে শেষবার এসেছিলেন?

এর মধ্যেকার পাথরের টুকরোগুলো গুণতি কর, একটা ছোট্ট কাপড়ের পুঁটুলি আমার হাতে-দিয়ে হো বলল, একটা টুকরো সমান একটা দিন।

আমি তার তীক্ষ্ণ বুদ্ধিবৃত্তির প্রশংসা করে বললাম, পাথরের নুড়ির দিনপঞ্জী। বাঃ, চমৎকার ব্যাপার তো। আমি পুঁটুলিটি খালি করে এক এক করে গুণে দেখলাম, মোট নুড়ির সংখ্যা একষট্টি। আমি ঘোষণা করলাম, তাহলে আগামী কালই 'বসন্ত উৎসব' শুরুর দিন।

আমার এই কথা শুনে হো প্রায় দু-মণ ওজনের চালভর্তি একটা বস্তা নিয়ে এল। তারপর এই বস্তাটি সিস্টার সুয়ে-লিয়েনকে দিয়ে বলল, অনেক দিন ধরেই এটা তোমাকে দেব বলে ভাবছিলাম, কিন্তু আমি ভালোভাবেই জানতাম, তুমি এটা নিতে না। কিন্তু 'বসন্ত উৎসব' এসে গেছে, আজ তোমায় এটা নিতেই হবে; অন্তত আমার দলের চাঁদা হিসেবেও এটা তুমি নেবে।

চালের বস্তাটা এবার গ্রহণ করে সিস্টার সুয়ে-লিয়েন অনেকক্ষণ ধরে এই নিঃস্বার্থ মানুষটির দিকে তাকিয়ে রইলেন; তারপর বললেন, ঠিক আছে, আমি তাহলে এখন 'বসন্ত-উৎসব' অনুষ্ঠানের প্রস্তুতি শুরু করে দিই, কি বল।

পরের দিন খুব ভোরে আমরা বসন্ত-উৎসব শুরু করলাম। কেউ কেউ জায়গাটা পরিষ্কার করল, অনেকে আবার তাদের চুল ছেঁটে নিল; এই ভাবে বিভিন্ন মানুষ বিভিন্ন কাজ করে যেতে লাগল। একটি গুহার প্রবেশ-মুখে অনেকে হোর কাজ দেখতে লাগল—হো তখন গুহার মুখটি সুন্দর করে সাজাচ্ছিল। গুহার পাথরের দেয়ালে হো কাঠকয়লা দিয়ে দু'ছত্র কবিতা লিখে রাখল। ডান ধারের দেয়ালে সে লিখল, 'যদিও গুহায় করছি বাস, মনে বিপ্লব বারোটি মাস।' বাঁ দিকের দেয়ালের ছত্র দুটি এই রকমের,

'ছত্রাকে করি জীবন ধারণ, মানুষের সেবা করি অবারণ।'

উপরে একটা পতাকা উড়িয়ে দাও, সিস্টার সুয়ে-লিয়েন প্রস্তাব করলেন।

কিন্তু এই পতাকার উপরে কি লেখা হবে?

তিনি এক মুহূর্তেই চিন্তা করে বললেন, লেখ—'কৃষক আর মেহনতি মানুষের বিপ্লব দীর্ঘজীবী হোক।'

সকলেই একবাক্যে এই স্লোগানটিকে স্বীকার করে নিয়ে বলল, আমাদের এই বিপ্লব যখন জয়যুক্ত হবে, তখন আমরা সব্বাই আমাদের ছেলেমেয়েদের আমাদের এই গিরিগুহার আদর্শ শিক্ষা দেব।

আমরা তখন আনন্দে চিৎকারে এমন মশগুল হয়ে পড়েছিলাম যে, চাচা চিং-শ্যান্ কখন আমাদের মধ্যে এসে গেছেন, আমরা তা জানতেই পারিনি।

চাচা চিং-শ্যান্ সঙ্গে এনেছিলেন বেশ বড় একটা মোটা বাঁশের পোল। তাঁর কাপড়ে লেগে থাকা বরফের আচ্ছাদনগুলো ঝেড়ে ফেলতে ফেলতে খুব খুশি মনে তিনি বললেন, এটাই তো সত্যিকারের আদর্শ। বিপ্লবীদের উৎসাহের প্রাচুর্য থাকা একান্ত প্রয়োজন।

তাঁকে দেখে আমাদের মনে হল, আমরা যেন বহুদিন পরে আমাদের কোনো ঘনিষ্ঠ আত্মীয়কে ফিরে পেয়েছি। আমাদের আনন্দ উত্তাল হয়ে উঠল।

চাচা চিং-শ্যান্ বলে যেতে লাগলেন, কুয়োমিন্টরা আসলে শরতের ফড়িং ছাড়া কিছু নয়—তাদের দিনও প্রায় শেষ হয়ে এসেছে। ঘাঁটির বাইরে খাদ্যদ্রব্য নিয়ে যেতে তারা আমাদের প্রচণ্ড বাধা দিয়েছে। এবার তাদের বেলাতেও ওই একই ব্যাপার ঘটবে। আমার সঙ্গের এটি ওদের চোখে ধুলো দিয়ে শেষ পর্যন্ত কোনওভাবে এখানে আনতে পেরেছি, দেখ, এই বলেই তিনি বাঁশের পোলটি উল্টোভাবে খাড়া করে ধরলেন, আর সঙ্গে সঙ্গে সেই বাঁশের খোলের মধ্য থেকে পাঁচ-ছয় কেজি চাল গড়িয়ে পড়ল।

অনেক চিন্তা-ভাবনা আর আলোচনার পর খাদ্য আমদানির ব্যাপারে আমরা এই পদ্ধতিটাই গ্রহণ করলাম। এই প্রচেষ্টা যদি সফল হয়, গ্রামের লোকেরা বলল, তাহলে পাশ্বে পর্বতমালার ডানদিকে ঢালের গুহাতে তারা এই পদ্ধতিতে খাদ্যশস্য পৌঁছে দিতে পারবে। এই দিককার পাহাড়ি অঞ্চলে জ্বালানি কাঠ কুড়োতে আসবার সময় প্রতি তিন দিনে একদিন করে খাদ্যশস্য নিয়ে আসবে। তারপর সিস্টার সুয়ে-লিয়েন তাদের কাছে গিয়ে এই খাদ্যশস্য গুহায় নিয়ে আসবেন।

সিস্টার সুয়ে-লিয়েন উৎফুল্ল হয়ে বললেন, চমৎকার ফন্দি!

এই ব্যবস্থা মত সিস্টার সুয়ে-লিয়েন প্রতি তিন দিন অন্তর নির্দিষ্ট জায়গায় গিয়ে চাল সংগ্রহ করে সেগুলো গ্রেনেড রাখার বেল্টের খোলের মধ্যে পুরে নিয়ে চলে আসতেন। এই বেল্টটা হো তার লড়াইয়ের জায়গা থেকে নিয়ে এসেছিল।

শত্রুপক্ষ নিশ্চয় শক্তিশালীই ছিল, কিন্তু জনগণ ছিল আরও বেশি শক্তিশালী। দলের নেতৃত্বে য়্যালোপিং গ্রামের লোকেরা দীর্ঘ তিনবছর ধরে চরম সংগ্রাম চালিয়ে শেষ পর্যন্ত শত্রুপক্ষের অসংখ্য ঘেরাও দমন-অভিযান ধ্বংস করে দিয়েছিল। তাদের কর্মতৎপরতার গুণে আহত অথবা অসুস্থ—কোনো একজনও শত্রুপক্ষের হাতে গিয়ে পড়েনি।

সব সময়েই ফেলে আসা দিনগুলির কথা আমার মনে পড়ে; আর য়্যালোপিং গ্রামবাসীদের অতি পরিচিত ও প্রিয় মুখগুলি আমার চোখের সামনে ভেসে ওঠে। হাজার হাজার এই সব সরল ও দৃঢ় প্রত্যয়ী বীর-যোদ্ধা আর বীর-রমণীদের কথা ভাবতে ভাবতে সব সময়েই চেয়ারম্যান মাও-এর একটি বাণী আমার মনে উদয় হয়—'জনগণ দীর্ঘজীবী হোক!'

হাইকু

নন্দদুলাল ভট্টাচার্য

হাইকু একপ্রকার জাপানি কাব্য-রীতিতে রচিত ছন্দকৌশলময় কবিতা। বাংলায় হাইকু জাতীয় কবিতা কম লেখা হয়েছে। ৫+৭+৫, তিন চরণের ১৭টি সিলেবল্-এর বাঁধুনিতে এই অণুকবিতায় আঁকা হয়ে যায় শব্দে আঁকা অণুচিত্র। রবীন্দ্রনাথ জাপানি রীতির এই কবিতাকে বলেছেন—'হৃদয়ের মিতব্যয়িতা'।

(১)

একটা চিল,
মেঘের ফাঁকে নীল,
ডিঙি ভাসছে।

(২)

কালো বোঁটায়
পলাশের আগুন
বুকে ফাগুন।

(৩)

ক্ষুধার হাত
নিরন্ন দেহ জীর্ণ
অভিসম্পাত।

(৪)

শুকনো ডাল
ফাল্গুনের বনানী
কাক কুড়ানী।

(৫)

সকাল সন্ধে
সূর্যের দিকে চেয়ে
সোনালি মেয়ে।

(৬)

বিশ্ব সংসার
নিন্দার প্রশংসার
গলার হার।

(৭)

গিরি ভাস্কর্য
স্তন যুগলে বন্দী
অর্ধেক সূর্য।

(৮)

মানুষ মত্ত
পশুর মত মুখ
ছুরিকাহত।

(৯)

কচি পাতায়
অশ্বত্থ দেবদারু
রৌদ্র নাচায়।

(১০)

কর্ণ আয়ত
বাঁশ পাতার মত
চাতক চোখ।

(১১)

কালো সাদায়
চন্দ্রমল্লিকা খোঁপা
হৃদ্ কাঁপায়।

যে যেখানে আছো

মৃণাল বসুচৌধুরী

ঠিক কত জোরে ঝড় এলে
আমরা উড়িয়ে দিতে পারবো
আমাদের উজ্জ্বল পতাকা
নির্ভীক প্রচারপত্র
হলুদ প্রত্যাশা
উন্মুখ চোখের সামনে
ভাসিয়ে দিতে পারবো আমাদের যুদ্ধজাহাজ
অন্তর্দহনের স্মৃতি
বিশুদ্ধ আবেগ
শীতের সমুদ্র ঠিক
কতটা উত্তাল হ'লে
আমরা ভাসিয়ে দেবো
আমাদের সহনশীলতা
মূল্যবোধ
দুরন্ত শপথ
কত কি কত জোরে ঝড় এলে
আমরা উড়িয়ে দেবো
রূপকথা
ছেঁড়া ক্যানভাস্
আমাদের বিষণ্ণ গৌরব
অভিমানী মুক্তির প্রয়াস

ঠিক কত জোরে ঝড় এলে
আমাদের মুষ্টিবদ্ধ হাত
সম্মিলিত স্বর
ছন্দময় পদক্ষেপ
কঠিন চোয়াল
প্রথামতো
এ সমস্ত নিয়ে কোন আলোচনা
হবার আগেই

আসে ঝড়
আসে উদ্দাম স্রোতের টান
আসে আবাহন
কুয়াশায়
চাঁদ আর আগুনের
আশ্চর্য প্রেরণা

যে যেখানে আছো
ওঠো
খেলাঘর নিবিড় উঠোন
খামার পেরিয়ে এসো
দ্যাখো
পায়ে পায়ে কি ভীষণ আগুন জ্বলেছে
দ্যাখো
পায়ে পায়ে মানুষের স্বপ্ন হেঁটে যায়

আবহমান

নির্মল হালদার

ধূসরতা পথ নয়
যেমন, চিরুনি নয় চুলের কথা। যেমন,
নোখদাঁত নয় মানুষের পরিচয়

ওই তো অন্তর থেকে বাহির হয়, অন্তর-প্রবেশের
বহমান আগুন

২.
মগ্নতা এক গাছের রূপ
সারাদিন এক ঠাঁই এক আনন্দে বিভোর।
এখানে বৃক্ষজননী বললে
সন্তান ব'লে তোমাকে মানাবে না

৩.

শাড়ির পাড় ছিঁড়ে গেলেও
নদীর পাড় আছে, পায়ের ছাপ পাড় থেকে
জনপদধ্বনি—

উল্লাসে উল্লাসে উৎসব ফসলের ক্ষেতে

অন্ধকারে

প্রমোদ বসু

ঘন অন্ধকারের মধ্যে দিয়ে যেতে যেতে আজ
চোখে পড়ছে
পরিণতিহীন এক পরিক্রমণ!
আর, সেই গোলকধাঁধার মধ্যেই শুনতে পাচ্ছি
রক্তপাতের শব্দ, কান্না ও হাহাকার।

কেননা, আমাদের প্রত্যেকের পাশাপাশি দেখি
এসে দাঁড়িয়েছে ভীম বিক্রম হিংসা,
আদিম অপবিত্র পাপ।
আমাদের মধ্যবর্তী ফাঁকগুলি ক্রমশই ভরে উঠছে অস্ত্রে
অনিশ্চয় আশঙ্কায়।

এই দৃশ্যে হীন হয়ে যায় জন্ম ও জীবন।
এই দৃশ্যে দাঁড়িয়ে থাকে মানুষের চেহারায়
অজস্র অজস্র অরণ্য-শ্বাপদ!

আর, রক্তে মাখামাখি এই বেঁচে থাকায়
প্রতিনিয়ত
চিৎকার করে ওঠে একটা-দুটো-তিনটে-চারটে যুদ্ধ।—
তার ভয়ঙ্কর দামামায়
চাপা পড়ে যায় আমাদের বোধ ও বিশ্বাস,
ভাষা ও ভালবাসা।

আর, আমরাই মেতে উঠি অসম্ভব আনন্দ-খেলায়
অন্ধকার অন্ধকারে।

বিশুদ্ধ জলের জন্য তৃষ্ণা

কৃষ্ণা বসু

যে জল শাদা, জলের ভিতর গন্ধ নেই কোনো,
সফেদ জল, বিশুদ্ধ জল, তৃষ্ণা সলিল, শোনো;—
আমার তৃষ্ণা স্বচ্ছ জলের, আমার তৃষ্ণা অন্য;
কারোর তৃষ্ণা অপরিমিত, অপর্যাপ্ত, বন্য,
আমার শুধু স্বচ্ছ জলের জন্য হা হা করে
বুকের মধ্যে, খুব মরু ঝড় আছাড়পিছাড় ওড়ে,
মরুঝড়ের মধ্যিখানে মরুদ্যানের জন্য
রাত জেগেছি, স্বপ্ন পুষি, স্বপ্নে কন্যা ধন্য।
কত রকম তৃষ্ণা তোদের রঙিন ঘোলাজলে
আঁকাবাঁকা প্রতিবিম্ব মধ্যরাত্রে দোলে।
নিজের ছবি চিনতে পারো? নিচের ছায়া খোঁজো?
খুব হুল্লোড়, স্বপ্নাক্রান্ত, অনিদ্রা চোখ বোজো,
তোমার কাছে তোমার কাছে শৈশব কি আছে?
বুক পকেটে ছেলেবেলার ফটোগ্রাফটি নাচে?
খুলে তাকাও দেখো তো দেখি চিনতে পারো কি;
অনেক পথ পেরিয়ে এসে একলা মানুষী,
কোলাহলে বাতাস কাঁপে ঘোর-লাগা সংসার,
ভিতরদিকে তৃষ্ণা জাগে তৃষ্ণাকাতর হাড়,
স্বচ্ছ জলের জন্য আমি রাত্রি জেগেছি
ও তৃষ্ণাজল, পরিশ্রুত, একলা চিনেছি,
সারাজীবন তপ্ত কাতর সারাজীবন হন্যে
বিশুদ্ধ এক অবিকল্প সম্পর্কের জন্যে!

ও মহাভারত!

মল্লিকা সেনগুপ্ত

মহাভারত মহাভারত
অষ্টাদশ পর্ব
তুমি আমার ছেলেবেলার
গল্প শোনা গর্ব
তোমার কাছে শিখেছিলাম
যুধিষ্ঠির ধর্ম
শিখেছিলাম অর্জুনের
ধনুক এবং বর্ম
পাখির চোখে যে রাখে চোখ
যে পারে তির ছুঁড়তে
সেই তো জয়ী, আমরা আছি
হৃদয়ব্যথা খুঁড়তে
চেয়েছিলাম কুন্তী হতে
মন্ত্রমাখা কন্যা
ডাকব যাকে আসবে সেই
পুরুষ চাই, মন না।
দ্রৌপদীর মধ্যে আমি
আগুন দেখেছিলাম
পাঁচস্বামীর সামনে যার
ইজ্জতের নীলাম

তারপরেও দৃপ্ত সেই
কন্যা উঠে দাঁড়ায়
বিপ্লবের আগুন এক
মহাভারত পাড়ায়
বন্ধু ভাই পরিজনের
খুনে রঙীন খেয়ালে
জীবনটা যে সাজানো যায়
তুমিই সেটা শেখালে
রাজারাজায় ষড়যন্ত্র
রানির শাড়ি হরণ
মহাভারত তুমি জীবন
তুমি শেখাও মরণ
ধর্ম আর অধর্মের
বিরোধাভাস তুমি
পাণ্ডবের কৌরবের
মহাযুদ্ধ ভূমি
আজও সেই যুদ্ধ চলে
বাংলা গুজরাটে
ভাইয়ে ভাইয়ে যুদ্ধ হয়
মাটির বুক ফাটে।

জাতিকার গল্প

চৈতালী চট্টোপাধ্যায়

নেমে এসেছিল, ছুঁচ পতনেতে যত
শব্দ জেগেছে, তারও চেয়ে নিঃশব্দ
কান্নামুখর নারীদের মুখ স্বপ্নে।
দেহহীন কেন, তাৎক্ষণিকের প্রশ্নে
যৌনঘুঙুর পাক খেয়ে নাচে ঘুমে,
কেননা তখন নর্তকীদের রোমে
ঘৃণাকন্টক, তেহাই পড়ছে সমে।

বস্তুত, আমি অপরিচয়ের ঘোরে
শরীর রেখেছি মন-বোনা পিঞ্জরে।
যে নারীরা আসে স্বপ্নে এবং শ্রবণে
জাতিকাগল্প শোনায়, তাদের মননে
কীভাবে মহল স্ফূর্তির মতো বেজেছে,
ভয়ে, লজ্জায় দেহফল যত মজেছে
সুপক্ক হয়ে, ভিন্ন ভিন্ন ভ্রমণে।

এই গুণাগার জীবনানন্দ আমারই

শরণার্থী

সুবোধ সরকার

ছাড়োনি তুমি ভিয়েৎনামে ঘর
ইজরাইলে ছাড়োনি তুমি মাটি
হোমর, বাল্মিকীর আগে থেকে
মাথায় নিয়ে চলেছো ঘটিবাটি।

এভাবে শরণার্থী হতে হতে
পরের দেশে পরের ভাষা শুনে

পরের দেশে পরের ভাত খেয়ে
জীবন পেলে পয়সা দিয়ে গুনে।

মাথায় নিয়ে চলেছ ঘটিবাটি
ছেঁড়া লুঙ্গির সঙ্গে ছেঁড়া স্মৃতি
পারলে নিও সঙ্গে হাতপাখা
পারলে লিখো পুজোর আগে চিঠি।

বিদেশে গিয়ে দেশের ঘর করি
দেশের নাম মুছতে এলো যারা
তাদের হাতে বিশ্বায়ন-থলি
গরিব হবে আবার ভিটে ছাড়া।

পাঠিও তুমি একটু খুদকুঁড়ো
পাঠিও তুমি ডাঁটার চচ্চড়ি
পৃথিবী জুড়ে বড়লোকের খেলা
আমরা শুধু বারংবার মরি।

প্রিয় গানগুলির পাশে ২০০২

ব্রত চক্রবর্তী

'জগতে আনন্দযজ্ঞে আমার নিমন্ত্রণ...';
কেউ কারও মন পায় না এখন।
'জল বলে চল মোর সাথে চল/তোর আঁখিজল
হবে না বিফল...';
আঁখিজলের দাম দেয় না এখন কেউ,
সঙ্গে গিয়ে বুঝি সঙ্গে যেতে বলা এক ভুল।
'বেলা বয়ে যায়, ছোট্ট মোদের পানসি তরি
সঙ্গে কে কে যাবি আয়...';
তড়িঘড়ি যেতে গিয়ে যদি দেখি ভুল নৌকায় উঠেছি।
'সিন্ধুতে জনম আমার, বিন্দুতে কী ভয়...';
দূরের নয়, কাছের লোকজনদের জন্যই ভয় ইদানিং।
'দুর্গম গিরি কান্তার মরু দুস্তর পারাবার...';

পতাকা তোলার হাতগুলোই দেখি পতাকা নামাবার।
'লালন কয় জাতের বিচার দেখলাম না এ-সংসারে...';
জাতের নামেই দেখি মানুষ মানুষকে বেশি মারে।
'এ কোন্ সকাল রাতের চেয়েও অন্ধকার...';
আজ যার দোর হাট, কাল গিয়ে দেখি বন্ধ দ্বার।
'এক কাপ চায়ে তোমাকে চাই...';
চা জুড়োলে ফুরলে আর ভালবাসা কই!
'এই বেশ ভাল আছি...';
ভাল বলেই যদিও মুখ সরিয়ে নেয় সকলেই।
'আমায় প্রশ্ন করে নীল ধ্রুবতারা...';
আঁকড়ে ধরেছি যাদের, তারা ঠিক কারা!

পোস্টার

উপাসক কর্মকার

দেয়ালে ইটের চাইতে বেশি অক্ষর
অক্ষরগুলির চাইতে বেশি রঙের ছায়া
কেবলই ছায়া ভিড় করে আসে অক্ষরে দাঁড়ি কমায়
পোস্টারে পোস্টারে ছয়লাপ দীর্ঘ অনুতাপ...

নিশ্চিন্ত জীবনের আহ্বান নয় অনিশ্চিত ভবিষ্যৎ নয়
রক্ত নয় ক্লেদ নয় বরাভয় অঙ্গুলি নির্দেশ নয়
শস্য ফলনের ভাষ্য নয় পরিণত শরীরের দীর্ঘ রমণ নয়
পোস্টারে পিকাসো আঁকে ঘুঘু
শাদা পারাবত হয়ে ওড়ে
আমার আঁকা পশু মানুষের মুখোশ পরে

ঘরবাড়ি

দীপচন্দ্র বসু

বাড়িতে একদিন ঢুকেছিলাম
সেদিন বর্ষা ছিল তুমুল,
তোমার হাত ধরে ঢুকেছিলাম
প্রথম জীবনের সচ্ছলতায়।

যেমন থাকে এক শূন্যতার
মোড়কে ভরা সব নতুন ঘর;
দেয়াল, ছাদ, মেঝে প্রথম দিন
অবাক বিস্ময়ে দেখেছে মুখ।

পায়ের শব্দ ও নিশ্বাসের
শব্দে পরিচয়, দেয় দখল,
নিজের বাড়ি তবু অচেনা সব
প্রথমে থেকে যায় যেমন রঙ।

আমি তো জানি নই বাড়ি আমার;
আমার বাড়ি, আর আমার ঘর
অথচ মনে হয় আমার নয়
স্বদেশে এসে তবু যেন প্রবাস।

একটু চেনাশোনা হবার পর
দু'হাত পেতেছিল বাড়ির ঘর,
চেয়েছে নির্জনে সঙ্গসুখ
দিয়েছে বিনিময়ে মাথার ছাদ।

বাড়িতে একদিন ঢুকেছিলাম
সেদিন বর্ষা ছিল তুমুল,
ঘরের দখলও নিয়েছিলাম
তবুও থেকে গেছে কোথাও ফাঁক।

আজ আর লজ্জা লুকোব না
ঋজুরেখ চক্রবর্তী

নির্জন, আজ আর তোমার কাছে লজ্জা লুকোব না। আর, লুকোবই বা কোথায়? এই যে আমার নরকের পর নরক সফর করে আসা পোড়-খাওয়া মন আজ হঠাৎই আবিষ্কার করল, তার কাছে একতরফা হাত পেতে নিতে নিতে আমার হাতে-ধরা স্ফটিকের পানপাত্র ক্রমশ পরিণত হয়ে যাচ্ছে তোবড়ানো এনামেলের বাটিতে আমি দেখেও দেখছি না, শুধু পরিত্যক্ত মড়কের এক কোণে দাঁড়ানো শেষ কুষ্ঠরোগীটির মতো করুণ বিভ্রমে ভেবে যাচ্ছি, এই স্তব্ধ স্পর্শরহিত অন্ধকার বুকে নিয়ে আমিও ঈশ্বরের মতো একা হতে পারি...আজ এই তীব্র তিক্ত আত্মধিক্কারের রাতে আমি যে এমনকি ঘুমের অছিলাতেও চোখ পর্যন্ত বুজতে পারছি না, নির্জন— আমি যে জানি, বোজা চোখের তরল অন্ধকারে নিশ্চিত নিঃশব্দে ভেসে উঠবে তার মুখ, আর আমি লজ্জা লুকোবার জায়গা পাব না কোনওখানে। এমনকি ঋণীরও কিছু দেয় থাকে। এতটাই দীন আমি, সে আমার কাছ থেকে কিছুই চাইবে না কোনওদিন? মুক্তি ছাড়া কিছুই চাইবে না?

গৃহস্বামী
অমিতাভ চৌধুরী

পাশাপাশি দুটি ক্যালেণ্ডারের ছবি, খাটে বিছানা পাতা
এবং যেদিকে বালিশ উত্তরমুখো, মাথা রাখার উপযুক্ত নয়—
অর্থাৎ এই কক্ষটি শূন্য, মনুষ্যবিহীন, এই খাটে এখন
ঘুমায় না কেউ :
অন্য প্রান্তে একটি কুলুঙ্গি, শতাব্দি প্রাচীন
কাঠের আলমারি, দরজা খুললে মর্মান্তিক ক্রন্দন ধ্বনি,
কুলুঙ্গিতে পুতুল বিগ্রহ, সামনে ছোটো পিতলের থালায়
এক চামচ চিনি, পাশের ঘরে
ঠাকরুণ মালা গাঁথছেন আর গুনগুন কীর্তন গাইছেন
সেই গান শুনে ক্যালেণ্ডারের ঠাকুর রামকৃষ্ণ
ঠাহর করতে চাইছেন
এই কক্ষটি এখন কার অধীন,
তিনি স্নেহ দেখাচ্ছেন কিন্তু ঠিক সেরকম হাসছেন না।

বিভ্রম
প্রবীর ভৌমিক

মৃদু মরীচিকা তুমি—সম্ভ্রান্ত বিভ্রম।
প্রতিটি নদীর পাশে স্বচ্ছ মাছরাঙা।
বনের ভিতরে রাত্রি,
তার পাশে অগ্নিবলয়—যৌন দাবানল
রক্ত লাগা ভস্ম পড়ে আছে—
নেশাতুরা নগ্নিকার কোলে।

ভস্ম জানে নিজস্ব অধিকারটুকু।
কতদূর যেতে পারে, কতদূর চলে যাওয়া যায়
যেখানে সে শুয়ে আছে
তার নিচে রক্ত, শিরা, বাসনার তৃতীয় প্রহর।

মৃদু মরীচিকা তুমি ভস্ম জানে,
জানে এ মুহূর্তটুকু তৃতীয় প্রহর।
অপেক্ষার পর তীব্র আলোড়নটুকু
ভস্ম শুধু একদিন জেনে নিয়েছিল।

চক্র
রাহুল পুরকায়স্থ

রাত্রি চিহ্নহীন, আমি নামি তমসায়
সম্মোহন কোথাও কি ছিল, কিবা আসে যায়
যদি থাকে, বিরহের ভেসে আসা ফুলে
গাঁথো মালা, আমি তবে জড়াই আঙুলে

ঘুম ভাঙা গান, তার ভেসে আসা সুর
যতটা নিকটে আছো ততটা কি দূর
তুমি নও, প্রকৃত দেহের অস্থি অগ্নিপাত্র, ছাই
আমাকে জড়াও ত্রস্ত, ধাতুস্বপ্ন, আমাকে জড়াই

ধাঁধা

দুলাল ঘোষ

সীমানায় দাঁড়ালে আগে
দুয়ারে পড়ত এসে সটান ছায়া
আপনি খুলে যেত দ্বার
কৃশমুখ-সতত উজ্জ্বল, সেই মিহি গলা—
'আয়...আয়...কি ভাগ্য আমার—'

সুদেমূলে ফুলে ফেঁপে গড়িয়েছে জল
যদিও বা পাওয়া গেল বিস্তর খুঁজে,
আড়চোখে দেখে নিই—'বি ওয়্যার...' আছে কিনা লেখা
কোথায় কলিংবেল...
কতটা শোভন হবে গলা ছেড়ে ডাকা...

নিপুণ চোরের মত এসে
সব দেখি ধাঁধা

ঢেউ

অজিত বাইরী

নিস্তরঙ্গ বয়ে যাওয়া নয়; তোমার কাজ
ঢেউ জাগানো।

ঘটনার সঙ্গে সংঘর্ষে তুমুল আলোড়িত
হওয়া, আর বয়ে নিয়ে যাওয়া উত্তরকালে
অভিঘাত থেকে অর্জিত সময়ের অভিজ্ঞান।

পাথর নিশ্চল, নদী বক্ষে। তার কোনো
অভিব্যক্তি নেই; তাকে জাগানো, ধ্বনিত করা
তোমারই কাজ; ইতিহাস তৈরি হয় না,
সৃষ্টি করে মানুষ—সংঘর্ষে, সংগ্রামে।

নইলে শিল্পের জরায়ুতে তোমার কলম বন্ধ্যা।

আমার বয়স

সুজিত সরকার

আমার বয়স আমি নিজেই কখন ভুলে যাই।

না, এমন নয় যে জন্মসাল জানা নেই,
বিলক্ষণ জানা আছে—কেন যে নিজেকে তবু
ছোট-বড় সকলের সমসাময়িক মনে হয়।

বৃদ্ধদের তাসের আড্ডায় আমি আছি,
শিশুদের রংমশালের উৎসবেও আমি আছি,
চলচ্চিত্রে অষ্টাদশী নায়িকাকে দেখে আজও
ভিতরে ভিতরে কেঁপে উঠি—

আমার বয়স আমি নিজেই কখন ভুলে যাই।

ঈশ্বরের জন্য কয়েক লাইন

প্রবালকুমার বসু

যে শুধুই বালিতে লেখে, সূর্য উঠলে অন্ধ হয় রোজ
এইভাবে সন্তার পড়ে তোলে বালির খাতায়
যে শুধু মৃত্যু লেখে, যে তার নিজেরই আত্মজ
প্রতি রাতে দৃষ্টি ফিরে পায় যে নাম না জানা রাতের তারায়

কী লেখে সে, সমুদ্র যা দিনান্তে নেয় শুষে
শব্দগুলো ভেসে ওঠে মাঝরাতে অনন্যোপায় তারার আলোক
আমি সেই সমুদ্রের জল থেকে কয়েক ফোঁটা ধরেছি গণ্ডুষে
পুনরুদ্ধার হল, এই ভেবে অন্ধ তার মুছে ফেলে লোক

যে শুধুই বালিতে লেখে, সেই লেখা জলে থাকে ভেসে
সে লেখা ঈশ্বর পড়ে, গ্রহ তারা আলো দেয় এসে

পালক গোঁজা আকাশ

নমিতা চৌধুরী

আজকাল আকাশের গায়েও আমি
দু'একটা রঙিন পালক গুঁজে দিতে পারি
কিংবা অতিরিক্ত মেঘের ডানা
তারপর আকাশটুপি আমার মাথায়
আমি সার্কাসের দড়ির উপর লাফাতে থাকি
নিচে অগুন্তি দর্শক অফুরন্ত হাততালি
আমাকে উসকে দেয়
মেঘের উপর গা এলিয়ে জিব দিয়ে ঘষে ঘষে
মেঘেদের গা চেটে হাতের তেলোর মত পরিষ্কার করি
তারপর ডিগবাজি খাই মেঘেদের টক তেতো নোনতা
ভেজা স্বাদ আমার শরীরে লেপ্টে যায়
আমি অসহিষ্ণু হয়ে উঠি
আমার আর ডিগবাজি খেতে ভালো লাগে না
দর্শকদের হাততালি সার্কাসের সব কৌশল
ম্যাজিক বাক্সের সমস্ত বুজরুকিতে আমার
ঘেন্না ধরে যায় ট্রাপিজের ঘেরাটোপ থেকে
দুর্দান্ত লাফে ছিটকে বাইরে বেরিয়ে আসতে চাই
লাফিয়ে পড়ি বালির সমুদ্রে নোনা জলে
সেখানেও পালক গোঁজা আকাশ
আমার আশ্রয় তাঁবু

বিপন্ন ঈশ্বর

শঙ্কর বসু

গোধরায় বাতাসে যখন লাশপোড়া গন্ধ ম ম করছে
তখন চিলেকোঠার গ্যালিসপরা শকুনগুলো
আদিম উল্লাসে হল্লা বাধিয়ে দিল—
তাদের ঘাড়ের মর্চে ধরা বলবেয়ারিংয়ে
ঘূর্ণিঝড় তছনছ করে দিল সভ্যতার ইতিহাস

ভ্রূণের পেটে শিক ঢুকিয়ে মাংসের কাবাব
তৈরি করতে গিয়ে সব ভুলে গেল তারা
উপড়ে ফেলল ধর্ষিত মাটির বুক
দু'চোখে ক্লান্তির কুয়াশা মেখে পুড়িয়ে দিল
চেতনার তমসুক;
তখন খুনীরা নদীর শীতল জলে মৃত পাপ ধুয়ে ফেলছে

বিষাদে, কান্নায় পাশ ফিরে শোয় বিপন্ন ঈশ্বর।

আমাদের কবিতা এখন

কাজল চক্রবর্তী

আমাদের কবিতা এখন প্রীতি ও শুভেচ্ছায় আনন্দলোক
সব গ্রহণ করে অনায়াসে, ভণ্ডামি, তাঁবেদারি, মেঘবিলাস
যা কিছু সহজ, এমনকি দালালিও।

সেইসব দামাল অক্ষরেরা, তাদের খণ্ড খণ্ড অবসর জুড়ে জুড়ে
রচনা করে এতটুকু কামরা, ছোট্ট কার্পেট, সাজানো রবীন্দ্রনাথ
উদ্বাহু বুদ্ধকে হাসিয়ে রাখে অনায়াসে।

পারে, আমাদের কবিতা এখন অনায়াসে সব কিছু পারে
শুধুমাত্র রাস্তার অভুক্ত ভিখিরির থেকে হাত পেতে
ভুক্ত জ্যোৎস্নাটুকু গ্রহণ করতে পারে না।

জীবনের ভাঁজ

ঈশিতা ভাদুড়ী

সিগন্যালের লাল আলোর সামনে দিক্‌ভ্রান্ত আমি
খুঁজছি পথ। কি যেন ঠিকানা আমার। উত্তরে যাবো,
না, পশ্চিমে। বামে, না, দক্ষিণে। লাল আলো
জ্বলছে নিভছে।...পাশ দিয়ে হুস্ হুস্ গাড়িগুলো

যাচ্ছে চলে।...আমি একা দিক্‌ভ্রান্ত পথের মধ্যিখানে
বেমালুম হারিয়ে ফেলেছি পথ-নির্দেশ, আমার অনিবার্য
ঠিকানাটি। পাশে দাঁড়িয়ে থাকা রাস্তার কুকুরটিও অবশেষ
চলে গেল লেজ নেড়ে নিজস্ব পথে। আমি অবিচল
ন যযৌ ন তস্থৌ।...ইদানীং বড় ভুল হয়ে যায়, দিক্‌ভ্রমে
পার হয় জীবনের ভাঁজ।...

মনের পরাজয়

নন্দিতা বন্দ্যোপাধ্যায়

ঝড় কাঁপছে ঝড়ের বিষণ্ণতায়
নদী কাঁপছে অতীত ঢেউ ঘিরে
জ্যোৎস্নার বুকে অশ্রু-পীড়িত চাঁদ
মন, তুমি জানো রীতিনীতি জীবনের

অন্ন রাঁধে অন্নের সহকারী
পারাপার জানে নদীর কলতান
বসন্ত ঋতু কোকিলের ডাক চেনে
মানুষ-জীবন একটা ডুব-সাঁতার

অশ্রুরা চেনে ঘর বাড়ি উৎসব
যখন যেমন হয়—
মনই শুধু চিনতে শেখেনি
মনের পরাজয়।

ঘুম দিন
সিদ্ধার্থ সিংহ

লোকজন অনেক বেশি সহনশীল হবে।

ঠেলতে ঠেলতে বাসের একদম কোণে চেপে ধরলেও
লোকে বলবে; দাদা, একটু সরে দাঁড়াবেন, লাগছে।
কেরোসিন তেলের লাইনে যারা এসেই জোর-জবরদস্তি সামনে ঢোকে
লোকে তাদের সামনে মুখ কাচুমাচু করে বলবে;
ভাই, একটু লাইন দিন না, ভাল হয়।
যারা রকে বসে চোখের নৌকোয় পারাপার করে
দু'দিকে বিনুনি ঝোলানো মেয়েদের
লোকে তাদের বলবে; সোনা ছেলে আমার, ওরকম করতে নেই।

লোকজন অনেক বেশি সহ্য করতে শিখবে
শুধু ওদের দু'চোখে দু'চামচ নিশ্চিন্ত ঘুম দিন; ব্যস।

বন্দীর বন্দনা
শিশির সামন্ত

এই শহর,
এই বলয়, গভীর বন
ছিন্ন হয়ে নাড়ির টান
একাকী, মন

বন্দী, শুধু কান্না উপচে, পাশাপাশি
ভেবেছে তো হাইটেক কিনে নেবে,
দৌড় দৌড় চতুর্দিকে, বিদেশী জন
বণিক এসে কিনে নেবে,—কয়েকজন

কড়ির দানে, স্মৃতির রাঙা যে ইতিহাস
ঘর উঠোন, ফুলগাছ সেই, পুকুরপাড়,

কল ভেঙেছে গাছের ডাব, যে নিঃশ্বাস

গাম্য দেশ, আলো আমার, স্মৃতি আমার
শিউরে ওঠে সবলরেখা অনির্দেশ—
এই শহরে প্রেমিকা সব দুপুরবেলা
এসেছিলো, ম্যাটিনিশো, শো ভাঙার
পরে হাঁটবো, শুধু হাঁটবো, ধূম নৃত্য চক্রাকার;

এই বন্দী, এখন শুধু বন্দীর এক বন্দনা।

স্মৃতি-পাঠ

বাসব দাশগুপ্ত

প্রত্নতলে জেগেছে নিবিড় বাক্য, কত দিন আগে
সেই কথা বলেছিল প্রেমিক যুবক—
এ সময়ে বেঁচে থাকা সর্বশেষ সত্য, মনে রেখ

তারপর মহাকাশ থেকে হরপ্পা নগরে সন্ধান পর্ব চলে,
কুশল সংবাদ লেখা চিঠি আশা করে বসে থাক
সমস্ত দুপুর

তুমি যেন দারুণ মানবী, নিহত সৈন্যের স্ত্রী অথবা
উচ্ছেদ হওয়া লোকটির বোন, কলেজের সেই মেয়ে স্বপ্নতাড়িত,
শহরতলীতে; বিশ্বশহরে, গ্রামে যতবার আশ্রয় পেলে
নিরাশ্রয় তার থেকে বেশী

শুধু সন্দেহ করে জেলে রাখা যায়, সন্ত্রাস ফেরি করে
বিখ্যাত হয়ে গেছে কিছু অর্থবান, এইখানে সব ঘাস
পুড়ে গেলে তোমার বাক্য সত্য হয়ে ওঠে

শুধু বেঁচে থাকা নয়, ধাত্রীর মত বেঁচে থাক তুমি

আলোর দেরাজ

কানাইলাল জানা

ভোর রাতে আমার দু'চোখে ধারালো শিশির জমে। বেলা
বাড়লে সেই শিশির আরো ধারালো নক্ষত্র হয়ে ঝুলে থাকে
আমার অন্ধকার দেশে। আর ঠিক তখনই চারপাশের
যত রূপকথা ছেঁকে ধরে : কোথায় পেলে এত আলো!
প্রবলভাবে চূর্ণ হওয়ার চেষ্টা করি, আমার হাসি থেকে
গড়িয়ে পড়ে এক একটি শ্রাবণ মাস...

গুজরাত : এক

প্রদীপ পাল

নাও তবে ধুয়ে নাও রোমকূপ, ধুয়ে নাও অগ্রকেশ
ধুয়ে ধুয়ে সাফ করো নদীর মোহনা, নখের ধুলো
শীত ভেঙে, বসন্ত ভেঙে, এসো গ্রীষ্মের চরায়, কালোমেঘে
কলরব তোল, আমি তো জ্বালাইনি আগুন, আমি তো ভাসাইনি চিতা

নাও তবে ধুয়ে নাও ক্লেদ, ধুয়ে নাও শরীর অবশেষ
ধুয়ে ধুয়ে সাফ করো ত্রিশূলধ্বজ, উদ্যত মরচে বেওনেট
বসন্ত ভেঙে, গ্রীষ্ম ভেঙে, বর্ষার আভরণে এসো মদির সন্নিবেশে
দিন-রাত হোক কোলাহল কে ঘাতক, কেইবা দিল জীবন

ইতিহাস শুধু সাক্ষী থাকুক, তুমিই দিয়েছো ট্রেনে আগুন

পটভূমি

বিশ্বজিৎ রায়

এই থাকা না-থাকার পটভূমি প্রতিমুহূর্তের
সত্য থেকে সরে আসা অস্থির জলযান
দ্বিধার স্রোতে অবচেতনের স্রোতে ভাসতে ভাসতে অনিয়ম
জটলার ভিতর অচেনা আগন্তুক অথবা
নীল ছায়া থেকে দূরে হেঁটে যাওয়া স্তূপাকার গ্রীষ্ম—

এমনই অস্তিত্বের ভিতর প্রতিদিন ঘুরে যায় চাবি
বল্কলে খেলে বৃষ্টি ও রোদ,
আর অবিরাম স্রোতের নীচে গোঙানি—
যা আসলে চলমানতা, পরিণামহীন সময়ের...

বাঘশুমারি

তাপস রায়

মিলিত শব্দটির মানে খুঁজি। মধ্যযাম
অলৌকিক রং ভেসে আসে—গজেন্দ্রগমন
নাকি হরিণীর চঞ্চলতা চাই
তোমার ইচ্ছা থেকে আমার ইচ্ছা বিযুক্ত গলদঘর্ম ভোররাত
শয্যা নিপাট করে, স্বত ছোটাছুটি
কে কার কতখানি পশ্চাদগামিনী বর্ণময় দিনে
মন্ত্রী মহোদয়ও জানে না আগামী বাজেটে
কত কোটি তার সাথে, প্রকাশ্যে বা চুপি চুপি

সাহচর্য এক বোধ শুধু, চুক্তি কি। তুমি চাও
সে আসে—আসে না, তুমি যাও
সেও শুধু দিগন্তরেখা—ছবির আলাপ
পিঁপড়ে যাত্রায় এই-ই এক কর্মকুশলতা
এ-বাড়ি ও-বাড়ি ইতিহাস

যেকথা বলছিলাম, ভাবুন
চেয়ারের সাথে ক্লোরোফিলের সাথে
শিকড়ের সাথে মদের সাথে যৌনকর্মীর সাথে
সম্পর্কের কথা সৈন্যবাহিনীর লোকেরাও জানে
আর আমি আপনি দুধ-পোষা—পুনরায় ইতিহাস যাপন

এখন ১০৪ ডিগ্রী

রমেন্দ্রনারায়ণ নাগ

এখন ১০৪ ডিগ্রী ভাইআরাস—
ঘিলুর ভেতরে—ফুসফুসের ভেতরে—যকৃতের ভেতরে—
এখন আগুন জ্বলছে আপাদমস্তক—
হ্যালো—ফায়ার ব্রিগেড—
আ ডজন ইঞ্জিন—এস. ও. এস.

অথচ এখন বাইরে শুধুই ঝমঝম—
ওপার থেকে হাঁকলো কে উথালপাথাল দিকদিগন্ত
হেই সামালো—
এপার থেকে ভাসালো কে টালমাটাল মণিমানিক্য
হেই সামালো—

টালমাটাল অন্ধকারে—হাই ফাদার!
উই লিভিং মিলিয়নস ডাই এ্যালোন!
উথালপাথাল অন্ধকারে—তুমিও একাকীনি
জননী আমার! বিষাদ আমার!
যন্ত্রণা!

এখন এই ঝোড়ো হাওয়ার মৌলিক তাণ্ডবে
সাইরেন বাজায় এক উন্মাদ সারেঙ্গ—
১০৪ ডিগ্রী ভাইআরাস এখন
ঘিলুর ভেতরে—ফুসফুসের ভেতরে—যকৃতের ভেতরে—
হ্যালো—ফায়ার ব্রিগেড—
এখন আগুন জ্বলছে আপাদমস্তক...

সম্পাদনা দপ্তর ঃ ৮৯ মহাত্মা গান্ধী রোড, কলকাতা-৭০০ ০০৭
ব্যবস্থাপনা দপ্তর ৩৮/৬, ঝাউতলা রোড, কলকাতা-৭০০ ০১৭

অন্নদাশঙ্কর রায়

ভবেশচন্দ্র সান্যাল

ইলা মিত্র

বিজিতকুমার দত্ত

গম্ভীর সিং মুড়া

বাঁধন দাস

অরিজিৎ মিত্র

মঞ্জুষ দাশগুপ্ত
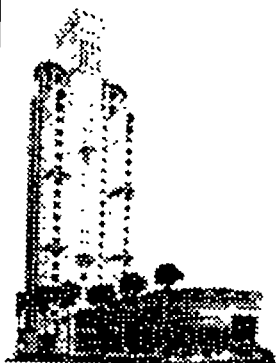
লোকসংস্কৃতি ও আদিবাসী সংস্কৃতি কেন্দ্র

প্রকাশিত পুস্তক ও ক্যাসেট তালিকা

পুস্তক তালিকা

গবেষণামূলক গ্রন্থমালা

লোকসংস্কৃতির নন্দনতত্ত্ব পবিত্র সরকার ২৫ টাকা

আদিবাসী সমাজ ও পালপার্বণ ধীরেন্দ্রনাথ বাস্কে ৪৫ টাকা

পশ্চিমবঙ্গের লৌকিক দেবদেবী ও লোকবিশ্বাস বীরেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায় ৭০ টাকা

বাউল ফকির কথা সুধীর চক্রবর্তী ২৫০ টাকা

বস্তুবাদী বাউল শক্তিনাথ ঝা ২০০ টাকা

বাংলার লোকসংস্কৃতি ও আদিবাসী সংস্কৃতি ধীরেন্দ্রনাথ বাস্কে ১০ টাকা

বাংলার প্রাচীন মৃত্তিকা ভাস্কর্য নীহার ঘোষ ৭০ টাকা

লোকায়ন চর্চার ভূমিকা অরুণকুমার রায় ৩০ টাকা

লোকশিল্প বনাম উচ্চমার্গীয় শিল্প ব্রতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় ৬০ টাকা

শিখীর দিসম বেয়া ঃ সহরায় এনেচ সেরেঞ সহদেব মুরমু ৭০ টাকা

হাওড়া জেলার লৌকিক দেবদেবী মোহনলাল মণ্ডল ৭০ টাকা

উত্তরবঙ্গের লোকনাট্য ও লোকজীবনের সুবোধ সেন ৯০ টাকা

লোকসংস্কৃতি পরিচয় গ্রন্থমালা

আলকাপ মহঃ নুরুল ইসলাম ৮০ টাকা

গম্ভীরা পুষ্পজিৎ রায় ৫০ টাকা

ডোমনি সুবোধ চৌধুরী ৬০ টাকা

লেটো বরুণকুমার চক্রবর্তী ৮০ টাকা

ঝুমুর নরনারায়ণ চট্টোপাধ্যায় ৭০ টাকা

টুসু শান্তি সিংহ ১৫০ টাকা

বোলান মোহিত রায় ৪০ টাকা

ভাওয়াইয়া সুখবিলাস বর্মা ১২৫ টাকা

ভাদু সুব্রত চক্রবর্তী ৬০ টাকা

ছৌ ইন্দ্রাণী দত্ত শতপথী ৪০ টাকা

রণনৃত্য আদিত্য মুখোপাধ্যায় ৩০ টাকা

লোককথা দিব্যজ্যোতি মজুমদার ৪০ টাকা

সীমান্ত বাংলার লোকক্রীড়া সুব্রত মুখোপাধ্যায় ৩০ টাকা

ভাটিয়ালি দিনেন্দ্র চৌধুরী ৮০ টাকা

ভাঁড়যাত্রা শ্যামল বেরা ৯০ টাকা

বাদাই গান শিবেন্দু মান্না ৪৫ টাকা

লোকশিল্পী জীবনী গ্রন্থমালা

কবিয়াল গুরুদাস পাল মালিনী ভট্টাচার্য ও প্রদীপ্ত বাগচি সঃ ৫০ টাকা

চারণকবি গুমানী দেওয়ান আবদুর রাকিব ১০০ টাকা

ঝাকসু শক্তিনাথ ঝা ২৫ টাকা

আব্বাসউদ্দিন আবুল আহসান চৌধুরী ১২০ টাকা

লোকসংগীত স্বরলিপি

গ্রামীণ গীতি সংগ্রহ স্বরলিপিসহ (প্রথম খণ্ড) দিনেন্দ্র চৌধুরী ২০০ টাকা

ভাওয়াইয়া গীতি সংগ্রহ ও স্বরলিপি শ্যামাপদ বর্মণ ৫০ টাকা

গ্রামীণ গীতি সংগ্রহ (দ্বিতীয় খণ্ড) দিনেন্দ্র চৌধুরী ২২৫ টাকা

বিবিধ গ্রন্থমালা

গ্রাম নামের উৎপত্তি : বাঁকুড়া রামশংকর চৌধুরী ২৫ টাকা

পশ্চিমবঙ্গের পটচিত্র অশোক ভট্টাচার্য সঃ ২৫০ টাকা

লোকসংস্কৃতি গ্রন্থ ও নিবন্ধপঞ্জি পল্লব সেনগুপ্ত সঃ ১০০ টাকা

লোকশ্রুতি প্রবন্ধ সংকলন মিহির ভট্টাচার্য সঃ ২০০ টাকা

পরিবেশিত পুস্তক

সাঁওতাল আর্কিটেকচার (ইংবাজি) ২০০ টাকা
সুধী প্রধান স্মারক গ্রন্থ মালিনী ভট্টাচার্য সঃ ২০০ টাকা
সাঁওতাল কাহিনী : বনবীর গাঁথা লোকনাথ দত্ত (অরুণ চৌধুরী সঃ) ৫০ টাকা
জেলা লোকসংস্কৃতি পরিচয় গ্রন্থ
বর্ধমান ১৪০ টাকা
মেদিনীপুর ১৪০ টাকা
হাওড়া ৭০ টাকা
বাঁকুড়া ১০০ টাকা
গবেষণামূলক মুখপত্র (ষান্মাসিক)
লোকশ্রুতি ১২, ১৩, ১৪ ২৫ টাকা
লোকশ্রুতি ১৫, ১৬, ১৭, ১৮, ১৯ ৪০ টাকা
লোকশ্রুতি ২০, ৫০ টাকা

বাংলা লোককথার টাইপ ও মোটিফ ইনডেকস দিব্যজ্যোতি মজুমদার ১০০ টাকা
জাগগান সুখবিলাস বর্মা ৬০ টাকা
সমাজ, সমকাল, লালনসাঁই আবুল আহসান চৌধুরী ৪০ টাকা
আব্বাসউদ্দিনের গান ৭৫ টাকা
লোকসংস্কৃতি ঐতিহাসিক ও তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ সুস্মিতা পোদ্দার ১৫০ টাকা
লোকসংগীতের সংজ্ঞা, প্রকৃতি ও বৈশিষ্ট গৌরী ভট্টাচার্য ২৫ টাকা
আদিবাসী লোককথা দিব্যজ্যোতি মজুমদার ১৫০ টাকা

ক্যাসেট তালিকা

ঝুমুর
শিল্পী : সলাবৎ মাহাতো ★ ধীরেন সর্দার ★ নবকিশোর মাহাতো ★ শ্রীবাম সহিস ★ প্রমথ সহিস ★ প্রশান্ত কুমাব ★ স্বপন দুলে

লালনের গান ১
শিল্পী : গঙ্গাধর মণ্ডল ★ তুলিকা হাজরা ★ খেজমৎ ফকির ★ মনসুর ফকির

লালনের গান ২
শিল্পী : লালু ফকির ★ কালিদাসী অধিকারী ★ সোমেন বিশ্বাস

ভাওয়াইয়া
শিল্পী : সুখবিলাস বর্মা ★ সিদ্ধেশ্বর রায ★ উত্তমকুমার দাস ★ সুমিত্রা রায়

মরমী গান
শিল্পী : দিনেন্দ্র চৌধুবী

ঝুমুর গান
শিল্পী : সলাবৎ মাহাতো

দরবেশি গান
শিল্পী : কালাচাঁদ দরবেশ

দাশরথি রায়ের পাঁচালি
শিল্পী : সুনীল ভট্টাচার্য (অথ রাবণ বধ পালা)

জাতের নামে বজ্জাতি
শিল্পী : মনসুর ফকির ★ মিনতি মহান্ত ★ শ্যামুয়েল মণ্ডল ★ খেজমৎ ফকির ★ সোমেন বিশ্বাস

ও আমার জাত গেলরে
শিল্পী : সোমেন বিশ্বাস

মূল্য—৩৫ টাকা

কমপ্যাক্ট ডিস্ক তালিকা

ঝুমুর ও বাউল

মূল্য—১৫০ টাকা

মধুসূদন মঞ্চ, ঢাকুরিয়া, কলকাতা-৭০০ ০৬৮
ফোন : ২৪৭২-৪১১৬, ফ্যাক্স : (০৩৩) ২৪৮৩-৫৪৩৭
ই-মেল : loksanskriti@vsnl.com
প্রাপ্তিস্থান : কেন্দ্রের কার্যালয় ও বাংলা আকাদেমি, কফি হাউস বইঘর, ন্যা... ন বুক এজেন্সি, দে'জ ও পুস্তক বিপণি।

আই সি এ ৬০৫৪/২০০২

পরিচয়

কার্তিক-পৌষ ১৪০৯
নভেম্বর '০২-জানুয়ারী '০৩
৪-৬ সংখ্যা ৭২ বর্ষ

প্রচ্ছদে : রবীন্দ্রনাথের ছবি

সম্পাদক
অমিতাভ দাশগুপ্ত

যুগ্ম সম্পাদক
বাসব সরকার বিশ্ববন্ধু ভট্টাচার্য

কর্মাধ্যক্ষ
পার্থপ্রতিম কুণ্ডু

সম্পাদকমণ্ডলী
ধনঞ্জয় দাশ কার্তিক লাহিড়ী
শুভ বসু অমিয় ধর

সম্পাদনা সহায়তা — অজয় চট্টোপাধ্যায়
দপ্তর সচিব — দুলাল ঘোষ

উপদেশকমণ্ডলী
হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়
মঙ্গলাচরণ চট্টোপাধ্যায় রাম বসু

সম্পাদনা দপ্তর ঃ ৮৯ মহাত্মা গান্ধী রোড, কলকাতা-৭

পার্থপ্রতিম কুণ্ডু কর্তৃক ঘোষ প্রিন্টিং ওয়ার্কস, ১৯/এইচ/এইচ, গোয়াবাগান স্ট্রিট, কলকাতা-৬ থেকে মুদ্রিত ও ব্যবস্থাপনা দপ্তর ৩০/৬, ঝাউতলা রোড, কলকাতা-১৭ থেকে প্রকাশিত।

ধূলির আখর

সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায়

॥ দুই ॥

আগের অংশটি যেখানে ছেড়ে দিয়েছি, সেখান থেকে ছেঁড়া সুতো আবার তুলে নেবার আগে মনে হল কিছু কথা বলা হয়নি। অবশ্যই আমি যৎসামান্য, সেই সামান্য-আমিরও হয়ে ওঠার স্মৃতিকথা লিখতে গেলে, যে কথাগুলি অনুক্ত রাখা সমীচীন হবে না। বলা দরকার আমার কলেজ জীবনের কিছু কিছু স্মৃতি। তা আজও অমোচনীয়। বলা দরকার কিছু কিছু ব্যক্তিগত দোষত্রুটির কথা—যেখানে অদ্যাপি আমি নিজেকে ক্ষমার্হ বলে মনে করি না। তখনকার কালে স্যারদের সঙ্গে সাধারণ ছাত্রদের সম্পর্ক কেমন ছিল তার একটা লেখচিত্র একটুও অন্তত না দিলে কালের কাছে অকৃতজ্ঞ হতে হয়। মফস্বল থেকে এসেছি। প্রেসিডেন্সি কলেজে পড়ার যোগ্যতা ছিল না। শিয়ালদহের কাছেই রিপন কলেজ। ছাত্র সংখ্যা বিস্ময়কর। সিঁড়িতে কমনরুমে, করিডোরে তিলধারণের স্থান নেই। প্রথম প্রথম দমবন্ধ দিশাহারা অবস্থা। দিশা একটু একটু করে ফিরে পেলাম। আজও দেখতে পাই সিঁড়ি দিয়ে মৃদুকণ্ঠে কথা বলতে বলতে নামছেন বিষ্ণু দে বুদ্ধদেব বসু। মাপা পদক্ষেপে উঠে গেলেন শ্রদ্ধেয় হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়। এক একদিন এক একরকম পোশাকে বিমলাপ্রসাদ গল্প করছেন অনাড়ম্বর বেশভূষার এক মানুষের সঙ্গে। অনুমান করি শেষোক্ত ব্যক্তির কোনো সকৌতুক মন্তব্য হাসির মুক্ত আবহাওয়া এনে দিয়েছে শিক্ষকগৃহে—এ ব্যক্তি প্রমথনাথ বিশী। তাঁদের সরস বাক্যালাপের বিবরণ শুনেছি বিমলাপ্রসাদবাবুর মুখে। পুজোর ছুটির মুখে একটা বড় ক্লাস সেরে বিমলাপ্রসাদ শিক্ষক বিশ্রামাগারে ফিরে গিয়ে প্রমথনাথকে বলছেন—কবে ছুটি পড়বে বলুন তো, আর তো পারা যায় না সেই গরমের ছুটির শেষ থেকে সমানে এদের একই পঁচাত্তরটা মুখ দেখে দেখে ক্লান্ত হয়ে গেলাম যে। প্রমথনাথ মৃদু হেসে জবাব দিলেন—ওদের কথাটাও একটু ভাববেন, আপনি তো তবু পঁচাত্তরটা মুখ দেখতে পাচ্ছেন, ওরা যে একখানি মুখই আড়াই মাস ধরে দেখে আসছে। ছাত্র এবং শিক্ষকের সমীহ-সম্ভব দূরত্বের মধ্যেও রফাভাব হত না। চতুর্থ বর্ষে ক্লাসে একটি নতুন মুখ দেখে অধ্যাপক বিশী জিজ্ঞাসা করলেন, তুমি কোথা থেকে এলে বাপু। নবাগত ছাত্রটি জবাব দিল সে স্কটিশ থেকে ট্রান্সফার নিয়ে এসেছে। বলা দরকার তখন রিপনে সহপাঠ ছিল না। অধ্যাপক বিশীর সকৌতুক জিজ্ঞাসা ক্লাসে হাস্যরোল সৃষ্টি করল—তোমার এরকম প্যারাডাইস লস্ট কেন? আমরা অনুভব করতে পারতাম আমাদের মতো গড়পড়তা ছাত্রদেরও স্যারেরা অবহেলা করতেন না। অরণিতে প্রকাশিত আমার একটি কবিতা বিমলাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের ভাল লেগেছিল। তিনি প্রকাশ্য ক্লাসরুমে প্রশান্ত ইংরাজিতে আমাকে বাহবা দিয়েছিলেন। সারা কলেজে আমার কবি পরিচিতি প্রতিষ্ঠিত হয়ে গেল। ফল হল ছাত্রসংসদের নির্বাচনে আমাদের ক্লাস থেকে আমি সাহিত্যবিভাগীয়

আসনে বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নির্বাচিত হলাম। নির্বাচন পরিচালক ছিলেন হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়। তিনি সেই দারুণ প্রতিদ্বন্দ্বিতার দিনের অপ্রতিদ্বন্দ্বী নির্বাচিতকে দেখতে চাইলেন—'ভাগ্যবানটি কে?' আমি উঠে দাঁড়াতে আমাকে অভিনন্দন জানালেন। অনুভব করতাম তিনি আমাকে একটু স্নেহও করতেন। স্নেহের পাত্রের বোধহয় একটু স্পর্ধা থাকে। সেই স্পর্ধায় আমি এক কাণ্ড করে ফেললাম। তখন পরাধীন ভারতবর্ষের শেষ সাধারণ নির্বাচন এসে গিয়েছে। মনুমেন্টের তলায় কম্যুনিস্ট পার্টির নির্বাচনী সমাবেশ। প্রবীণ বক্তা তখনকার সাধারণ সম্পাদক পূরণচাঁদ জোশি। আমি মিছিল করে নৈহাটির ছেলেদের নিয়ে সমাবেশে ঢুকতে চলেছি, দেখি এক পাশে ধুতি পাঞ্জাবি পরা হীরেনবাবু পাজামা পাঞ্জাবিপরা জোশিজীর সঙ্গে অন্তরঙ্গ আলাপে মগ্ন। আমার দিকে স্যারের চোখ পড়তেই আমি কোথায় তাঁকে গিয়ে প্রণাম করবো, তা নয়, মিছিল থেকেই তাঁর উদ্দেশে ডান হাত মুঠো করে লাল সেলাম জানালাম। এবং কী আশ্চর্য, সম্পূর্ণ অবিরক্ত চিত্তে সহাস্যে এক লহমাও বিলম্ব না করে আমাকে প্রত্যাভিবাদন জানালেন অধ্যাপক হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়। এই স্মৃতিটা আজও আমার মনে উজ্জ্বল হয়ে আছে—আমার আবেগময় বোকামির জন্য নয়, হীরেনবাবুর তরুণ কমরেডের প্রতি সহৃদয় উদারতার জন্য। রিপনের সাধারণ ছাত্রমণ্ডলী সম্বন্ধে অধ্যাপকেরা কী মনোভাব পোষণ করতেন হীরেনবাবুর 'তরী হতে তীরে' নামক গ্রন্থ থেকে তার কিছু অংশ আমার মন্তব্য সমেত তুলে দিচ্ছি। হীরেনবাবু মনোজ্ঞ গদ্যে বলছেন—'প্রেসিডেন্সি কলেজে যা বিরল তা এখানে সর্বদাই দেখা যেত—'ডেলি প্যাসেঞ্জারি' করে ছেলে আসে যায় কলেজে, হয়তো গোবরডাঙ্গা কিংবা নৈহাটি থেকে, সাতভোরে খেয়ে আসে, সারাদিন পেটে কিছুই হয়তো পড়ে না, অথচ লেখা-পড়ায় আগ্রহ, জ্ঞানস্পৃহায় আকুল'—এর সঙ্গে আমি মন্তব্য যোগ করেছিলাম এই—'ইয়েস স্যার, আমিও অনেকের মতো রিপন কলেজের অগণিত বিস্মৃত ডেলি প্যাসেঞ্জার ছাত্রদের একজন—কিন্তু আমাদের জীবনেও অহঙ্কারের কথাটি আপনি এমন করে স্মরণ করিয়ে দিলেন বলে ধন্যবাদ। একথা স্বীকার করতে আমার দ্বিধা নেই যে, রিপন কলেজে আপনার বহুশ্রুত পাণ্ডিত্য, সঠিক অ্যাকসেন্টে অক্সফোর্ড-সম্ভব উচ্চারণ বিলিতি পোশাক দেখে তটস্থ হয়েছিলাম বটে, কিন্তু একটু এগিয়ে গিয়েই দেখেছিলাম এসব কিছুর অন্তরে অপেক্ষমান রয়েছে একজন খাঁটি সহৃদয় স্নেহশীল বাঙালি মুখুজ্জেমশাই।'

প্রয়োজনে তিনি তিরস্কারও করেছেন। ঘটনাটি একটু খুলে বলা দরকার। আগেই বলেছি আমি আমাদের ক্লাসের সাহিত্য বিভাগীয় প্রতিনিধি নির্বাচিত হয়েছিলাম। শুধু তাই নয় সংসদ মিটিঙে আমি সর্বসম্মতিক্রমে রিপন কলেজ পত্রিকার সম্পাদকও নির্বাচিত হলাম। আমি একটা ভুল করে ফেললাম। প্রমথনাথ বিশীর সঙ্গে আমার সশ্রদ্ধ হৃদ্যতা ছিল। ডেকে কথা বলতেন তিনি। কিন্তু পত্রিকার লেখা সংগ্রহের সময় আমি তাঁর কাছে লেখা চাইলাম না। আমার দিক থেকে বলার কথা এই আমি বুদ্ধদেব বসু, বিষ্ণু দে কারো কাছেই লেখা চাইনি। পত্রিকার ইংরাজি বিভাগটি দুর্বল হয়ে যাচ্ছে দেখে আমি হীরেনবাবু ও প্রফুল্লকুমার গুহ মহাশয়ের কাছে লেখার জন্য গিয়েছিলাম। কিন্তু ঘটনাটির ব্যাখ্যা হয়ে গেল অন্য। আমাদের

বিপক্ষীয়রা আমার রাজনৈতিক ভূমিকাকে টেনে এনে জলঘোলা করতে চাইলেন। যখন হীরেনবাবু আমাকে স্টাফরুমে আমার আচরণের জন্য তিরস্কার করলেন, তখন বুঝলাম একটা উত্তাপ শিক্ষকাগারেও সঞ্চারিত হয়েছে। হীরেনবাবুর কাছে তিরস্কৃত হয়ে আমি তাড়াতাড়ি বিশী মহাশয়ের কাছে ছুটেছিলাম—কিন্তু তখন অনেক দেরি হয়ে গেছে। তিনি কঠিন ভাষাতে আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন—'তুমি আমার কাছে লেখা এখন চাইছ কেন?' আমি কী বলব ভেবে না পেয়ে উত্তর করলাম—'আপনি বড়ো লেখক বলে'। তিক্ত হেসে প্রমথনাথ জবাব দিলেন—'বড়ো লেখকদের জন্য বড়ো কাগজ আছে, তোমার কাগজে লিখতে যাবো কেন'। বুঝলাম। ক্ষতটা আমার মন থেকে কোনোদিন মুছে যায়নি। যাই হোক না কেন দোষটা আমারই।

কলকাতার প্রগতি লেখকদের অবস্থান ও ভূমিকা আমি ঠিক বুঝে উঠতে পারিনি। যতদিন সেটা ফ্যাসিবিরোধী লেখক ও শিল্পী সংঘ ছিল ততদিন মঞ্চটা ব্যাপক, প্রশস্ত ও সুপরিসর—বিচিত্র সাহিত্যিক ও শিল্পী ব্যক্তিত্ব একই ভূম্যাসনে বসে আলোচনা করছেন তার আলোকচিত্র আমরা দেখেছি। এই প্রতিষ্ঠানের পক্ষ থেকে বুদ্ধদেব বসু লিখেছিলেন 'সভ্যতা ও ফ্যাসিজম্'। কার্যকরী সভায় মাটিতে বসে সভার কাছে অংশ নিচ্ছেন তারাশঙ্কর অরুণ মিত্র বিনয় রায় শম্ভু মিত্র এবং আরো কেউ কেউ। সাতচল্লিশ সালে তারাশঙ্কর রাস্তায় দাঙ্গাবিরোধী বক্তৃতা দিচ্ছেন। মহম্মদ আলি পার্কের সম্মেলনে আমি প্রথম দেখি শেখ গোমহানিকে—তারাশঙ্কর তাঁকে নিয়ে এসেছিলেন—তারাশঙ্করই তাঁর পরিচয় দিলেন সভাসমক্ষে। তবু আমি অনুভব করতাম সংঘের ভিতরে ভিতরে একটা বাঁকা স্রোতও বইছে। তারাশঙ্করকে নিয়ে হৈচৈ করার কোনো মানে হয় না—রমেশ সেন তাঁর চেয়ে বড়ো মাপের উপন্যাস লিখেছেন। আর বিষ্ণু দে—কবি হিসাবে অনেক আগেই আটকে গেছেন। যে ব্যক্তি একথা বৌবাজারের অরণি অফিসে আমাকে বলেছিলেন বিষ্ণু দে আর কিছু করতে পারবেন না, তেভাগার লড়াইয়ের মাঠে গিয়ে লড়াকু চাষিদের জন্য ভাত রাঁধুন, তবে যদি তাঁর কিছু বাস্তব অভিজ্ঞতা হয়। আরাগঁ-গারোদি মতান্তরের জের এখানেও পৌঁছল সে কথা আগেই বলেছি। শ্রদ্ধেয় অধ্যাপক নীরেন্দ্রনাথ আরাগঁপন্থী। বিষ্ণু দে স্বভাবসঙ্গত ভাবে গারোদিকেই মদত দিলেন—আরো একপদ এগিয়ে গিয়ে বললেন, শিল্প সাহিত্যের ক্ষেত্রে পার্টি লাইন বলে কিছু থাকতে পারে না। তখন রণদিবে আমল। ঐতিহ্যের পুনর্বিচার শুরু হয়েছে। সমরেশকে আমি বললাম—এতো ঐতিহ্যের পুনর্বিচার নয়—ঐতিহ্যের লাঞ্ছনা। নীরেন রায় ভবানী সেন প্রাজ্ঞ ব্যক্তি। তাঁদের কথা তবু মন দিয়ে শোনা যায়। কিন্তু এমন এমন ব্যক্তি এই বিচারবিলাসে ঢুকে পড়লেন, যাঁরা একান্তই রবাহূত। তাঁরা তখন হাতে মাথা কাটছেন—বুর্জোয়াদের দেখতে পেলেই মাথায় নুন ছড়িয়ে খেয়ে ফেলেন আর কি। বিষ্ণু দের ব্যঙ্গতিক্ত জিজ্ঞাসাটি মোক্ষম—এই কি সংস্কৃতির লাল রাস্তা, নাকি রাস্তা তৈরি এ নয়। এ বুঝি বিপ্লব বিপ্লব খেলা।

আমি আগের সংখ্যায় 'পরিচয়'-পত্রে 'দ্বীপপুঞ্জ' নামে নরেন্দ্রনাথ মিত্রের উপন্যাসটি কীভাবে আমার হাতে সমালোচনার জন্য এল সে কথা বলেছি। এই মন্তব্য করে আগের কিস্তি শেষ করেছিলাম যে এর জল অনেক দূর গড়াল। এবার সেই গড়ানো জলের ধাক্কা

আমার উপরে কীভাবে কতটা এসে পড়ল সে কাহিনীটি বলা দরকার। আমার জীবনের সামান্য ইতিকথায় সে ঘটনার দূর প্রভাবী প্রতিক্রিয়া অন্তত আমার কাছে অবিস্মরণীয়। কম্যুনিস্ট পার্টির সাংস্কৃতিক ফ্রন্টে চিড় যে ধরেছে সেটা বোঝা যাচ্ছে। পার্টির সর্বভারতীয় ইংরাজি সাপ্তাহিকে তারাশঙ্করের বেশ বড় ছবি সমেত আওয়ার ফোরমোস্ট নভেলিস্ট এই শিরোনামে প্রবন্ধ ছাপা হল—লেখক প্রখ্যাত মার্কসবাদী বুদ্ধিজীবী হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়। পার্টির মাঝারি মাপের পণ্ডিতমন্য—যাঁদের কথা একটু আগে বললাম তাঁরা একটা বিদ্বিষ্ট গুঞ্জন সৃষ্টি করলেন। এই সব চোরা গোপ্তা আক্রমণের সব থেকে বড়ো লক্ষ্য হলেন বিষ্ণু দে। বলা হতে লাগল এই আত্মম্ভরী ভদ্রলোক প্রচণ্ড বৈদগ্ধ্যাভিমানী—ইনি ঘরে সবুজ আলো জ্বালিয়ে প্রকৃতির কবিতা লেখেন, লাল আলো জ্বালিয়ে বিপ্লবের কবিতা। নতুন তাত্ত্বিক অবস্থানে কম্যুনিস্ট পার্টির তাত্ত্বিক মুখপত্র 'মার্কসবাদী'র চতুর্থ সংখ্যায় প্রকাশিত হল 'বাংলা প্রগতি সাহিত্যের আত্মসমালোচনা'—লেখক প্রকাশ রায়। সুবিখ্যাত 'মার্কসবাদী সাহিত্য-বিতর্ক' গ্রন্থের সম্পাদক ধনঞ্জয় দাশ জানাচ্ছেন প্রকাশ রায় সাহিত্যিক সাংবাদিক প্রদ্যোৎ গুহের ছদ্মনাম। সমস্ত আলোচনাটি থেকে লেখকের সাহিত্য চেতনার কোনো প্রমাণ মেলে না। 'আমি আর আমার মামু ছাড়া গাঁয়ের সবাই চোর, দারোগাবাবু'—এই বিখ্যাত গ্রাম্য প্রবাদটির একটি প্রতিরূপ লেখকের আলোচনাটিতে ফুটে উঠেছে। ওই প্রবন্ধের একটি পরিচ্ছেদের নাম ছিল 'লেজুড় মনোবৃত্তি'। লেজুড় মানে বুর্জোয়া মনোবৃত্তির লেজুড়। ওই পরিচ্ছেদে আরো নানাজনকে বধ করার পর প্রকাশ রায় পড়লেন আমাকে নিয়ে—উপলক্ষ্য সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায় ও দ্বীপপুঞ্জ উপন্যাসের সমালোচনা। বলা দরকার প্রকাশ রায় সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায় নাম উচ্চারণ করতেও ঘৃণা বোধ করেছেন, 'পরিচয়ের সমালোচক' এই অভিধায় তিনি আমাকে চিহ্নিত করেছেন। আলোচনার প্রারম্ভিক বাক্যটি ছিল—'লেজুড় মনোভাবের কদর্য এবং উৎকট প্রকাশ হয়েছে নরেন্দ্রনাথ মিত্রের 'দ্বীপপুঞ্জ' উপন্যাসের সমালোচনায় (ফাল্গুন ১৩৫৫)।' বলা হল আমি 'মার্কসবাদী বিবেকের দংশনকে উড়িয়ে দিতে' কিছুমাত্র দেরি করিনি। এমন একটি গল্পকে আমি প্রশংসা করেছি যা মোটেই বিশুদ্ধ গল্প নয়। প্রকাশ রায় আমার আলোচনাকে বললেন 'আবিলতায় তরল'। তিনি ফতোয়া দিলেন—'নরেন্দ্র মিত্র বা তাঁর উপন্যাস বাংলা সাহিত্যের ভীড়ে কোনো বিশিষ্টতারই দাবী করতে পারে না, তবু তাঁর সম্পর্কে এতখানি স্থানের অপব্যয় করতে হল এই কারণেই যে, তথাকথিত 'বিশুদ্ধ' গল্প সম্পর্কে আমাদের মোহটা যে কি রূপ নিয়েছে, এই সমালোচনার মধ্যেই তা প্রকট।' এই কি সংস্কৃতির লাল রাস্তা—প্রশ্নটা আমাদের মনে ক্রমশ ধূমায়িত হতে। একে একে সবাইকে কোতল করে প্রকাশ রায় তাঁর সুদীর্ঘ প্রবন্ধ শেষ করলেন এইভাবে, লোককবি গুরুদাস পালের চারটি পংক্তি তিনি উদ্ধৃত করলেন :

'নির্বিচারে নরনারী ছাত্রছাত্রী হত্যা
এই যদি হয় শিশুরাষ্ট্রের আইন নিরাপত্তা,
তবে আমি সভার মাঝে উচ্চকণ্ঠে কহি,
পাঁচশো হাজার অসংখ্যবার আমি রাজদ্রোহী।

বিষ্ণু দে-র মতো তথাকথিত 'ভদ্র' কবিরা রচনা করুন তো দেখি এমন কবিতা, তাঁদের মুরোদ বুঝি। কিন্তু বিষ্ণু বাবুদের তা সাধ্যাতীত—কোথায় পাবেন বুর্জোয়াদের বশংবদ সংস্কৃতিবিদেরা এই প্রাণশক্তি।' আমার কাছে প্রকাশ রায়ের এই রচনাটি একটি বিস্ময়কর থাপ্পড়। আরো দুটো থাপ্পড় খেয়েছি। প্রকাশ রায়ের লেখাটির হাতা এবং মাথা, মাথা এবং মুণ্ডু কিছুই আমার বোধগম্য হল না, অন্য দুটি থাপ্পড়ও আমার কাছে থেকে গেল বোধাতীত। এই দুটি থাপ্পড় আমি খেলাম দমদম সেন্ট্রাল জেলে। উনপঞ্চাশ সালে চব্বিশ ঘণ্টা আড়াআড়ি সমরেশ এবং আমি জেলবন্দী হয়ে গেলাম। সমরেশ গ্রেপ্তার হল কলকাতায় পার্টির একটা গোপন ঘাঁটি থেকে। তাকে নিরাপত্তা আইনে আটক করে প্রেসিডেন্সি জেলে পাঠিয়ে দেওয়া হল। আমাকে আমার বাড়ি থেকে সশস্ত্র পুলিশবাহিনী এক শীতের শেষরাত্রে তুলে নিল। জামিন যোগ্য নয় এমন বোধহয় ছটা অভিযোগ আমার নামে—আমি আমার উকিলের কাছে শুনলাম নারীহরণ ছাড়া ফৌজদারী দণ্ডবিধির বেশ কয়েকটি ধারায় আমাকে অভিযুক্ত করা হয়েছে—মানে আটক করাটাই আসল উদ্দেশ্য। আমাকে পাঠানো হল দমদমে।

এখানে আমার কারাকাহিনী ফলাও করে বলার একটা সুযোগ আছে। কিন্তু আমি সে সুযোগ নেব না। প্রথম কারণ এই সময়ের জেলখানার অভিজ্ঞতাকে ভিত্তি করে একাধিক উপন্যাস লেখা হয়েছে। আমার একটি উপন্যাসে—যা 'পরিচয়' পত্রেই ধারাবাহিক প্রকাশিত হয়েছিল—'গোলাপ হয়ে উঠবে'-তে সে অভিজ্ঞতার খানিকটা বর্ণনা দিয়েছি। আবার সেই পুরানো কথার কচকচি ভাল লাগবে না। তবু জেলখানাতেই আমি প্রথম থাপ্পড় খেলাম। জোলিও কুরি কলকাতায় এলেন যুদ্ধবিরোধী সম্মেলন উপলক্ষ্যে। আশা করেছিলাম ময়দানের প্রকাশ্য সমাবেশে এতগুলি বামপন্থী নারীপুরুষ বিনাবিচারে, অবিচারে আটক রয়েছেন, সে সম্বন্ধে তিনি কিছু বলবেন। আমরা একটু হতাশ হলাম তিনি কিছু বললেন না বলে। দ্বিতীয় থাপ্পড়টির কথা আমার উপন্যাসে আছে। একদিন সকালে তখনকার 'দ্য নেশন' পত্রিকার একটি প্রবন্ধ ও সংবাদ মারফৎ আমরা জানলাম আমাদের তত্ত্বে ও রণনীতিতে ভ্রান্তি আছে। আমরা ভুল পথের পথিক হয়েছিলাম। আমার এ-কাহিনী আমার রাজনৈতিক জীবনের ইতিবৃত্ত নয়—আমি পার্টি সদস্যও ছিলাম না। আমি সেদিনও যেমন আজও তাই—কম্যুনিস্টদের সহযাত্রী। কিন্তু সেদিনের 'নেশন' পত্রিকার অভিঘাতে নিস্তব্ধ জেলখানার অঙ্গণের মুহ্যমান অবস্থার কথা আমার স্মৃতিতে মুদ্রাঙ্কিত হয়ে রয়েছে। যে মালবেরি গাছটার গোড়ায় কয়েকমাস আগে লকআপ প্রত্যাখ্যান কারণে জেল বিদ্রোহের অভিযোগে দুটি ছেলেকে পুলিস গুলি করে মেরেছিল, তাদের রক্তের দাগ তখনো বুঝি মুছে যায়নি। সেই মালবেরি গাছের তলায় দাঁড়িয়ে একজন নিঃশব্দে চোখের জল ফেলছেন—বলছেন—ভুল, সবই ভুল—এখন আমি নিজের কাছে কী জবাবদিহি করব। করুণ গাম্ভীর্যের মাঝখানে ইতিহাস বিধাতা একটু কমিক রিলিফের ব্যবস্থা করতে ভোলেন নি। সেবার ছাব্বিশে জানুয়ারি প্রথম সাধারণতন্ত্র দিবস। জেল কর্তৃপক্ষ স্থির করলেন এদিন সন্ধ্যায় আহারের শেষে সকল রাজবন্দীকে পায়স খাওয়ানো হবে। তুমুল উষ্মা দেখা দিল। বিপুল মতভেদ দেখা দিল, এ পায়স আমরা খাব কিনা তাই নিয়ে। একদল বললেন—এ পায়স প্রত্যাখ্যান করা হোক। আরেকদল বললেন—ব্যাপারটিকে

উপেক্ষা করা হোক। শেষ পর্যন্ত স্থির হল আমরা পায়স খাবো—কিন্তু হাসি মুখে খাবো না। আমরা বিরস গম্ভীর মুখে পায়স খেয়ে বিপ্লবী কর্তব্য সম্পন্ন করলাম।

জেল থেকে ছাড়া পেলাম। বেরিয়ে এলাম সম্পূর্ণ ভাঙা মন নিয়ে। আমরা তখন বিশ্বাস হারিয়ে ফেলেছি। পরস্পরকে সন্দেহ করছি। বিপ্লব নয়, আর্মড্ ইন্‌সারেক্‌শন নয়, আমরা যেন এক আজব খেলায় মেতে উঠেছিলাম। সমুদ্রের আন্দোলন বানডাকা সন্ত্রাসে নিঃশেষ। বাড়ি ফিরে এলাম—দেখলাম কলমও হারিয়ে ফেলেছি—যাকে আমি ভেবেছিলাম আমার আসল অভিজ্ঞান সে বুঝি আমাকে ছেড়ে গেছে। 'অরণি' উঠে গেছে। অরুণদা ফ্রান্সে। আমার নামে রটানো হল আমি 'ডরপুক আদমি'—আমার সিয়াশি খেয়ালে ঘাটতি আছে। কেন লিখব, কী হবে লিখে। এক নিদারুণ নৈঃশব্দ্য এবং নৈষ্কর্ম্য আমাকে গ্রাস করে ফেলল। এমন সময় হাতে এল এক কপি বিষ্ণু দে-র কবিতার বই 'অন্বিষ্ট'—সেই 'বুর্জোয়াদের বশংবদ' কবি বিষ্ণু দে। আমার বা আমার মতো আরো অনেকের সামগ্রিক নিয়তি যেন বিষ্ণু দের কবিতায় কথা বলে উঠল :

> তোমাকে জানি বিশ বছর বাইশ
> কতোকাল যে তোমার কানাকানি।
> তুমি অশেষ, তোমাকে জানাজানি
> দেশে ও কালে ব্যাপ্ত দশদিশি
> তোমার আসা ইতিহাসের কাল।...
> বিজ্ঞ বলে এ বুর্জোয়া চাল।

এক উদ্‌ভাসিত মুহূর্তে আমি যেন সেই 'তুমি'-কে চিনে নিলাম। বুঝে নিলাম রবীন্দ্রনাথের 'তুমি'-র মতো এই তুমিও বহুমাত্রিক। আমি অমিত প্রত্যয় পেলাম এ কথায় 'কুৎসা শুধু কুয়াসা, হবে ভোর, উষায় যাবে অসহিষ্ণু ঘোর।' আমি পেয়ে গেলাম এই বোধ যে, এই 'তুমি'-ই আমার সব—আমার উপজীব্য, আমার অবলম্বন, আমার আশ্রয়, আমার শান্তি এবং অশান্তিও। 'অন্বিষ্ট'-এর শেষ কবিতা 'জল দাও'। এই কবিতাটির শেষাংশ পড়তে পড়তে আমার অশ্রুস্নান সম্পূর্ণ হল। আমারও মনে জাগল এই কথা—'তোমার স্রোতের বুঝি শেষ নেই।' আমার পুনর্দীপন ঘটল। আমিও যেন বলে উঠলাম :

> আমি দূরে নও বা কাছে পালে পালে কখনও বা হালে
> তোমার স্রোতের সহযাত্রী চলি ভোলো তুমি পাছে
> তাই চলি সর্বদাই।

আমি যার কাছ থেকে বইটি ধার নিয়েছিলাম তাকে বইটি ফিরিয়ে দিলাম। তারপরে বেশ করে ভেবেচিন্তে, অনেক ইতস্তত করে বিষ্ণু দে-কে একখানি চিঠি লিখে ফেললাম। শোনা ছিল বিষ্ণুবাবু খুবই উন্নাসিক, শোনা ছিল তিনি তির্যক চোখে সবাইকে পরিমাপ করে তার মূল্য নির্ণয় করেন। আমার চিঠিখানি তিনি নিশ্চয় সেন্টিমেন্টাল রাবিশ বলে ফেলে দেবেন—এই ম্লান মফস্বলীয়াকে তিনি পাত্তা দেবেন কেন। কিন্তু কী আশ্চর্য চিঠিটি ডাকে দেবার চতুর্থ দিনে আমি একটি চিঠি ও একটি বুকপোস্ট পেলাম। বুকপোস্টের মোড়ক ছাড়িয়ে

বেরিয়ে এল এক কপি 'অন্বিষ্ট'—প্রাণকৃষ্ণ পালের অপূর্ব প্রচ্ছদচিত্রের মাথায় লেখা 'সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায়ের করকমলে বিষ্ণু দে।' চিঠিটা সংক্ষিপ্ত—'তোমার চিঠি পেয়ে ভাল লাগল, কেননা এতো এক আধুনিক কবির কারাবাসের পরের কথা—একদিন দেখা হলে খুশি হবো।' সংক্ষিপ্ত চিঠি। কিন্তু এর মধ্যে দুটি কথা আমাকে যেন বলল, ব্যর্থ প্রাণের আবর্জনা পুড়িয়ে ফেলে আগুন জ্বালো। আমি যে আধুনিক কবি এই স্বীকৃতি চিঠিটির মধ্যে রয়েছে। আর রয়েছে একটি আন্তরিক আমন্ত্রণ। শুরু হল বিষ্ণু দে-র সঙ্গে আমার দীর্ঘ পত্রালাপের পালা।

এই ফাঁকে আমার যে জীবন একান্ত ব্যক্তিগত, যে বিষয়ে মুখরতা অবাঞ্ছনীয়ও বটে, সে কথা একটু বলে না নিলে ব্যক্তিমানুষটার একটা বড় ভগ্নাংশ বাদ পড়ে যায়। গরিফা স্কুলের সামান্য চাকরিটুকু সম্বল করেই আমি আমার মায়ের সনির্বন্ধ অনুরোধে বিয়ে করে ফেললাম। আমার মায়ের এক বান্ধবীকে মা কথা দিয়েছিলেন। তখন বালিকাটি সপ্তম শ্রেণীতে পড়ে—আমি প্রথম বর্ষে। এখন সে ইন্টারমিডিয়েট পাশ করেছে—আমি স্কুল শিক্ষক—জেল ফেরত কম্যুনিস্ট। আমি মেয়েটিকে বলে পাঠালাম, সে ইচ্ছা করলে কেটে পড়তে পারে। সে উত্তর পাঠিয়েছিল তার মায়ের মারফৎ, এরকম কোনো অভিপ্রায়ই তার নেই। সেই আঠারো বছরের মেয়েটি আমাদের বাড়িতে ঢুকেই সবাইকে বশ করে ফেলল। শাশুড়ী বউয়ের এমন পারস্পরিক সশ্রদ্ধ সম্পর্ক আমি কোনো উপন্যাসেও পড়িনি। যৌথ পরিবার। বাড়িতে মেলা আত্মীয়স্বজন—সকলেই সব সময় খুঁজছে তাকে। নিজের দেবরেরা এবং জ্ঞাতি সম্পর্কিত দেবরেরা তাকে মাথায় করে রেখেছে। সেও তাদের বুকে করে রেখেছে। তাদের স্ত্রী পুত্রকন্যাদের অঢেল ভালবাসা সে পেয়েছে। জীবনের প্রথম তিনটে বছর যখন দুঃসহ দারিদ্র্য, একমাত্র পুত্রের অন্নপ্রাশনটাও ঠিকভাবে দিতে পারলাম না, তখনো তার হাসিমুখ ম্লান হতে দেখিনি। তৃতীয় বৎসরে আমি স্কুল ছেড়ে কলেজে যোগ দিলাম। ওই বছরই আমি একটি কন্যাসন্তানও পেলাম।

আমার কলেজে চাকরি পাবার ব্যাপারটা একটু বিস্তারিত করে বলতে হবে। কেননা একটা সময়ের পরিচয় পাওয়া যাবে সে ঘটনার ভিতর দিয়ে। আমি যখন বিশ্ববিদ্যালয়ে শেষ বর্ষের ছাত্র তখন নৈহাটি কলেজের প্রতিষ্ঠা। নতুন কলেজে অধ্যাপনা করব এ বাসনা মনের মধ্যে ছিল। কিন্তু কলেজ পরিচালন কমিটি আমার যোগ্যতা অপেক্ষা আমার রাজনৈতিক মতাদর্শকে গুরুত্ব দিলেন বেশি—সেটা এমনই প্রতিবন্ধক হল যে তাঁরা আমাকে নির্বাচনী ইন্টারভিউতেই ডাকলেন না। অধ্যক্ষ মহাশয় বহিরাগত। উপাধ্যক্ষই একমাত্র আমাকে জানতেন। একটি সাংস্কৃতিক সমাবেশে আমি একটি ছোট বক্তৃতা দিচ্ছি, দেখি অধ্যক্ষ উপাধ্যক্ষ দুজনে কানাকানি করছেন। সভা শেষে অধ্যক্ষ আমাকে কাছে ডেকে বললেন—কয়েকদিনের মধ্যে কাগজে বিজ্ঞাপন বেরুবে, আমাদের একজন বাংলার অধ্যাপক দরকার। আপনি কিছু আশা করবেন না। তবে দরখাস্ত করুন। বলা দরকার এর মধ্যে আগের পরিচালন সমিতি বিশ্ববিদ্যালয়ের নির্দেশে বাতিল হয়ে গিয়েছে। দরখাস্ত করলাম। একদিন অধ্যক্ষ মহাশয় আমাকে ডেকে বললেন—'দেখুন, আপনার কেস খুব জটিল। এর মধ্যেই আমি একজন কম্যুনিস্টকে কলেজে ঢোকাতে চাইছি বলে ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে দুখানি বেনামি চিঠি গেছে।'

ম্যাজিস্ট্রেট তৎকালীন কলেজ পরিচালন কমিটির সভাপতি। চিঠি সহসভাপতির কাছেও পৌঁছেচে। তিনি একজন অবসরপ্রাপ্ত আই. এ. এস.। তাঁরা দুজনেই মন্তব্যশূন্য অবস্থায় চিঠিগুলি অধ্যক্ষ মহাশয়ের কাছে পাঠিয়ে দিয়েছেন। মেঘের আড়ালের মেঘনাদটি কলেজেরই একজন অধ্যাপক বলে আমার মনে হল। নামটা আর উচ্চারণ করলাম না। অধ্যক্ষ কিন্তু সঠিক অনুমান করেছিলেন। তখন সবে ওপার বাংলা থেকে উদ্বাস্তু মানুষজন—গুণী সজ্জনও যথেষ্ট এপার বাংলায় চলে আসছেন। তাঁরা অনেকেই এদিকে চাকরি খুঁজছেন। কারো আবেদনপত্রের সঙ্গে সিনিয়র অশোক মিত্রের সুপারিশপত্র, কারো সঙ্গে বা অন্নদাশঙ্করের। ডবল এম. এ. দেড় গণ্ডা। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম শ্রেণীও একজন আছেন। অধ্যক্ষ মহাশয় আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কারো কাছ থেকে আমি আমার প্রার্থী ভূমিকার অন্তত একটা সমর্থনপত্র নিয়ে আসতে পারি কিনা। কিছু বললাম না। সারারাত ভাবলাম। অধ্যাপকদের শতহস্ত দূরে থাকতাম। কিন্তু মনে হল একজন আমাকে মনে রাখলেও রাখতে পারেন। তাঁর ক্লাসে তিনি একদিন রবীন্দ্রনাথের .শেষসপ্তক থেকে একটি কবিতার রসগ্রাহী ব্যাখ্যা লিখতে দিয়েছিলেন। আমার ব্যাখ্যাটি পড়ে তিনি হেসে বলেছিলেন—রবীন্দ্রনাথের কবিতাটি অবশ্যই ব্যাখ্যাগম্য, কিন্তু তোমার ব্যাখ্যাটি ততোধিক ব্যাখ্যাগম্য। এমন দুঃসাহসী ছাত্রকে কোনো অধ্যাপক ভোলেন না। আমি ঠিক করলাম তাঁর কাছেই যাব। যাচ্ঞ মোঘা বরমধিগুণে নাধমে লব্ধকামা। কোথায় যাচ্ছি কাউকে প্রায় না বলেই বিশ্ববিদ্যালয়ে চলে গেলাম। গ্রীষ্মের দুপুর। অভুক্ত, অস্নাত। বসেই আছি, বসেই আছি। তারপরে তাঁকে পেয়ে গেলাম। আমি ঠিকই অনুমান করেছি—কোনো নির্বোধ উত্তরদাতাকে কোনো স্যার ভোলেন না। তিনি আমায় চিনতে পারলেন। 'এসো' এই সহৃদয় আহ্বানে আমার সব সংশয় ঘুচে গেল। মনে হল এই তো যথেষ্ট। বসতে বললেন। আমি তখন ভাবছি—চলে যাই। এই ঋষিকল্প আচার্যকে দিয়ে আমি যা করাতে চাইছি তা শালগ্রাম শিলা দিয়ে বাটনা বাটার সামিল। 'কিছু একটা বলবে মনে হচ্ছে'। আমি বলেই ফেললাম। স্যার একটু গম্ভীর হয়ে গেলেন। বললেন, 'একাজ করাটা আমার পক্ষে সমীচীন হবে না।' আমি হাঁফ ছেড়ে বললাম—'তবে থাক, আপনাকে বিরক্ত করব না।' আমার দিকে তাকিয়ে ওঁর কী মনে হল, বললেন, 'এতদিন কী করছিলে?' ওঁকে সব বললাম। জেলজীবনের অভিজ্ঞতার কথাও বললাম। জিজ্ঞাসা করলেন—'এর মধ্যে কী পড়লে বল।' আমি জানালাম—টলস্টয়ের 'ওয়ার অ্যাণ্ড পীস' আদ্যোপান্ত সবে শেষ করেছি।' স্যার তখন 'ওয়ার অ্যাণ্ড পীস' থেকে নানা প্রশ্ন আলোচনা ছলে তুললেন। অনেকক্ষণ ধরে আলোচনা চলল। শিখলাম জানলামও অনেক কিছু। তারপরে আবার বললেন 'বোস একটু।' নিজের ব্যক্তিগত লেটার প্যাডে একখানি চিঠি লিখলেন। খামে মুড়ে, সিল করে, ঋষি বঙ্কিমচন্দ্র কলেজের পরিচালক সমিতির সম্পাদক, অর্থাৎ অধ্যক্ষ মহাশয়ের নাম লিখে, খামটি আমার হাতে দিলেন। আমি বাড়ি ফেরার আগে নৈহাটি স্টেশনে নেমে কলেজে গেলাম। অধ্যক্ষ জিজ্ঞাসা করলেন, কোথা থেকে? বললাম, বিশ্ববিদ্যালয়ে গিয়েছিলাম। কাজ করতে করতে নিরাসক্ত কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করলেন—'কারেও পাইলেন?' আমি চিঠিখানি হাতে ধরিয়ে দিয়ে বললাম—'ডক্টর শশিভূষণ দাশগুপ্ত'। কাজ

থামিয়ে বিস্মিত গলায় অধ্যক্ষ বললেন—'কন কী, ডক্টর শশিভূষণ দাশগুপ্ত!' চিঠিখানি পড়ে তৃপ্ত কণ্ঠে তিনি বললেন—'বাঃ, যান গিয়া ঘুমান গে।' আমি বুঝলাম এখানে 'যান' মানে 'আসুন'। ওই চিঠিতে কী ছিল আমি জানি না। শুধু জানি ওই চিঠির জোরেই আমি প্রতিকূলতাকে জয় করেছিলাম। স্যারকে যখন খবরটা দিলাম, স্যার বলেছিলেন—এবার একটু পড়াশুনো কর। সেটাই করা হয়ে উঠল না।

এদিকের খবর তো এই, ওদিকের খবর? ওদিকে নতুন দুইজনের সঙ্গে আলাপ হয়েছে। একজন মঙ্গলাচরণ চট্টোপাধ্যায়। অপরজন 'নতুন সাহিত্য' সম্পাদক অনিলকুমার সিংহ। মঙ্গলাচরণ তখন 'পরিচয়'-এ কবিতার দিকটা দেখতেন। আমার একটি কবিতা প্রসঙ্গে তিনি আমায় একবার দেখা করতে বললেন। আমি তাঁর কবিতার অনুরাগী আগে থেকেই। যখন তখন যথা মুখস্ত আবৃত্তি করতাম :

প্রভু আমার ঐক্য বিধায়ক হে
দূরে তাকাই দূরে আমার লক্ষ্যে
কিছু না শুধু অথৈ জল হারানো দিক্‌চিহ্ন

অথবা 'ইস্কুল' কবিতা, কিম্বা সুকান্তের মৃত্যুতে তাঁর অসামান্য কবিতা :

আকাশ যদি সূর্য ঝরা চোখে অগাধ অন্ধকার
যাই

এ যেন সুকান্তের কবিতারই উল্টোপিঠ :

গোধূলি আকাশ বলে গেল
তোমার মরণ অতি কাছে,
তোমার বিপুল পৃথিবীতে
তথাপি বসন্ত বেঁচে আছে।

আমি 'শাঁখা সিঁদুর' নামে একটি কবিতা পাঠিয়েছিলাম। আহ্বানটা সেই কবিতা প্রসঙ্গে। সেই আমার প্রথম মঙ্গলাচরণের সঙ্গে মুখোমুখি দেখা হওয়া। বিদ্যাসাগর স্ট্রিটে তখন 'পরিচয়' দপ্তর। আমার ধারণা মঙ্গলাচরণ আজও সেই প্রথম সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায় দর্শনের কথা ভোলেন নি। মামাশ্বশুর বাড়ি নিমন্ত্রণ রক্ষা করে পরিচয় অফিসে গেছি—পরণে নতুন বরের গরদের পাঞ্জাবি, জরিপাড় ধূতি, কাঁধে পাড়ওয়ালা কাশ্মিরী শাল, পায়ে সোয়েটের পাম্প শু—হাতে পাথর বসানো আংটি। ফুলসার্ট পরা, আটপৌরে পোশাকের মঙ্গলাচরণ কখনো এমন পোশাকের কাউকে 'পরিচয়'-এ দেখেন নি। স্বভাবতই তিনি স্তম্ভিত। দশ সেকেণ্ড বাদে বললেন—বসুন। তখন আমি আত্মপরিচয় দিলাম। এবার মঙ্গলাচরণ একটু সহজ হলেন—আলোচনা শুরু হল। 'শাঁখা সিঁদুর' কবিতাটি যে আমার সামান্য পদ্যকার জীবনে একটি পথসন্ধির নির্দেশক সে কথা বললেন। স্বল্পভাষী, মৃদুকণ্ঠ মঙ্গলাচরণকে আমার খুব ভাল লাগল। তিনি কিন্তু মাঝে মাঝেই আমার অপরূপ সাজ পোশাকের দিকে তাকাচ্ছিলেন। মঙ্গলাচরণ পরে সমরেশকে আমার কথা বলতে গিয়ে জিজ্ঞাসা করেছিলেন—'উনি খুব সাজতে

ভালবাসেন? না?' সমরেশ বলেছিল—না তো, লংক্লথের আস্তিন গোটানো পাঞ্জাবি, মোটা মিলের ধুতি আর ফিতে ওল্টানো কাবলি জুতো—এই তো ওর পোশাক বলে জানি। মঙ্গলাচরণ তখন আমার পোশাকের বর্ণনা সমরেশকে দিয়েছিলেন। সমরেশ হতবাক হয়ে মন্তব্য করেছিল—বিয়ে করে মাথা খারাপ হয়ে গেল নাকি? আমাকে সমরেশ বলেছিল কথাটা। এই ঘটনার পর আমি আর কোনোদিন গরদের পাঞ্জাবি পরিনি।

মণীন্দ্র রায়ের সঙ্গে আমার আগে থেকেই আলাপ ছিল। মঙ্গলাচরণের সৌজন্যে এবার সে আলাপ সখ্যে প্রগাঢ় হয়ে উঠল। দ্বিতীয় পর্যায়ের আলাপ হল মহাত্মা গান্ধি রোডের পরিচয় অফিসের দরজায়। আমি তখন বেশ একটু মোটা হয়ে গেছি। মণীন্দ্র রায় আমার দিকে দ্বিতীয়বার তাকিয়ে বললেন—'সরোজবাবু না, আমারও তাই মনে হচ্ছে উসকো হাম কাঁহাপরি দেখা থা।' গল্পের উৎসটি তারপরেই স্বচ্ছ করে দিলেন। এক সর্দারজী কোন্ কিশোরবেলায় আয়নায় একবার নিজেকে দেখেছিল। তারপর কলকাতায় এসে একদিন এক চুলকাটাই সেলুনে নিজের ছায়া প্রমাণ সাইজের আয়নায় প্রতিফলিত দেখে স্বগতোক্তি করেছিলেন—'শালাকো হাম কাঁহাপরি না কাঁহাপরি একরোজ দেখা থা।' 'পরিচয়ে'র গল্প শুরু হলে শেষ হতে চাইবে না। তবু দুটো গল্প বলি। একদিন গোপালদা তাঁর কোনো বিরক্তিকর অভিজ্ঞতায় তিনি যে ক্লান্ত সে কথা জানাচ্ছেন। তখন পরিচয় সম্পাদক দীপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়। দীপেন্দ্রনাথ বলে ফেলল, 'আপনি ওই বিরক্তিকর সাবকমিটিতে থাকছেন কেন?' গোপালদা একটু চুপ করে থেকে আমার দিকে চেয়ে বললেন, 'একটা গল্প বলি শুনুন। একদিন আমি আর অমরেন্দ্রপ্রসাদ নৈহাটি যাচ্ছি। নৈহাটি লোকালেই দুজনে উঠেছি। দুপুরের ট্রেন। ভীড় তেমন নেই। উল্টোডাঙ্গায় একজন মাতাল উঠল। আমাদের সামনের বেঞ্চে বসে সে আমাদের গালাগাল দিতে শুরু করল। দমদমে ব্যাপারটা যখন আমাদের অসহ্য মনে হল তখন দুজনে ঠিক করলাম বেলঘরিয়ায় কম্পার্টমেন্ট বদল করে ফেলা যাক। বেলঘরিয়ায় যখন আমরা নামতে যাব, তখন মাতালটা উঠে দাঁড়িয়ে হাতজোড় করে আমাদের বলল, একী আপনারা নেমে যাচ্ছেন যে, আপনারা নেমে গেলে আমি গালাগাল দোব কাকে? পয়েন্টটা বুঝলেন?' সবাই সহাস্যে বললাম, বুঝলাম। আরেকদিনের গল্পটিতে যতটা কৌতুক, ততটাই কারুণ্য। 'পরিচয়'-এ আমরা সবাই বসে গল্প করছি—সময়টা তখন উত্তেজক। কেরলে নির্বাচিত বামফ্রন্ট সরকারকে ফেলে দেবার কেন্দ্রীয় চক্রান্ত তখন পেকে উঠেছে—কেন্দ্রীয় হস্তক্ষেপ তখন হয়-হয়। আগের দিন কলকাতায় একটা বিশাল মিছিল বেরিয়েছিল কেন্দ্রীয় হস্তক্ষেপের প্রতিবাদে। এরকম মহত্তম মিছিল কলকাতা শহরে খুব কম হয়েছে। আনন্দবাজারের ভূমিকা ট্রাম ধর্মঘটের সময়, তেভাগা আন্দোলনের সময় যা ছিল কেরলে সেন্ট্রাল ইন্টারভেনশনের প্রাক্কালে তা থেকে আলাদা হবে একথা ভাবার কোনো কারণ নেই। বামফ্রন্ট সরকারের পক্ষে কেরলের জনসাধারণ নেই এটাই ছিল আনন্দবাজারের বক্তব্য। ওই মহত্তম মিছিল থেকে ধ্বনি উঠেছিল—এই মিছিলে কত লোক আনন্দবাজার গুণে নাও। এই সব কথা 'পরিচয়'-এর ঘরে আলোচিত হচ্ছে। আমাদের মধ্যে একজন এই আলোচনায় অস্বস্তিবোধ করছেন। এমন সময় চিনুদা—চিন্মোহন সেহানবিশ ঘরে এলেন। তাঁর হাতে একটা

কাগজ। তিনি কেরলে কেন্দ্রীয় হস্তক্ষেপের বিরুদ্ধে বুদ্ধিজীবীদের স্বাক্ষর সংগ্রহ করছেন। বিনা বাক্যে আমরা সকলেই স্বাক্ষর দিলাম—দিলেন না উক্ত অস্বস্তিভোগকারী ভদ্রলোক। কেন? তিনি বললেন তিনি যে বুর্জোয়া সংবাদ প্রতিষ্ঠানে চাকরি করেন, তাঁরা এই সইসাবুদ ব্যাপারটি ভালো চোখে দেখবেন না। এ গল্পটি বলার কোনো দরকারই হত না, যদি না উক্ত ভদ্রলোক হতেন আমার পূর্বে কথিত 'বুর্জোয়া খাদক' মহাবিপ্লবীদের একজন। অতিবিপ্লব প্রতিবিপ্লবের অগ্রচর। অতিক্রিয়া প্রতিক্রিয়ার পূর্বগামী।

যেদিন হাবুলদা থাকতেন 'পরিচয়'-এ সেদিন একটা সরস স্রোত সদাই প্রবহমান থাকত। সুশোভন সরকারের মতো গম্ভীর মানুষও হাবুলদার গল্পিকা শুনে হেসে ফেলতেন। কলকাতার এক বনেদি বাড়ির দেশজোড়া নামডাকের অধিকারী এক ব্যক্তির আত্মীয় নাকি 'রবীন্দ্রনাথ' নামটা শুনে বলেছিলেন, 'হ্যাঁ হ্যাঁ চিনতে পেরেছি, দেবেন ঠাকুরের ছোট ছেলে তো?' আমি হাবুলদাকে জিজ্ঞাসা করেছিলাম, 'ওঁরা তিনদিনের জন্য নিমন্ত্রণ করেছেন, যদি চারদিন করে ফেলি। হাবুলদা আমাকে একটা ছড়া শুনিয়েছিলেন। হয়তো অনেকেই হাবুলদার কাছে সে ছড়া শুনেছেন, তবু আরেকবার শুনতে দোষ নেই :

এক বেহায়া গিয়েছিল জোচ্চোরের বাড়ি
(বলল) 'আজ আমাদের খাওয়াদাওয়া এইখানেই সারি।'
জোচ্চোরে বেহায়াকে ভাগানোর জন্য বলল :
আজ আমাদের রাঁধাবাড়া, কাল আমাদের খাওয়া,
বেহায়া বলল—আমি আজও আছি, কালও আছি, পরশু আমার যাওয়া।

আমার যাওয়া আসা একটু দ্বিখণ্ডিত হয়েছে। সপ্তাহে অন্তত একটা দিন চলে যাই আমার নতুন বন্ধুর আড্ডায়—তিন নম্বর শম্ভুনাথ পণ্ডিত স্ট্রিটে, 'নতুন সাহিত্য' পত্রিকার দপ্তরে—নতুন সাহিত্য প্রকাশালয়ও সেখানে। নতুন বন্ধু অনিলকুমার সিংহ, পত্রিকা সম্পাদক—সুলেখকও বটে। দেখতে দেখতে আমরা খুব জমে গেলাম। অনিলকুমারের সম্পাদকীয় ব্যক্তিত্বে রুচির সঙ্গে শিল্পবোধের, দৃঢ়তার সঙ্গে স্নিগ্ধতার বাঞ্ছিত মিলন ঘটেছিল। সেইসব দিনগুলি আমার জীবনের সোনালি স্মৃতির দিন—আমাদের নৈহাটির বাসায় অনিলকুমার, মঙ্গলাচরণ, মণীন্দ্র রায়, সব সময় এক ট্রেন ফেল করা সিদ্ধেশ্বর সেন সারাদিন ধরে অনাড়ম্বর খাওয়াদাওয়া সেরে সোল্লাস আড্ডা দিয়েছি। বিকেলে মঙ্গলাচরণ শুনিয়েছেন তাঁর সুবিখ্যাত কবিতা 'আমার ভালবাসা', মণীন্দ্র রায় শুনিয়েছেন মিশ্রবৃত্তে বিজোড় মাত্রার অন্ত্যপর্ব জুড়ে নতুন চলন, হয়তো আমি শুনিয়েছি সবে লেখা কবিতা 'পরীদিয়ার মাঠ'। নতুন সাহিত্যে কবিতা লিখে আমি প্রথম টাকা পেয়েছিলাম। তখন নবযুগ আচার্য সম্পাদিত, আসলে বিষ্ণু দে পরিচালিত 'সাহিত্যপত্র' ত্রৈমাসিকেও কবিতা লিখছি। বলা দরকার সেই 'দ্বীপপুঞ্জ' ঘটনার পর আর আমাকে 'পরিচয়' থেকে আলোচনার জন্য কোনো বই দেওয়া হয়নি। দিলেন অনিলকুমার, দিলেন 'সাহিত্যপত্র' সম্পাদক। 'পরিচয়'-এ দীপেন্দ্রনাথ আমাকে বই দিতে শুরু করলেন এরপর। কিছুকাল পরিচয়ে বছরে একটি সংখ্যা শুধু সমালোচনা সংখ্যা হিসাবেই প্রকাশিত হ'ত। তাতে গল্প কবিতা থাকত না—থাকত কেবল সমালোচনা-প্রবন্ধ। এ সংখ্যায়

আমি দীপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের আমন্ত্রণ অবশ্যই পেয়েছি। তা নইলে 'পরিচয়'-এ আমার কবিতাই প্রকাশিত হয়েছে। তখন আমার কবিতা যে কবিতায় আগ্রহী রসিক সজ্জনেরা পড়ছেন তার প্রমাণও। কবি মৃগাঙ্ক রায় 'চতুষ্কোণ' পত্রিকায় রাম বসুও আমাকে নিয়ে একটা প্রবন্ধই লিখে ফেললেন। নতুন সাহিত্যে আমার একটি কবিতা বেরুল। কবিতার বিষয় রাজা শ্রীবৎসের ভাবরূপে তখনকার ভিটেমাটি হারানো দেশচ্যুত এক বাস্তব মানুষ। রাজা শ্রীবৎস মা লক্ষ্মীকে সোনার সিংহাসনে বসিয়ে শনির প্রতিস্পর্ধী হয়েছিল। আমার দেখা ওই মানুষটিও যেন দেশলক্ষ্মীকে স্বাধীনতার সিংহাসনে বসিয়ে নিজে সর্বস্ব হারিয়েছে। কবিতাটির প্রতি স্তবকের শেষ পংক্তিটি পুনরাবৃত্ত হয়েছে এই বলে—'জননী তোমার সিংহাসনের দাম।' একেবারে শেষে স্বাধীন দুটি পংক্তি—রাজা শ্রীবৎস বলছে :

চোখে দিতে পারো চোখের জলের সাজা,
রাজা শ্রীবৎস আপন হৃদয়ে রাজা।

আমার সব কবিতাই হারিয়ে গেছে। এই কবিতাটি হারিয়ে যাবার দুঃখ আমার আজও যায়নি। তখন বিশ্ববিদ্যালয়ের আন্টার্টিকা যুবক তার ভালবাসার জনকে চিঠি লিখছে—চিঠির শেষে পরিচয়ে প্রকাশিত (পরে বিষ্ণু দে সম্পাদিত 'একালের কবিতা' সংকলনে গৃহীত) 'অপরাজিতা' কবিতা থেকে তুলে দিচ্ছেন একটি পংক্তি—'হৃদয় করে হৃদয় পণ দিবস গণি গণি।' সেদিনের সেই অপরিচিত যুবককে আজ সবাই চেনেন। ইনি সত্যজিৎ চৌধুরী।

তবু আমার কবিতার আলো ব্যাটারি ফুরিয়ে যাওয়া টর্চের মতো স্তিমিত হয়ে আসতে লাগল। তারপর একেবারেই নিবে গেল। অনেকের কাছে এজন্য তিরস্কৃত হয়েছি। কিছুদিন আগে 'দিবারাত্রির কাব্য' সংস্থা থেকে আয়োজিত এক সম্বর্ধনা সভায় শঙ্খ ঘোষ প্রকাশ্যেই এ অনুযোগ জানিয়েছিলেন, আমি কেন কবিতা লেখা ছেড়ে দিলাম। তাঁর মুখেই শুনেছিলাম, ওপার বাংলার পাঠকেরা এখনো আমার কবিতার কথা মনে রেখেছেন। আমার জীবনের নানা বাইরের ঘটনার সঙ্গে ব্যাপারটি জড়িত। এবার সব কথা খুলে বলা দরকার। প্রথমে যে গল্পটি বলব, সে গল্পটি আমি কাউকে বিশ্বাস করতে বলছি না। 'পরিচয়'-এর পাঠকদের তো নয়ই—আমি নিজেও বিশ্বাস করি না। তবু গল্পটি বলা দরকার। পাঠকদের মনে আছে বোধ করি, বাংলা সাহিত্যের হাটে 'অবধূত' নামে এক লেখকের খুব পশার হয়েছিল। তিনি থাকতেন গঙ্গার ওপারে। সোজা হিসাব ধরলে আমার এখনকার বাড়ি থেকে সমরেশের বাড়ি যতটা পূবে, অবধূতের বাড়ি ততটা পশ্চিমে। মাঝখানে কেবল গঙ্গা। যখনকার কথা বলছি তখন কিন্তু বাবার চাকরির সুবাদে আমরা রেলের ওপারে রেল কোয়ার্টার্সে থাকি। একদিন দুপুরবেলায় আমি কলেজ থেকে ফিরেছি, অবধূত এসে হাজির। গৈরিক পরা অবধূত ভীষণ উত্তপ্ত। সেই উত্তপ্ত অবস্থায় তিনি আমায় জানালেন তিনি আমার কাছে একটি অনুরোধ নিয়ে এসেছেন—তিনি নতুন সাহিত্যে লেখা ছাপাতে চান, আমি যেন অনিল সিংহকে একটা চিঠি লিখে দিই, তিনি এখনি যাবেন। আমি জানালাম, তিনি ভুল জায়গায় খাপ খুলতে যাচ্ছেন, অনিলকুমার সিংহ যে চিপিটক নয় যে এ বারি সিঞ্চনে সিক্ত হবেন। তুমুল বাক্যবিনিময়ের মধ্যে তিনি বললেন, আপনি নিজের জন্য হলে তো প্রার্থী হতে লজ্জিত

হতেন না। আমার রাগ চড়ে গেল। আমি ডান হাতটা টেবিলের উপর চিৎ করে ফেলে বললাম, আমার হাত কোথাও এভাবে পাতা থাকে না। হঠাৎ অবধূত আমার হাতের দিকে চেয়ে চুপ হয়ে গেলেন। একেবারে অন্য মানুষ হয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, আপনার হাতের এই কালো তিলটি কতদিনের? আমি বললাম, লক্ষ করিনি, আজই প্রথম দেখছি। কথা বন্ধ করে, খাতা বন্ধ করে তিনি বললেন—সাবধান থাকবেন, আপনার সামনে অনেকদিন ব্যাপী অনেক দুর্ঘটনা। উনি আমাকে একটা পাথর ধারণ করতে বললেন। আমি হেসে উড়িয়ে দিলাম। বললাম, ওসব গাঁজাখুরি ব্যাপারে, হাত দেখা ইত্যাদিতে আমার বিন্দুমাত্র বিশ্বাস নেই। তিনি আমাকে বললেন—অপঘাত, অপযশ, মানসিক উদ্বেগ, নানা বিপর্যয় আপনার সামনে। আমি বিশ্বাস করিনি। কথাটাকে পাত্তাও দিলাম না। আজও দিই না।

তিন সপ্তাহের মধ্যে আমাদের সমস্ত পরিবার ঝড়ে উপড়ে যাওয়া গাছের মতো লুটিয়ে পড়ল। পার্থ আমার চেয়ে বয়সে অনেক ছোট। পার্থ আর আমার মধ্যে আরো তিন ভাই ছিল। দ্বিতীয় ভাই মারা যায় দেড়বছর বয়সে। চতুর্থ ভাইয়ের মৃত্যুর সংবাদ আগের কিস্তিতে দিয়েছি। তৃতীয় ভাই প্রশান্তকুমার প্রকৃত প্রস্তাবে আমার মেজভাই। পার্থর সঙ্গে হৃদ্য স্নেহসম্পর্ক। প্রশান্তকুমারের সঙ্গে ছিল আমার গভীর সখ্য সম্পর্ক। আমাদের দুজনের বয়সের ব্যবধানও অল্প। আমার স্ত্রীর সঙ্গে ছিল তার নিবিড় বন্ধুত্ব। গোঁড়া মার্কসবাদী, নির্দ্বিধ রবীন্দ্রনিষ্ঠ, বিষ্ণু দে অনুরাগী প্রশান্তকুমার কোনো দুর্বোধ্য কারণে ঘুমের ওষুধ খেয়ে আত্মহত্যা করল। তখন তার বয়স চব্বিশ। কোন্ বিপন্ন বিস্ময় তার রক্তে খেলা করে তাকে ক্লান্ত করে তুলেছিল তা আমরা আজও জানি না। শোকে বিমূঢ় আমাদের কানে শহরের এক শ্রেণীর মানুষের কদর্য কৌতূহল সঞ্জাত নোংরা জনরব। আমি সর্বার্থে মূক। আমাদের সংসারটা নিশ্চল। এমন সময় তাকে আবার বাইরে থেকে ধাক্কা দিল আমার তিন বছরের অত্যন্ত দামাল ছেলেটি। সে দেড়তলার ছাদ থেকে দোল খেতে গিয়ে একেবারে মাটিতে মাথা গুঁজে পড়ে গেল। মস্তিষ্কে প্রায় কনকাশন। হাসপাতালে সাতদিন মা এবং তার ঠাকুমা মৃত্যুর সঙ্গে লড়াই করে জিতে ফিরে এল। এই দুনম্বর আঘাতটায় যেন শকথেরাপি হল। মা আমাকে বললেন আর রেল কলোনিতে নয়। চল আমরা ফিরে যাই আমাদের পুরানো জায়গায়—কাঁটালপাড়ায়। একটা কথা কাঁটালপাড়ায় গিয়ে একদিন ভাবলাম—গত আটবছরে তিন তিনটে আত্মহত্যার ঘটনা আমাকে দারুণ আঘাত হেনে গেল। এক, আমার কৈশোর-যৌবনের সাহিত্যগুরু, বিশ্ববিদ্যালয়ের উজ্জ্বল ছাত্র চন্দ্রশেখর ভট্টাচার্য, দুই, আমার অন্তরঙ্গতম রাজনৈতিক দাদা বেলঘরিয়ার প্রভাস সরকার। তিন, আমার ভাই প্রশান্তকুমার। তিনজনেই ছিল নির্ভেজাল পার্টিভক্ত। আমার কেমন যেন মনে হয় রণদিবে তত্ত্বে যে এরর অফ জাজমেণ্ট তাই এই সব ট্র্যাজিক ফ্রাসট্রেশনের মূলে অনেকটা বিমর্ষতা সঞ্চার করেছিল। আমার বিপর্যয়ের পালা কিন্তু এখানেই চুকল না—কুছ ভৈল, বহুৎ বাকি বা।

কাঁটালপাড়ায় ফিরে এলাম। এখান থেকেই আমার কবিতা লেখা শুরু হয়েছিল—সম্পূর্ণ পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে সেখানে ফিরে এসে কিন্তু আমার কবিতার কলম আর ফিরে পেলাম না। বস্তুত আমি আর কবিতা লিখিইনি। অনেক পরে শেষ কবিতা লিখেছি দীপেন্দ্রনাথের

শক্তি চট্টোপাধ্যায়ের কবিতায় প্রকৃতি বিজ্ঞান

শম্ভুলাল বসাক

বিখ্যাত বিজ্ঞানী ও দার্শনিক অধ্যাপক জে. বি. এস. হ্যালডেন ভারতবর্ষের নাগরিকত্ব গ্রহণ করার পর Science and Indian Culture নামে এক প্রবন্ধগুচ্ছের বই লেখেন। এই বইয়ের অন্তর্গত "In 'Science' a Misnomer ?" প্রবন্ধে যা লেখেন তার থেকে কবিতার এক নতুন সংজ্ঞার সন্ধান মেলে। তিনি লিখেছেন, "Scientific method can not be explained but only demonstrated. (Scientific) Research is rather like poetical composition. There are rules for both, but you will not becomes a poet at all. let alone great poet by adhering to the rules. Nor will you make great scientific discoveries by following 'scientific method' as said down by writers on that subject. Both great poets and great scientists adhere to the normal canons as a rule, but do not hesitate to violate them from time to time. Their violation may sometimes become the canons of art or science in future ages." তাই যদি হয়, তবে সার্থক কবিতা রচনার প্রক্রিয়া যেন বৈজ্ঞানিক গবেষণালব্ধ আবিষ্কারের মতো। বিজ্ঞান ও কবিতা একই প্রবাহ।

এই বৈজ্ঞানিক-দার্শনিক এই প্রসঙ্গে আরো বলেছেন, "I am inclined to think therefore, that the word 'Science', through it is not grossly misleading in western Europe, may be so India. I do not know how it is translated into most Indian Languages. But I should like to see it translated into a word or phrase meaning 'Interest in Nature' or perhaps better, 'Interest in prakriti' for as I understand it, the word covers those aspects of human minds which can be the subjects of scientific investigations." এই বক্তব্যর তাৎপর্য হল কবি কিংবা বিজ্ঞানী মূলত প্রকৃতি অনায়াস অনুসন্ধানী। কবি শক্তি বহুলাংশে কবিতায় প্রাকৃতিক অনুষঙ্গকে মেধায় জাগ্রত করে বহু কবিতায় স্পষ্ট কিছুটা প্রচ্ছন্ন বিজ্ঞানের ধারাভাষ্য দিয়েছেন এই দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে শক্তির কবিতাসমূহে অনুসন্ধান করা প্রাসঙ্গিক।

অধ্যাপক হ্যালডেন ধ্রুপদী সাহিত্যের মূল্যায়ন কালে লিখেছেন, 'For me the early formulation of scientific hypotheses are especially fascinating, most fascinating of all when they are formulated by a poet. What do we mean, for example by a law of nature ? এই উক্তি থেকে স্পষ্টই বোঝা যাচ্ছে যে কোনো বৈজ্ঞানিক অনুমিতি চিত্তাকর্ষক, কিন্তু সেই বৈজ্ঞানিক অনুমিতি কোনো কবির করা হলে তা আরো বেশি চিত্তাকর্ষক। সুতরাং শক্তির মতো একজন সার্থক কবির কবিতায় বিজ্ঞানের কী কী উপকরণ আছে তা অনুধাবনযোগ্য।

শক্তি চট্টোপাধ্যায় আপাত সরল কিন্তু অত্যন্ত গভীর ব্যাঞ্জনাময় পঙক্তি লেখেন—

ঈশ্বর থাকেন জলে
তাঁর জন্য বাগানে পুকুর
আমাকে একদিন কাটতে হবে।
আমি একা...
ঈশ্বর থাকুন, এই চাই—জলেই থাকুন (পঃ সঃ ৩, ১৭৫ পৃঃ)

শক্তি কবিতাটির উপর নিজস্ব ভাষ্য লিখেছেন। তিনি লিখেছেন, 'ঈশ্বর থাকেন জলে' স্থলে নয়, অন্তরীক্ষে নয়—এই বাক্যবন্ধটি পাবার পর হুর রে বলে চিৎকার করে উঠেছিলাম, মনে মনে। মেজাজে বেশ টানটান ভার বোধ করেছিলাম। আত্মবিশ্বাসে ভরপুর, তৎক্ষণাৎ ভাবি, এই যে আমি জানতে পেরে গেলাম, সেই কারণেই তাঁকে আমার কাছাকাছি আনার চেষ্টা দিতে হয়। এবং পরক্ষণেই, তাঁর জন্যে বাগানে পুকুর কাটার পরিকল্পনা।" ঈশ্বর থাকেন জলে এই বাক্যবন্ধটি পেয়ে কবির মনে এক আবিষ্কারের আনন্দ জেগেছিল তা কবির স্বীকারোক্তিতে পরিষ্কার। কবির ঈশ্বর এখানে সব কিছুর সৃষ্টিকর্তা এবং তাঁর উৎস বা নিবাস হল জল। এই সবকিছুর অর্থ প্রাণের বিকাশ ও সৃষ্টি।

চমকের মত এই বাক্যবন্ধ—ঈশ্বর থাকেন জলে—অধ্যাপক হ্যালডেনের ভাষায় most fascinating of all when they are formulated by a poet. কল্পনার পরী উড়ে যায় সেই সুদূর অতীতে আনুমানিক ৪৮০ কোটি বৎসর আগের সময়ে। সেই সময় ছায়াপথের অন্তর্গত এক নীহারিকাপুঞ্জে বিশাল বিস্ফোরণ ঘটে। তখনই অশান্ত সূর্য ও তার উপগ্রহদের আবির্ভাব ঘটে। এর পর ৬০ কোটি বছর চলে আলো আঁধারীর খেলা এবং যার পর সূর্য ও গ্রহরা যায় অন্যতম এই গ্রহ, যাকে বলি পৃথিবী, শান্ত হয়, সংকুচিত হয়। হাওয়ায় ভাসমান দুই বিরোহী হাইড্রোজেন ও অক্সিজেনের শুভ পরিণয়জাত জলের আগমন এই পৃথিবীতে। সেই যে ৬০ কোটি বছর ব্যাপী কালের শুরু যখন তখনকার ঘটমান অবস্থার কথা মনে করিয়ে দেয় শক্তির কবিতা—

তখনো ছিলো অন্ধকার তখনো ছিলো বেলা
হৃদয়পুরে জটিলতার চলিতেছিলো খেলা (পঃ সঃ ১, ৭৪ পৃঃ)

এই 'বেলা' শেষে জল সমবেত হল আদি সমুদ্র। শুরু হল জলকে উৎস করে আদিম জীবাণু, এ্যালগি ও অমেরুদণ্ডী জলজ জীবের। প্রাণপ্রেতিয় বিকাশ শুরু হল মহাকালের সোপান বেয়ে। মহাকালের অগ্রগতির সঙ্গে এল উভচর প্রাণী। এই ধরার মাটিতে প্রাণের প্রথম পদক্ষেপ। তারপর পর্যায়ক্রমে এল গাছ, গাছের বৈচিত্র্য, ডায়নাসোর, স্তন্যপায়ী ক্ষুদ্র জীব, পাখি, ডায়নাসোরের অবলুপ্তি, এল বড় মাপের জন্তু, বড় মাপের স্তন্যপায়ীরা, ঘাস, বানর বৈচিত্র্য এবং ১৬০ লক্ষ বছর আগে এসে হাজির মানুষের আদি জনক অস্ট্রালোপিথেকাস এ্যাফারেনসিস। প্রাক মানুষের বহু সংস্করণ হতে হতে প্রায় কেটে গেল ১০০ লক্ষ বছর—এল উনমানুষ—*Humo erctus,* দুপায়ে ভর দিয়ে মানুষ যারা আরো সংস্কৃত হয়ে হল মানুষ। জল থেকে ধীরে, অতি ধীরে বিবর্তিত হয়ে যে মানুষ এল, সেই মানুষের উত্তরসূরী কবি শক্তির মেধায় বিদ্যুত সঞ্চারের মত এক ধ্রুবপদ উঠে এল 'ঈশ্বর থাকেন জলে।'

আধুনিক, মানুষ কবি শক্তি সাধ্যমত সেই আদিম যুগের চিত্র আঁকেন—

অন্ধকারে, বনের আড়ালে খেলা
খেলা চলিতেছিলো, মেলা চলিতেছিলো বনে
বনের আড়ালে,
কক্কুট কুক্কুটি নিয়ে লড়াই চলিতেছিল
হাটে, মাঠে, লড়াই চলিতেছিলো
মানুষ মানুষী নিয়ে লড়াই চলিতেছিলো,
মানুষ কখনও জেতে, কখনও মানুষী।
(পঃ সঃ ৫, ২৬৬ পৃঃ)

কবি এখানে শব্দ চয়নে অব্যর্থ সেই আদিমকালকে চিত্রার্পিত করতে। অন্ধকার, বন, কক্কুট, কুক্কুটি মানুষ এবং মানুষী শব্দগুলি চয়নে। এই আদিমতা আরো তীক্ষ্ণ করেন কবি— মানুষ মানুষী নিয়ে লড়াই চলিতেছিলো। যেন বহুকাল ব্যাপী এই লড়াই।

সূর্যের আবির্ভাব না হলে গাছের এ ধরায় আগমন সুনিশ্চিত হতে পারতো না, আবার গাছ না এলে মানুষের বিবর্তন হত অসম্ভব। এই বক্তব্য বৈজ্ঞানিকভাবে সত্য। আবার জল না থাকলে জীবনের হত পরাজয়। কবির ভাষায়—

মা বলতেন, খোকা জানিস, ঐ জলের নাম জীবন (পঃ সঃ ৫, ২১ পৃঃ)

এই জীবন হল প্রাণ ধারক। যিনি বাঁচান, যেমন জল, সেখানেই ঈশ্বরের আবাস। সেই আদিকালের চিত্র গুরুগম্ভীর ভাষায় ধরেছেন কবি—

সে এক অঙ্গতমিস্র ছিঁড়ে ছিঁড়ে আমায় আলোক হতে হলো। মৃণ্ময়
মায়ের উত্তমর্ণ পুষ্পকে ছিন্ন করে উদ্ভিদ হই। তারপর বার্দ্ধেয় প্রভাত,
পৃথিবী, সুখের সাম্রাজ্যের প্রজা, এরা ওরা জানলো ভরদ্বাজ পিতামহ
ঋষি পিতামহী নক্ষত্র, আমি স্বয়ংপ্রভ সূর্যের বিভা। তাই এক বিপুল
অঙ্গতমিস্র অলংকার মোচন করে আমায় আলোক হতে হলো।
(অঃ প্রঃ শঃ, ১০০১ পৃঃ)

এছাড়া বিবর্তনের ধারাভাষ্য লেখেন অন্য এক কবিতায়—

প্রজাপতি ঋষি তমোনিভৃতে গড়লেন দুটি পুতুল, আকাশ হল চোখ।
অনপ্রত্যতায় বিষণ্ণ গাছ-মাটি-পাথরের কোল জুড়ে দিলেন তাদের,
লীলাবিলাসে আত্মীয় হল ময়ূর, জোনাকি, তক্ষকের জ্বর, ইক্ষুর মূল, ইঙ্গু
হিরণ্যগর্ভ দিনের তপোবন, রাত্রির সুনিবিড় ভয়ের সুখ। লজ্জা জননী
বাতাবরণের জনক দিবস, বটস্টতে, নারিকেলের অরণ্যে পাকা-পাকা
তেলাকচুর ফল খেয়ে, বৌঁচ, আমলকি খেয়ে দিবস হত রজনী, ঢালের
বেড়ায় শ্যাওড়া শাখায় বেড়ায় বৃত কুটিরের প্রান্তে বাজতো শজারুর নৃত্য,
তিতিরের বিষণ্ণ কণ্ঠ, মুষিকের, কীটের অনবিচ্ছিন্ন কর্কশ সন্ধান আর প্রভাতে
সজিনা নাজিনার পুষ্প বিছিয়ে যেতো দূর নক্ষত্রের মতো ক্ষুদ্র পরিষ্কৃত অঙ্গনের

পর আর আর্যার উত্তমাঙ্গে বসন নেই, স্তনভূমি পর্ণপ্রসন্ন শাখার মতো মসৃণ।

(অ প্রঃ শঃ, ১০৪ পৃঃ

চুম্বক হিসেবে তুলে নিচ্ছি উপরের উদ্ধৃত কবিতার শেষ পঙক্তি থেকে 'স্তনভূমি পর্ণপ্রস্য শাখার মতো মসৃণ।' পর্ণপ্রসন্ন হচ্ছে গাছ যা স্তনদানে সক্ষম। অতএব জননী সমা। এ গাছ সূর্যের আলো পান করে সালোকসংশ্লেষ করে আপন দেহে যা সঞ্চয় করে তা হ নিরামিষ-ভোজী জীব মায় মানুষের পুষ্টির ভাণ্ডার। এমন আভাস রয়েছে নিচে উদ্ধৃত কবিতায়—

আলো থেকে ছিটকে আসে আলোর পালক
পয়সার বদলে নেয় ভিখারি বালক
সর্বস্ব সর্বস্ব
সে কি নেয় আর দেয়?
ধান ভাত খড় ঘাস অবশ্য অবশ্য
হাত থেকে পেটে যেতে সম্পর্ক শুখায়। (পঃ সঃ ৩, ২৬৯ পৃঃ)

একই কথা লিখেছেন রবীন্দ্রনাথ কিন্তু দুজনের শব্দচয়ন ও প্রকাশভঙ্গি একেবারেই স্বতন্ত্র। রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন,

আয় আমাদের অঙ্গনে
অতিথি বালক তরুদল
মানবের সঙ্গ নে
চল আমাদের ঘর চল।

রবীন্দ্রনাথ যাকে বালক তরুদল বলেছেন, শক্তি আরো বেশি প্রচ্ছন্নভাবে বলেন ভিখারি বালক। যা সত্য তা স্থির, কিন্তু তার প্রকাশভঙ্গি বা ভাষার আদল পাল্টে সেই সত্য প্রকাশিত হয়।

গাছের প্রতি শক্তি প্রগাঢ় ভালবাসা একাত্ম হওয়ার প্রচুর উদাহরণ রয়েছে তাঁর কবিতায়। এমনকি গাছকে মানুষের চেয়ে বড় করে দেখার এক অনিবার্য ঝোঁক দেখা যায় শক্তির কবিতা কিংবা তার আপন ভাষ্যে। এই ঝোঁক প্রকাশ ঘটেছে এইভাবে—

মনের ভিতরে কিছু গাছপালা এঁকে দেবে বলে।
এদের বলায় কোনো মিথ্যা নেই সতর্কতা
মানুষের মতো নয় এরা সব একটু আলুথালু
এদের প্রকৃতি—এই ভালো লাগে ভালোরও উপরে। (পঃ সঃ ৬, ২৫ পৃঃ)

এই গাছের সঙ্গে কবি আত্মীয়তার সন্ধান পান। নান্দনিক কারণে, ভাল লাগার তাগিদে সমগ্র কবিতাটি এখানে বপন করি—

ফুলন্ত পাতার দেবদারু চারখানি—
ইনিয়ে বিনিয়ে পর্টুলাকা
বাতাস হাতড়ে গেছে জুঁই দোতলায়,

একইভাবে মাধবীও গেছে।
নিচে পাথরের পথ দুখানি বাগান ভেদ করে
বাঁদিকে বেলির সারি, লিলি রঙ্গন,
শাদা জবা অজস্র ফুটেছে।
এই সব নিয়ে ছোট্ট বাগানের ঘাসে—
আমি বসে থাকি চেনা স্ট্যাচুর মতন।
চৈ দিয়ে কৈ খাবো বলে পুঁতি পানপাতা চৈ,
নার্সারি ছেনে ও ছেঁকে ফুলগাছ এনেছি
ভয় করে, তাকে ঝড় একদিন ঠোকরাবে—
তবুও তো ঝড় চাই, বৃষ্টি চাই বেঁচে থাকতে হ'লে
হোক ঝড়-বৃষ্টি, আমি বুক দিয়ে বাঁচাবো—
গাছপালা, আত্মীয়-স্বজন (পঃ সঃ ৬, ৫৪ পৃঃ)

একটু অপ্রাসঙ্গিক হলেও পাঠকদের বলে দেওয়া উচিত যে বাগানের ছবি কবি এঁকেছেন এ তাঁর বসতবাড়ির ছোট বাগানের নিখুঁত বর্ণনা দিয়ে।

গাছকে পবিত্র ভেবে কবি একটি কবিতায় বর্ণনা দেন—

আমরা ভাবতাম লোকটা ইস্টুপিড।
নইলে লম্বা তেঠেঙে একটা ফটো তুলো, বাঁধিয়ে
তারই সমানে নিত্যদিন বসে থাকে
হয়তো পুজো-আচ্চাও করে, মনে মনে,
অনেক দুঃখ তার, ঐ ইস্টুপিড লোকটার (পঃ সঃ ১, ২৫৪ পৃঃ)

কবি গাছকে মানুষের চেয়েও বড়ো ভাবেন এবং তাঁর ইচ্ছে গাছের কাছে হেরে যান। সবার উপরে মানুষ এমন ভাবনার বদলে সবার কিংবা মানুষের চেয়ে গাছ বড়—এ ভাবনা আপাতদৃষ্টি ব্যতিক্রমী ভাবনা মনে হলেও, বিজ্ঞানের নিরিখে সত্য। কবি লেখেন—

গাছের নিচে দাঁড়িয়ে আছে গাছের মতন
ফুল ফুটেছে সেই মানুষের বুকের ধারে
পাতায় শাখায় হারিয়ে গেছে মুখটি তাহার
গাছের কাছে পারলে হারে... (পঃ সঃ ২, ১৬৫)

কবি গাছকে যুবতী অর্থাৎ ভবিষ্যত জননী হিসেবে ভেবে নিয়ে লেখেন—

দুটি যুবতীর মতো দাঁড়িয়ে রয়েছে দুটি গাছ
অর্কিডেপ ঝুরি নামা যেন কোন দুরন্ত হাওয়ায়
কেশস্তূপ ভেঙ্গে প'ড়ে যুবতীর গায়ে শুয়ে আছে (পঃ সঃ ৩, ৪২ পৃঃ

যে গাছের কাছ থেকে মানুষ অহরহ পুষ্টি আহরণ করে জীবনধারণ করে বাঁচে মানু কবি সেই মহার্ঘ গাছের ভিতরে নিজেকে স্থাপন করে গাছের বেড়ে ওঠার বৃত্তান্ত জে নিতে চান। তাই লেখেন—

ও গাছ আমাকে নাও, মুহূর্তের জন্যে হলে নাও
তোমার ভিতরে আমি ধীরে বেড়ে-ওঠা দেখে আসি
পাথরের মতো স্তব্ধ তুমি নও, সম্প্রীতি রয়েছে
রস আছে, স্নেহ আছে, ভালোবাসা, বিবেচনা আছে,... (পঃ সঃ ৩, ২২৬ পৃঃ)

গাছের অন্তরে রহস্যসন্ধানী কবি আবারও লেখেন—

গাছের ভিতরে গিয়ে বসি আমি
সন্ধ্যায় সকালে—
প্রতি গাছে জল দিই, ফুল দেয়
পরিবর্তে গাছ।
এই দেওয়া-নেওয়া চলে অনুচ্চারিত
মৃদু প্রেমে,
গাছ ও মানুষে বোঝে এই প্রেম, আর
কেউ নয়। (পঃ সঃ সঃ ৬, ১৭ পৃঃ)

'গাছ ও মানুষে বোঝে এই প্রেম' কবির এ হেন উক্তির মতই মহাকবি রবীন্দ্রনাথের এমনতর উক্তি আছে। রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন, 'আমি একদিন সমুদ্রস্নানসিক্ত তরুণ পৃথিবীতে গাছ হইয়া পল্লবিত হইয়া উঠিয়াছিলাম।...আমার প্রাণের মধ্যে গাছের প্রাণের গূঢ় স্মৃতি আছে, আজ মানুষ হইয়াছি বলিয়াই একথা কবুল করিতে পারিতেছি।" এখানে মনে রাখা উচিত যে কবি শক্তি কিন্তু রবীন্দ্রনাথের অনুকারক নন, বরং দুজনেই এক পরম সত্য উপলব্ধিতে উপনীত। শক্তি নিজের কিছু কবিতার অন্তর্নিহিত অর্থ বোঝাতে লিখেছেন, "অন্তরে মন যেমন, বনও তেমন আছে। সারল্য, জটিলতা, রহস্য সব"; "মানুষকে গাছ হিসেবে দেখা আমার প্রিয় ব্যসন। বিশেষত নিজেকে।"; "প্রকৃত পক্ষে, ঐ গাছ মনেরই মাটিতে। সে গাছ গাছের মতন নয়, রমণীর মতন।" দুই কবির গদ্যে কথা বলার ভঙ্গিও স্বতন্ত্র। শক্তি আরো লিখেছেন কবিতায়—

গাছেদের মানুষের দুজনের জীবনও আলাদা।
মৃত্যু হয়তো এক, অপৃথক, নিশ্চিত একাকী।
তার কোনো ঘর নেই, গেরস্থালি নেই, শান্তি নেই
এক অশান্ত তার জীবনের ছিদ্রে বসে মাছি। (পঃ সঃ ৩, ৮৯ পৃঃ)

এই কবিতার প্রথম পঙক্তিতে গাঁথা শব্দ 'দুজনের' প্রয়োগ মানুষ ও গাছের অস্তিত্ব একই উচ্চতায় রাখেন কবি। উপরের উদ্ধৃতি সহ ভূমিকায় এক বৈজ্ঞানিক সত্য নিহিত আছে আছে যে বিষয়টি অনেকের কাছে হয়তো বা অস্পষ্ট। আজ থেকে ছয় হাজার লক্ষ বছর থেকে দুহাজার দুশো পঁচিশ লক্ষ বছর ব্যাপী যে যুগ তা পোলিওজয়িক মহাযুগ পর্ব। এই মহাকালে উভচর ও উদ্ভিদ, তার বিভিন্ন বৈচিত্র্যসহ, উদ্ভব হয়েছিল পৃথিবীর বুকে। এর পর এলো মেসোময়িক যুগ (২২৫০ লক্ষ বছর থেকে ৭০০ লক্ষ বছর ব্যাপ্ত)। এরই অন্তর্গত জুরাসিক যুগে উদ্ভব হল ডায়নাসোর এবং স্তন্যপায়ী আদি জীব। তার সঙ্গে বিবর্তিত হল

অপুষ্পক থেকে সপুষ্পক গাছের। এই মহাযুগের শেষে ডায়নাসোরের ঘটল বিলুপ্তি। স্তন্যপায়ী জীবদের বিবর্তনীয় রূপান্তর অব্যাহত থাকল। শুরু হল সেনোজয়িক মহাযুগ (৭০০ লক্ষ বছর আগে শুরু এবং ব্যাপ্তি প্রায় ঐ যুগকাল পর্যন্ত)। এই যুগে এল বড় বড় পশুর দল, আদি ঘাসমাতা, এবং এই মহাযুগের শেষ প্রান্তে এল হোমিনিড, মনুষ্য সদৃশ্য কিন্তু চারপায়ে লাঙুল বিশিষ্ট জন্তু সকল। এরা হচ্ছে বিভিন্ন ধরনের বানর, ওরাংওটাং, গোরিলা, শিম্পাঞ্জী ইত্যাদি। বানর থেকে শিম্পাঞ্জী অবধি অগ্রগতিতে লাঙুলের ক্রমবিলোপ ঘটতে লাগল। এরা সকলে গাছে আশ্রয় নেয় এবং নিরামিষাশী অর্থাৎ গাছের পাতা, ফল ও কন্দ আহারী ছিল। এর পর প্রায় মানুষের মতো পূর্বোক্তদের উত্তরসূরী অস্ট্রালোপিথেকাস এ্যাফারেনসিস। এরাও গাছের ফল ফুল কন্দ আহারী। পূর্বোক্তদের বলা হয় প্রাইমেট। এই অবস্থায় এসে এদের মস্তিষ্কর বৃদ্ধি ঘটেছে। অস্ট্রালোপিথেকাসের উদ্ভবের পর আদি মানুষের ক্রম অগ্রগতি হতে লাগল শাখাপ্রশাখায় বিবর্তনের মধ্য দিয়ে। সেই শুরুর সময়টা আজ থেকে ১৬০ লক্ষ বছর আগে। প্রাক মানুষ প্রজাতি থেকে মানুষের মধ্যবর্তী প্রজাতিরা খাদ্য হিসেবে গাছের বিভিন্ন অঙ্গপ্রত্যঙ্গকে বুদ্ধি দিয়ে বাছাই করে খাওয়া আরম্ভ করল। গাছ থেকে উৎকৃষ্টতর পুষ্টি আহরণ করার ফলে ক্রমে মস্তিষ্কের আয়তন বৃদ্ধি পেতে লাগল। এমন ভাবেই প্রায় ১০০ লক্ষ বছর চলে গেল। তারপর এল প্রায় মানুষ যার নাম *Homo ercctus,* ঊনমানুষ। এর এল দুপায়ে চলন শক্তি ও উদ্বাহু হবার ক্ষমতা। তারপর এল মানুষ, যার মেধাশক্তি হল চরম। এরাও গাছের থেকে আহরণ করতে লাগল খাদ্য। এই জন্যেই গাছ জননী সম ভাবা। সম্ভবত গাছই মানুষের প্রথম প্রেমের আনন্দ। বোঝদার মানুষ চারদিকে তাকিয়ে দেখতে পেল তার পাশে রয়েছে দ্রুতগামী হিংস্র জন্তুরা, আক্রমণের অপেক্ষায়। কিন্তু ঐ স্থবির অথচ আকাশ পানে বৃদ্ধি গুণসম্পন্ন গাছ কিন্তু কাউকে আক্রমণ করে না, কিন্তু খাদ্য দেয় জীবনরক্ষার জন্যে। শুধু আদি কেন আজও গাছ একমাত্র অহিংসার প্রতীক। মাতৃসমা। এই প্রেক্ষাপটটি কবির মনে তীব্রভাবে জাগ্রত। যার প্রকাশ ঘটেছে তাঁর কবিতায়। তাই কবি পরম শ্রদ্ধায় লেখেন—

> বড়ো দীর্ঘতম বৃক্ষে বসে আছো দেবতা আমার (পঃ সঃ ১, ৪২ পৃঃ)

বা

> যে বৃক্ষ নির্মাণ করে সেই বীজ অনবব্যহিত কর হতে
> তোমাতেই ফিরে যায়, গাঁথা বুকে বাগানের দাগ।
> ....
> সব, জানো তুমি, তোমার অদেয় কিছু নেই;
> আছ সঙ্গ হতে দূরে, কোথায় হে জননী জনক
> প্রেমের সর্বস্ব-ধন? বাঁধি মোর খড় মূলে পাতা
> সাজাই তোমার বৃক্ষ, অনুপম মিলন বিন্যাসে
> ভুলে থাকি শিল্পে, মোহে, নীচতায়, রুগ্ন জড়দেহী
> কোথা তুমি, কোথা তুমি, হে দেবতা যদি সখা তার? (দেবদূত; পঃ সঃ ১; ৩৪ পৃঃ)

একটু অন্যভাবে কবি লেখেন—

না বলিলে সবাই বুঝিতে পারে—যখন অযথা
বক্তৃতা দিতে চাহিনা। বরং গাছের ভিতরে দেবতার
প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া থাকি। (অঃ শঃ ১১৪ পৃ

গাছের প্রতি মানুষের অবহেলা দেখে কবি দুঃখ পান—

উদ্ভিদের মতো কৃতী, তবু তাকে বর্জন করেছি (পঃ সঃ ৩, ৫৬ পৃ

বড় গাছের উদ্ভবের পর ঘাসের জন্ম—এমন কথা গাছের প্রতি উদ্দেশ্য কে লিখেছেন—

মা তোমার জন্মদিনে, একই ভাবে
সব ঘাসিনীর জন্ম হয়? (পঃ সঃ ৩, ১৭৯ পৃঃ

এই গাছকে সবার চেয়ে বড়োর আসনে বসান—

আসলে কেউ বড়ো হয় না বড়োর মতো দেখায়।
নকলে আর আসলে তাকে বড়োর মতো দেখায়
গাছের কাছে গিয়ে দাঁড়াও, দেখবে কতো ছোটো (পঃ সঃ ৫, ৬২ পৃঃ

এই কবির মনে অতি সুদীর্ঘকাল ধরে বিবর্তনের প্রতি পরতের সুলুক সন্ধান ছিল চেতনা ও মেধায়।

ইতিপূর্বে বলা হয়েছে জল থেকে প্রথম প্রাণের সৃষ্টি হয়ে তার সমাপ্তি ঘটেছে মানুষে আবির্ভাবে। সৃষ্টির প্রথমে উভচর, গাছ, ফার্ন, ডায়নোসোর, স্তন্যপায়ী জন্তু, পাখি, সরীসৃ এবং শেষে মানুষ যে নানা দেহাকৃতির সংস্কার হতে হতে এই যে বিবর্তনের ধারা, তা জন্যে দায়ী হঠাৎ পরিবর্তন, অর্থাৎ যা হবার তা না হয়ে অন্যকিছু হওয়া, যাকে বলে ভুল ঘটনা ঘটা। বৈজ্ঞানিক পরিভাষায় বলে নিউটেশন। জিন যখন তার কাজে ভুল করতে থাকে তখন ঐ ঘটনাকে বলে মিউটেশন এবং এই মিউটেশন অর্থাৎ জিনের ভুল ক্রিয়া ফলে পরিবর্তন-বিবর্তন। এই সমস্ত ভুল থেকে বিবর্তিত হবার কথা কবি মাত্র একটি পঙক্তিতে সারসত্যর মত বলেছেন—

পৃথিবীতে ঘটনার ভুল।
চিরদিন হবে (শঃ চঃ শ্রেঃ কঃ ৭সং; ৩৩ পৃঃ)

(দুই)

মানুষ এবং কবিশক্তির গাছপালাদের মধ্যে কী ও কেমন সম্বন্ধ বিষয়ে তীক্ষ্ণ পর্যবেক্ষণ ছিল এবং তা তিনি কবিতার মধ্যে প্রতিষ্ঠিত করেছেন। একটি প্রজাতির গাছের সঙ্গে অন্য প্রজাতির সম্বন্ধ কখনো বন্ধুর মত আবার কখনও শত্রুর মত। যেমন বাকুচি, রাঁধুনি পাগল, পার্থেনিয়াম প্রভৃতি প্রজাতি তার শিকড় থেকে ফিউরোকৌমারিন জাতীয় যৌগ নিঃসরণ ঘটায় মাটিতে এই যৌগটি অন্য প্রজাতির বীজকে অঙ্কুরোদগম ঘটাতে বিঘ্ন ঘটায় কিংবা সেই গাছের বৃদ্ধিতে ব্যাঘাত ঘটায়। তেঁতো জাতের আখরোটের শিকড়ে থেকে হাইড্রোয়ানিক এ্যাসিড নিঃসরণ

ধরে বলে ঐ গাছের নিচে বা সংস্রবে অন্য গাছ বাঁচেই না। লেগুম বা শুটি জাতীয় গাছ তাদের শিকড়ে নাইট্রোজেন আবদ্ধ করে বাতাস থেকে এবং তার সংস্রবে অন্য শস্য নাইট্রোজেনের পুষ্টি পেয়ে উপকৃত হয়। আবার অর্কিড বা সোনাঝুরি অন্যগাছের উপর পরজীবী হয়ে বাঁচে। কোনো কোনো লতা বড় গাছের তলায় জন্মে, বড় গাছের ছায়া এড়াবার জন্যে গাছ বেয়ে উর্ধ্বমুখী হয় সূর্যের আলো আহরণের জন্যে। বিভিন্ন গাছেদের মধ্যে পারস্পরিক সম্বন্ধ—শত্রু কিংবা বন্ধুর মত, এই সম্পর্কের বৈজ্ঞানিক নাম Allelopathy যা মোটামুটি নতুন ধরনের বৈজ্ঞানিক ক্রিয়া। এই বিষয়ে বিচার-বিশ্লেষণ সম্বন্ধে শক্তি অবহিত ছিলেন না। কিন্তু তাঁর মেধাবী পর্যবেক্ষণ ক্ষমতায় বিষয়টি হৃদয়ঙ্গম করেছিলেন যার নিদর্শন কবিতায় রয়েছে। যেমন—

> গাছ কেন গাছের বিরুদ্ধে কথা বলে?
> ....
> কারণ জানি না কেন গাছ কথা বলে
> গাছের বিরুদ্ধে, গাছ মানুষ তো নয়! (পঃ সঃ ২, ২০৬ পৃঃ)

বা

> বাগানের দুটি গাছ দুরকম ব্যবহার করে।
> একজন কাছে ডাকে, অন্যজন, বলে, যাও দূর—
> একজন ক্রুদ্ধকণ্ঠ, অন্যজন আপ্লুত মধুর.......... (পঃ সঃ ৫, ১১০ পৃঃ)

কবি বিভিন্ন গাছের জীবনপ্রণালীর মধ্যে পার্থক্য লক্ষ করেন এবং শালগাছের সমবায়হীন স্বভাবের কথা কবিতায় জ্ঞাপন করেন—

> গাছের ভিতর কিছু ভেদাভেদ আছে।
> শালের জঙ্গলে নেই অন্য কোনো গাছ
> তা কি শুধু শোভা, শুধু সৌকর্য একক,
> নাকি শাল অন্য কোনো সংস্রবে বাড়ে না,
> একাকী জঙ্গলে বাড়ে, মরেও একাকী..... (পঃ সঃ ৫, ২১৬ পৃঃ)

ছোট এবং বড় গাছেদের মধ্যে জঙ্গলে সহঅবস্থান সত্ত্বেও, ছোট গাছের জীবন সংগ্রামকে নিয়ে কবি দেখেন—

> ছোটোখাটো গাছপালা কিছু আছে শ্বাপদের মতো,
> তাদের ভিতরে শোয়, তাদের ভিতরে কথা বলে,
> বড়ো গাছ পড়ে থাকে শুধু পরিপ্রেক্ষিত বানাতে,
> ছোট গাছপালা ঐ শ্বাপদের মতন বাঙ্ময়। (পঃ সঃ ৫, ২৫২ পৃঃ)

এখানে শ্বাপদ শব্দটির জন্যে ছোট গাছে সংগ্রাম বললেও একে সমন্বয় কিংবা symliosis-যা গাছেদের আকছার ঘটে, তাও বলা চলে।

দুটি গাছের পারস্পরিক সম্বন্ধ একের শিকড়ের সঙ্গে অন্য গাছের শিকড়ের—যে কথা আগেই বলা হয়েছে। সেই সম্বন্ধই কবি লেখেন—

শিকড়-বাকড়ের সঙ্গে, ফুলের চেয়ে
শিকড়ের সঙ্গেই এখানে সমঝোতা বেশি
মাটির কাছাকাছি থাকে বলেই গায়ে এদের
কেমন সোঁদা সোঁদা গন্ধ—যা কেবলই মনে পড়ায়
ভাটফুল, যজ্ঞডুমুর, দোলমঞ্চ আর দেবদারুর ফল (পঃ সঃ ৫, ২৮৭ পৃঃ)

এই যে গাছের শিকড়ের সঙ্গে অন্য গাছের শিকড়ের সংঘাত তা কিন্তু অরণ্য, বিশেষত প্রাকৃতিকভাবে সৃজিত, সেখানে সম্মেলিত হয় এক এক ধরনের গাছের জনতা, যেমন শালের, কবির ভাষায়—

মাথার উপর শালবনে
কান পেতে তার কথা শোনে
রোদ্দুর বৃষ্টিতে শোনে কথা
একা, ঐ একাকী জনতা। (পঃ সঃ ২, ১৭১ পৃঃ)

ভারতে আমরা যে অরণ্যদের সচরাচর দেখি তার মধ্যে যেমন থাকে যূথবদ্ধ শাল তেমনই আরো অনেক গাছ। এককালে প্রকৃতি যেমন অরণ্য রচনা করেছিল তেমনি তার মধ্যে গড়ে তুলেছিল বিভিন্ন গাছের মিলিত সমাজ। কবি তাঁর কবিতায় পরম মমতায় সেই অরণ্য সৃষ্টি করেন এই লিখে—

একবার বসন্তে এসে ঘুরে যেও জঙ্গল মহলে।
পলাশ শিমুল দেখবে হৈ হৈ কাণ্ড বাধিয়েছে,
সে আগুনে পুড়ে যেতে ইচ্ছে হবে রোজ, প্রতিদিন।
বহ্নবর্ণ পলাশের সাজে হয়ে উঠবে লক্ষ্মীসরা,
চোবাবে কাপড় তার রংমশালে, জলে—
মানুষ ফুলের মতো ফুটে উঠবে নিশ্চয় সেদিন।
শাল ও সেগুনের হাল্‌কা মঞ্জরী খসিয়ে,
পলাশের নেশা শুরু, শিমুল মাদার
কুল গাছে ফুলগন্ধ ফাল্গুনের শেষে।
গণ্ডোয়ানা পাথরের ভাঁজে ভাঁজে উঠেছে অর্জুন
আর আছে মহানিম পিয়াশাল, বাঘের আড়াল
বাঁশ, বেঘোঘাস আর পাথরের খাঁজে ফার্ন লতাপাতা অর্বুদ জোনাকি
মনে হবে দেওয়ালির রাত বুঝি জঙ্গলে প্রত্যহ
নিঃশব্দ দেয়ালি আজ জঙ্গলে-আকাশে। (জঙ্গলে বিষাদ আছে, পঃ সঃ ৬, ৭১ পৃঃ)

শক্তির এই আরণ্যক চিত্রকল্প আমার কল্পনাকে লাগামছুট করে। মনে হয় বসন্তের জঙ্গল মহলে যে সব গাছ ফুল ফুটিয়ে অগ্নিসম রঙ ছেটায়, যেসব গাছ বা ফুল ছাড়া এই জঙ্গল মহলে আরো অনেক গাছ। সূর্যের আলো নিয়ে উক্ত, অবশ্যই কবিতায়, গাছ যা শোষণ করে প্রাক বসন্তে যে নিজেদের দেহবিন্যাসে সক্ষম হয়েছে, বসন্তর আগমনে যে সেই সূর্যের

আলোকে প্রত্যাবৃত করে দেওয়ালির আলো হয়ে ফুটে উঠেছে। এ যেন কবির প্রকৃতি সাধনা অর্থাৎ সৌন্দর্য বা সুন্দরের অন্বেষণ, যা বিজ্ঞানেও অন্যতম শর্ত।

(তিন)

পাঠকরা জানেন এই কবির কবিতায় চাঁদ উপস্থিত হয়েছে নানা সূত্রে। প্রত্যেক প্রাকৃতিক উপাদান যখন কবিতায় আসে তখন কবির মনের একটা গূঢ় চিত্র পরিকল্পনা থাকে। যার থেকে মনে জাগে এক অনুভাবনা। এর কিছু ব্যাখ্যার প্রয়োজন। ইংরেজ বিজ্ঞানী ও দার্শনিক অধ্যাপক সি এইচ ওয়াডিংটন তাঁর লেখা বই, Scientific Attitude বইয়ের (১৯৪৯) অন্তর্গত প্রবন্ধ Art looks to Science-এ প্রণিধানযোগ্য উক্তি করেছেন। তিনি লিখেছেন, 'If the moon is a body giving off light of such and such wave length and such and such an intensity, there is no smear of sentimentality over its face. Light of that colour and brightness can be significant moving, not because we have been told that the moon is the Goddess of love, but perhaps because it abolishes difference of colour and fineness of detail from what we see: or becuse we experience it at the sametime as silence and a relief from necessity of doing something soon; or even possibly some more obscure reason to do with the habits of life of our biological ancestors.'

এবার কবিতার খোঁজ পেতে চাই। তাও আছে, যেমন—

হলুদ জোনাকি এসে উড়ে উড়ে পড়ে
চাঁদের প্রচ্ছায়া জলে একাকী লুকোনো
প্রান্তর পাথর নিয়ে বৈশাখ জুড়ে
—নীরবতা কোথা আছে, কান পেতে শোনো— (পঃ সঃ ২, ১৫৩ পৃঃ)

লক্ষণীয় ঐ নীরবতা শব্দটি, যা silence বোঝাচ্ছে। কিংবা

পথে পড়ে আছে চাঁদ, তাকে নাও তুলে
সংকেতের মতো রাখো কৃষ্ণ সিঁথিমূলে
জঙ্গলের, নিজে পাহাড়ে দাঁড়াও—
চূড়ায় আকাশ এসে তোমায় শুধাবে :
এ পথে নিঃশব্দে যাও, তার দেখা পাবে। (পঃ সঃ ২, ১৭৯ পৃঃ)

ঐ পথে নিঃশব্দে যাও অর্থাৎ আবার silence ইঙ্গিতময়। আবার অন্য একটি কবিতা—

শব্দের ঝর্ণায় স্নান করে ওরা আকাশের নিচে
উৎসব শুরু ও শেষ, শোলাফুল চাঁদোয়ায় হিম
চাঁদের মুখের দিকে চেয়ে থাকে, মনে পড়ে তারও
আর কোনো কাজ নেই

'এবার অন্যত্র যেতে পারো' (পঃ সঃ ২, ১৯৮ পৃঃ)

অধ্যাপক ওয়াডিংটনের তত্ত্বকথা যথা—Silence and relief from necessity of

doing something soon এমন কথাই কবি বুঝিয়েছেন যে আর কোনো কাজ নেই— 'এবার অন্যত্র যেতে পারো'। কবির এক কবিতা সম্পর্কে কবি ব্যাখা দিয়েছেন, সেই কবিতার নাম—'হাতছানি, নীল হাতছানি' (পঃ সঃ ৩, ১৬৯)। কবির নিজস্ব ব্যাখ্যা—"পদ্যটা শুরু করেছিলুম 'শিলচরে নীল চাঁদ—' এই বলে। কিন্তু অবুঝের মতো সরে এলুম। হয়তো নীল চাঁদ মানে শান্তি ও ছুটির নিমন্ত্রণ।" সেই silence (শান্তি) and a relief from necessity of doing something soon (ছুটির নিমন্ত্রণ) বোঝাচ্ছে। স্যার ওয়াডিংটন জেনেটিক্স ও বিবর্তন বিশেষজ্ঞ ছিলেন এবং ১৯৪৯ সালে প্রকাশিত বইয়ের Arts look Science-এ যে বক্তব্য বা ব্যাখা দিয়েছেন চাঁদ সম্পর্কে তার হদিস কবি শক্তির জানা ছিল না, কিন্তু শক্তির কী আশ্চর্য অনুমিতি (hypotheses of science), তার থেকে আশ্চর্য হল বিজ্ঞানীর সঙ্গে এক কবি, বিশেষত শক্তির মত কবির ব্যাখ্যার অসম্ভব মিল। শক্তির কবিতার ভাষায় যেন— "চাঁদ ছিলো চাঁদে লেগে।"

স্যার ওয়াডিংটন উপরোক্ত উদ্ধৃতিতে চাঁদকে বলেছেন,..."the Moon is the Goddess of love" অর্থাৎ ভালোবাসার প্রতীক। এবার লক্ষ্য করি শক্তির কবিতাংশে—

এক গাধা আর চাঁদ নিঃশব্দে হেঁটে চলেছে বনের মধ্যে দিয়ে
কেউ কারুর দিকে ফিরেও তাকাচ্ছে না।
এভাবে, এককালীন সঙ্গে যাওয়ার নাম, তোমরা দিয়েছ—
ভালোবাসা। (পঃ সঃ ১, ২৪৩ পৃঃ)

এই কবিতাংশে পাচ্ছি নিঃশব্দে (silence), ভালবাসা (love) এবং বনে গাধার চাঁদের সঙ্গে হাঁটা (obscurity) এবং habit of life of our biological ancestor. যে কিনা মানুষের পূর্বসূরী গাধা।

(চার)

জুরাসিক মহাযুগে উদ্ভব স্তন্যপায়ী প্রাণী কেমন ইঁদুর এবং সেই স্তন্যপায়ীর ক্রম রূপান্তর ঘটে সিনোজয়িক মহাযুগের শেষ প্রান্তের কোয়ারটারনারি যুগে মানুষের আগমন। এই কবির কবিতায় ইঁদুর এসেছে নানা প্রেক্ষিতে। বিবর্তন প্রসঙ্গে কবিতা—

তাই ইঁদুর এসেছে আজই মাঠে
জ্যোৎস্নায় রোমাঞ্চ তার চোখ পড়ে—
সে
মানুষেরই বন্ধু, তার আপন...... (পঃ সঃ ২, ১২৮ পৃঃ)

আর একটি কবিতায় কবি আভাস দেন মানুষের বিবর্তনের বাল্যকালে—

জ্বালা সব ধুয়ে মুছে গেছে সবুজ বৃষ্টিতে ঝড়ে মেঘে
আন্দোলন করে পাখি সন্ধ্যায় সকালে বায়ুবেগে।
খরগোশ ইঁদুর আছে, ছোটো প্রাণ নিয়ে আছে বুঁদ
এখানেই, ঝর্ণাজলে ঝিকিমিকি মাছ করে খেলা

এখানেই মনে হয় স্তব্ধ হয়ে আছে ছেলেবেলা
বড় দুঃখী মানুষের মানুষীর সুখে-ভরা মন।। (পঃ সঃ ৬, ১২৫ পৃঃ)

এ কি কবির নিজস্ব বাল্যকাল না মানুষ মানুষীর বাল্যকাল, যার যাত্রা শুরু হয়েছিল খরগোশ-ইঁদুর থেকে। খরগোশ ইঁদুরের অনেক আগে এসেছিল মাছ সেই জলে যেখানে থাকেন কবির ঈশ্বর অর্থাৎ জীবনের সৃষ্টিকর্তা।

কবি শক্তি অন্য একটি কবিতায় বিবর্তন পরিক্রমা করেন—

বদ্‌লে যায় বদ্‌লে যায়—বদলে যেতে যেতে
একটি ইঁদুর থমকে দাঁড়ায় খড়বিচলির ক্ষেতে
বলে, আমার স্বেচ্ছা সাধ্য সব নিয়ে এ কাঙাল
যাওয়ার মধ্যে ঝাঁট দিতে চাই বিশ্বভুবন জাঙাল
এবং তাকে জড়ো
করি চুড়োয় আকাশস্পর্শ ইচ্ছা এমন

বদ্‌লে যায় বদ্‌লে যায়—বদ্‌লে যেতে যেতে
একটি মানুষ থম্‌কে দাঁড়ায় জীবনে হাত পেতে
দিন ভিখারি বাউল বলে, ইচ্ছামতন পারি
বদলবন্ধ কাল কাটাতে...কিছু না রাজবাড়ি
এবং ভাঙা ঘরও
শুধু বাঁধন, বদ্‌লে যাওয়া মূর্তিকে রঙ করো। (পঃ সঃ ১, ৪৮ পৃঃ)

এই কবিতাটি অন্যতম উদাহরণ যা কবিতার মাধ্যমে মানুষের বিবর্তনের অদৃশ্য পরিক্রমা অন্তে দাঁড় করিয়ে দেয় পাঠককে। ক্ষীরবৎ চিন্তার সঙ্গে লেখনীর এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। জুরাসিক মহাযুগে ইঁদুরের আবির্ভাব। এই স্তন্যপায়ী ইঁদুর বিবর্তিত হতে হতে মানুষে সমাপ্ত হতে লেগেছিল ১০০০ লক্ষ বছর। ইঁদুরের ইচ্ছে ঝাট দিতে চাই বিশ্বভুবন জাঙাল অর্থাৎ বিবর্তনের পথ পরিষ্কার করা। বদল বন্ধ কাল কাটাচ্ছে মানুষ। মানুষ যে রাজবাড়ি এবং ভাঙা ঘরের বাঁধনে জড়িয়েছে। মানুষের এই স্বভাব কিন্তু ইঁদুরের স্বভাবের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ। ইঁদুর মাটি খুঁড়ে মাটির তলায় নির্মম, করে নিজের ঘর, আর মাটি খুঁড়ে মাটির উপরে বাড়ি করে মানুষ। তাহলে আদিম ও আধুনিক, অর্থাৎ ইঁদুর ও মানুষের দুধরনের বসবাসের একই ধরনের প্রবৃত্তি কাজ করে। এই বিষয়টির উপর বৈজ্ঞানিক স্যার ওয়াডিংটন লিখেছেন, In the same way as the rat, man of today, even separated from his traditional culture, still appears to be the scientific architect as a being with certain character, requiring houses of a kind which will allow, in fact encurage, the character to express itself.

শক্তির কবিতায় ইঁদুরের বাস্তুস্থাপনের সংকেত রয়েছে—

বুকের মধ্যে হাত ঘুরিয়ে তুললে ,মাটি
ডাক দেবে না শীতলপাটি

গভীর ইঁদুর
আঁধারে ধান বইবে ঘরে, স্বপ্নে কি দূর
পরাণে মোর যাওয়া? পাবোই বাস্তু খাঁটি
বুকের মধ্যে হাত ঘুরিয়ে তুললে মাটি? (পঃ সঃ ১, ২৫২ পৃঃ)

কিংবা মানুষের গৃহস্থ হয়ে কোনো এক সম্প্রীতিদায়কের অদৃশ্য অস্তিত্ব অনুভবের কথা কবিতায় প্রকাশ—

তিনি এখন গৃহস্থ, তাই
আমার ঘরের মধ্যে তাঁহার সম্প্রীতি পাই
এবং দেখি ছড়িয়ে আছে
যাবজ্জীবন পথ জুড়ে স্বতন্ত্র নাচে...... (পঃ সঃ ১, ২৫১ পৃঃ)

বুদ্ধিমান মানুষের এই হল গৃহের অন্তর চিত্র।

(পাঁচ)

শক্তির কবিতায় আছে—'সবার থাকে না বীজ শাখা থাকে' অর্থাৎ বীজের মাধ্যমে সেই গাছের প্রসারণ ঘটে না। বহু বহু গাছ বিশেষ করে অনেক ফুলের, ফলের গাছের বীজ উৎপাদনে ব্যর্থ হয় কিংবা বীজ থাকলেও বীজ থেকে চারা ব্যবহার হয় না, যেমন আম। জবা, রজনীগন্ধা, বেল, চন্দ্রমল্লিকা ইত্যাদি গাছ বীজ উৎপাদনে অপারক। এই গাছগুলির শাখা বা কন্দ থেকে নতুন গাছের চারা করতে হয়। বীজ উৎপাদন ঘটতে হলে গাছের স্ত্রী বা গর্ভকেশরে পুং পরাগ সংযোগ ও নিষিক্তির ফলে সফল বীজ সৃষ্টি সম্ভব। কিন্তু অনেক গাছের সে ক্ষমতা থাকে না। সাধারণত এই সব গাছ কিন্তু আদি কালে বীজ উৎপাদক ছিল। পরবর্তীকালে প্রকৃতিতে প্রজাতিদের মধ্যে অবাধ সঙ্গমে সংকরায়ণ হয়ে তার গুণ বর্ধিত হলেও বন্ধ্যা হয়ে গেছে। তাই তাদের শাখা বা স্ফীত শিকড় থেকে তাদের অযৌন প্রজনন করা হয়। বৈজ্ঞানিক ভাষায় বলা হয় vegetative propagation বা অধুনা পরিচিত শব্দ cloning এবং ফুলের স্ত্রীঅঙ্গ পুরুষঅঙ্গের সম্প্রবহারা। তাই শক্তি লিখেছেন, ছুঁয়ে আছো চন্দ্রমল্লী, পৃথিবীর অমর বিধবা। (পঃ সঃ ১, ৩০)।

শক্তি তাঁর কবিতায় লিখেছেন—

বহুমুখী বীজ ঝরে, কিংবা দেহ, দেহের দ্যোতনা.......
ঝরে পড়ে..... (পঃ সঃ ১, ২৪ পৃঃ)

বহুমুখী বীজ অবাস্তব কিছু নয়। একটি বীজ থেকে গাছের কোনো কোনো প্রজাতির এইরকমের বীজ সমূহের অভ্যাস আছে। লেবুর বীজে এরকম দেখা যায়, একটি বীজ থেকে একাধিক শিশুগাছ অঙ্কুরিত হয়। এমন প্রবণতা বাজরা কিংবা অনেক ঘাস প্রজাতির আছে। একে বলে polyembryonic বা ভ্রূণবিশিষ্ট একটি বীজ। এই ধরনের বীজ উৎপাদিত হয় বীজাধারী কোষের মিশনে ভ্রূণসাদৃশ্য অস্তিত্বের সৃষ্টি করে বা অযৌন সঞ্চারণ বলা যায়। এমন ঘটনাকে বলা হয় apomixis বা অসঙ্গযোনি।

শক্তির মধ্যে গাছ ফুল ফলের প্রকারভেদ নিয়ে এক দুর্বার অনুসন্ধিৎসা ছিল। তাই কবিতায় পাই—

সব ফুলই কি গোষ্ঠীগত, সব ফুলই কি চাঁদের
একটি দুটি আমায় চিনুক, বাদবাকি সব তাঁদের (পঃ সঃ ৫, ১৯ পৃঃ)

এখানে চাঁদ রাতের প্রতীক। বহু ফুল সূর্যের প্ররোচনায় যেমন ফোটে, তেমন অনেক ফুল সূর্যাস্তের পর ফোটে, দিন কাটলে। যেমন কৃষ্ণকলি, ঝিঙে, হাসনুহানা, কামিনী, বেল। অনেক সাদা রঙের ফুল রাতে ফোটে। ধুতরোর একটি প্রজাতির ফুলকে বলে moon flower অর্থাৎ চান্দ্রেয় ফুল।

বীজ উৎপাদিত হয় ফুলের গর্ভে। বীজ হচ্ছে গাছের নিজের অস্তিত্ব বজায়ের যান। প্রজাতির অস্তিত্ব বজায় রাখা তখনই সম্ভব যদি ফুলটি থাকে যথাস্থানে। শক্তি তাই কবিতায় নিষেধাজ্ঞা জারী করেন—

গাছের ফুলগুলি দাও গাছে থাকতে
ফুলগুলি তুলো না।
এতে যে গাছের ক্ষতি
এ তথ্য ভুলো না। (পঃ সঃ ৭, ৩২১ পৃঃ)

কবির মনে পাতা বা ফুল ঝরে যাওয়া কিংবা ফুটে ওঠা কবিতার আস্পদ হয়।

ফুলের জঞ্জাল আমি নাড়াই দুপায়ে
উঠোনের এ-অবস্থা। কাঠচাঁপা ঝরে পড়ে আছে।
ডিঙিয়ে-ডিঙিয়ে আমি যতো যেতে চাই
ততো যাই কাঠচাঁপায় ছড়িয়ে।
এছাড়া আমার আছে যুঁইফুল, বেলি ও মাধবী
তাদের একজন শুধু গাছে সেঁটে থাকে।
বাকি সব ঝরে পড়ে পদতল স্পর্শ করবে ব'লে
ভূতের ভয়ের মধ্যে ওরা সব তন্দ্রার প্রহরী। (পঃ সঃ ৫, ২৮১)

কাঠচাঁপার তলের মাটি ঝরা ফুলে ভরে যায়। যুঁইফুল ও মাধবী স্বাভাবিক ভাবে ঝরে যায়, সে তুলনায় বেল ঝরতে দ্বিধা করে। ফুল ঝরা নয়, পাতা ঝরাও এক প্রাকৃতিক দৃশ্য হয় কবিতায়—

দেবদারুর হলুদ পাতা ছড়িয়ে আছে
গাছের ডাল বড় কাঙাল হয়েছে ফাল্গুনে
কচি ও কাঁচা সবুজ পাতা আসেনি কাল গুনে
দেবদারুর হলুদ পাতা ভূতল ভরে আছে।

পাতা বা ফুল ঝরে যাওয়ার তারতম্য আছে। কোনো গাছের পাতা বা ফুল ঝরে যায় abscissic acid যার ক্রিয়ায় পাতা বা ফুল ঝরে যায়, তার তারতম্যের জন্য। দেবদারু যে ফাল্গুনে পাতা ঝরায় এই পাতা ঝরানো annual ring formation হয় গাছের গুঁড়ির

মধ্যে। ঐ ring গোলাকৃতি দাগের, সংখ্যা গুনে বয়েস গোনা যায় গাছের। এ হল বাৎসরিক পর্ণমোচন।

পর্ণমোচন ফাল্গুনের আনন্দবার্তা বহন করে ভেবে কবি লেখেন—

সজিনার পাতা ঝরে—তবু কার বিদায় বেদনা
এত সুখকর (পঃ সঃ ১, ১২২ পৃঃ)

এই পাতার বিদায় নতুন পাতার, কচি ও কাঁচা পাতার আনন্দময় বার্তা বহন করে। কবি লিখেছেন—

তারো দুঃসময়
পাতা থেকে ফুল বড়ো নয়
পাতা থেকে ফল বড়ো নয়... (পঃ সঃ ১, ৯২)

বলা বাহুল্য পাতা তার সবুজ রঞ্জক—ক্লোরোফিল-এ সূর্যরশ্মি আবদ্ধ করে যে খাদ্য সংশ্লেষ করে তা গাছের পুষ্টি ও বৃদ্ধি সাধন শুধু করে তা নয়, মানুষের আহার্যভাণ্ডার সৃষ্টি করে। পাতাই মূলত সালোকসংশ্লেষের মাধ্যমে বেড়ে ওঠে। গাছের ফুল ফল তো গাছের বৃদ্ধির পরিণতি পাতার অবদানে। তাই কবি তাঁর 'বৃক্ষের প্রতিটি গ্রন্থে' লেখেন—

স্তনের শাঁসের মতো অন্তঃপত্নী তোমার প্রাণের সংবেদনা
চিত্তের ঐকিক গ্রন্থে ছিঁড়ে দেয়, আমার পল্লব...
শ্বেত অজধারা এসে অমল ক্ষুরের চিহ্নে ভরে দেয়
আকাশের শাখা।
পাই না শুধুই ফুল, মূল, ক্ষত সত্যের বেদনা ভালবেসে।
(পঃ সঃ ১, ৬০ পৃঃ)

এই কবিতার অংশ আরো প্রাঞ্জল ভাবে লেখেন কবিতায়—

কারা যেন কাঠ কাটে, করাতের মধ্যে কারা কাঁপায় জঙ্গল
মনে পড়ে তার যত ফল
খেয়েছি প্রাণের জন্য, তার মূল্য কত
(পঃ সঃ ৩, ৯৪ পৃঃ)

কবি জড় ও জীব অর্থাৎ গাছের বৃদ্ধির কথা লিখেছেন চমকের মতন—

এইভাবেই, যেন গাছ, ছাঁদ ফুঁড়ে আকাশের দিকে
বেড়ে চলে, জীবন্ত বলেই বাড়ে, প্রাসাদ বাড়ে না...
(পঃ সঃ ৩, ২৮ পৃঃ)

গাছের সূর্যের আলো পাতার অঞ্জলি ভরে নেওয়ার ছবি আঁকেন—

উঠানে পড়েনি খসে শিরীষের পাতা
সকল সবুজ কিছু উচ্চে উঠে আছে
প্রাসাদের পার্শ্বে বসে প্রাসাদ নির্মাতা
রোদ্দুর, গরদবস্ত্র, লেগে থাকে গাছে.... (পঃ সঃ ২, ২১৬)

কবি আবার পাতার অনিবার্য উপস্থিতিতেই ফুলের সঞ্চারের কথা বলেন—

বাগানে ফুলের চেয়ে পাতা
অবশ্যম্ভাবী।
পাতার প্রেক্ষিতে ফোটে ফুলগুলি... (পঃ সঃ ৬ ১৪ পৃঃ)
ভালো-মন্দ মেশা,
কিন্তু পাতা জেগে থাকে, বাগিচা
বিস্তৃত করে রাখে—
আক্রমণ হবে বলে কোনোদিন
ফলের, বীজের।

উদ্ভিদ বিজ্ঞানে বলা আছে যে flower is a modified shoot, এখানে shoot বলতে বোঝানো হয়েছে পাতাকে। পাতারই অন্তিম রূপান্তর ফুলে যা থেকে সৃজিত ফল। এই বৈজ্ঞানিক সত্যটি কবির কবিতায় জেগে ওঠে—

পাতাগুলি দ্রুত ফুল হয়ে যাচ্ছে।
আমার হিসেবে গরমিল ঘটিয়ে
শেষ পর্যন্ত পাতার ফুল হওয়াই
বড়ো হয়ে উঠলো
তার হিসেবনবিশ হিসেবে আমার হল হার। (পঃ সঃ ৫, ২৩৬ পৃঃ)

কবি তাঁর কবিতায় জানান কী করে গাছের পুষ্টির জোগান হয়—

পাতায় রোদ্দুর পড়ে। শিকড়ে যায়
তা থেকে মাটিতে মিশে অনুর্বরতাকে
সময়ে উর্বর করে। পাতা ও মাটিতে
কী দারুণ যোগাযোগ। কী গভীর টান
শিকড়ের। অভ্যন্তরে, টেনেছে পাতালে।। (পঃ সঃ ৫, ৭১ পৃঃ)

আসলে গাছের শিকড়ের যত বৃদ্ধি ঘটে, ততই তার শাখা প্রশাখা পত্রসমৃদ্ধ হয় এবং বৃদ্ধ পাতারা মাটিতে পড়ে জৈব সার হয়ে গাছের পুষ্টি জোগায়। তাছাড়া ফসল কাটার পর শিকড় মাটিতে থেকে যায় এবং এবং তাও জৈব সার জোগান দেয় মাটিকে।

মাটিকে সম্বৃদ্ধ করার যে প্রাচীন প্রাকৃতিক ঘটনা, যেমন বন্যা, তাকেও কবি আহ্বান জানান—

মাঝে মধ্যে বন্যাও দরকার।
কেননা মাটির খাদ্য চাই
সবুজের পুষ্টি চাই, পলি চাই, বিবর্তন চাই—
মাঝে মধ্যে বন্যাও দরকার।

কিন্তু মানব প্রেমিক কবি তেমন বন্যা চান; যা

কিন্তু হাহাকার নয়, মৃত্যু নয়, ধ্বংস নয় কোনো—

এবং সেই বন্যার স্বরূপ হবে—

দরজার কাছে এসে ফিরে যাবে জল
দিয়ে যাবে, নিয়ে যাবে অপুষ্টি বাতিল
দেবে ভবিষ্যত-ভরা খাদ্যের পসারা.... (পঃ সঃ ৫, ৭২ পৃঃ)

কবির মনস্কতা পাঁকের মাটির সর্বাঙ্গীণ স্বাস্থ্যরক্ষায় প্রধান ভূমিকার কথা। তিনি লেখেন

শ্যাওলা দাম মজ্জায় কোনা
তলায় শোয় পাঁকে কালোসোনা (পঃ সঃ ৭, ২৬৮ পৃঃ)

এই পাঁককে মৃত্তিকা-বিজ্ঞানীরা নাম দিয়েছেন Humus এবং স্টেপটোমাইসিন আবিষ্কর্তা অধ্যাপক ওয়াকসম্যান এই Humus-এর রাসায়নিক গুণাগুণ নিয়ে একটি পাঠ্যবই রচনা করেছিলেন। মাটিতে যত বেশি Humus থাকবে ততই হবে উর্বর। তাই কবি এর নাম দেন 'কালোসোনা'।

অতীতে, সুদূর প্রাচীনকালে সমৃদ্ধ অরণ্য পৃথিবীর উথাল পাথাল অবস্থায় সবৃক্ষ অরণ্য প্রোথিত হয়েছিল মাটির গর্ভে। সেইসব বৃক্ষ মাটির চাপে ফসিলে পরিবর্তিত হয়। সে ফসিল আসলে অঙ্গার। এই ঘটনাও এই কবির কবিতার বিষয় হয়—

গাছে বজ্রপাত নিয়ে, কয়লা নিয়ে, পাথর প্রতিমা
তাকে সঙ্গে, বুকে নিয়ে, পাথর হয়েছি অহংকারে। (পঃ সঃ ৩, ২৩৯)

পাথর প্রতিমাকে নিয়ে মাটির অহংকার। মানুষ সেই কয়লাকে মাটি খুঁড়ে জ্বালিয়ে দিচ্ছে বলে কবির আক্ষেপ—

আমার প্রত্যক্ষ দোষ, মাটি খুঁড়ে করেছে বাহির
মৃণ্ময়ী প্রাচীন কীর্তি; যেন কাঠ কয়লার দ্যোতিত
মানুষের কাজে আসে, শিল্প হয় সংস্রবে বধির—
তার কাজ? কয়লা থেকে অস্পষ্ট, আড়ালে থাক রীতি। (পঃ সঃ ৩, ২৩৩ পৃঃ)

(সাত)

কবি শক্তি চট্টোপাধ্যায়ের কাছে প্রধানত গাছ দুরকমের অস্তিত্বসম্পন্ন। কখনো কবি নিস্পৃহ হয়ে গাছের কথা কবিতায় অলংকরণ করেন, আবার কখনো কবি নিজেই গাছের সত্তায় বিলীন হয়ে কবিতায় জেগে ওঠেন। কিংবা কখনো গাছই ঈশ্বর নয়তো মাতা অথবা রমণী। গাছকে এত বহুমাত্রিক রূপে দেখা এই কবির এক উল্লেখযোগ্য কবি মনন। যেমন সম্ভবত ঈশ্বর—

বনের সর্বত্র তিনি গাছ হয়ে দাঁড়িয়ে প্রত্যহ
আমাদের দিকে যেন স্থিরদৃষ্টি, যেন কোনোভাবে
সহজে লাগে না রোদ, ছায়া লাগে, সবুজের ছায়া।
বনের সর্বত্র তিনি গাছ হয়ে দাঁড়িয়ে প্রত্যহ
দীর্ঘদৃষ্টি মেলে দেন, আমাদের লাগে—

সুখ ও দুঃখের পারে অসীম শুদ্ধতা।

এই 'তিনি' কে? যিনি কবির চেয়ে বড় এবং কবিকে নির্ভরতা দান করেন, যাঁকে কবি ঈশ্বর বলেছেন। আবার নিজেকে অর্থাৎ মানুষকে গাছ হিসেবে দেখেছেন—

আমার শিকড় নেই, ডালাপালা নেই পাতা নেই
মাংসে ঘোর দুঃখ আর হাড়ে আছে বাতাস বহতা
আমার বাগান নেই, মাটি নেই, মাতৃভূমি নেই
আমার স্বপ্নের মধ্যে শুধু ও'ড়ে শুধু ধুলো ও পাথর। (পঃ সঃ ৩, ১৮৫ পৃঃ)

পুনরাবৃত্তি হওয়া সত্ত্বেও বলা সমুচিত যে কবি কবিতার ব্যাখ্যা করতে গিয়ে নিজেই লিখেছিলেন, মানুষকে গাছ হিসেবে দেখা আমার প্রিয় ব্যসন। বলার অপেক্ষা রাখে না যে কবি গাছকে শুধুই মানুষ নয়, রমণীর মতনও ভাবেন (পঃ সঃ ৩, ১৮১)। তাছাড়া, গাছ তার সকল বৈচিত্র্য সম্ভার সাজিয়ে এই পৃথিবীতে মানুষের আবির্ভাবের আগে আগত হওয়ায়, মানুষ তাকে দেখে হৃদয়ঙ্গম করেছিল এক অসীম রহস্যবোধ। মানুষ সবিস্ময়ে আবিষ্কার করেছিল এই মূক ও চলচ্ছক্তিছুট গাছেদের পাতা, ফুল, প্রশাখা-শাখা বিস্তারের হেতু অবয়বের ভিন্নতা মানুষের কল্পনাকে উস্কে দিয়েছিল। বিশেষ করে ভারতবর্ষের মানুষ বহুরূপে গাছকে তাদের কল্পনায় স্থান দিয়েছিল। এই কল্পনাকে ভিত্তি করেই ভারতবর্ষে প্রাথমিক আয়ুর্বেদ শাস্ত্রের সূচনা যা গাছের প্রতি বিভিন্ন গুণাগুণ আরোপ করা হয়েছিল। তার থেকেই ভেষজ বিজ্ঞানের সূত্রপাত। আদি কল্পনা যখন বিশ্বাসের পর্যায়ে এল অভিজ্ঞতার পথ পরিক্রমা করে, তখন আয়ুর্বেদ শাস্ত্র যেমন হল সমৃদ্ধ, তেমনই ভাবুক, কল্পনাবিলাসী ও কবি চিত্তেও গাছকে নিয়ে শুরু হয়েছিল পুলকিত কল্পনার বিস্তার। এমনতর যে কাল্পনিক বোধ গাছের প্রতি আরোপ করা, বিজ্ঞানের ভাষায় তাকে বলা হয়েছে—Doctrine of Signature. যার একটি লোকায়ত ব্যবহার এই যে, যেহেতু বট বা কাঁঠাল পাতা ছিঁড়লে দুধের মত রস নির্গত হয় গাছ থেকে, সেইহেতু কাঁঠাল বা বটপাতা গরু বা ছাগলকে খাওয়ালে ঐ দুগ্ধদায়ী পশুরা বেশি দুধ দেবে। এই বৈজ্ঞানিক আনুমানিক সূত্র ধরে প্রাচীন ভারতীয় কবি থেকে শুরু করে রবীন্দ্রনাথ, জীবনানন্দের মনন ঘুরে কবি শক্তির মধ্যে আরো তীব্রতর গাছ সম্পর্কে বোধ আভাসিত যার সাক্ষ্য উপরে উদ্ধৃত কবিতার মধ্যেই আছে। এই গাছকেন্দ্রিক Doctrine of Signature যেমন বিজ্ঞানে বিশ্বাস নির্ভর গবেষণাকে উদ্বুদ্ধ করেছে, তেমনই কবিদের গাছকেন্দ্রিক কবিতা কল্পনাকে আলোড়িত করেছে। কবি শক্তি এমনতর কল্পনায় সম্ভবত সর্বাধিক আক্রান্ত অর্থাৎ তাঁর কবিতায় গাছ নানা রূপে রূপান্তরে উদ্ভাসিত হয়েছে।

(আট)

এই কবির চেতনায় সতত বহতা সময়ের বোধ ছিল জাগ্রত এবং তাঁর কবিতায় তা ফুটে উঠেছে। বিখ্যাত বিজ্ঞানী হকিন্স এই বিশ্বের সৃষ্টিরহস্য উন্মোচন তত্ত্ব সন্ধানকালে তাঁর বৈজ্ঞানিক মননে এই ধারণার কথা ব্যক্ত করেছেন, বিশেষত সময়ের শুরুর বিষয়ে। তিনি বলেছেন সময়-এর অস্তিত্ব ছিল মানুষ যখন থেকে, সময় গণনা করে অর্থাৎ সেই মহা

বিস্ফোরণের ফলে আজকের বিশ্ব সৃষ্টির প্রভাত থেকে, তারও আগে সময় ছিল যাকে বলা যায় ঋণাত্মক সময়। অনেকটা এইরকম যে সময় নিরবধিকাল ব্যাপী প্রবাহিত। আবার আইনস্টাইন প্রবর্তিত যে আপেক্ষিকবাদের সূচনা সেই বৈজ্ঞানিক সূত্রে আছে সময়ের বিরাট ভূমিকা। হকিন্স বা আইনস্টাইনের প্রতিপাদ্য যদিও জড়জগৎ সম্পর্কে। কিন্তু প্রকারান্তরে জীবজগতের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। অবশ্যই আদি-অন্ত বিবর্তনের প্রতি এই প্রতিপাদ্য আরোপ করা যায়। কিন্তু জীবের তথা মানুষের খণ্ডকালের জীবনে এই প্রতিপাদ্যও প্রযুক্ত করাই যায়। শৈশব, বাল্য, যৌবন, প্রৌঢ়ত্বে, বার্ধক্য ও মৃত্যু তা সবকিছুই সময়ের অগ্রগতির অভিঘাত।

সময়ের অগ্রগতির সাথে এসে বুড়িয়ে যাওয়ার চিত্র ফুটে ওঠে কবির কবিতায়—

এইতো সেদিন আমরা আমাদের জন্মদিনে করেছি গ্রহণ—
বয়েসের পরচুলা। (পঃ সঃ ১, ২০৪ পৃঃ)

এই পরচুলা গ্রহণ মানেই একবছর বেড়ে যাওয়ার সংবাদ। ঐ কবিতায় আরো লিখেছেন—

বয়স তো কারো একা নয়?
বয়স দাঁড়িয়ে থাকে কোনো মাঠে স্কেলকাঠি হয়ে—
মানুষ মাপিতে যায়, মানুষী মাপিতে যায়, বালকেরা হাসে
৫´-৪´´-এ হয়ে যায় মনোরমা কাপ-নির্বাচন।
বহুদিন বেদনায় বহুদিন অন্ধকারে হয় হৃদয়ের উদঘাটন

(পঃ সঃ ১, ২০৪ পৃঃ)

কবির বাল্যকালে ফুটবলের মনোরমা কাপ প্রতিযোগিতায় উচ্চতা মাপা হত বালকদের, বয়েস নয়। তাই বয়েস দাঁড়িয়ে থাকে মাঠে স্কেলকাঠি হয়ে। বয়েস উচ্চতা নিরপেক্ষ। আবার সেই মানুষের, যার আছে হৃদয়, বিবর্তন বহুদিন বেদনা ও বহুদিন অন্ধকার যাপনের পর হৃদয়ের উদঘাটন ঘটে। তাও ঘটে সময় সাপেক্ষে। এই সময় শুধু অনন্তই নয়। সময় উত্তাল তরঙ্গ সৃষ্টি করে বহে যায় পরিবর্তনের মোহর ছাপ এঁকে। সময় স্থির থাকা—সময়ের পরাজয়। কবির কবিতায় তা ফুটে উঠেছে—

নিজের করে বললে এসে দাঁড়ায়
সময় তাকে সব খেলাতেই হারায়
একটি খেলায় নিজে কেবল হারে
সময় কোথাও স্থির দাঁড়াতে পারে? (পঃ সঃ ৩, ১২২ পৃঃ)

বা একটু প্রচ্ছন্নভাবে একই কথা লেখেন কবি—

হারাই সুবর্ণ ঘড়ি শুঁড়ির দোকানে
প্রকৃত যা মানে
মুখোমুখি পু-জীবন তারও কিছু জানে
কিছু বা জানে না (পঃ সঃ ৩, ১২৩ পৃঃ)

সময় শুধু একটি খেলায় হারে যদিবা হয় স্থির, কিন্তু তা অসম্ভব। সুবর্ণ ঘড়ি শুঁড়ির দোকানে হারানো মানে সময়কে ক্ষয়ে যেতে দেওয়া শুঁড়ির দোকানে। সময়কে লক্ষ্য করে কবি লিখেছেন—

চলে আসে নিজ-কোট ছেড়ে অন্য-কোটে।
একে ধ্বংস করে তবে নিজেকে বাড়ায়,
তখন সময় কিংবা দুঃসময় রাজ্যপাট করে
একা-একা।। (পঃ সঃ ৪, ১০৩)

এই সময়ের রাজ্যপাট একা-একা বলতে বোঝাচ্ছে সব কিছু জড় কিংবা জীবের উপর তার অনিবার্য প্রভাব থাকলেও সময় নিরপেক্ষ। এই কবির সময়কে ধারণ করে আরো অনেক কবিতা আছে যাদের উল্লেখ করতে গেলে লেখার পরিধি বেড়ে যাবে। বিজ্ঞানে সময়ের প্রভাবের প্রবক্তা আইনস্টাইন। তাঁর বৈজ্ঞানিক সূত্রকে যিনি ঋদ্ধ করেছিলেন সেই অসাধারণ প্রতিভাবান সত্যেন্দ্রনাথ বসু 'আইনস্টাইন' নামক প্রবন্ধে লিখেছেন, "জড়জগতের ঘটনা সমূহের বিবৃতি ও উহাদের মধ্যে কার্যকারণ সম্বন্ধে নির্দ্ধারণের জন্যে বৈজ্ঞানিক যে দেশ ও কালক্ষেপরূপে প্রক্ষেপভূমির পরিকল্পনা করেন, তা যে দর্শক নিরপেক্ষ নয়, দ্রষ্টার গতির সঙ্গে তাঁহার পরিকল্পিত দেশ-কাল-ধর্মের যে নিকট ও নিত্য সম্বন্ধ আছে, ইহাই এই নতুন মতবাদের (আপেক্ষিকবাদ) প্রধান কথা। এই তত্ত্বটি দার্শনিকের কাছে খুব নতুন না ঠেকিলেও ইহাকে স্বীকার করিয়াও....পদার্থবিজ্ঞান সম্ভব হইতে পারে।" (সত্যেন্দ্রনাথ বসু রচনা সংকলন)। জড়জগতে কালের যে অভিঘাত, তেমনি জীবজগৎ ও তার বিবর্তনের উপর সময়ের এমনকি ব্যক্তিজীবনে কালের অভিঘাত অনিবার্যভাবে উপস্থিত। সময় যদি এক অসীম ধারা বা প্রবাহ হয় তবে মানুষ মায় তাবৎ ভিন্ন ভিন্ন জীব সকলেই তার সূক্ষ্ম স্পন্দনমাত্র। সময়ের লীলাখেলার সুন্দর স্বরূপ এঁকেছেন কবি—

সময়ের দুটি মুখে সরীসৃপ।
একজন এগোলে, তবে অন্যটি পিছোয়,
এইভাবে দিন থেকে অন্যদিন, বছর গড়ায়
রূপবান জীবনের দুটি মুখই পোড়ে
একদিন। (পঃ সঃ ৪, ১০৩ পৃঃ)

(নয়)

এর আগে বলা হয়েছে কবি গাছকে কখনো মাতা, কখনো ঈশ্বর বা দেবতার স্বরূপে কবিতায় স্থাপন করেছেন। শুধু গাছ নয়, পাতাকে মাতা বলেছেন। যেমন—

মাতৃসমা পাতা যদি তুমুল বিস্তার
নিয়ে আসে—
আমার আনন্দ হয়, আমি দেখি
রূপসী বাগিচা।

সবুজের রকমারি আস্ফালন দেখে
হিংসা হয়,
ফুল তো মানুষ হয়ে জেগে থাকে
সমাজে, সংসারে। (পঃ সঃ ৬, ১৪ পৃঃ)

সবুজ বলতে এখানে বোঝাচ্ছে সবুজ রঙদায়ক পাতার মধ্যে থরে বিথরে সম্মেলিত ক্লোরোফিল। এই ক্লোরোফিল সূর্যের আলো শোষণ করে যে শক্তির অধিকার হয় সেই শক্তির করুণায় পাতা শ্বেতসার উৎপাদন করে নিজের জীবনের (গাছের) চাহিদা মিটিয়েও অতিরিক্ত শ্বেতসার নানা অঙ্গপ্রত্যঙ্গে সঞ্চয় করে, যা মানুষের তথা নিরামিষাশী জীবজন্তুর খাদ্য সংস্থান করে। এই সালোকসংশ্লেষের মূল উপাদান গাছের পাতার জল ও কার্বন ডাইঅক্সাইড যা মানুষ প্রশ্বাসে নির্গত করে এবং যা মানুষের কাছে বিষাক্ত গ্যাস এবং পাতা আবহাওয়া থেকে এই বিষাক্ত গ্যাস নীলকণ্ঠের মতো পান করে গাছের সবুজ পাতা। তার বদলে আবহাওয়ায় দান করে অক্সিজেন যা বিনা মানুষের প্রাণধারণ ব্যর্থ হত। এই কবির মনে এই সব বিষয়ে ছিল সহজাত জ্ঞান যা তাঁরই তন্নিষ্ঠ অনুসন্ধিৎসা ও পর্যবেক্ষণ ক্ষমতার রসায়নে উদ্ভাসিত কবির মনেও তার সঞ্চার কবিতায়।

কবির কবিতা অনুসন্ধানে প্রমাণ পাওয়া যাচ্ছে যে কবি একথাও জানতেন যে ক্লোরোফিল দুপ্রকারের। শক্তিশালী এবং কার্যকরী, অবশ্যই বেশি, অংশটি সবুজ এবং অপেক্ষাকৃত কম কার্যকরী অংশের রং হলদে। তাই কবি আশংকা প্রকাশ করেন সবুজ ও হলুদ অংশের মধ্যে দ্বন্দ্ব। তাই কবিতায় লেখেন—

পাতার ভিতরে আছে
সবুজে-হলুদে
আছে দীর্ঘ রেশারেশি
কে কাকে কখন কোন সুযোগে দাবিয়ে দিয়ে
হবে নিরঙ্কুশ। (পঃ সঃ ৪, ১৮৬)

গাছের পাতা যদি সরাসরি সূর্যের আলো থেকে বঞ্চিত হয়, তবে পাতার মধ্যে সবুজ রঙ দায়ী ক্লোরোফিল বিবর্ণ হয়ে হলুদ রঙের হয়ে যায়। এর ফলে সালোকসংশ্লেষ ক্ষীণ হতে থাকে। এও এক ধরনের অসুখ। একথা কবির কবিতায় আছে—

বারান্দায় ঝরে পড়ে হলুদ অসুখ
এই অসুখে সূর্যালোক অত্যন্ত জরুরী (পঃ সঃ ৬, ১৯)

জন্মগত কারণে আবার অনেক গাছ ক্লোরোফিলের গঠনে অপারগ হয়। সেইসব গাছে সূর্যের আলো পেলেও সাদা রঙের থেকেই যায়। গাছের পাতার অন্তরের ক্লোরোফিলই গাছের জীবনশক্তি। তার অভাব হলে গাছের মৃত্যু অনিবার্য। একথা কবির কবিতায় আছে—

ও তন্ময় সাদা পাতা, ভাগ্যহত, বিপদ লাঞ্ছিত। (পঃ সঃ ৭, ২৭৯ পৃঃ)

এই কবির মানসে গাছের, অরণ্যের সম্যক বোধ অপ্রতিরোধ্য। বহু বহু কবিতায় প্রসঙ্গক্রমে কিংবা সরাসরি গাছের বিভিন্ন অঙ্গ বা অরণ্যের কথা এসেছে। কবিরা, বিশেষত

বড়ো মাপের কবিদের মধ্যে এই গাছ বা তার সম্মেলনকে ভালবেসে কবিতায় স্থান করে দিতে দেখেছি। এই ভাবের মধ্যে শুধুই সৌন্দর্যবোধ কাজ করে না, যুক্তিবোধ বা বিজ্ঞানবোধ কাজ করে। গাছ মানুষের দেহ থেকে ছেড়ে দেওয়া কার্বন ডাইঅক্সাইড শোষণ করে তার বদলে আমাদের ও অন্যান্য জীবকে অক্সিজেন সরাবরাহ করে। এটা সহজাত জ্ঞান হলেও গাছের মহিমাকে কবিতায় তুলে সেই কবিই ধরবেন, যাঁর গাছকে তার কল্যাণময় পরিপ্রেক্ষিতে হৃদয়ঙ্গম করেছেন।

এই তত্ত্বকথা কবির মনে এতই আকুতি জাগায় যে কবি যিনি কবিতা লেখেন গূঢ় ভাষায়, তিনি সরাসরি লেখেন—

গাছের সবুজটুকু শরীরে দরকার
আরোগ্যের জন্যে ঐ সবুজের ভীষণ দরকার
....
শহরের অসুখ হাঁ করে কেবল সবুজ খায়
সবুজের অনটন ঘাটে...
....
চোখ তো সবুজ চায়!
দেহ চায় সবুজ বাগান
গাছ আনো, বাগানে বসাও।
আমি দেখি।। (পঃ সঃ ৪, ১৫৬ পৃঃ)

এখানে কবি ব্যাপক অর্থে সবুজ শব্দটি ব্যবহার করেছেন। যথা গাছের সবুজ পাতা, ঐ পাতায় সম্মেলিত সবুজ ক্লোরোফিল যার সাহায্যে সূর্যালোকের উপস্থিতিতে কার্বন ডাইঅক্সাইড আত্মস্থ করে অক্সিজেন নির্গত করে দেয় মানুষ ও অন্যান্য জীবের নিশ্বাসের শুদ্ধ বায়ু সেবনের জন্যে। তাছাড়া সবুজ ক্লোরোফিল আমরা শাক-সবজি খাই। বৈজ্ঞানিক মত এই যে ক্লোরোফিল খাওয়ার জন্যে শ্বাস-প্রশ্বাসের বায়ুশুদ্ধি ঘটায়।

এই পর্যটনপ্রেমিক কবি একবার চলে যান সেই কালে যখন কৃষি সভ্যতার শুরুই হয়নি এবং আবার ফিরে আসেন দুঃসময়ভরা আধুনিক কালে। কৃষি সভ্যতার বিকাশের আগে গাছ আগাছার পার্থক্য করা হত না। মিশ্র চাষ হত। কিন্তু কৃষি সভ্যতার অগ্রগতির সঙ্গে গাছ (শস্য) আর আগাছার পার্থক্য করা শুরু হয়েছিল। এখন আগাছাকে তুলে ফেলা হয়, কিন্তু কবি আগাছা তোলা হলে দুঃখ পান। আগাছাও কবির ভালবাসার ধন। এ কথাও সত্য যে বহু আগাছার ভেষজ গুণ আছে। কবি দুঃখ করে লেখেন—

সকলেই গাছ নয়, কিছু কিছু
আগাছাও আছে,
তাদের নিড়ুনি দিয়ে তুলতে হয়, গাছ
সুখে থাকে,
....

আগাছাও তুলে ফেলতে কষ্ট হয়,
তারও ফুল আছে। (পঃ সঃ ৬, ১৭)

(দশ)

কবি লিখেছেন, "কয়েকটি গাছের আবার জানলা আছে, অলিন্দ আছে, পোর্টিকোর নিচে আছে আবক্ষ ঘড়ি' (পঃ সঃ ৭, ১৭৬ পৃঃ)। সত্যি সত্যি গাছে ঘড়ি আছে যার বৈজ্ঞানিক নাম Biological Clock, বিশদ অর্থে an innate mechanism controlling the rhythmic physiological activities of an organism. বাংলায় বলা যায় জৈবিক ঘড়ি যা প্রতিদিনের সূর্যের আলো ও রাতের আঁধারের তারতম্যের ছন্দের সাথে সাথে মানানসই ক্রিয়া করে। আহ্নিক গতির সঙ্গে সাযুজ্য রেখে কাজ করে। সাধারণ উদাহরণ, কৃষ্ণকলি এবং পোর্টুলাকা গাছকে যথাক্রমে 4 O' clock এবং 9 O'clock গাছ নামে ইংরেজিতে ডাকা হয়, কারণ বিকেল চারটে এবং সকাল নটায় ফুল ফোটে যথাক্রমে কৃষ্ণকলির এবং পোর্টুলাকার। মনে রাখা দরকার যে এই জৈব ঘড়ি মানুষ থেকে সকল জীবজন্তুদের মধ্যে আছে। জৈব ঘড়ি দিন ও রাতের সময়কে মাপতে পারে। আমরা ইংরেজিতে একটা যুগল শব্দ ব্যবহার করি, যেমন jet lag যা দুর দুরান্তে ভ্রমণের পর ঘটে। আসলে এটা অন্তরনিহিত জৈব ঘড়ির ছন্দপতন।

এই কবি তাঁর এক কবিতায় লিখেছেন—

রোদ্দুর লেগেছে বলে আমাদের বিবাহের মানে
ওলোট পালোট হয়ে গেছে আজ—আমি সবই জানি (পঃ সঃ ১, ১২৯ পৃঃ)

এই উদ্ধৃতি বেশ গূঢ় এবং দুর্বোধ্য ঠেকতে পারে অনেক পাঠকের। কিন্তু যে কথা লিখেছেন তা বৈজ্ঞানিক প্রমাণসিদ্ধ। বিবাহ বলতে এখানে নারী ও পুরুষের যৌনমিলন। এই মিলন অন্ধকারে উদ্দীপ্ত করে এবং প্রচণ্ড আলোয় নির্বিকার করে। দিন ও রাতে মানুষের শারীরিক স্পৃহার বদল হয়। কবি যা বলতে চেয়েছেন তাকে বলা যায় Discription of Diurnal Rhythimicity of Biological Clock অর্থাৎ জৈব ঘড়ির ছন্দপতন।

(এগারো)

শক্তির কবিতায় আরো অনেক বিজ্ঞানের শাখা প্রশাখা ছড়িয়ে আছে। সব কিছু উত্থাপন করলে লেখা অতিরিক্ত বৃদ্ধি পাবে বলে ছেদ টানতেই হচ্ছে। এই কবির গদ্য লেখায় আছে সরাসরি উদাহরণ। সে-সব লেখা অভ্রান্তভাবে বুঝিয়ে দেয় শক্তির বিজ্ঞানমনস্কতা। এই মনস্কতার জন্যে চাই নিবিড়ভাবে প্রকৃতি পাঠ, উপলব্ধি পর্যবেক্ষণ ও দার্শনিকতা যা শক্তির মধ্যে ছিল প্রবল। শক্তির কবিতায় লক্ষ্যণীয়ভাবে জিজ্ঞাসা চিহ্নের উপস্থিতি দেখা যায়। বহু কবিতার শিরোনাম জিজ্ঞাসা চিহ্ন যুক্ত। কবিতার পঙক্তি শেষে বিস্ময়ের চিহ্নও আছে প্রচুর। জিজ্ঞাসা বা প্রশ্নচিহ্ন এবং বিস্ময়চিহ্ন পাঠককে সংশয়ী করে ভাবায়। বিস্ময় ও জিজ্ঞাসা বোধ কিন্তু বিজ্ঞানের আদি ধর্ম। পঙক্তি শেষে জিজ্ঞাসা বা বিস্ময়চিহ্ন বসানো এই কবির

বিশেষ বৈশিষ্ট্য বললে অত্যুক্তি করা হয় না।

শক্তির কবিতায় প্রকৃতি যার অন্তর্গত বিশ্বসংসারের সকল জড় ও জীব যেন অতি মুখর হয়ে দেখা দিয়েছে। এমনকি মহাশূন্য এসেছে প্রভূত শাব্দিক ছলনায়। যেমন—

দুয়ার এঁটে ঘুমিয়ে আছে পাড়া
কেবল শুনি রাতের কড়ানাড়া
'অবনী বাড়ি আছো?'

এই অবনী কিন্তু কোনো নাম নয়, যার আভিধানিক অর্থ মহাশূন্য। তাইতো—

বৃষ্টি পড়ে এখানে বারোমাস
এখানে মেঘ গভীর মতো চরে।

নতুন করে এর ব্যাখ্যা এইখানে সমাপ্ত। শেষ করার আগে আমি আবার বিজ্ঞানী অধ্যাপক হ্যালডেনের পুনরোক্তি করছি, "For me the early formulation of scientific hypotheses are especially fascinating. most fascinating of all when they are formulated by a poet." অর্থাৎ একজন কবি যখন একটা বৈজ্ঞানিক অনুমতি বা বিজ্ঞানের নিয়মের কথা বলেন তখন তা হয় সর্বাপেক্ষা চিত্তাকর্ষক। কবিতায় একটি অংশ উদ্ধার করি—

বাগানে তা কতো ফুল, তার মধ্যে প্রিয় কৃষ্ণচূড়া।
দুরকম ফুল আছে—একটি হলুদ, অন্য লাল
....
বর্ষায় ফোটে এ-ফুল, অন্যকালে পাতা জেগে থাকে।
সবুজ পাতাও হয় হলুদ এবং ঝরে যায়,
ফুলগুলি ঝরে যায় সময়ের গূঢ় আবর্তনে—
মানুষ বাগান থাকে পাশাপাশি, এবং থাকে না।

(পঃ সঃ ৬, ১৪৬ পৃঃ)

কৃষ্ণচূড়ার সবুজ পাতা হলুদ ফুলে রূপান্তরিত হয়ে সময়ের গূঢ় আবর্তনে ঝরে যায়। কবিতার এই অংশ আমাদের সেই বৈজ্ঞানিক সূত্র—পাতা থেকে ফুলে রূপান্তর ঘটে তা যেমন মনে করিয়ে দিচ্ছে, তেমনই কবির মুন্সিয়ানা দেখি, লালের বদলে হলুদ কৃষ্ণচূড়া ঝরে যাওয়ার সংবাদ দেওয়াতে। পাতা হলুদ যেমন ঝরে তার সঙ্গতি রেখে হলুদ ফুলের ঝরে যাওয়াও স্বাভাবিক। হলুদ শব্দটি ঝরে যাওয়ার দ্যোতক। এখানে বাগান বলতে বুঝতে হবে অরণ্য, সেই আদিকালে আরণ্যক সভ্যতার কালে মানুষ ছিল অরণ্যচারী অর্থাৎ ছিল পাশাপাশি। কিন্তু বর্তমানে অরণ্যের অপসৃয়মান যুগে আর থাকে না।

যেহেতু এই রচনা শক্তির কবিতায় প্রকৃতি বিজ্ঞান নিয়ে আলোচনা করা হল, সেহেতু কবিদের শ্রেষ্ঠ প্রতিনিধি রবীন্দ্রনাথ ও বিজ্ঞানীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ প্রতিনিধি আইনস্টাইনের মধ্যে 'সত্যের স্বরূপ' নিয়ে আলোচনার কিছু অংশ প্রাসঙ্গিক বোধে উদ্ধৃত করছি। আইনস্টাইন বলেছেন, "বিশ্বের স্বরূপ সম্বন্ধে দুইটি বিভিন্ন কল্পনা আছে, (১) তার একতা, সেও মানবের (ভাবরাজ্যের) অধীন অথবা (২) মানুষ হইতে স্বতন্ত্র, তাহার অস্তিত্ব।" রবীন্দ্রনাথের উত্তর—

"বিশ্বকে যখন চিরন্তন মানুষের সঙ্গে এক সূত্রে বাঁধা অনুভব করি, তখনই তাহা আমাদের জ্ঞানচক্ষে সত্য ও অনুভূতিতে সুন্দর।" আইনস্টাইনের মন্তব্য, "এ তো বিশ্বরূপের নিছক মানবীয় কল্পনা!" রবীন্দ্রনাথের উত্তর, "অন্যপ্রকারের কল্পনা অসম্ভব। এ জগৎ মানুষের জগৎ। বৈজ্ঞানিক কল্পনাও তাই। বিজ্ঞানীও তো মানুষ। তাহাঁর মুক্তি ও তাহার আনন্দের একটা তুলামান আছে যার সাহায্যে সে সত্যকে পায় : এই তুলামানও সেই সনাতন মানবের, যার অভিজ্ঞতা আমাদের ব্যক্তি বিশেষের অভিজ্ঞতার ভিতর দিয়া (ক্ষণে ক্ষণে) পুঞ্জীভূত হইতেছে।" (সত্যেন্দ্রনাথ বসু অনূদিত)। উক্ত ব্যক্তি বিশেষ বলতে বোঝায় যে কবি সত্য ও সুন্দরকে অনুভব করে কবিতায় প্রকাশ করেন, যেমন বিশিষ্ট কবিরা। যেমন রবীন্দ্রনাথ, বিভিন্ন কৃতী বিজ্ঞানী এবং এই কবি শক্তি চট্টোপাধ্যায়। যেহেতু শক্তির কবিতায় সত্য-অসত্য, বিশিষ্ট জ্ঞান বা বিজ্ঞান, যা অন্য অর্থে সত্য, এবং সুন্দর-অসুন্দর—সব কিছুকেই কবিতার আশ্লেষে আনেন। বিজ্ঞানকে জানতে কোনো পাঠ্যপুস্তকের সাহায্য তাঁকে নিতে হয়নি। সহজাত সত্যের মত তাঁর মননে বিজ্ঞানের আলো কাব্যমনকে উদ্ভাসিত করে গেছে তাঁর অজান্তেই।

(বারো)

শক্তির যে কটি পদ্যসমগ্র প্রকাশিত হয়েছে অদ্যাবধি, সেগুলির অন্তর্গত কবিতাসমূহ পাখির চোখে সমীক্ষা করে দেখা গেছে যে ঐসব কবিতায় কম-বেশি তিনশো উদ্ভিদ প্রজাতির উল্লেখ আছে নানা প্রেক্ষিতে। একজন কবির মেধায় এত ব্যাপক উদ্ভিদ বৈচিত্র্যবোধ এবং তাদের কবিতায় স্বতঃস্ফূর্ত প্রয়োগ বিস্ময়কর প্রতিভার স্বাক্ষর। অথবা বলা যায় এও যেন উদ্ভিদবিজ্ঞানের পশরা।

এখানে জানিয়ে রাখা কর্তব্য যে কবির কবিতায় বিজ্ঞান কীভাবে উদ্ভাসিত তার আলোচনা করার সময়ে কবিতার রসের কথা ভুলিনি। কবির বহু কবিতার অঙ্গ ছিনিয়ে যে উদ্ধৃতগুলি দিয়েছি তা যিনি কবিতা রসিক বুঝে নেবেন ঠিকই। তবুও আমার এই লেখার সমালোচনা করছি, অবশ্যই রবীন্দ্রনাথের ভাষায়। তিনি লিখেছেন, ...আদিকাল থেকে আজ পর্যন্ত যত মানুষ হয়েছে তাদের জগৎ কি গুণে শেষ করা যায়?" এর অর্থ দাঁড়ায় এক-একটি মানুষের জগৎ বা পৃথিবী বিশ্ববোধ ও দৃষ্টিভঙ্গি অবশ্য পৃথক এই কথার অনুসরণে এও ঠিক যে কবিতার মধ্যে যে রস তার উপভোক্তাদের অনুভূতি ও রসবোধ পৃথক হতেই পারে কিংবা বাস্তবে তাই হয়। একথা মেনে নিতেই হবে। শক্তির কবিতায় উছলে পড়া রসের মধ্যে বিজ্ঞানকে ছুঁড়ে পাই, তা অতিরিক্ত মাত্রায় রসসিক্ত করে মনকে, চেতনাকে ও বোধকে।

অমিতাভ দাশগুপ্তের কবিতা ঃ প্রতীক পাথর

তরুণ মুখোপাধ্যায়

পঞ্চাশ দশকের অন্যতম জনপ্রিয় ও শক্তিমান কবি অমিতাভ দাশগুপ্ত। বামপন্থী রাজনৈতিক মতাদর্শে বিশ্বাসী এই কবি কিন্তু কোনো মতবাদের খোপে নিজেকে ধরে রাখতে চান না। তাই কবিতা লিখতে গেলে ইস্তেহার এবং ইস্তেহার লিখতে গেলে কবিতা হয়ে যায়, এমনতর অভিযোগে তাঁর কৈফিয়ৎ—

কারো কথায় কান না দিয়ে
বাকী জীবনভর
আমি শুধু কবিতার মত ইশ্‌তেহার
আর
ইশ্‌তেহারের মত কবিতা লিখে যেতে থাকি।

(কবিতা ও ইশ্‌তেহার)

অর্থাৎ মানুষের জন্য কবিতা লিখতে চান তিনি। মানুষের মাঝখানে থাকতে চান। কোনো গজদন্তমিনারে তাঁর লোভ নেই। "কবি ও মানুষ" কবিতায় বলেন—

কবি তো বসেছে ট্রামে মানুষের পাশে
মানুষের গন্ধ খাবে বলে।

শেষ পর্যন্ত কবি নিজেকে অসুখী বলেন। কেননা, অসুখ ছাড়া কবিতা কেউ লেখে না।

১৯৫৪ সাল থেকে অমিতাভ দাশগুপ্তের কবিতা লেখা। ১৯৫৭-তে প্রথম কাব্যগ্রন্থ "সমুদ্র থেকে আকাশ" প্রকাশিত হয়। তারপর এই ২০০২ পর্যন্ত তাঁর কাব্যগ্রন্থ প্রকাশের ধারা অব্যাহত। আছে কাব্যনাট্য, উপন্যাস, জার্নাল, অনুবাদ। রবীন্দ্রপুরস্কারসহ নানা পুরস্কারে তিনি ভূষিত। সবচেয়ে বড়ো পুরস্কার পাঠকের ভালোবাসাপ্রাপ্তি। তথাকথিত 'শুদ্ধকবিতা' লেখায় তাঁর বিশ্বাস নেই। "কেন লিখি" প্রবন্ধে বলেন, "আমার ধারণা একজন লেখক লেখার গোড়ার পর্বে পরের কথা পরের ভাষায় লেখেন। মাঝামাঝি জায়গায় এসে তিনি পরের কথা নিজের ভাষায় বলেন। আর পরিণত পর্বে, নিজের কথা নিজের ভাষায় বলতে চেষ্টা করবেন।" এর যোগ্য দৃষ্টান্ত তাঁর রবীন্দ্র পুরস্কারধন্য সাম্প্রতিক কাব্যগ্রন্থ "আমার নীরবতা, আমার ভাষা"র "হৃদয় যতটা বাঁয়ে" কবিতা। যেখানে প্রকৃত কবির উচ্চারণ শোনা যায়—

হৃদয় যতটা বাঁয়ে
আমি তো তার চাইতে বেশি বামপন্থী নই

পরিণত বয়সে নিজের কণ্ঠে নিজের ভাষায় যখন এই কবি কবিতা লেখেন তখন টগ্‌বগে তরুণ কবিকে, বাদামী ঘোড়ার গতিকে পাওয়া যায় না। বরং তাঁর লেখায় আসে কাঠ ও করাত, ঝর্ণা ও নুড়ি; আসে পাথর। দুঃখ-কষ্ট-অভিজ্ঞতার স্মারকচিহ্ন হয়ে ঘুরে ফিরে শব্দগুলি

আসে—যা প্রায়শ সমার্থক এবং প্রতীকী। অন্তত কাঠ ও পাথর শব্দের পৌনঃপুনিক ব্যবহার বুঝিয়ে দেয় কবির অন্তর্গত বেদনা ও বোধিকে।

"কাঠের চেয়ার" কবিতা পড়তে গেলে একজন মানুষের বন্দিত্ব, অসহায়তা, বিচ্ছিন্নতা যুগ-কালের প্রেক্ষিতে তীব্র হয়ে ওঠে।

সে এমন এক কাঠের চেয়ার এখন,
যার শরীরের সন্ধিতে সন্ধিতে শুধু
জং ধরা পেরেকের গান
ঘুরঘুর ঘুণপোকার গান
একটানা করাত চেরাইয়ের গান।

একটু অন্যভাবে কবি স্বদেশ-স্বদেশবাসীর জন্য তাঁর যন্ত্রণাকে লিপিবদ্ধ করেন—

ক্ষুধা ও অন্নের মাঝখানে মানুষ,
নৌকা ও তীরের মাঝখানে সজলের হাহাকার। (চলে যাওয়া)

এই বৈপরীত্য ও দ্বন্দ্বই সমীকৃত হয়েছে পাথর প্রতীকে। যা বলতে চান, যা পেতে চান, যা বলা হয় না ও যা পাওয়া হয় না—এসব নিয়েই এক সংবেদনশীল কবির হাহাকার, আর্তি পাথরকেও আমূল নাড়া দেয়। কবি যেন এলিয়টের ওয়েস্টল্যান্ড ও রক্‌কে তুচ্ছ করেছেন। যুগ-কাল নয়, কবি নিজেই পাথর হয়েছেন। কেন এই প্রতীকী রূপান্তর? কেনই বা পাথরের বুকে এমন জীবনের জন্য তৃষ্ণা? এসবের উত্তর লুকিয়ে আছে তাঁর কবিতায়।

তাঁর প্রথম পর্যায়ের কাব্যে অমিতাভ দাশগুপ্ত এই বলে ক্ষোভ জানিয়েছিলেন—

বুকে রেখে গেলে বজ্রমণির জ্বালা
অঙ্গারে কেন আঁকতে শিখিনি ছবি? নির্বাচিত কবিতা)

সেদিন অবশ্য দেখেছিলেন—

পাথরের বুক ফাটিয়ে শিমূল রঙ্গে
চিত্রীকে ডাকে নানা বর্ণিকা-ভঙ্গে।

কিন্তু বয়স ও অভিজ্ঞতা তাঁকে পাল্টে দেয়। অহল্যার পাষাণমুক্তি যদিও কল্পনা করেন, তবু জানেন—

অপেক্ষায় অপেক্ষায়
অলীক ভাতের দানা জমতে জমতে
আমাদের প্রত্যেকের মুঠো
এক-একটি নিওলিথিক পাথর
(শুয়োর মারার গল্প/"আমি তোমাদেরই লোক")

এই ভাবনার সূত্র ধরে আসে দেশকালের কথাও। যেমন 'পরিত্রাণ' কবিতায়—

ও হাওয়া, যাকে ছোঁও সে-ই পাথর, একি
অমোঘ অভিশাপ পৌরাণিক।

কিংমিডাসের ছোঁয়ায় সোনা হওয়ার গল্প আমরা জানি। কিন্তু এখানে এই প্রস্তরীভূত

হওয়া যে যন্ত্রণার, যে বন্ধ্যাত্বের ইঙ্গিত দেয়, তা ক্রমে ব্যক্তিক হয়ে ওঠে। "আমাকে সম্পূর্ণ করে নাও" কাব্য থেকে তাঁর এই অতি ব্যক্তিগত উচ্চারণ আমরা শুনতে পাই—

সমস্ত পাথর অপেক্ষা করে আছে
কখন তারা এক-একটা মানুষের মুখ পাবে। (কয়েক টুকরো)

সেই শিল্পীর প্রতীক্ষা তাঁরও। কেননা তিনি জেনেছেন—

সেরকম ভালোবাসলে
পাথরও ঝর্ণা হয়ে যায়—(ঐ)

সেই ভালোবাসা স্বদেশকে, নারীকে তিনি দেন। কিন্তু তাঁর জন্য কী থাকে? তিনি কি সেই ভালোবাসার আগুনে উষ্ণ হতে পারেন? সেঁকে নিতে পারেন হৃৎপিণ্ড? এখানেই অমিতাভ দাশগুপ্তর যন্ত্রণা। বিনিময় একে বলব না; কিন্তু প্রত্যাশা তো বটেই। তাই ব্যাকুল হয়ে বলেন—

এসো।
ছোঁও।
সম্পূর্ণ পাথর হয়ে গেছি কিনা, দ্যাখো।
পাথরের বুক থেকে মাংস নাও,
পাঁজরের রিডে রিডে চাপ দাও দশটি আঙুলে,
আমাকে বাজাও তুমি
বিঠোফেন-বালিকার হাত (এসো, স্পর্শ করো)

এখনো তিনি সজীব, সচঞ্চল এবং প্রবল বর্তমান, জানাবার এই কাতরতায় গাছ কিংবা চেয়ারের রূপক ভেঙে ফেলেছেন। পাথরের প্রতীকে মূর্তিময় হতে চান। পাথরের বুকে নিহিত ঝর্ণার সজলতা-কে ফোটাতে চান। 'ছিন্নপত্র নয়, ছেঁড়া পাতা" কাব্যে কৈফিয়ৎ দেন—

তুমি ভাবো, পুরোটা পাথর?
এ পাথরে ফুটোফাটা নেই?

এরপর জানিয়ে দেন ভয়ঙ্কর সত্যটি—

কতখানি কষ্ট পেতে পেতে
মানুষও পাথর হয়ে যায়। (পাথর হওয়ার কষ্ট)

নুড়িপাথরের কষ্টের কথা বলেন আরেকটি কবিতায়। যেখানে একজন মানুষের অসফলতার কথা পাই। আর "এলিজি সপ্তক"-এ যে শোকাশ্রু পাই তা নিবেদিত হয়েছে স্ত্রী রত্নার জন্য—যিনি অকালমৃতা। বুঝতে পারি যার নিরন্তর তাগিদে, প্রেরণায় কবির পথচলা, জীবনোপভোগ—তা আজ নিষ্প্রাণ পাথর হয়েছে। স্মৃতিহীন, ভালোবাসাহীন প্রত্নপাথর হয়ে যান কবি। কিন্তু চান প্রিয়তমার কণ্ঠে প্রিয় আহ্বান শুনতে। সেই কাম্য ডাকটুকু না শুনতে পেয়ে অভিমানে, বেদনায় বলেন—

সে-দূরবাসিনী নারী যাওয়ার বেলায়
ঐ মূর্খ লোকটিকে সম্পূর্ণ পাথর করে রেখে চলে গেছে।

শেষ পর্যন্ত কবি স্বীকার করেন—"আমার সমস্ত নদী না-পারার কংক্রিটে বাঁধানো।"

রবীন্দ্রপুরস্কার ধন্য কাব্যগ্রন্থ "আমার নীরবতা, আমার ভাষা"-য় সেই গোপন যন্ত্রণা অনুরণিত হয়েছে এইভাবে—

ভালোবেসে বেসে
আমি বধির হয়েছি। তুমি জানো।
ভালোবেসে বেসে
আমি অন্ধ হয়ে গেছি। তুমি জানো।
এখন আমার কোনও শ্রুতি নেই দৃষ্টি নেই আলোড়ন নেই।
এভাবে সর্বস্ব গেলে
কে আমাকে নেবে? তুমি নেবে? (পাথরের গান)

যে চলে গেছে তার স্মৃতি কবচের মতো ধারণ করে একা সারারাত—'জ্যোৎস্না বুকে করে আমি পাথরেরই মতো শুয়ে রব' একে পাথরের কান্না যদি বলি, ভুল বলা হবে কি? একই দাহ ও যন্ত্রণা মূর্ত হয়েছে "পাথর" কবিতায়—

কিভাবে কোথায় ধুয়ে মুছে নেব গোটা জন্মের ক্ষত
জানি না জানি না জানি না,
পাথর তুলেছি এত, আজ আর কিছু নামাতে পারি না।

কবি যেন একালের সিসিফাস হয়ে যান। আত্মসমীক্ষায় কবি জানান—"আমার কবিতা লেখা দণ্ডিতের মৃত্যুর সমান।" অন্যদিকে পাথরে জাগে প্রাণ ও প্রেম—

তুলনামূলক প্রেমে বারবার জেগে উঠি
কাঠে ও করাতে। (এসো রাত্রি, এসো হোম)

বধিরতা, অন্ধত্ব সত্ত্বেও এই পাথর স্পর্শস্পৃহ, স্পর্শভিক্ষু। তাই গাছের মতো নীরবতা ও স্থিরতা নিয়েও নিহিত প্রাণাবেগে ডালপালা মেলতে, ফুল ফোটাতে চান। একখণ্ড নিশ্চল পাথর হয়েও যোগ্যতমার হাতে সমর্পিত হতে উৎসুক হন। একে যদি একান্তই ব্যক্তিগত বাসনা-বেদনার সাক্ষ্য মনে হয়, ক্ষতি কি? কবি কি নিজের জন্য কিছুই লিখতে বা বলতে পারবেন না? দেশ-কাল-মানুষের পটভূমিতে জল-হাওয়া-মাটিতে প্রবর্ধিত হলেও একলা মানুষের কথারও দরকার থাকে। সমুদ্রশাসনকারী কবি, উরুতে বাদামী ঘোড়ার দুরন্তপনা নিয়ে চলা গার্হস্থ্য সন্ন্যাসে দীক্ষিত এই কবি এখন আপন কারো কাছে মেলে ধরতে চান নিজেকে। প্রিয়জনকে হারানো তাঁকে পাথর করে। দেশের সংকট, মানুষের লোভ ও হিংস্রতা তাঁকে পাথর করে। জীবনের ছোট বড়ো চাওয়া-পাওয়া আর দাবির অপূর্ণতার বেদনায় পাথর হন। কিন্তু ভিতরের মানুষ ও কবি মরে না। অহল্যার মতো যোগ্য পাদস্পর্শে জেগে ওঠেন। ভালোবেসে অন্ধ হয়ে যান। একদা স্বদেশ ও স্বকালের প্রতি তাঁর যে প্রশ্ন উন্মুখ ছিল—"ভালোবেসে বেসে চোখ চলে যায়/ভালোবাসা সে কি ভুল হয়েছিল?" আমরা বলি, না। এই ভালোবাসার প্রাপ্তি ও গহনতায় তিনি স্বতন্ত্র। পাথরে ঝর্ণার গান কান্না হয়ে বাজে।

"কিছুই সহজ নয়, কিছুই সহজ নেই আর।"

অচ্যুৎ মণ্ডল

বুদ্ধদেব বসু, বিষ্ণু দে এবং অমিয় চক্রবর্তীর কাব্যালোচনায় নতুন কোনো বিচারদৃষ্টির প্রাসঙ্গিকতাই অনেক সমালোচকের কাছে হয়তো হারিয়ে গেছে। এই তিনজন কবিকে খুব সহজেই এক একটি নির্দিষ্ট আখ্যায় ভূষিত করার প্রয়াস সেই মনস্তত্ত্বেরই পরিচায়ক। বুদ্ধদেবকে 'কলাকৈবল্যবাদী' বিষ্ণু দেকে 'মার্ক্সবাদী' এবং অমিয় চক্রবর্তীকে 'আধ্যাত্মিক' আখ্যা দিয়ে এবং 'আধুনিকতা' শব্দের এক অস্পষ্ট মায়াজালে ত্রয়ী কবিকে আবদ্ধ করে এঁদের কাব্যপ্রয়াসের অন্তর্গত জটিলতা, আত্মদ্বন্দ্ব এবং যন্ত্রণাকাতর অনুসন্ধিৎসু মনকে এড়িয়ে যাওয়ার চেষ্টা বাংলা সমালোচনার প্রচলিত অভ্যাস। একথা অবশ্যই স্বীকার্য যে কলাকৈবল্য, মার্ক্সীয় ধরনের সমাজ এবং এক সূক্ষ্ম আধ্যাত্মিক উত্তরণ যথাক্রমে বুদ্ধদেব, বিষ্ণু দে এবং অমিয় চক্রবর্তীর কাব্যের অন্বিষ্ট। কিন্তু সেই লক্ষ্যবস্তুগুলির সন্ধান ও অপ্রাপ্যতা যে মূল লক্ষ্যগুলির চারিত্র্যলক্ষণের ওপর ক্রিয়া করে তাদের নিহিত জটিলতা বাড়িয়ে দিয়েছে তাতে কোনো সন্দেহ নেই। ফলে আপাতদৃষ্টিতে সহজবোধ্য কবিমানসিকতাগুলিও হয়ে উঠেছে সংশয়দীর্ণ সমকালের অস্থিরতার প্রতিভূ। বুদ্ধদেবের সহজ সরল কাব্যভাষাতেই রয়ে গেছে সেই জটিলতার ইঙ্গিত—

"কিছুই সহজ নয়, কিছুই সহজ নেই আর"
('দায়িত্বের ভার' যে আঁধার আলোর অধিক)

বুদ্ধদেব বসুকে কেউ চিহ্নিত করতে চেয়েছেন প্রেমের কবি হিসেবে আবার কারও মতে কাব্যের বা সাহিত্যের উৎস সন্ধানই তাঁর প্রধান বিষয়। প্রেম আর কাব্যজিজ্ঞাসাই যে বুদ্ধদেবের কবিতার মূল সুর এ ব্যাপারে সেই সব সমালোচনার সঙ্গে আমাদের বিশেষ মতবিরোধ নেই। বরং বুদ্ধদেবের প্রেম ও কাব্যজিজ্ঞাসার স্বরূপ নির্ণয়ের মাধ্যমেই আমরা এগোতে চাইব তাঁর জীবনবোধের কেন্দ্রীয় ভাবনাটির কাছাকাছি।

বুদ্ধদেব বসুর কবিতায় তাঁর প্রেমচেতনা আপাতদৃষ্টিতে খুব স্পষ্টভাবেই বিবৃত। প্রথম কাব্যগ্রন্থ 'বন্দীর বন্দনা' যে যৌনতার যন্ত্রণাকর তীব্র আকাঙ্ক্ষার প্রেক্ষিতে শিল্পীর আত্মঘোষণায় মুখর তা নিয়ে সন্দেহ করার কোনো কারণ নেই। কিন্তু শ্রীমতী দীপ্তি ত্রিপাঠীর বক্তব্যের সঙ্গে এ বিষয়ে সম্পূর্ণ একমত হওয়া যায় না। তাঁর ভাষায়—"'বন্দীর বন্দনা'র পিছনে ছিল ভিক্টোরীয় পিউরিট্যানিজম ও বাস্তব অভিজ্ঞতার সংঘর্ষ। কন্টিনেন্টাল সাহিত্যপ্রভাবিত 'কল্লোল যুগ' এর আন্দোলন দেহকে স্বীকার করে নিল এবং বুদ্ধদেবও তাতে পেলেন মুক্তির সন্ধান। 'পৃথিবীর পথে'র মধ্যে এই দ্বিতীয় পরিচয় মেলে। তাঁর আত্মদ্বন্দ্বের অবসান হল, আত্মকেন্দ্রিক জীবন থেকে হল নিষ্ক্রমণ।" (পৃ. ৯১, আধুনিক বাংলা কাব্য পরিচয়)

বাহ্যিকভাবে বুদ্ধদেবের প্রেমের কবিতার বিবর্তন সম্পর্কে শ্রীমতি ত্রিপাঠীর এই বক্তব্য

প্রায় নির্ভরযোগ্য কিন্তু বাস্তব অভিজ্ঞতার সঙ্গে শুধুমাত্র ভিক্টোরীয় পিউরিট্যানিজমের দ্বন্দ্বই যে 'বন্দীর বন্দনা'র জন্ম দিয়েছিল তা মেনে নেওয়া কঠিন। তর্কের খাতিরে যদি মেনেও নেওয়া যায় যে যৌনতার জৈব বোধের সঙ্গে জাগ্রত মানবিক চেতনার সংঘাত আসলে 'ভিক্টোরীয় পিউরিট্যানিজম' ছাড়া কিছুই নয়, তাহলেও বলতে হবে যে বুদ্ধদেবের কবিতায় সে দ্বন্দ্বের সমাধান হয়নি। 'আত্মদ্বন্দ্বের অবসান' না হওয়াতেই বুদ্ধদেব পরবর্তীকালে প্রেমের বদলে শিল্পেই খুঁজেছেন প্রার্থিত 'মুক্তির সন্ধান'। সে ইঙ্গিতও 'বন্দীর বন্দনা'র 'মানুষ' কবিতাটির শেষ দুটি পংক্তিতে প্রকাশিত হয়েছে বলিষ্ঠ ভাষায়—

"আমি যে রচিবো কাব্য, এ উদ্দেশ্য ছিল না স্রষ্টার।
তবু কাব্য রচিলাম। এই গর্ব বিদ্রোহ আমার।"

খেয়াল রাখতে হবে যে কবিতাটিতে যৌনতার বিপরীতে প্রেমকে প্রতিস্থাপিত না করে কবি শিল্প সাহিত্যে মানুষের স্বাধীন সংকল্প ও কর্মের উদ্যোগকেই তার প্রতিস্পর্ধী বলে ঘোষণা করেছেন। আরও খুলে বলতে গেলে বলা যায় যে প্রেমকে বুদ্ধদেব যৌনতার ওপরে, শিল্প ও সাহিত্যের মানবিক প্রসাধন বলেই মনে করেছেন চিরকাল। 'শার্ল বোদলেয়ার ও আধুনিক কবিতা' প্রবন্ধে তিনি লেখেন—"লা রশফুকো বলেছিলেন যে মানুষ যদি প্রেমের কথা এত না শুনতো তাহলে সে প্রেমে পড়তো না। যা সাহিত্যে নেই তা জীবনেও অনুভূত হয় না : রেনেসাঁস শিল্পে বিষাদের উল্লাস দেখে তবে মানুষ জানতে পারলো যে বিষণ্ণ হওয়া তার স্বভাবের একটি লক্ষণ।" (পৃ. ২৩৫, প্রবন্ধ সংকলন)

বুদ্ধদেবের কবিতায় প্রেম সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে বৈষ্ণব প্রেমের পর্যায়গুলির উপমা ব্যবহার করে শ্রীমতী ত্রিপাঠী লিখেছেন—"প্রেমের যে দুটি পর্যায় আবেগের জন্ম দেয়—পূর্বরাগ ও মিলন, বুদ্ধদেব তার কবি। (পৃ. ৯১, আধুনিক বাংলা কাব্য পরিচয়) এই অতি সরলীকৃত ব্যাখ্যার একটু দূরেই অবশ্য রয়েছে এমন একটি পর্যায় বৈষ্ণব রসশাস্ত্রীরা যার নাম দিয়েছিলেন 'প্রেমবৈচিত্ত্য'। মিলনের মুহূর্তেও বিচ্ছেদের দুঃখ ভোগ করা এই পর্যায়ের চমৎকার উদাহরণ চণ্ডীদাসের রচনায় রয়েছে—

'দুহুঁ ক্রোড়ে দুহুঁ কাঁদে বিচ্ছেদ ভাবিয়া।"

মিলনকালের এই বিচ্ছেদভাবনা শুধু বৈষ্ণব কাব্যেই নয়—পাশ্চাত্য দর্শন ও সাহিত্যেও আধুনিককাল পর্যন্ত প্রকাশমান। সাহিত্যের এই ভাবনার পিছনে দার্শনিক ভিত্তি অনুসন্ধান করেছেন জঁ পল সার্ত্র 'Being And Nothingness' গ্রন্থে—। মার্সেল প্রুস্তের উপন্যাসের নায়ক নায়িকার সম্পর্ক বিশ্লেষণ প্রসঙ্গে তিনি লেখেন—"Proust's hero, for example, who installs his Mistress in his home, who can see her and possess her at any hour of the day, who has been able to make her completely dependent on him economically, ought to be free from worry. Yet we know that he is, on the contrary, continually gnawed by anxiety. Through her conciousness Albertine escapes Marcel even when he is at her side." (Page 366) চণ্ডীদাসের পদের যে প্রেমবৈচিত্ত্য প্রুস্তের নায়ককে বেদনায় মথিত করেছে, কবি বুদ্ধদেব বসুও সেই

একই বেদনার অংশীদার—

"অনিশ্চিত ভয়ে ভরা ভবিষ্যৎ তরে
যে উৎকণ্ঠা নিত্য হানা দেয়
তোমারে-আমারে;
আমাদের মিলনের পরিপূর্ণতম মুহূর্তটি
যে ব্যথায় টনটন করে ওঠে;—"

('প্রেমিক', বন্দীর বন্দনা)

এই 'ব্যথা' বা 'anxiety'র কারণ নির্দেশ করতে গিয়ে বুদ্ধদেব অনাগত মৃত্যুর শীতল সম্ভাবনাকেও চিহ্নিত করেছেন একই কবিতার কয়েক পংক্তি পরে—

"সম্মুখে মৃত্যুর গুহা, তোমার মৃত্যুর;
ফুটেছো ফুলের মতো ক্ষণতরে আজিকার উজ্জ্বল আলোতে
প্রেমের আলোতে মোর।"

অস্তিবাদী দর্শনে বা সাহিত্যে মৃত্যুকে 'Limit Situation' বা অন্তিম সীমানা হিসেবে দেখার প্রবণতা তা প্রেমের মুহূর্তেও তার কালো ছায়া যেন এখানে ছড়িয়ে দিয়েছে। Milan Kundera র সাম্প্রতিক উপন্যাস Identity-তেও একই বিশ্লেষণ দেখতে পাই—"Nostalgia? How could she feel nostalgia when he has right in front of her? How can you suffer from the absence of a person who is present ? (Jean-Marc knew how to answer that : you can suffer nostalgia in the presence of the beloved if you glimpse a future where the beloved is no more; if the beloved's death is invisibly, already present." (Page 38, Identity, Milan Kundera) চণ্ডীদাস, প্রুস্ত, কুন্দেরা বা বুদ্ধদেবের সমানুভবের মধ্যেও ব্যাখ্যার তারতম্য অবশ্যই আছে কিন্তু কারো প্রেমই নিঃসংশয় বল্‌গাহীন মিলনের আবেগে উদ্দাম বলে মনে হয় না। বুদ্ধদেবের প্রেম একদিকে যেমন যৌনতার জৈব আকাঙ্ক্ষায় দ্বিখণ্ডিত, তেমনই মানব অস্তিত্বের অস্থায়ী অসহায় অবস্থানের বেদনায় কাতর।

'দময়ন্তী' কাব্যগ্রন্থের 'দময়ন্তী' কবিতাটি সম্পর্কে শ্রীমতী ত্রিপাঠির অভিমত "বাৎসল্য ও শৃঙ্গার রসের এমন যৌগিক মিশ্রণ বাংলা সাহিত্যে ইতিপূর্বে হয়নি।" ইঙ্গিতে যে জটিল মনস্তত্ত্বের ইশারা শ্রীমতি ত্রিপাঠী করেছেন তা যথাক্রমে সার্ত্রের 'The Flies' এবং বুদ্ধদেবের 'কলকাতার ইলেক্ট্রা' নাটকে বিশ্লেষিত ও ব্যাখ্যাত। বুদ্ধদেবের প্রেমচেতনা শুধু খণ্ডিত জটিল এবং বেদনাহতই নয়, পরোক্ষে তাঁর শিল্পভাবনাও যে আসলে কবির প্রেমের অপ্রাপণীয়তা এবং যৌনতার জৈবিক পূর্বনির্ধারিত মত্ততারই বিপ্রতীপ ফলপরিণিত সে কথা আমরা আগেই বলেছি। অধ্যাপক অশ্রুকুমার শিকদার যথার্থই লেখেন, "কবির এই শিল্প সমীক্ষা ছড়িয়ে আছে 'বন্দীর বন্দনা' থেকে শুরু করে বুদ্ধদেবের সমস্ত রচনায়।" (পৃ. ১৮৯-৯০, আধুনিক কবিতার দিগ্বলয়)

কবি বুদ্ধদেব ও সমালোচক বুদ্ধদেবের মধ্যে বাংলা সাহিত্যে কার স্থান অধিক সুনিশ্চিত

তা নিয়ে কোনো তর্কের অবকাশ নেই। ফলে বুদ্ধদেবের সমালোচক মন শিল্প-সাহিত্য চর্চার মাধ্যমেই যে খুঁজতে চাইবে তার স্বরূপটি তা বলাই বাহুল্য। প্রাবন্ধিক ও সমালোচক হিসেবে তাঁর রচনাগুলিতে যে শিল্পভাবনা ছড়িয়ে রয়েছে তাই প্রকাশ পেয়েছে বিভিন্ন সময়ে কবিতার আকারে। কিন্তু তাঁর সাহিত্যদৃষ্টিতে এক আশ্চর্য স্ববিরোধ উপস্থিত, যাকে হয়তো 'রুচির সমগ্রতা' বলেও ব্যাখ্যা করা যায়। ভাবতে অবাক লাগে সমালোচক বুদ্ধদেব রবীন্দ্রনাথ ও বোদলেয়ার, দুটি সম্পূর্ণ বিপ্রতীপ কাব্যাদর্শের মধ্যে কিভাবে সমান পক্ষপাত প্রদর্শন করতে পারেন। 'কবিদের কবি' শার্ল বোদলেয়ারকে কিন্তু রবীন্দ্রনাথ 'আসবাবপত্রের কবি' হিসেবেই চিহ্নিত করেছিলেন। প্রাবন্ধিক বুদ্ধদেব বসু প্রকরণে রবীন্দ্রবিরোধী হলেও চিন্তায় ও সংস্কারে ঐ রোমান্টিক ঐতিহ্যেরই ধারক ও বাহক। তাই তাঁর বোদলেয়ার ব্যাখ্যার অধিকাংশ জুড়েই থাকে রোমান্টিক দৃষ্টিভঙ্গীর উৎস, বিকাশ ও বিপন্নতারই কাহিনী। প্রবাদপ্রতিম 'শার্ল বোদলেয়ার ও আধুনিক কবিতা' প্রবন্ধে তিনি রবীন্দ্রনাথের সৌন্দর্যচেতনার সঙ্গে বোদলেয়ারের সৌন্দর্য চেতনার তুলনা করতে যেমন পিছপা হন না, পরপৃষ্ঠাতেই তেমনই বোদলেয়ারকে তুলনা করেন দস্তয়েভ্স্কির 'ইডিয়ট' উপন্যাসের নায়ক প্রিন্স মিশ্‌কিনের সঙ্গেও। এই স্ববিরোধিতা রোমান্টিক মনোভঙ্গিসর্বস্ব অথচ আধুনিক জীবনের যন্ত্রণায় কাতর, দ্বিধাবিভক্ত প্রাবন্ধিকের স্বাভাবিক পরিণতি। অথচ কবি বুদ্ধদেবের 'বন্দীত্ব' তাঁর 'বন্দনাগান'কেও ছাপিয়ে ওঠে যখন আলোচ্য প্রবন্ধের শেষে তিনি লেখেন—"মানুষ দুঃখী, কিন্তু সে জানুক সে দুঃখী; মানুষ পাপী, কিন্তু সে জানুক সে পাপী; মানুষ রুগ্ন কিন্তু সে জানুক সে রুগ্ন; মানুষ মুমূর্ষ এবং সে জানুক সে মুমূর্ষু; মানুষ অমৃতাকাঙ্ক্ষী এবং সে জানুক সে অমৃতাকাঙ্ক্ষী বোদলেয়ারের সমগ্র কাব্যে, যেমন ডস্টয়েভ্স্কির উপন্যাসে এই বাণী নিরন্তর ধ্বনিত হচ্ছে।" (পৃ. ২৫০, প্রবন্ধ সংকলন, বুদ্ধদেব বসু)

পাস্তেরনাক এবং বোদলেয়ার সম্পর্কে সম্পর্কে বুদ্ধদেবের আলোচনায় যে গভীর জীবনদর্শনের পরিচয় পাওয়া যায় তা সম্ভবত বাংলা সমালোচনার ইতিহাসে তুলনারহিত। অনুরূপ ভাবেই সার্ত্র তাঁর মনস্তাত্ত্বিক জীবনী গ্রন্থগুলিতে বোদলেয়ার, জঁ জেনে এবং ফ্লব্যের-এর জীবন ও সাহিত্যের আলোচনার মাধ্যমে নিজস্ব দর্শনের প্রয়োগ ও বিবর্তন ঘটাতে সক্ষম হয়েছিলেন। এ প্রসঙ্গে বুদ্ধদেব ও সার্ত্রের বোদলেয়ার ব্যাখ্যার সামান্য তুলনা বুদ্ধদেবের জীবনদর্শনকে বুঝতে সাহায্য করতে পারে বলে আমাদের মনে হয়। সার্ত্রের 'বোদলেয়ার' গ্রন্থটি সাহিত্যের চেয়ে জীবনী আলোচনায় ফ্রয়েডীয় মনোবিকলনের বিরুদ্ধে অস্তিবাদী মনস্তত্ত্বের প্রয়োগেই বেশি উদ্যোগী হয়েছে তাতে সন্দেহ নেই। কিন্তু কাব্যালোচনার মাধ্যমে বুদ্ধদেব এবং জীবনীর ব্যাখ্যায় সার্ত্র শেষ পর্যন্ত বোদলেয়ারের অন্বিষ্ট সম্পর্কে প্রায় সহমতে উপনীত হন। বুদ্ধদেবের ভাষায়—"তাঁর পক্ষে যৌনতাও আত্মনির্যাতনের একটি উপায়, 'পাপকর্মের চৈতন্য' তার পরমসুখ; যদি তা পাপ হয়—আর বোদলেয়ারের তাই বিশ্বাস ছিলো—তা'হলে তাকে পাপ বলে জানতে পারাটাই মনুষ্যত্ব।" (পৃ. ২৩৮, প্রবন্ধ সংকলন)

সার্ত্রের আলোচনাটি বুদ্ধদেবের তুলনায় অনেক জটিল এবং মনস্তত্ত্বের দার্শনিক বিচারে দুরূহ। সমালোচক Izenberg-এর ব্যাখ্যায় মূল বক্তব্যটি সহজতরভাবে উপস্থাপিত করা

যাবে—"Baudlaire thus necessarily condemned himself to constant guilt......The guilty person also had a lore and set of rights within a theocratically and morally structured universe—the right of recognition as a sinner, the right to punishment, repentance and even forgiveness." (Page–246. Gerald N. Izenberg. The Existential Critique of Freud—The Crisis of Autonomy.)

'মানুষ পাপী কিন্তু সে জানুক সে পাপী' এই উপলব্ধি বুদ্ধদেব তো নিবন্ধের শেষেই প্রকাশ করেছেন। পাপ, দুঃখ, যন্ত্রণা ইত্যাদির মাধ্যমেই মানুষ প্রকৃত সন্ত হয়ে উঠতে পারে বলে মনে করেছেন জঁ পল সার্ত্র তাঁর 'Saint Genet' জীবনীগ্রন্থটিতে। একই সঙ্গে চোর, সমকামী, বিশ্বাসঘাতক জেনের মধ্যে সার্ত্র দেখতে পেয়েছেন প্রকৃত সাধুত্বের প্রয়াস ও সম্ভাবনা। পাপের আগুনে পুড়ে শুদ্ধ চৈতন্যের দিকে যাত্রার এই তত্ত্বটি খ্রিস্টীয় বিশ্বাসের বাইরে আধুনিক জীবন দর্শন ও যাপনপদ্ধতি হিসেবে প্রথম তিনিই উপলব্ধি করতে সক্ষম হন। পাস্তেরনাক প্রসঙ্গে 'অমিয় চক্রবর্তীকে লেখা খোলা চিঠি' তে বুদ্ধদেব দস্তয়েভ্স্কির আলোচনা প্রসঙ্গে প্রায় একই কথা লিখেছেন—

"এক বিস্ফোরক মুহূর্তে আমরা উপলব্ধি করি যে আমরা সাংসারিক ভালোমানুষের দল, আমরাও পাপী অথচ নিজেদের সাধু বলে জেনেছি, কিন্তু ডষ্টয়েভস্কির পাপীরা নিজেদের পাপী বলেই জানে, তা জানে বলেই পুণ্যের জন্য আকাঙ্খা তাদের জ্বলন্ত, এবং সেই হিসেবে তারা আমাদের চাইতে উন্নত মানুষ, চৈতন্যে উন্নত, এবং চৈতন্য মানেই আধ্যাত্মিকতা। যারা সামাজিক বিধিবিধানের অনুগত হয়ে কোনোরকমে ভদ্রভাবে জীবনটা কাটিয়ে দেয়, যারা স্বার্থসিদ্ধির কারণে বাধ্য না হলে অন্যের কোনো ক্ষতি করে না এবং অহমিকার আত্মকুণ্ডয়ন ব্যতীত অপরের জন্যে কড়ে আঙুলটি তুলতে হলেও ক্লান্ত হয়ে পড়ে, তারা আসলে না ভালো না মন্দ না কোনোকিছু....দুর্লভ, অতি দুর্লভ সেই সাধুতা, যা সচেতন সদর্শক এবং সকর্মক, যা কতগুলো নিষেধপালনের সমষ্টি মাত্র নয়, মানুষের অন্তস্থিত অকল্যাণ ও বৈনাশিকতা বিষয়ে সম্পূর্ণরূপে সজ্ঞান, এবং সর্বমানবের দুঃখভার নিজের মধ্যে বহন করা যার তপস্যা।" (পৃ. ৫৫-৫৬ সঙ্গ ঃ নিঃসঙ্গতা রবীন্দ্রনাথ)

একটি ছোট্ট সংহত বাক্যে সার্ত্র এই মনোভাব প্রকাশ করেছেন—

"Genet is we. That is why we must read him." (Page–644. Saint Genet) বুদ্ধদেবের শিল্পীমনস্তত্ত্বের বিচার ও সমালোচনায়, দীর্ঘ উদ্ধৃতিটির প্রয়োজন এ কারণেই যে তাঁর সমালোচকেরা সহজেই এই মনোভঙ্গীটি আবিষ্কার করেছেন। কিন্তু অধিকাংশের কাছেই তা শুধু কবিতা রচনার পদ্ধতি হিসেবেই স্বীকার্য। শ্রীমতি ত্রিপাঠী তাঁর গবেষণাগ্রন্থের ১১৭ পৃষ্ঠার পাদটীকায় 'যে আঁধার আলোর অধিক' কাব্যটি সম্পর্কে প্রণবেন্দু দাশগুপ্তের মন্তব্য অনুসারে টোমাস মানের Death in Venice, Tristan এবং Tonio Croger গল্প ত্রয়ীর প্রভাবের কথা বলেছেন। বুদ্ধদেবের নিজস্ব সংগ্রহে টোমাস মানের যে গল্পগ্রন্থটি ছিল তাতেও ওই তিনটি গল্পের নানা জায়গায়, তাঁর মন্তব্য এবং বন্ধনীকরণ লক্ষ করা যায়। বিশেষ করে টোনিও ক্রোগারের একটি পংক্তি তিনি বিশেষভাবে চিহ্নিত করেছেন বইটিতে—"The artist

must be unhuman extra human, he must stand in a queer, aloof relationship to our humanity".

মান্ এর রচনায় প্রকৃতি ও মানব সত্তার দ্বন্দ্ব, বুদ্ধদেব তাঁর 'আধুনিক কবিতার প্রকৃতি' নিবন্ধে নিজেই উল্লেখ করেছেন। এই প্রবন্ধে তাঁর দার্শনিক চিন্তা ভাবনা সবচেয়ে সংহত এবং নির্দিষ্ট চেহারা লাভ করলেও অধিকাংশ সমালোচকই শুধু 'কাব্যজিজ্ঞাসা' বলেই এই বোধকে এড়িয়ে গেছেন বললে অত্যুক্তি হয় না। কিন্তু বুদ্ধদেব শুধু প্রকৃতি নয়, নিশ্চেতন মানবতা বা "Our humanity'র বিপরীতে এক চেতন মানবসত্তার কল্পনা যে করতে পেরেছিলেন শিল্পীর স্বভাব হিসেবে, তা তাঁর রচনাতেই প্রকাশিত। এই প্রসঙ্গে বুদ্ধদেবের ব্যবহৃত 'চেতনা' বা 'চৈতন্য' শব্দগুলি যে সমালোচকদের অন্তর্দৃষ্টির করুণা লাভ করতে ব্যর্থ হয়েছে তাও স্মরণীয়। অধ্যাপক অশ্রুকুমার শিকদার তাঁর বুদ্ধদেব আলোচনায় লিখেছেন "মনীষা ও চৈতন্যকে অথচ একসময় বুদ্ধদেব সন্দেহের চোখে দেখেছিলেন, ভেবেছিলেন বুদ্ধিমনীষার কোনো ভূমিকা নেই সৃষ্টিকর্মের ব্যাপারে।" (পৃষ্ঠা ১৯১, আধুনিক কবিতার দিগ্বলয়) 'মনীষা', 'চৈতন্য' এবং 'বুদ্ধি' শব্দগুলিকে খুব আলগাভাবে প্রায় সমার্থক বলে মনে করাতেই এই বিপত্তির সৃষ্টি হয়েছে। দার্শনিক বিচারে এই তিনটি শব্দের মধ্যে প্রভূত পার্থক্য বিদ্যমান। বুদ্ধি সম্পূর্ণভাবে অমানবিক গুণ নাও হতে পারে বা বুদ্ধিমান মানুষকেই চৈতন্যশীল ভাবা যায় না। প্রবল মনীষা বা বুদ্ধি সত্ত্বেও পশ্চিমী দর্শন চৈতন্যকে ব্রাত্য বলেই ধরে নিয়েছিলো দীর্ঘকাল। বুদ্ধদেব পাশ্চাত্য যুক্তিবাদের ধারায় মানুষের বুদ্ধি বা মনীষার জয়গান করেন নি। তাঁর আলোচনা স্পষ্টতই চেতনাকেন্দ্রিক—

"শুধু মানুষই পারে বীর, সন্ত অথবা শিল্পী হতে, শুধু তার পক্ষে সম্ভব হিংসা বা আত্মত্যাগ, চেষ্টা, চিন্তা, সাধুতা বা দুষ্কৃতি। পৃথিবীতে প্রাণী যদিও অসংখ্য, মানুষের তুলনায় তাদের সপ্রাণ জড় বললেও ভুল হয় না; চেতন সত্তা একমাত্র মানুষেরই আছে। তাই মানুষ প্রকৃতিচ্যুত, সৃষ্টিপ্রক্রিয়ায় নিদ্রাময় মাতৃক্রোড় থেকে বিচ্ছিন্ন, তার চৈতন্যের প্রভাবে সে যা কিছু হতে চায়, হ'তে পারে, এবং কখনো কখনো হ'য়েও থাকে তার সমস্তটাই প্রকৃতির বিরোধী।" (পৃ. ৩২, সঙ্গ, নিঃসঙ্গতা, রবীন্দ্রনাথ)

অস্তিবাদী দার্শনিকদের অজস্র তুলনীয় উদ্ধৃতি উপস্থাপিত করে উদ্ধৃত বক্তব্যের সঙ্গে তাঁদের মতের সাযুজ্য দেখানো যায়। অস্তিবাদী দর্শনের প্রায় গোড়ার কথাই যেন প্রাবন্ধিক বুদ্ধদেব সুললিত ভাষায় এখানে উপস্থিত করেছেন বলে মনে হয়। শুধু প্রকৃতির এবং অন্ধ জৈবসত্তার সঙ্গে মানবসত্তার চেতনার পৃথকতাই এখানে একমাত্র উপজীব্য নয়। সঙ্গে সঙ্গে এসে পড়েছে মানুষের অপ্রকৃত অস্তিত্বের অসার্থকতার পাশাপাশি প্রকৃত অস্তিত্ববান হয়ে ওঠার প্রকল্পও। এই আলোচনায়, বুদ্ধদেবের বিভিন্ন প্রবন্ধের বিচ্ছিন্ন মন্তব্যের বিশ্লেষণে একথা কিছুতেই স্বীকার করে নেওয়া যায় না যে, শুধুমাত্র 'কাব্যজিজ্ঞাসা'ই এই জীবনবোধের একমাত্র অন্বিষ্ট বস্তু। বুদ্ধদেব নিজেই তো লিখেছেন "শুধু কবিতা বা সন্ন্যাসই নয় প্রকৃত পাপও চৈতন্যের ফল;" (পৃ. ২২৬, প্রবন্ধ সংকলন)

কাব্যজিজ্ঞাসা, পাপবোধ ও আধ্যাত্মিক উত্তরণের আকাঙ্ক্ষায় উদ্ভাসিত সমগ্র জীবনই

যে বুদ্ধদেবের অন্বিষ্ট তাতে আর সন্দেহ করা যায় না। কবিতারচনা সে জীবনের একটি মাধ্যম—তাও উত্তরণের পথ হিসেবেই পরিগণিত। ফলে বুদ্ধদেবের ক্ষেত্রেও অন্য যে কোনও মহান্ মানুষের মতোই কাব্যজিজ্ঞাসা ও জীবন জিজ্ঞাসা একাকার। প্রেমের অপ্রাপণীয়তাতেই তার জন্ম, কিন্তু প্রেমের অভিমুখেই তার যাত্রা। সমালোচনা করতে গিয়েই অধ্যাপক শিকদার একটি গুরুত্বপূর্ণ মন্তব্য করেছেন—"যিনি যাতনা সয়ে যান, আর যিনি সৃষ্টি করেন তিনি একই মানুষ—দুই সত্তার মধ্যে দেয়াল তোলা যায় না।" (পৃ. ২০৩, আধুনিক কবিতার দিগ্বলয়)

অধ্যাপক শিকদার পাশ্চাত্য যুক্তিবাদের এবং মানবমনীষার জয়গানের একটু বাইরে সরে গিয়ে বুদ্ধদেবকে পর্যবেক্ষণ করলেই হয়তো বুঝতে পারতেন, যে দেয়াল বুদ্ধদেব তোলেন নি, দেয়াল ভাঙাই তাঁর লক্ষ্য ছিল। বুদ্ধির দেয়াল দিয়ে প্রকৃতি থেকে বিচ্ছিন্নতা তাঁর অভিপ্রায় ছিল না। যন্ত্রণাকাতর চেতনাশীল সত্তার সৃষ্টিশীলতাকে সম্পূর্ণভাবে দেখায় সমকালীন বাঙালিদের মধ্যে তিনিই অগ্রগণ্য। কেউ একে কাব্যজিজ্ঞাসা বলতে চান বলুন, কিন্তু সেই কাব্যজিজ্ঞাসাও যে এক বৃহত্তর জীবনজিজ্ঞাসারই গূঢ় অংশীদার তাতে আমাদের কোনও সন্দেহ নেই।

প্রাবন্ধিক বুদ্ধদেবের এই জীবনদর্শনের প্রেক্ষিতে তাঁর কবিতাকে পড়লে, অনেক সূত্রই খুঁজে পাওয়া যাবে যা চিরাচরিত চিন্তা দিয়ে অনুভব সম্ভব নয়। সার্ত্রের মতে চেতনাই শূন্যতার জন্মদাতা—চেতনার মাধ্যমেই পৃথিবীতে শূন্যতার আগমন—যে শূন্যতা এক সৃষ্টিধর্মী নবত্বের পূর্বগ। বুদ্ধদেব তাঁর 'শীতরাত্রির প্রার্থনা' কবিতায় লেখেন—

"এসো আস্তে পা ফ্যালো, সিঁড়ি বেয়ে উঠে এসো তোমার শূন্য ঘরে—
তুমি ভরে তুলবে তাই শূন্যতা।"

এই নবজন্ম যে শুধু প্রতীকী—নিত্যই এই জন্মান্তর ঘটে যায় মানবসত্তার—তাও স্পষ্ট করেছেন তিনি একই কবিতায়—

"—বার বার মরতে হয় মানুষকে, নতুন ক'রে
জন্ম নেবার জন্য,
শুধু জন্ম জন্মান্তর নয়, একই জন্মে তার এই মৃত্যু আর পুনরুত্থান,
শুধু একজনের নয় সকল মানুষের"

'Nothingness থেকে 'Being'-এর এই অভিযাত্রা যে শুধু প্রার্থনাই নয়—প্রতীক্ষা এবং প্রস্তুতিও, তার অবিচ্ছেদ্য অংশ, তাও ঘোষণা করেছেন কবি। ব্যক্তি মানুষের স্বাধীন উদ্যোগেই এই নবজন্মের এক কারিগর তা তিনি বিস্মৃত হন নি—

"তোমার শূন্যতার অজ্ঞাত গহ্বর থেকে নবজন্মের জন্যে
প্রার্থনা করো, প্রতীক্ষা করো, প্রস্তুত হও।"

মনে হয় শুধু বোদলেয়ারের কাছে নয়, বুদ্ধদেবের কাছেও "তাই শুধু শ্রদ্ধেয় যা রচিত, চৈতন্যের দ্বারা শোধিত, চেষ্টা ও সাধনার দ্বারা প্রাপণীয়।" এই চেষ্টা, সাধনা, দৈনন্দিন অপ্রকৃত অস্তিত্ব থেকে এক প্রকৃত অস্তিত্বে উত্তরণের প্রয়াস হিসাবে দেখা যায়—শুধু কবিতা রচনাই তাঁর এই চেষ্টা বা সাধনার একমাত্র লক্ষ্য নয়—

"কিছুই সহজ নয়, কিছুই সহজ নয় আর
লেখা, পড়া, প্রুফ পড়া, চিঠি লেখা, কথোপকথন,
যা কিছু ভুলিয়ে রাখে আপাতত প্রত্যহের ভার
সব যেন বৃহদরণ্যের মতো তর্ক পরায়ণ
হয়ে আছে বিকল্পকুটিল এক চতুর পাহাড়'

('দায়িত্বের ভার' যে আঁধার আলোর অধিক)

নতুন এক আশ্চর্য জটিলতা আর দায়িত্বের সন্ধান কবি পেয়েছেন বলে মনে হয় এই কবিতায়। কবিতাটির ব্যাখ্যায় আমরা অবাক হয়ে লক্ষ করি দৈনন্দিন কাজকর্মের চেয়ে লেখাকে কবি বেশি গুরুত্ব দিয়ে আর ভাবতে চাইছেন না। প্রেমিকার রূপকে তিনি উপস্থিত করেছেন 'সত্তার সারাৎসার' সমর্পণ করবার এক দীপ্ত আলিঙ্গনকে। বোদলেয়ারের কাব্যেও প্রেমের রূপকে 'উজ্জ্বল উদ্ধারে'র উত্তরণের কথা রয়েছে। বুদ্ধদেবের ক্ষেত্রে তাই হয়ে দাঁড়িয়েছে 'উদার উদ্ধার'। কি সেই আশ্চর্য উদ্ধার যা দৈনন্দিন যাপানের একঘেয়েমি থেকে মুক্তি দেয়? অস্তিবাদী চেতনায় Inauthentic Existence-এর বদলে Authentic Existence এর দিকেই কবি যাচ্ছেন বলে মনে হওয়া অস্বাভাবিক নয়—

"কোনো এক দীপ্ত প্রেমিকার
আলিঙ্গনে সত্তার সারাৎসার ক'রে সমর্পণ—
দেখেছি দাঁড়িয়ে দূরে, যদিও সে উদার উদ্ধার
লুপ্ত করে দিলো ভাবা, লেখা, পড়া, কথোপকথন,"

অপ্রকৃত অস্তিত্ব থেকে প্রকৃত অস্তিত্বের দিকে যেতে গেলে, স্বাধীন সত্তার নির্বাচনপ্রক্রিয়াটি অবশ্যম্ভাবী বলে মনে করেছেন অস্তিবাদীরা, আর এই নির্বাচনের দায়িত্ব প্রতি মুহূর্তেই ব্যক্তির উপরেই ন্যস্ত।

স্বাধীন সত্তার প্রকল্প-নির্বাচনকালীন সংকট, শুধুমাত্র ব্যক্তিরই কিন্তু সার্ত্রের মতে যেহেতু ব্যক্তিমানুষের নির্বাচনে সমস্ত মানবজাতির প্রতিভূ হিসেবেই সে নিজে প্রতিবিম্বিত হয়, তাই ব্যক্তিগত দায়িত্বের ভারই বহুগুণে বর্ধিত হয়ে এক কঠিন দায়িত্বে পর্যবসিত হয়। প্রকৃত অস্তিত্বের সন্ধানে এই কঠিন দায়িত্ব থেকে ব্যক্তি মানুষের মুক্তি নেই। হয় অপ্রকৃত অস্তিত্ব নতুবা এই দায়িত্বভার, দুটির যে কোনো একটিকে তার বেছে নিতেই হয়। নিতান্ত সহজ জীবন-যাপন আর সম্ভবপর হয় না কিছুতেই—। সার্ত্রের ভাষায়—"I am responsible for myself and for all" (page-30, Existentialism and Humanism)। বুদ্ধদেবের কবিতাকে সার্ত্রের উক্তির আলোতে ব্যাখ্যা করা যায় হয়তো, প্রেমের রূপকে প্রকৃত অস্তিত্বের কথাই যদি বলে থাকেন তিনি—

"তবু প্রেম, প্রেমিকেরে ঈর্ষা করে, নিয়ে এলো ক্রূর বরপণ—
দুরূহ, নূতনতর, ক্ষমাহীন দায়িত্বের ভার।
কিছুই সহজ নয় কিছুই সহজ নেই আর।"

"তিনি আধুনিক কাব্যজগতের প্রথম অস্তিবাদী কবি," এই বাক্যটি যাঁর সম্পর্কে প্রয়োগ

করেছিলেন অধ্যাপিকা দীপ্তি ত্রিপাঠী তাঁর গবেষণাগ্রন্থে, সেই কবি বিষ্ণু দে-কে 'অস্তিবাদী' আখ্যায় ভূষিত করার চেষ্টা আপাতদৃষ্টিতে বাতুলতা বলেই মনে হবে। অবশ্য শ্রীমতী ত্রিপাঠী সেই দোষে কিছুতেই অভিযুক্তা নন, কেননা পরের পংক্তিতেই তিনি বোঝান যে এই 'অস্তিবাদী' Existentialism নয়—অন্যকিছু। "রবীন্দ্রনাথের ভাষায় 'হাঁ' ধর্মী, যদিও সেই 'হাঁ' ধর্মী, যদিও সেই 'হাঁ' ধর্মের প্রকৃতি সম্পূর্ণ আধুনিক এবং রবীন্দ্রনাথের জীবনবেদ থেকে উৎসারিত অস্তিবাদ থেকে তার মৌল পার্থক্য স্পষ্ট।" (পৃ. ২৫৫, আধুনিক বাংলা কাব্য পরিচয়)

রবীন্দ্রনাথের এই 'হাঁ' ধর্মটি আদৌ কোনো স্পষ্ট দর্শনচিন্তার দ্যোতক হতে পারে বলে আমাদের মনে হয় নি। পাশ্চাত্য বা প্রাচ্য কোনো দর্শনের ধারাতেই 'হাঁ' ধর্ম বা 'না' ধর্ম কোনো পৃথক দর্শনের প্রতিনিধি নয়। বৌদ্ধ 'সর্বাস্তিবাদ', বৈদিক বা হিন্দু চিন্তায় 'নাস্তিক' দর্শন হিসেবেই বিবেচিত হয়েছে, কেননা ঈশ্বরের অস্তিত্ব বা অনস্তিত্ব সংক্রান্ত সিদ্ধান্তই সেখানে 'হাঁ' ধর্ম এবং 'না' ধর্মের পরিচায়ক। তা বলে বৌদ্ধ চিন্তাকে নেতিবাচক বলে মেনে নিতে কেউই রাজি হবেন না। আবার পাশ্চাত্য Positivist দর্শনকে মার্ক্সীয় চিন্তায় ইতিবাচক জীবনদৃষ্টিভঙ্গী বলে প্রায়শই মনে করা হয় না। ইতিবাচক এবং নেতিবাচক এই দুভাগে দর্শনচিন্তাকে বিভাজন করবার যে বৈকালী চা-এর আড্ডার প্রবণতা বাঙালি সমাজ জীবনে লক্ষ করা যায়, তারই দুঃখজনক প্রতিফলন বাংলা সমালোচনা সাহিত্যেও এখনও পর্যন্ত পর্যাপ্ত পরিমাণে প্রকাশমান। ফলে কবি বিষ্ণু দে বা অন্য যে কোনো কবি বা লেখকের মধ্যে ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি খুঁজে পাওয়া বা না পাওয়ার মধ্যে, তাঁদের দর্শন চিন্তা সম্পর্কে প্রায় কিছুই বলা হয় না। অবশ্য মার্ক্সবাদকে সাধারণভাবে ইতিবাচক দর্শন বলে ধরে নিয়ে বাকি সমস্ত চিন্তা ও চেতনাকে নস্যাৎ করার প্রবণতা পশ্চিমী চিন্তা জগতে বাতিল হয়ে গেলেও, সম্ভবত রাজনৈতিক প্রেক্ষিতের হাত ধরেই এ বাংলায় আজও চলনসই। কিন্তু কবি বিষ্ণু দে'র কাব্যজীবন তো প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত এই তথাকথিত 'হাঁ' ধর্মে নিষিক্ত নয়। বরং অধ্যাপক অশ্রুকুমার শিকদারের ভাষায় বলা যায়—

"কবিজীবনের প্রথমস্তরে বিষ্ণু দে নিঃসম্পর্কিতের উদাসীন নির্লিপ্ততা নিয়ে ক্ষয় নৈরাজ্য আর নিষ্ফলতার মানচিত্র এঁকেছেন।" (পৃ. ২০৪, আধুনিক কবিতার দিগ্বলয়)

বিচ্ছিন্ন ও একক সত্তার যন্ত্রণা, প্রেমের ব্যর্থতা ও নিষ্ফলতা অর্থাৎ মানুষের সংযোগবিচ্ছিন্ন একাকীত্বের সমাধান খুঁজতে গিয়েই কবি বিষ্ণু দে পৌঁছেছিলেন এই 'হাঁ' ধর্ম বা মার্ক্সবাদের সামাজিক মিলনের স্রোতে। প্রথম দিকের রচনায় তাঁর এই আত্মানুসন্ধান যথেষ্টই চর্চিত এবং আলোচিত। ফলে পুনরুল্লেখের বিড়ম্বনায় না গিয়ে দু-একটি মূল প্রবণতা নির্দিষ্ট করলেই তা আমাদের বক্তব্যের পরিপূরক হবে। 'চোরাবালি'র 'দায়িত্ব' কবিতায় তিনি লিখছেন—

"প্রেমের ক্যাফিন গেল আমাদের বেলায় বিফলে
জিজ্ঞাসার মদিরায় মস্তিষ্কে এ সবই ব্যর্থ হয়।" বা একই কাব্যের ভিন্ন কবিতায় দেখি—

"অভ্যাস, শুধু অভ্যাস ভালো তাই তো বাসি।"

অস্তিবাদী (আমাদের সমালোচনায় 'অস্তিবাদ' শব্দটি কোনো 'হাঁ' ধর্মকে না বুঝিয়ে

পাশ্চাত্য Existentialism-কেই বোঝাচ্ছে) দর্শনের একটি বিশেষ দিক মানুষের সঙ্গে মানুষের সম্পর্ক। ইয়াসপার্স, মার্সেল এবং ব্যুবার, তিন জনেই এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন। অবশ্য ব্যুবারের 'I and Thou' বইটিই এ বিষয়ে পৃথকভাবে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য রচনা। তাঁর ভাষায় "All real living is meeting'। জীবনযাপনের প্রতিটি ক্ষেত্রে ব্যক্তির সঙ্গে বস্তুর মিলন এবং ব্যক্তির সঙ্গে ব্যক্তির মিলনই ব্যুবারের চোখে মূল গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। কবি বিষ্ণু দে মানুষের অরণ্যের মধ্যে নিজেকে বিদেশী বলে মনে করেছেন তার কারণ বাকি মানুষের সঙ্গে তাঁর ভাষা ও ভাবের সংযোগহীনতা। তিনি যখন কথা বলেন তখন প্রতিবেশী রূপকের গাছটি তাঁর চোখে কেন ইট পাথরের পাঁচিল মনে হয়, এ প্রশ্নের উত্তর খুঁজতে হবে ব্যক্তি সম্পর্ক বস্তু সম্পর্কে পরিবর্তিত হয়ে যাওয়ার মধ্যেই। ব্যক্তির সঙ্গে ব্যক্তির পরিচয়ের প্রারম্ভেই অপরের চোখে নিজের এবং নিজের চোখে অপরের বাস্তবিক প্রয়োজনীয়তার গুরুত্ব বেড়ে গিয়ে এক বস্তুমুখী দৃষ্টিভঙ্গীর জন্ম হয়। যাতে ব্যক্তিকে উদ্দেশ্য সাধনের প্রয়োজনীয় বস্তুরূপে প্রতিভাত হওয়াই ভবিতব্য। অর্থাৎ ব্যুবারের ভাষায় বলতে গেলে 'I-Thou' সম্পর্কটি 'I-It' সম্পর্কে পর্যবসিত হয়। প্রেমের ক্ষেত্রেও সম্পর্কের এই বস্তুগত ও প্রয়োজনের অভ্যাসজাত প্রতিক্রিয়া বিষ্ণু দে-কে আচ্ছন্ন করেছিল। প্রেমের অনিবার্যতার অভাব রবীন্দ্রনাথের মতো বিষ্ণু দে-কেও আহত করেছে—

"যদি আমি জন্মাতুম বহু দূরদেশে
তোমাকে পড়ত মনে, নিতুম কি চিনে?
এ দূরত্ব এড়িয়ে কি আসতুম হেসে?
তুমিও চিনতে হেসে পরিচয়হীনে?" (গার্হস্থ্যাশ্রম)

বিষ্ণুদের এই প্রেমের আকস্মিকতা এবং চিরন্তনতার অভাববোধ, রবীন্দ্রকাব্যেরই প্রভাব না একেবারে ব্যক্তিগত উপলব্ধি সে বিতর্ক নিষ্প্রয়োজন। কিন্তু তাঁর বেদনাটি অস্তিবাদী দর্শনেই সবচেয়ে সফলভাবে ব্যাখ্যাত। বিষ্ণু দের শেষ দুটি পংক্তি এইরকম—

"সুযোগ পেয়ে তো তবে পাশাপাশি মিলি?
আমাদের ভালবাসা প্রাকৃতিক লিলি।।"

জাঁ পল সার্ত্র তাঁর Being and Nothingness গ্রন্থের 370 পৃষ্ঠায় লিখছেন "In this sense if I am to be loved by the other, this means that I am to be freely chosen as beloved. As we know, in the current terminology of love, the beloved is often called the chosen one. But this choice must not be relative and contingent.... ....Actually what the lover demands is that the beloved should make of him an absolute choice." রবীন্দ্রনাথ ও বিষ্ণু দের এই প্রবণতার ব্যাখ্যায় সার্ত্রের সামগ্রিক আলোচনাংশটিকেই প্রায় শেষ কথা বলা যায়। বিষ্ণু দের কবিতায় 'সুরেশ-লিলি-রমা-অলকা'র নিষ্প্রাণ এবং ব্যর্থ প্রণয় সম্পর্কে প্রায় একইভাবে আলোচনা করেছেন সুধীন্দ্রনাথ দত্ত—"ক্রেসিডা বা ওফেলিয়ার মতো এই নিঃসম্বল লিলি-রমা-অলকার ভাগ্যে বিষ্ণু দের করুণাকণা জোটেনি; তিনি জানেন না অথবা জেনেও মানেন না যে এদের

দৈন্যেও একটা জাগতিক নিয়ম ক্রিয়াশীল; এবং ফলে, এরা তাঁর বিশ্ববীক্ষার দৃষ্টান্ত হয়ে ওঠে নি, শুধুই যুগিয়েছে তাঁর নেতিবাচক অবস্থার উপলক্ষ।" (পৃ. ১০৮, কুলায় ও কালপুরুষ)

সূক্ষ্ম সমালোচনাদৃষ্টির অধিকারী সুধীন্দ্রনাথও হয়তো জানতে পারেন নি অথবা জেনেও মানতে পারেন নি যে আধুনিক প্রেমের নিঃসম্বলতা ও নিঃসহায়তার পিছনে 'ক্রিয়াশীল একটা জাগতিক নিয়ম' বিষ্ণু দেও খুঁজে পেয়েছিলেন। আসলে সুধীন্দ্রনাথের 'ক্রিয়াশীল জাগতিক নিয়ম' এবং বিষ্ণুদের 'ক্রিয়াশীল জাগতিক নিয়ম' দুটিই ছিল ভিন্ন ধরনের। 'হাঁ' ধর্মী বা 'না' ধর্মী তক্‌মা এঁটে না দিয়েই আমরা বলতে পারি যে Alienation-এর মার্ক্সবাদী উৎপাদনবিচ্ছিন্ন মধ্যবিত্ত জীবনযাত্রার ব্যাখ্যাটিই ছিল বিষ্ণু দের মনঃপূত, বিপ্রতীপে সুধীন্দ্রনাথ ব্যক্তি বিচ্ছিন্নতার পিছনে আর্থসামাজিক কারণের চেয়ে মনস্তাত্ত্বিক সংকটকেই বেশি গুরুত্ব দিয়েছেন। ফলে মধ্যবিত্ত ব্যক্তিবিচ্ছিন্নতার বিপরীতে বিষ্ণু দে সামিল হতে চেয়েছেন জনস্রোতে—বেছে নিয়েছেন মার্ক্সবাদী চিন্তা ও চেতনার রাস্তাটিই। সার্ত্র ও কাম্যুর মতোই বিচ্ছিন্নতার উপলব্ধিতে সুধীন্দ্রনাথ বা বিষ্ণু দের মধ্যে পার্থক্য নেই। কিন্তু সার্ত্রের মতোই বিষ্ণু দে যখন মেনে নিয়েছেন মার্ক্সীয় পদ্ধতিতে শ্রমিকশ্রেণীর সঙ্গে একাত্মতার মাধ্যমেই ঘটতে পারে মধ্যবিত্তের বিচ্ছিন্নতার একমাত্র অবসান, তখন কাম্যুর মতো সুধীন্দ্রনাথ মার্ক্সবাদের উদ্দেশ্য ও উপায়ের বৈপরীত্য দেখে ব্যথিত হয়ে ফিরে এসেছেন আবারও একাকীত্বের অমোঘ পরিণামেই। কিন্তু সার্ত্র যেমন শেষ পর্যন্ত ব্যক্তিযন্ত্রণা থেকে মুক্তির উপায় হিসেবে জনসমুদ্রকে বেছে নিলেও ব্যক্তিসত্তার ও শিল্পীর স্বাধীনতাকে সম্পূর্ণ বিসর্জন দিতে রাজি হন নি, বিষ্ণু দেও কি পেরেছেন জনসমুদ্রের জোয়ারে হৃদয়ের চড়ার একূল ওকূল ভাসিয়ে নিয়ে যেতে? নাকি জনসমুদ্রের জোয়ারে তাঁর একদিকের চড়া যেমন ভেসে গেছে আবেগান্বিত প্লাবনে, অন্যদিকে সংশয়ের ভাঁটা সৃষ্টি করেছে আশ্চর্য চোরাবালির যেখানে শিল্পীর স্বাধীনতা ক্রমশই ডুবে যায় দলমতের নিষ্ঠুর পেষণে। সুধীন্দ্রনাথ বিষ্ণু দে সম্পর্কে দ্বিতীয় অভিমতটিই পোষণ করেছেন এক অননুকরণীয়, প্রায় সান্ধ্যভাষায়—"তিনি যখন উন্নাসিক ভেদবুদ্ধির প্ররোচনায় সুরেশাদির সংসর্গ ছেড়ে দাঁড়ান, তখনও তাঁর দুরুক্তি যেন খেদোক্তির মতো শোনায়, বোঝা যায় না তিনি কখন হাসছেন, কাঁদছেনই বা কখন।" (পৃ. ১০৮, কুলায় ও কালপুরুষ)

মার্ক্সবাদী সমাজচেতনায় প্লাবিত হয়েও বিষ্ণু দে তাই শিল্পী হিসেবে মার্ক্সীয় নন্দনতত্ত্বের কড়া শাসন মেনে নিতে পারেন না। ফলে সমকালীন মার্ক্সীয় সমালোচকরা তাঁর কাব্যালোচনায় 'সমাজতান্ত্রিক বাস্তবতা'র 'সার্থক' প্রতিফলন দেখতে না পেয়ে যে ক্ষুব্ধ হবেন তা তো স্বাভাবিক। তিনি তবু পার্টি প্রবক্তাদের মাধ্যমেই মোকাবিলা করতে চেয়েছেন এই সমস্যার। ফরাসী কম্যুনিস্ট পার্টির নেতদের উল্লেখ করে কবি যখন 'শিল্পকে সামাজিক পণ্যদ্রব্য' ভাবতে রাজি হন না, তখন একদিকে যেমন ধরা পরে ব্যক্তিসত্তার বিকাশ ও স্বাধীনতা হিসেবে শিল্পকে বেছে নেওয়ার প্রবণতা, অন্যদিকে কম্যুনিস্ট পার্টির অনুশাসনের বাইরে যাওয়ার নিরূপায়তাও কিন্তু গোপন থাকে না। নন্দনতত্ত্বের সফল আলোচক অধ্যাপক বিমলকুমার মুখোপাধ্যায় বোধহয় টের পেয়েছিলেন কবির দ্বিধাবিভক্ত মানসিকতার। তিনি লেখেন—

"পার্টিলাইন' বা 'পার্টি অর্গানিজেশন' সাহিত্যে কতটা প্রভাব বিস্তার করতে পারে এই সমস্যা যে শুধু বাঙালী বুদ্ধিজীবীদেরই ছিল, তা নয়। বিষ্ণু দে, এরভে ও গারোদির নামোল্লেখ করেছেন। এই প্রসঙ্গে আরাগঁ বা জঁ পল সার্ত্র-এর কথাও বলা যেতে পারত।" (পৃ. ১৭৫, সাহিত্যের মানচিত্র, দ্বীপ থেকে মহাদেশ) অধ্যাপক মুখোপাধ্যায়ের 'বলা যেতে পারত' বাক্যাংশটি গূঢ় অর্থ বহন করে বলে আমাদের মনে হয়েছে। 'বলা যেতে পারত' কিন্তু বলা যায় নি—কেননা বলাটা সমীচীন হতো না, গারোদি ও সার্ত্রের বিতর্ক এমন একটা জায়গায় পৌঁছেছিল সেসময়, যে যদিও বিষ্ণু দের সমস্যা সার্ত্রের সমস্যার অনেক বেশি কাছাকাছি তবু গারোদির নামোল্লেখে অন্ততপক্ষে কম্যুনিস্ট পার্টির প্রচ্ছন্ন সমর্থন ছিল যা সার্ত্রের তথাকথিত 'সংশোধনবাদী' অবস্থান থেকে পৃথক এবং বাঙালি মার্ক্সবাদীর কাছে অনেক বেশি সহনীয়। অথচ জঁ পল সার্ত্রের মতোই বিষ্ণু দে প্রাণান্ত প্রয়াস করেছেন পার্টির কাছে গ্রহণযোগ্য হয়ে উঠতে। পার্টির এবং সমাজতন্ত্রের প্রতি বিশ্বস্ততার নিদর্শন হিসেবে সার্ত্র ত্যাগ করেছেন কাম্যু এবং পরবর্তীকালে সমাজতন্ত্রে বীতশ্রদ্ধ মরিস মর্লোপন্তিকে। বিষ্ণু দেও সুধীন্দ্রনাথ-বুদ্ধদেবকে ত্যাগ করে চেষ্টা করেছেন নতুন সমাজ গড়বার। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত দুজনকেই সম্মুখীন হতে হয়েছে বিরূপ সমালোচনার। দুজনের রচনাই 'তথাকথিত' সাধারণ মানুষের কাছে সহজবোধ্য হয় নি বলে 'খণ্ডিত মধ্যবিত্তের লেখক' হিসেবেই তাঁরা স্ব স্ব দেশের কম্যুনিস্ট পার্টির কাছে পরিচিত ছিলেন। সার্ত্রের 'What is Literature' বইটি মূলত সাহিত্যের এই নতুন সামাজিক দিকটির সঙ্গে নিজস্ব শিল্পীসত্তার সংঘাতেরই পরিণতি। অধ্যাপক Poster-এর ভাষায় "Sartre's discomfort slemmed from the limitation of his audience to the petty bourgeoisie while he adopted the Marxist position and granted without hesitation that the fate of literature is bound up with that of the working class." (Page–136, Existential Marxism in post war France, Mark Poster)

বিষ্ণু দের সাহিত্য বিচার সম্পর্কেও প্রায় এক কথাই বলা যায়। সার্ত্রও বিষ্ণু দের মতোই মনে করেছেন যে বিচ্ছিন্নতার জীবনালেখ্য থেকে সাহিত্য বা শিল্পেই মিলতে পারে 'চিন্ময় কর্ম'। 'তাই শিল্পে' কবিতায় বিষ্ণু দের 'চিন্ময়কর্ম'ই যেন সার্ত্র তাঁর what is literature গ্রন্থে Creative action বলে বলে ব্যাখ্যা করেছেন। সাংগঠনিক রাজনীতির তুলনায় 'Creative Action'-এই এর গুরুত্ব সার্ত্রের মতো বিষ্ণু দের কাছেও অনিবার্য বলে মনে হয়েছে। 'স্মৃতি সত্তা ভবিষ্যৎ' কাব্যের 'সার্কাসের বাঘ' কবিতাটিতে অপূর্ব রূপকে বর্ণিত হয়েছে কবির উপলব্ধি—

"আমরাও চুপ করে বসি, কিংবা ছুটি নিঃশব্দ সঞ্চারে,
সর্পগন্ধা পায়ে পায়ে সিস, শাল সেগুনের উদ্গ্রীব অদ্ভুত
তীক্ষ্ণ আগ্রহের নিস্তব্ধ আশ্লেষে, প্রকৃতির নীরব উৎসাহে,
সভাসমিতির চেয়ে ঢের শক্ত ক্ষিপ্র তিতিক্ষায়"

অথচ কবি বিষ্ণু দে অস্তিবাদী চিন্তা ও চেতনাকে আক্রমণই করেছেন তাঁর কাব্যে। 'আলজিরিয়

অবসাদে অস্তিত্বের কাকবিষ্ঠা খোঁজা' পংক্তিটি আমাদের মনে হয়েছে আলজিরিয় ঔপন্যাসিক আলবেয়ার কাম্যুর প্রতি সরাসরি কটাক্ষ। কোনো কোনো বিদ্বান্ অবশ্য মনে করেন যে সমাজসচেতন কবি আলজিরিয় স্বাধীনতার যুদ্ধের প্রতি এখানে ইঙ্গিত করেছেন। তাঁদের এই অভিমত যদি একান্তই গ্রহণযোগ্য হয়, তাহলেও প্রকারান্তরে পংক্তিটির বিশ্লেষণ আমাদের বক্তব্যকেই বৃহত্তর অর্থে সুপ্রতিষ্ঠিত করবে। আলজিরিয় স্বাধীনতার যুদ্ধে অবসন্ন ফরাসী সাম্রাজ্যবাদী যদি 'অস্তিত্বের কাকবিষ্ঠা' খুঁজেও থাকে, তাহলেও সেই অনুসন্ধান সার্ত্র, ব্যোভের এবং কাম্যুদেরকেই চিহ্নিত করে। যে ভাবেই দেখা যাক না কেন, কবির অভিযোগটি কিন্তু ইতিহাস সমর্থিত নয়। 'অস্তিত্বের কাকবিষ্ঠা' খোঁজার আসামীরা কিন্তু আলজিরিয় যুদ্ধে ফরাসী সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধাচারণই করেছিলেন। একমাত্র কাম্যুই আলজিরিয়ায় ফরাসী উপস্থিতির কিছুটা পক্ষে ছিলেন। সার্ত্র ও ব্যোভেরদের সঙ্গে তাঁর মতান্তরের পিছনে শুধু মার্ক্সবাদের ব্যাখ্যাই নয়, আলজিরিয় যুদ্ধে ভিন্ন পক্ষাবলম্বনও একটি কারণ। সার্ত্রের আলজিরিয় যুদ্ধে ফরাসী সাম্রাজ্যবাদের বিরোধিতা, মার্ক্সীয় দলগুলির ক্ষেত্রেও পথনির্দেশকারী ছিল একথা বললেও অত্যুক্তি হবে না। অধ্যাপক Poster-এর ভাষায়—When Sartre took great risks and supported his friend Francois jeanson upon his arrest for leading a pro-Algerian group in France, the exixtentialist had placd himself to the left of the Communists on the colonial question. Standing with Jeanson, who was considered by many a traitor, Sartre had taken an independent position that aided in revitalizing Marxist politics. (Page–186, Existential Marxism in Post war France)

এদেশের মার্ক্সীয় দল ও বুদ্ধিজীবীর কাছে অজ্ঞতাবশত অগ্রহণীয় অস্তিবাদকে বিষ্ণু দের পক্ষেও উপেক্ষা করাই স্বাভাবিক। তবু তাঁর রচনায় যে ব্যক্তি ও সমষ্টিকে মেলানোর প্রাণান্ত প্রয়াস লক্ষ করা যায় তা তো সার্ত্রেরও অন্বিষ্ট ছিল—"We must mitilate in our writeing, in favour of the freedom of the person and the socialist revolution. It has often been claimed that they are not reconcilible. It is out job to show tirelessly that they imply each other." (Page 191, 'What is literature," Jean Paul Sartre)

বাঙালি কবির ভাষা পৃথক কিন্তু আবেদনটি মূলগতভাবে একই রয়েছে বলে মনে হয়—

"ব্যক্তির স্বরূপে ডুবি, ডুবি শুরু সমষ্টির হাঁকে,
সাযুজ্যের ডাক শুনি উন্মোচিত উর্মিল গাজনে"

কবি অমিয় চক্রবর্তী এই আলোচনায় আদৌ প্রাসঙ্গিক কিনা সে প্রশ্নও অনেকে করেছেন। রবীন্দ্রপরবর্তী প্রধান পাঁচ কবির মধ্যে তিনি অন্যতম শুধু একারণে, তাঁকে এই আলোচনার শরিক করা আমাদের অভিপ্রেত নয়। কবি হিসেবে তিনি এক অত্যাশ্চর্য সূক্ষ্মতার পরিচয় দেন, সেটাও তাঁর সম্পর্কে দার্শনিক আলোচনায় প্রবৃত্ত হওয়ার কোনো কারণ বলে মনে করি না। যদিও একথা স্বীকার করতে বাধা নেই যে একমাত্র জীবনানন্দ দাশ ছাড়া রবীন্দ্র পরবর্তী প্রধান পাঁচ কবির মধ্যে তিনিই সাম্প্রতিক আধুনিকতার সবচেয়ে কাছের মানুষ।

তাঁর রচনায় খণ্ডচিত্রাবলীর বিন্যাসের অত্যাধুনিক প্রক্রিয়াই, তাঁকে সাম্প্রতিক মেজাজের সুপরিবাহী করে তুলেছে। অথচ প্রচলিত বিচারে ভারতীয় আনন্দবাদী দর্শনের প্রেক্ষিতে তাঁর কবিতার ব্যাখ্যা, এই খণ্ডিত অস্তিত্ব এবং খণ্ডসমবায়ী মুহূর্তের সমানুপাতিক বলে মনে হয় না। কবি অমিয় চক্রবর্তীর প্রাকরণিক আপাত সারল্যের ফলে অনেক সময় তাঁর গভীর ও জটিল বোধের মর্মে পৌঁছনো দুষ্কর হয়ে পড়ে। যেমন 'পারাপার' কাব্যের 'বৈদান্তিক' কবিতাটি শুধু বেদান্তের ব্যাখ্যায় বুঝতে চাওয়া, তাঁর সরল ভঙ্গীর প্রতি অতিরিক্ত বিশ্বাসপ্রবণ একটি শিশুসুলভ ভুল প্রয়াসে পর্যবসিত হতে বাধ্য। যে জঙ্গলের কল্পনা কবি করেছেন তাতে শুধু রূপকের গাছ, গাছের রূপক, "মিষ্টি ফল, তীক্ষ্ণ স্বাদ, ফুলের তীর"ই লুকোন নেই। তাঁর ভাষাতেই ঐ রূপকারণ্যের অন্ধকারে আরো জটিল ও ভয়াবহ অবচেতনের সাক্ষাৎ মেলে, পাশ্চাত্য মনস্তাত্ত্বিক ব্যাখ্যা ছাড়া যার স্বরূপটি উপলব্ধি করা অসম্ভব—

"ভিতরে কত আরো গভীরে জন্তু চলে, হলদে পথ,
তীব্র ঝরে জ্যোৎস্না-হিম বুক-চিরিয়ে,
কী প্রকাণ্ড মেঘের ঝড় বৃষ্টি সেই আরণ্যক—"

কবি জানেন যে এই সবই—"বেরিয়ে এলেই নেই।" কিন্তু থাকার এবং বেরিয়ে যাওয়ার প্রশ্নটি অমিয়বাবু যে ভাবে চিন্তাভাবনা করেছেন, তাকে শ্রীমদ্ভাগবদ্গীতার সেই দেহহীনতার বিখ্যাত শ্লোকটি দিয়ে ব্যাখ্যা করলে ভারতীয় সংস্কৃতিপ্রেমী কবিকে কিঞ্চিৎ বিদ্রূপপ্রবণ মনে হওয়াও আশ্চর্য নয়। কেননা 'বেরিয়ে এলেই নেই' ধুয়াপদটি দিয়ে কিন্তু কবিতাটি শেষ হয় না। বৈদান্তিক মনোভঙ্গীর অঙ্গীকারের বদলে কবিতাটিতে যেন বৈদান্তিক দৃষ্টির সহৃদয় সমালোচনা বা বৈদান্তিক হয়ে উঠতে কবির অপারগতাই বর্ণিত হয়েছে। সেই সঙ্গে মুক্তির অন্য কোনো পথের খোঁজও কবিতাটির শেষে আমরা দেখতে পাই—

"বুকের মধ্যে বাড়ি-যাবার
খুঁজে পাবার এখনো কোনো চিহ্ন নেই,
দৃষ্টি আছে।।"

কবির এই 'দৃষ্টি'কে অনুসরণ করেই আমরা হয়তো পৌঁছতে পারব তাঁর জীবন দর্শনের অন্তিম পরিণতির কাছাকাছি। 'খণ্ডতা' এবং পূর্ণতা'র মধ্যে কবি ভারতীয় আনন্দবাদী দর্শনের পূর্ণতার অভিলাষী হয়েও শেষ পর্যন্ত খণ্ড বহমান মুহূর্তগুলির মধ্যেই শান্তি পেয়েছেন বলে আমাদের মনে হয়েছে। খণ্ডিত অস্তিত্বের উপলব্ধি এবং আনন্দবাদী দর্শনের পরম বিলয়ের আকাঙ্ক্ষার বদলে, জীবনের অন্তিম খণ্ডীকরণ হিসেবে মৃত্যুর উপস্থিতি কবিকে প্রথমাবধি বিব্রত করেছে। দৈনিক, ব্যবহারিক জীবনের খণ্ডিত অস্তিত্বের বোধ এবং 'Limit Situation' হিসেবে মৃত্যুর নিয়ত উপস্থিতি অস্তিবাদী দর্শনের একটি বহু আলোচিত বিষয়। ব্যক্তিসত্তার প্রকৃত অস্তিত্ব তার খণ্ডিত মৌহূর্তিক অস্তিত্বগুলি দ্বারা বাধাপ্রাপ্ত হয়ে নিজেকে অপরের চোখে এমনকি নিজের চোখেও উপযোগী যান্ত্রিক উপস্থিতি হিসেবে পরিণত করে তোলে। যেমন লেখকের লেখকসত্তাটি আবৃত্ত করে দেয় তার অন্য সব পরিচয়। আবার প্রতিটি কর্মী মানুষের স্ব স্ব কর্মপন্থা তার ব্যক্তি অস্তিত্বের একমুখী ব্যাখ্যা হয়ে উঠে বাধা সৃষ্টি করে সত্তার সমগ্রতায়।

একে অপরকে সামগ্রিক অবিচ্ছিন্ন মানবসত্তা হিসেবে দেখতে না পেরে আমরা খণ্ডিত অস্তিত্বকেই আত্মপরিচয়ের সম্বল করে সৃষ্টি করি বিচ্ছিন্নতার বেড়াজাল। মার্ক্সীয় দর্শনে উৎপাদনের প্রক্রিয়ায় সরাসরি অংশগ্রহণের অভাবকেই বিচ্ছিন্নতার কারণ বলে দেখানো হয়। অপরদিকে অধিকাংশ অস্তিবাদী মনে করেছেন যে উৎপাদনের প্রক্রিয়ায় গৃহীত ভূমিকাটিই অন্য সব পরিচয়কে মুছে ফেলে ব্যক্তিমানুষের বিচ্ছিন্নতার মূল কারণ হয়ে দাঁড়ায়। সেই সঙ্গে প্রতিনিয়ত উপস্থিত মৃত্যুর 'Limit Situation' এক অনির্দিষ্ট গোপন কাঁটার মতো 'Fragmented Existence গুলির মধ্যে নিরন্তর বিঁধে থেকে অস্পষ্ট রক্তক্ষরণের সৃষ্টি করতে থাকে। মার্সেলের ১৯৩৩ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত 'The broken World" নাটকে আমরা এই খণ্ডিত অস্তিত্বের পরিচয় পেয়েছি। গ্যাব্রিয়েল মার্সেলের দর্শন আলোচনা প্রসঙ্গে কপলস্টোনের মন্তব্যটি এ প্রসঙ্গে স্মরণীয়—"Man is as it were, fragmented, now a churchgoer, now a clerk, now a family man : The individual is medically overhauled from time to time as though he were a machine; and death is written off as a total loss." (A History of Philosophy IX, page-331 F. Coppleston)

কবি অমিয় চক্রবর্তী 'পারাপার' কাব্যের 'সাবেকী' কবিতাটির শেষাংশে ব্যঙ্গচ্ছলে একই যন্ত্রণা উচ্চারিত হয়েছে—

"আমারা কাজেরই নিযুক্ত কেউ কেরানী কেউ অভুক্ত
লাঙল চালাই, কলম ঠেলি, যখন তখন শুনে ফেলি
রাম নাম সত্ হ্যায়
শুনব না আর যখন কানে বাজবে তবু এই এখানে
রাম নাম সত্ হ্যায়।।"

শুধু একটি দুটি কবিতার আংশিক উদ্ধৃতির ভিত্তিতে কবি অমিয় চক্রবর্তীকে জোর করে আধুনিক অস্তিবাদের পোশাকে সজ্জিত করা আমাদের অভিপ্রায় নয়। তিনি আধ্যাত্মিক ছিলেন আধ্যাত্মিকই থাকবেন। এই আলোচনা কোনোভাবেই তাঁর আধ্যাত্মিক জীবন ও কাব্য চর্যায় বাধা সৃষ্টির প্রয়াসী নয়। কিন্তু একথাও মাথায় রাখতে হবে যে অস্তিবাদকে জাঁ পল সার্ত্রের সমার্থক ভাবার বাঙালি জনজীবনের ভুল ধারণাটিরই এ প্রসঙ্গে অবসান হওয়া উচিত। সার্ত্র, মার্লোপন্তিদের মতো মার্ক্সীয় মনোভঙ্গিসম্পন্ন দার্শনিকের পাশাপাশি অস্তিবাদ মার্সেল, ব্যুবার, ইয়াসপার্স প্রমুখ বহু আধ্যাত্মিক দার্শনিকেরও আশ্রয়স্থল। কবি অমিয় চক্রবর্তীও তাই তাঁর মূল নিহিত আধ্যাত্মিক আদর্শের কোনো বিচ্যুতি না ঘটিয়েই হয়ে উঠতে পারেন অস্তিবাদী ব্যাখ্যা বা আলোচনার উৎস। তাতে আধ্যাত্মিকতা ও অস্তিবাদ উভয়েই লাভবান হয়ে উঠতে পারবে হয়তো। কাজেই প্রশ্ন অমিয়বাবুর আধ্যাত্মিকতার চরিত্র নিয়েই। ঐ আধ্যাত্মিক চরিত্রটির বিশ্লেষণেই অস্তিবাদী আলোচনার অবকাশ রয়েছে। অমিয়বাবু যে সত্তা, শূন্যতা এবং সক্রিয় মানব চৈতন্যের ব্যাপারে অবহিত ছিলেন তা সহজেই প্রমাণ করা যায়। অধুনালুপ্ত 'কবিতা পরিচয়' পত্রিকায় তাঁর 'বৃষ্টি' কবিতাটির ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে বিতর্কে জড়িয়ে পড়েন নরেশ গুহ, আবু সয়ীদ আইয়ুব এবং আর ও দু-একজন। আইয়ুবের ব্যাখ্যা নরেশ গুহর রচনার মাধ্যমেই

কবিকে আশ্বস্ত করেছিল বলে মনে হয়। কবি নিজেই এ প্রসঙ্গের আলোচনায় অংশ নিয়েছিলেন। তাঁর লেখায় অবশ্য ব্যাখ্যাটি আরও হৃদয়গ্রাহী হয়ে উঠেছিলো। সেখানে অমিয়বাবু লিখেছিলেন, "মৃত্তিকার সত্তা'কে 'স্মৃতিহীনা' বলা হয়েছে কেননা স্মৃতির শুরু চৈতন্যে : অর্থাৎ মানুষের চৈতন্যে। যাকে বলা হয় প্রকৃতি তাতে সেই বোধের প্রমাণ নেই যদিও প্রসঙ্গ আছে, না হলে মানুষ ভিজে আকাশ, বর্ষার মাঠে তার বেদনা নিয়ে দাঁড়াত না।" (পৃষ্ঠা ১৫৫, 'কবিতা পরিচয়' সংকলন গ্রন্থ, পরিবর্ধিত দ্বিতীয় সংস্করণ)

আলোচ্য পংক্তিগুলি প্রাসঙ্গিক বিবেচিত হতে পারে বলেই উদ্ধার করা যায় না হলে বিশ্ববিদ্যালয় পাঠক্রমের সুবাদে কবিতাটি সাহিত্যের ছাত্র ও অধ্যাপকদের কাছে অতিপরিচিত—

"সেই সৃষ্টিক্ষণ
স্রোতঃস্বনা
মৃত্তিকার সত্ত্বা স্মৃতিহীনা
প্রশস্ত প্রাচীন নামে নিবিড় সন্ধ্যায়
এক আর্দ্র চৈতন্যের স্তব্ধ তটে।"

লক্ষ করতে হবে যে স্রোতঃস্বনা সৃষ্টিক্ষণটি কিন্তু 'এক আর্দ্র চৈতন্যের স্তব্ধ তটে'ই সৃষ্টি হচ্ছে। একদিকে এই পংক্তিগুলি যেমন সক্রিয় মানবচৈতন্যের সৃষ্টির প্রতীক হয়ে উঠেছে অন্যদিকে অমিয়বাবুর ব্যাখ্যায় আমরা বীজাকারে তাঁর পরবর্তী আধ্যাত্মিকতার খোঁজটিও দেখতে পাই, পরবর্তীকালে কোনো পূর্ণতাসন্ধানী দার্শনিক আনন্দবাদে না গিয়ে কবি নিজস্ব বেদনা নিয়ে 'ভিজে আকাশ' বা 'বর্ষার মাঠে' গিয়েই দাঁড়িয়েছেন। এই বিশেষ জীবনদৃষ্টি ভঙ্গীটিরও অবশ্য একটা সুপ্রাচীন ঐতিহ্য এবং অনুশীলন দূরপ্রাচ্যে ছিল তা তুলনামূলক ধর্মের গবেষক এবং সুপণ্ডিত অমিয়বাবু অবশ্যই জানতেন, এবং শুধু কবিতার আঙ্গিক এবং উপলব্ধিতেই নয় এমনকি নামকরণেও সেই ঋণ তিনি স্বীকার করতে কুণ্ঠিত হন নি। অধ্যাপিকা সুমিতা চক্রবর্তী অমিয় চক্রবর্তীর কবিরা দার্শনিক দিকের আলোচনাকালে অবশ্য এ ব্যাপারটি খেয়ালই করেন নি আর শ্রীমতী ত্রিপাঠী দুএক লাইনের স্বল্প পরিসরে দায়সারাভাবে উল্লেখ করে সরে এসেছেন এমনভাবে, যে না ওই স্বল্প আলোচনায় উদ্ভাসিত হতে পেরেছে ঐ ধর্মীয় দর্শনটি আবার কবির প্রত্যয়টিও রয়ে গিয়েছে উপেক্ষিতই। চীনে উদ্ভূত এবং অধুনা জাপানে অনুশীলিত Zen দর্শনের প্রভাব অমিয় চক্রবর্তীর শেষ দিকের রচনায় যে প্রচুর পরিমাণেই রয়েছে তা দিবালোকের মতো স্পষ্ট। 'পালা-বদল' কাব্যের নামকরণটিও কবির দার্শনিক মত-পরিবর্তনের ইঙ্গিতবাহী মনে হয়। ঐ কাব্যের একটি কবিতার নামই শুধু-'Zen ধরনে' নয়, পরবর্তী বহু কবিতায় Zen বৌদ্ধমতের প্রতিফলন দেখতে পাওয়া যায়। Zen প্রভাবিত জাপানী 'হাইকু' কবিতাকে অমিয়বাবু প্রায়শই প্রাকরণিক এবং আধ্যাত্মিক অর্থেই অনুসরণ করেছেন। যদিও হাইকুর প্রাকরণিক বিশেষত্ব তার আধ্যাত্মিক দর্শনের নিরিখেই বিবেচিত হওয়া উচিত। 'হাইকু' ধরনের কবিতা অমিয় চক্রবর্তীর সংগতকারণেই উদ্দিষ্ট ছিল না বরং প্রকৃত Zen প্রভাবিত হাইকুই তিনি রচনা করেছেন অনেক। Zen শব্দটির বাংলা

বর্ণীকরণে প্রকৃত উচ্চারণটি অসম্ভব বিবেচনা করেই, কবি হয়তো ইংরিজিতে শব্দটি ব্যবহার করেছেন বাংলা কবিতার মধ্যেও। আমরা অবশ্য সবসময় কবি প্রদর্শিত পথ এই আলোচনায় অনুসরণ করতে পারব না। এই প্রাকরণিক অসুবিধেটি ছাড়াও মনে রাখতে হবে যে জেন বৌদ্ধমতটি আলোচনায় পরিস্ফুট করা কঠিন। এটিকে মত বলে উল্লেখ করতেই অধিকাংশ জেন সন্ন্যাসী রাজি হবেন বলে মনে হয় না। তবু স্বল্প সাধ্যের মধ্যে অমিয় চক্রবর্তীর কাব্যে জেন চিহ্নগুলি এবং আধুনিক পাশ্চাত্য দর্শনের মধ্যে অস্তিবাদ ও জেন মতের সমধর্মী প্রবণতাগুলির উল্লেখ না করলে বাংলা কাব্য-আলোচনায় একটি অসম্পূর্ণতা রয়েই যাবে বলে এই 'অসাধু' প্রয়াস। প্রকৃত 'Zen' চিন্তক এই ঔদ্ধত্য ক্ষমা করতে পারবেন বলেও মনে হয়। Zen নামাঙ্কিত কবিতাটি সম্পূর্ণ উদ্ধার না করতে পারলে এ আলোচনা অসম্ভব বিবেচনা করেই কবিতাটির সমগ্রতা অক্ষুণ্ণ রাখা হল—

Zen ধরনে
(কোয়ান্)
প্রিমিপ্রিমি ঢেউ বুঝি সমে থামে
আগমের উপছানো গতি নামে—
চাঁদ ডোবা অরণ্য ইশারা,
তারা স্তিমিতের তীরে ধারা।
কত জল পার হল বহনের বেলা সেই—
ফেরিঘাট, হাট, লেনদেন;
কুহু ডাক, খরতরী, মেঘ লাগা, কিছু নেই—
স্রোতহীন নদীহীন Zen।।

(সাটোরি)
জন্মনীল চোখে দেখা
কালোর কাজল কচি ছায়া চোখে দেখা
শুধু তাই—
শুধু অবাকের দেখা
শুধু ঝুঁকে থাকা দেখা
কাঠ খড় বেড়াল বা জল—
যেখানেই দেখা,—দ্যাখে;
যেখানেই ছোঁয়—সব ছোঁয়;
তাই এত খুশি।
একেবারে।।

আপাত সরল-সহজ কবিতাটি 'কোয়ান্' এবং 'সাটোরি' দুটি শব্দের প্রয়োগে জটিল হয়ে গেছে বলে মনে হয়। আসলে এই দুটি শব্দই কবিতাটির জাদুশব্দ বা চাবিকাঠি। ইংরিজিতে যাকে 'Key words' বলা হয়। যদিও লোককথা অনুসারে ভারতীয় প্রচারক বৌদ্ধ সন্ন্যাসী

বোধিধর্ম চীনে Cha'n বলে যে ধর্মীয় অনুশীলন চালু করেন তাই আধুনিক জাপানে Zen বৌদ্ধমত হিসেবে পরিচিত, তবু বোধিধর্মের উপাখ্যানটি যেমন মতটির উৎসসংক্রান্ত ধোঁয়াশা কাটাতে পারে নি তেমনই 'ধ্যান' বা 'Cha'n' বা 'Zen' একই শব্দের বিভিন্ন রূপ হলেও, 'Zen' অনুশীলনের ক্ষেত্রে ধ্যানই শেষ কথা নয়। 'ধ্যান'কেন্দ্রিক অনুশীলনের পাশাপাশি 'কোয়ান্' এবং 'সাতোরি' প্রচলিত Zen অনুশীলনের একটি মাধ্যম। খেয়াল রাখতে হবে যে Zen মতের সব গোষ্ঠীই কিন্তু 'কোয়ান্' এবং 'সাতোরি'র পৃষ্ঠপোষক নয়। 'সোতো' গোষ্ঠীর জেন অনুশীলন ধ্যানকেন্দ্রিকই রয়ে গেছে। জাপানে সাম্প্রতিককালের একমাত্র 'রিনাজি' গোষ্ঠীর জেন অনুশীলনেই 'কোয়ান্' এবং 'সাতোরি' প্রথা বর্তমান, যদিও প্রাচীনকালে এই প্রথা আরও ব্যাপক ছিল বলেই মনে হয়। শব্দদুটির সহজ ব্যাখ্যা কিন্তু সম্ভব নয়। সাতোরিকে শ্রীমতী ত্রিপাঠী 'বুদ্ধত্ব' বলে ব্যাখ্যা করেছেন। কিন্তু 'সোতো' বা Zen ছাড়াও অন্য যে কোনো বৌদ্ধ ধর্মীয় গোষ্ঠীরই কাম্য তো বুদ্ধত্ব। সেক্ষেত্রে 'সাতোরি'র স্বতন্ত্রতা কোথায়? ধাপে ধাপে সৎকর্ম বা চিন্তাদির মাধ্যমে 'সাতোরি'র বুদ্ধত্বে পৌঁছানো যায় না। সাতোরি এক আকস্মিক উপলব্ধির ফল বা সাতোরিই এক আকস্মিক উপলব্ধি। ক্ষণিক উদ্ভাসে অকস্মাৎ প্রতিটি ব্যক্তিই তাঁর নিজস্ব বুদ্ধত্বকে উপলব্ধি করে মাত্র। যা নিজের মধ্যেই সুপ্ত তাকে পাওয়ার জন্যে সচেষ্ট হওয়া আসলে ছায়াকে গ্রেপ্তার করার মতোই অসাধ্য ও পণ্ডশ্রম, তাই বুদ্ধত্ব প্রাপ্তির বদলে বুদ্ধত্বের আকস্মিক জাগরণকেই সাতোরি বলা যেতে পারে। আধ্যাত্মিক অস্তিবাদী সোরেন কিয়ের্কেগার্ডের রচনায় এ ধরনের আকস্মিক উল্লম্ফন বা জাগরণসম্ভাবনার কথা বলা হয়েছে। Zen মতের সাতোরিকে যথার্থই কিয়ের্কেগার্ডের জাগরণের সঙ্গে তুলনা করেছেন হামফ্রেইস—

"We in the west are growing used to kierkegaard and his 'existential leap' and it is but the jump of Zen...we can speak of the approach and the results of satori, but seldom with profit of its nature. But we can, try." (Page–149-150, 'Zen Buddhism' Christmas Humphreys)

'সাতোরি' বা এই আকস্মিক ক্ষণিক বুদ্ধত্বের মুহূর্তটি উদ্ভাসিত হয়ে উঠতে পারে 'কোয়ান্'-এর মাধ্যমেই বলে চীনের লিন্ চি বা জাপানের রিনাজি গোষ্ঠীর জেনধর্মাবলম্বীরা মনে করেন। 'কোয়ান্' এমন কিছু Zen সমস্যা যা শিক্ষার্থীর কাছে রাখা হয় তার সন্দেহ, অবিশ্বাস এবং সেই সঙ্গে 'সাতোরি'র জন্যে তীব্র আকাঙ্ক্ষাকে বাড়িয়ে তোলার জন্যে। প্রচলিত 'কোয়ান্' গুলি রিনাজি গোষ্ঠী বাইরে প্রকাশিত হতে দেন না, কারণ তাতে শিক্ষার্থীরা সমাধান নিজে খুঁজে বের না করে জানা উত্তর দিয়ে পার পেয়ে যেতে পারে। কবি অমিয় চক্রবর্তীর 'কোয়ান্'টি অবশ্য প্রকৃতি থেকে তিনি নিজেই গঠন করে নিয়েছেন। প্রকৃতিই Zen মতের শ্রেষ্ঠ শিক্ষক তাতে সন্দেহ নেই। প্রকৃতিতেই রয়েছে সমস্ত জেন প্রশ্নাবলীর উৎস এবং তার সম্ভাব্য উত্তর। 'কোয়ান্'কে সমস্যা এবং 'সাতোরি'কে সমাধান বলে ধরে নিতে হবে প্রতিটি 'কোয়ান্' থেকেই আকস্মিক 'সাতোরি'র আবির্ভাব হয়। ফলে চরম বুদ্ধত্ব বলে জেন মতে কিছুই নেই। প্রতিটি মুহূর্তই সমস্যা ও সংকটের, আবার প্রতিক্ষণেই রয়েছে

সাতোরির আকস্মিক সম্ভাবনা। কোয়ান্-এর মাধ্যমে জেন শিক্ষার্থীর মনে যে শূন্যতা ও সংকটের উদ্ভব হয় তার চমৎকার ব্যাখ্যা করেছেন Alan. W. Watts—"He just knows nothing, the whole world, including himself, is an enormous mass of pure doubt. Everything he hears, touches or seees is as incomprehensible as 'nothing'. (Page 165-66, 'The way of Zen' Alan. W. Watts)

কবি অমিয় চক্রবর্তীর কোয়ান্টির শেষেও এই শূন্যতার অভিব্যক্তি আমরা টের পাই—

"কই ছায়া, নেই ঘূর্ণি, জল নেই

....

কুহু ডাক, খরতরী, মেঘ লাগা, কিছু নেই

স্রোতহীন নদীহীন Zen।।"

'কোয়ান্'-এর এই শূন্যতা ভরে ওঠে 'সাতোরি'র ক্ষণিক জাগরণে। বৌদ্ধ 'কেগোন' গোষ্ঠীর চিন্তায় 'রি'-কে বলা হয়েছে 'শূন্যতা' বা 'Plenum Void এবং 'জি' হল 'রূপম্' বা আকার। শূন্যতা থেকেই সত্তা আকার গ্রহণ করে। 'জি' এবং 'রি' এক অবিভাজ্য ঐক্যে গ্রথিত। তথতা হল শূন্যতা ও রূপের ক্রমান্বয়ী সমাপতন মাত্র।

কোয়ান্-এর মাধ্যমে সাতোরিতে উদ্ভাসকে তাই 'inauthentic existence' থেকে 'Authentic Existence'-এ উত্তরণ মনে হওয়া অসম্ভব নয়। 'শূন্যতা' 'রূপম্' ও 'তথতা'-কে মনে হতেই পারে 'Nothingness' 'Existence' এবং 'Being'। বৌদ্ধমতের সঙ্গে আধুনিক অস্তিবাদের এই সমধর্ম নজর এড়ায় নি প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য তাত্ত্বিকদের সঙ্গতকারণেই জাপানী গবেষক ইয়োশেনোরি তাকেউচি 'Buddhism And Existentialism : The dialogue between oriental and occidental thought.' নামের প্রবন্ধে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন বিষয়টির। অস্তিবাদী দর্শনবিশেষজ্ঞ অধ্যাপক ম্যাকোয়ারিও লক্ষ করেছেন এই সাযুজ্য। তাঁর ভাষায় "One can scarcely read the books of D. T. Suzuki, for instance, without becoming impressed with the many similarites between his version of zen Buddhism and the teachings of existentialism." (Page–43, Existentialism, John Macquarrie)

অমিয় চক্রবর্তীর 'সাতোরি' মৌহূর্তিক দেখার আস্তিক্যে সরিয়ে দিয়েছে পূর্ববর্তী 'কোয়ান্'টির নাস্তিক্যের সংকট। প্রতিটি দেখাকেই যাঁর মিথ্যে বলে মনে হচ্ছিল, শুধু দেখাতেই তিনি খুঁজে পেয়েছেন বাঁচবার সার্থকতা, কবি সুখী বা আনন্দিত নন—শুধু খুশি, এই তুচ্ছ খুশিটুকুই তাঁর দর্শন। মৌহূর্তিক সাতোরি হিসেবে মুহূর্তই তাঁর অনিষ্ট। এই বিচ্ছিন্ন মুহূর্তের উপাসক অমিয় চক্রবর্তী তাঁর 'ইতিহাস' কবিতাটিতে এক খণ্ডমুহূর্তের সমবায়ী কালচেতনার আবিষ্কার করলেন, যা পূর্ববর্তী কবিদের 'প্রবাহিত সময়ের ধারার' প্রচলিত বিশ্বাস থেকে সম্পূর্ণ পৃথক। ইতিহাসের এই ব্যক্তিগত মৌহূর্তিক ব্যাখ্যাই তাঁকে আধুনিক কবিপ্রজন্মের নিকটাত্মীয় করেছে। শুধু Zen দর্শনেই নয়, একেবারে সাম্প্রতিক পদার্থবিদ্-লেখক Julian Barbour তাঁর 'The End of Time' গ্রন্থে লেখেন—"Our brains may tell us otherwise, we have memories. we feel we have a past, we see motion, we have an unshakable

sense that time is ticking by constantly but this a huge deception." (quoted from 'The Statesman' 2 October 1999) তাঁর 'ইতিহাস' কবিতায় পরিবর্তমান মুহূর্তের কবি অমিয় চক্রবর্তী আমাদের জানিয়েছিলেন—'ঘড়িটা আসলে মৃত, ভুলেছে সময়'।

Zen প্রভাবিত হাইকু সার্থকভাবেই লিখেছেন অমিয় চক্রবর্তী। 'ঘরে ফেরার দিন' কাব্যের 'চলতি' কবিতার 'গ্রামে ফিরে' নামাঙ্কিত অংশটি একটি অপূর্ব উদাহরণ। ক্ষুদ্রে অনন্তের আভাস পাওয়া রাবীন্দ্রিক চেতনা থেকে বেরিয়ে গিয়ে তিনি আমাদের দেখালেন যে ক্ষুদ্রই অন্তত—

"জগৎযাত্রী গাছের তলায় বসে
চেয়ে দেখে মাছ ছোটো পুকুরের জলে
সারা ভুবনের ভ্রমণের মন নিয়ে।।"

'Shobogenzo' থেকে তুলনীয় অপূর্ব পংক্তিটি উদ্ধার করা যায় Alan. W. Watts-এর 'The way of zen' বইটি থেকে—

"when a fish swims, he swims on and on, and there is no end to the water."

জেন-হাইকুর প্রভাব 'চলতি' কবিতার সর্বত্রই ছড়িয়ে রয়েছে। 'একবার' নামাঙ্কিত অংশটি—

"আর্দ্র শুক্ল রং
পারুল পুষ্পিত পথে শাদা প্রজাপতি
চলেছে একটি শুভ্র মুহূর্ত নেশায়,
ফেরার সময় নেই।।"

আক্ষরিক না হলেও 'ফেরার সময় নেই' ভাবটি একই ভাবে খসে পড়া ফুলের মাধ্যমে প্রকাশ করেছেন 'মোরিতাকে' একটি হাইকুতে। পার্থক্য শুধু এই যে অমিয়বাবুর কাছে প্রজাপতিটি ফুলেরই সমানুপাতিক আর 'মোরিতাকে' ফুলটিকেই প্রজাপতির মতো হারিয়ে যেতে দেখেছেন—

"A fallen flower
Returning to the branch?
It was a butterfly."

অমিয় চক্রবর্তী কবিতার মুহূর্তগুলি আসলে মুহূর্তেরই কাব্যরূপ। কবিতা-র মুহূর্ত আর জীবনের মুহূর্ত এক হয়ে যা সৃষ্টি করেছে, কবির ক্ষণিক উপলব্ধির সেই ফসল, ঝরে যায় কিন্তু রয়ে যায়; যা পেয়েছেন তাকেই পাওনা বলে শুধু তিনি স্বীকারই করেন নি, পাওনার অতিরিক্ত কোনো আধ্যাত্মিক সত্যের সুদ অমিয় চক্রবর্তী দাবি করেন নি জীবন থেকে। এই তাঁর জীবন, এই তাঁর দর্শন, এই-ই তাঁর সংবিৎ। সংবিৎ বা সাতোরি যাই বলা যাক না তাকে—

"বেঁচে থাকার সত্যি
—একরত্তি।
প্রাণের চেয়ে বেশি সেই প্রাণ।।"

ক্রোড়পত্র

ত্রিবেণী সংগম

অন্নদাশঙ্কর রায়

আমি যখন ১৯৩৫-৩৬ সালে কুষ্টিয়ার মহকুমা হাকিম ছিলুম তখন একদিন ট্রেনে একই কামরায় ভ্রমণ করি সেকালের বিখ্যাত শিক্ষাবিদ কবীরুদ্দীন সাহেবের সঙ্গে। তিনি বলেন, 'বুলবুল পত্রিকায় হিন্দু-মুসলমান সম্বন্ধে আপনি যা লিখেছেন, আমি পড়েছি। আপনার মতে হিন্দু-মুসলমানের মিলন হতে আরও পাঁচশো বছর লাগবে। সত্যিই কি এতদিন লাগবে? চলুন আমার সঙ্গে আমার বাড়িতে। আমার নতুন বাড়ি তিন রকম ধারায় তৈরি হয়েছে। একটা প্রাচীন ভারতীয় হিন্দু ধারা, একটা মধ্যযুগের মুসলমান ধারা, আর একটা আধুনিক যুগের পাশ্চাত্য ধারা। এই তিনটি ধারার ত্রিবেণী সংগম আমাদের আদর্শ।'

তিনি তাঁর পুত্রদের নামকরণ করেছিলেন হুমায়ুন কবীর, জাহাঙ্গির কবীর, শাজাহান কবীর ও আলমগীর কবীর। দেশ যখন ভাগ হয়ে যায় তখন তিনি ছিলেন না। তখন তাঁর পরিবারও দু-ভাগ হয়ে যায়। হুমায়ুন কবীর ও জাহাঙ্গির কবীর থেকে যান স্বাধীন ভারতে। শাজাহান কবীর ও আলমগির কবীর চলে যান পাকিস্তানে। হিন্দু-মুসলমানের মিলন তো দূরের কথা, কবীর পরিবারে মিলনও বজায় থাকল না।

তবে তাঁর যা আদর্শ সেটাই ছিল ঠিক আদর্শ। একদিন না একদিন সকলে সেটা স্বীকার করবেন। তিনটি ধারার ত্রিবেণী সংগমই আমাদের ভবিষ্যৎ নির্ণয় করবে। তার জন্য কে জানে কত কাল লাগবে। পাঁচশো বছরও লাগতে পারে। এখন এক ভাইয়ের বিপদে আর এক ভাই ছুটে যেতে বা ছুটে আসতে পারে না—পাসপোর্ট লাগে, ভিসা লাগে।

ভারতে যেমন হিন্দু মুসলমান, ইউরোপে তেমনই ক্যাথলিক প্রটেস্টান্ট। ইউরোপেও সাম্প্রদায়িক কারণে দেশ ভাগ হয়ে যায়, ঝগড়া বেধে যায়। তার থেকে আসে যুদ্ধ-বিগ্রহ, পাসপোর্ট-ভিসা ইত্যাদি। এখন দেখা যাচ্ছে লোকে চায় সব দল মিলিয়ে ইউরোপের জন্য একটা ইউনিয়ন। সবচেয়ে প্রবল দুই শত্রু ফ্রান্স ও জার্মানি এখন ইউনিয়ন গঠনের জন্য সবচেয়ে তৎপর। একটা ইউনিয়ন গঠন করলে পর সকলের অর্থনৈতিক লাভ হবে। ইউনিয়নে যোগদান করার জন্য একদা কমিউনিস্ট শাসিত দেশগুলিও প্রার্থী হয়েছে। তুরস্ক তো মুসলমানদের দেশ। তার বেশির ভাগ অংশ ইউরোপের বাইরে এশিয়াতে অবস্থিত। দু-একটা বিষয়ে তুরস্কের রাজধানী এখনও ইউরোপে আছে। সেই সুবাদে তুরস্ক ইউরোপীয় ইউনিয়নের সদস্য হতে বিশেষ ব্যাকুল। সাম্প্রদায়িক রাজনীতি তারা ত্যাগ করেছে। তুরস্ক এখন একটি ধর্ম-নিরপেক্ষ দেশ। এই নিয়ে অনেকদিন ধরে একটা বিতর্কের পর এখন একটা আপস হয়েছে। এ যদি হয় ইউরোপের অবস্থা, তবে ভারত পাকিস্তান বাংলাদেশ নেপাল ভুটান মালদ্বীপ শ্রীলঙ্কা এই সাতটি দেশ মিলে একটি ইউনিয়ন গঠন করতে পারবে না কেন?

অর্থনীতি একদিন রাজনীতিকে নিয়ন্ত্রণ করবে। সেই সুদিন যখন আসবে তখন বাংলাদেশের প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমানের পরিকল্পনা কার্যকর হবে। আমরা কলকাতায় বসে পেশোয়ারের আঙুর আর সিলেটের কমলালেবু খেতে পারব। তেমনই ওরাও এখান থেকে ভোগ্যসামগ্রী সংগ্রহ করতে পারবে। আশা করি এই সুদিন অবিলম্বে আসবে। তা নইলে পেশোয়ারের আঙুর ও সিলেটের কমলালেবু ক্রেতার অভাবে পচে যাবে।

পার্টিশনের আগে আমি যখন ময়মনসিংহে গেলুম তখন আমার জন্য পেশোয়ার থেকে আঙুর, মোনাকা, পেস্তাবাদাম আসত ডাকের পার্সেল-এ। পার্টিশনের ফলে এখন আর সে রকম সুযোগ আমি পাইনে। সেই সুযোগ আবার আমি পেতে চাই। আজকের দিনে ধর্মের চেয়ে অর্থ আরও প্রভাবশালী। অর্থনীতি চায় এক প্রকার ইউনিয়ন যেমন ইউরোপে তেমনই ভারতীয় উপ-মহাদেশে। এটা একদিন-না-একদিন সম্ভব হবে। ধৈর্য ধরতে হবে। আমরা হয়তো দেখে যেতে পারব না, কিন্তু আমাদের সন্তান-সন্ততিরা দেখে যেতে পারবে।

পরিচয়-এ প্রকাশিত অন্নদাশঙ্কর রায়-এর শেষ লেখা। শারদীয় ১৪০৮।

ইলা মিত্রের
জবানবন্দি

কেসটির ব্যাপারে আমি কিছুই জানি না।

বিগত ৭-১-৫০ তারিখে আমি রোহনপুরে গ্রেফতার হই এবং পরদিন আমাকে নাচোলে নিয়ে যাওয়া হয়। যাওয়ার পথে পুলিশ আমাকে মারধোর করে এবং তারপর আমাকে একটা সেলের মধ্যে নিয়ে যাওয়া হয়। হত্যাকাণ্ড সম্পর্কে সব কিছু স্বীকার না করলে আমাকে উলঙ্গ করে দেওয়া হবে এই বলে এস. আই. আমাকে হুমকি দেখায়। আমার যেহেতু বলার মতো কিছু ছিল না, কাজেই তারা আমার সমস্ত কাপড়-চোপড় খুলে নেয় এবং সম্পূর্ণ উলঙ্গভাবে সেলের মধ্যে আমাকে বন্দি করে রাখে। আমাকে কোন খাবার দেওয়া হয়নি, একবিন্দু জল পর্যন্ত না। সেদিন সন্ধ্যে বেলাতে এস. আই-এর উপস্থিতিতে সেপাইরা তাদের বন্দুকের বাঁট দিয়ে আমার মাথায় আঘাত করতে শুরু করে। সেসময়ে আমার নাক দিয়ে প্রচুর রক্ত পড়তে থাকে। এরপর আমার কাপড়-চোপড় আমাকে ফেরৎ দেওয়া হয় এবং রাত্রি প্রায় ১২টার সময় সেল থেকে আমাকে বের করে সম্ভবত এস. আই-এর কোয়ার্টারে নিয়ে যাওয়া হয়, তবে এ ব্যাপারে আমি খুব নিশ্চিন্ত ছিলাম না।

যে কামরাটিতে আমায় নিয়ে যাওয়া হ'ল সেখানে স্বীকারোক্তি আদায়ের জন্য তারা নানারকম অমানুষিক পদ্ধতিতে চেষ্টা চালালো। দুটো লাঠির মধ্যে আমার পা দুটি ঢুকিয়ে চাপ দেওয়া হচ্ছিল এবং সে সময়ে চারিধারে যারা দাঁড়িয়ে ছিল তারা বলেছিলো যে আমাকে "পাকিস্তানী ইনজেকশন" দেওয়া হচ্ছে। এই নির্যাতন চলার সময়ে তারা একটা রুমাল দিয়ে আমার মুখ বেঁধে দিয়েছিলো। জোর করে আমাকে কিছু বলাতে না পেরে আমার চুলও উপরে তুলে ফেলেছিলো। সিপাইরা আমাকে ধরাধরি করে সেলে ফিরিয়ে নিয়ে গেলো কারণ সেই নির্যাতনের পর আমার পক্ষে আর হাঁটা সম্ভব ছিলো না।

সেলের মধ্যে আবার এস. আই সেপাইদেরকে চারটে গরম সেদ্ধ ডিম আনার হুকুম দিলো এবং বললো, "এবার সে কথা বলবে"। তারপর চার-পাঁচজন সেপাই আমাকে জোরপুর্বক ধরে চীৎ করে শুইয়ে রাখলো এবং একজন আমার যৌন অঙ্গের মধ্যে একটা গরম সিদ্ধ ডিম ঢুকিয়ে দিলো। আমার মনে হচ্ছিল আমি যেন আগুনে পুড়ে যাচ্ছিলাম। এরপর আমি অজ্ঞান হয়ে পড়ি। ৯-১-৫০ তারিখে সকালে যখন আমার পেটে লাথি মারতে জ্ঞান হলো তখন উপরোক্ত এস. আই এবং কয়েকজন সেপাই আমার সেলে এসে তাদের বুটে করে আমার পেটে লাথি মারতে শুরু করলো। এরপর ডান পায়ের গোড়ালীতে একটা পেরেক ফুটিয়ে দেওয়া হলো। সে সময় আধা অচেতন অবস্থায় পড়ে থেকে আমি এস. আইকে বিড়বিড় করে বলতে শুনলাম : আমরা আবার রাত্রিতে আসছি এবং তুমি যদি স্বীকার না করো তাহলে সিপাইরা একে একে তোমাকে ধর্ষণ করবে। গভীর রাত্রিতে এস.

আই. এবং সিপাইরা ফিরে এলো এবং তারা আবার সেই হুমকি দিলো। কিন্তু আমি যেহেতু তখনো কিছু বলতে রাজী হলাম না তখন তিন-চারজন আমাকে ধরে রাখলো এবং একজন সেপাই সত্যি সত্যি আমাকে ধর্ষণ করতে শুরু করলো। এর অল্পক্ষণ পরই আমি অজ্ঞান হয়ে পড়লাম।

পরদিন ১০-১-৫০ তারিখে যখন জ্ঞান ফিরে এলো তখন আমি দেখলাম যে আমার দেহ থেকে দারুণভাবে রক্ত ঝরছে, আর আমার কাপড়-চোপড় রক্তে সম্পূর্ণভাবে ভিজে গেছে। সেই অবস্থাতেই আমাকে নাচোল থেকে নবাবগঞ্জ নিয়ে যাওয়া হ'ল। নবাবগঞ্জ জেলে গেটের সিপাইরা জোর ঘুঁষি মেরে আমাকে অভ্যর্থনা জানালো।

সে সময় আমি একেবারে শয্যাশায়ী অবস্থায় ছিলাম। কাজেই কোর্ট ইন্সপেক্টর এবং কয়েকজন সিপাই আমাকে একটি সেলের মধ্যে বহন করে নিয়ে গেলো। তখনো আমার রক্তপাত হচ্ছিল এবং খুব বেশী জ্বর ছিলো। সম্ভবত নবাবগঞ্জ সরকারী হাসপাতালের একজন ডাক্তার সেই সময় আমার জ্বর দেখেছিলেন ১০৫ ডিগ্রি। যখন তিনি আমার কাছে আমার দারুণ রক্তপাতের কথা শুনলেন তখন তিনি আমাকে আশ্বাস দিলেন যে একজন মহিলা নার্সের সাহায্যে আমার চিকিৎসা করা হবে। আমাকে কিছু ওষুধ এবং কয়েক টুকরো কম্বলও দেওয়া হলো।

১১-১-৫০ তারিখে সরকারী হাসপাতালের নার্স আমাকে পরীক্ষা করলেন। তিনি আমার অবস্থা সম্পর্কে কি রিপোর্ট দিয়েছিলেন সেটা জানিনা। তিনি আসার পর আমার পরনে যে রক্তমাখা কাপড় ছিল সেটা পরিবর্তন করে একটা পরিষ্কার কাপড় দেওয়া হলো। এই পুরো সময়টা আমি নবাবগঞ্জ জেলের একটি সেলে একজন ডাক্তারের চিকিৎসাধীন ছিলাম। আমার শরীরে খুব বেশী জ্বর ছিল, তখন আমার দারুণ রক্তপাত হচ্ছিল এবং মাঝে মাঝে আমি অজ্ঞান হয়ে যাচ্ছিলাম।

১৬-১-৫০ তারিখে সন্ধ্যাবেলায় আমার সেলে একটা স্ট্রেচার নিয়ে আসা হল এবং আমাকে বলা হল যে পরীক্ষার জন্যে আমাকে অন্য জায়গায় যেতে হবে। খুব বেশি শরীর খারাপ থাকার জন্যে আমার নড়াচড়া সম্ভব নয় একথা বলায় লাঠি দিয়ে আমাকে একটা বাড়ি মারা হল এবং স্ট্রেচারে উঠতে আমি বাধ্য হলাম। এরপর আমাকে অন্য এক বাড়ীতে নিয়ে যাওয়া হ'ল। আমি সেখানে কিছুই বলিনি, কিন্তু সেপাইরা জোর করে একটা সাদা কাগজে সই আদায় করল। তখন আমি আধা সচেতন অবস্থায় খুব বেশী জ্বরের মধ্যে ছিলাম। যেহেতু আমার অবস্থা ক্রমাগত খারাপের দিকে যাচ্ছিল সে জন্যে পরদিন আমাকে নবাবগঞ্জ সরকারী হাসপাতালে পাঠানো হল। এরপর যখন আমার শরীরের অবস্থা আরও সংকটাপন্ন হল তখন আমাকে ২১-১-৫০ তারিখে নবাবগঞ্জ থেকে রাজশাহী কেন্দ্রীয় কারাগারে নিয়ে এসে সেখানে জেল হাসপাতালে ভর্তি করে দেওয়া হল। কোন অবস্থাতেই আমি পুলিশকে কিছু বলিনি এবং উপরে যা বলেছি তার বেশি আমার আর বলার কিছু নেই।

(রাজশাহী কোর্ট, ১৯৫৪ জুলাই)

কেন বোন পারুল ডাকো রে

সুভাষ মুখোপাধ্যায়

অন্ধকার পিছিয়ে যায়
দেয়াল ভাঙ্গে বাধার
সাতটি ভাই পাহারা দেয়
পারুল, বোন আমার
দেখি তো কে তোমার পায়
বেড়ি পরায় আবার।

শুয়ে শুয়ে দিন গুনছে
    পারুল বোন আমার
সোনার ধানের সিংহাসনে
    কবে বসবে রাখাল
কবে সুখের বান ডাকবে,
    কবে হবে সকাল।

শিয়রে জেগে সাতটি ভাই
মৃত্যুকে আজ তাড়ায়
ফুটবে ফুল লক্ষ আশার
জীবন হাত বাড়ায়
শিকলে বাঁধে স্পর্ধা কার?
পারুল বোন আমার।

কঁকিয়ে ওঠা যন্ত্রণা নীল
    আগুনে যাক পুড়ে
বাতাসে সব দুঃস্বপ্ন
    আকাশে যাক উড়ে
শুয়ে শুয়ে দিন গুণছে, পারুল বোন আমার।।

ঢাকায় হাসপাতালে ১৯৫৪ সালে ইলা মিত্রকে দেখে আসার পর সুভাষ মুখোপাধ্যাযের এই কবিতা পরিচয়-এ প্রকাশিত হয।

ফুল ফোটার গল্প

দীপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

অলিন্দে কয়েকজন দাঁড়িয়েছিল। ছাড়াছাড়া, বুঝি কেউ কাউকে চেনে না। তার দেখে মনে হয়েছিল—কি এক বেদনায় কয়েকটা গাছ যেন পাথর, আর কি-এক বিনয়ে সেই পাথর নম্র। নিঃসঙ্গ দাঁড়িয়ে সে রাস্তা দেখেছিল, মানুষ দেখেছিল, বিকেল দেখেছিল। অবাক হয়ে ভেবেছিল, কেউ জানে না। আরোগ্য ভবনের এতবড় প্রাঙ্গণে এতগুলি প্রাসাদের এই অসংখ্য মানুষ তাদের রোগ নিরাময়-জীবিকা এবং আনন্দ-শোকের একান্ত পৃথিবীতে নিজেই নিজের দাস। আর মালি কাঁটাতারের পাতা কাটে। কাঁটায় ফুল ফোটে। ফুলে অপরাহ্ন। কেউ জানেনা।

মহত্ত্বকে শ্রদ্ধা করে। কিন্তু অজ্ঞাতে নিভে যাওয়ায় বড় ভয়। তাই এই গোপন, নির্জন ও নিরহঙ্কার যন্ত্রণা তার কাছে অভিশাপ।

নীরবে দরজার সামনে এসে মাথা নিচু করে দাঁড়াল। সভ্য পৃথিবীতে জীবনের চরম লাঞ্ছনা ও নির্যাতনের স্মৃতি তাকে অবনত করল। কে যেন ইশারায় ভেতরে যেতে বলেছিল। কিন্তু চোখ তুলে তাকিয়ে মুখ দেখবে এমন সাহস তার ছিল না।

মাঝে মাঝে তীক্ষ্ণ তীব্র আর্তনাদ মুহূর্তে স্তব্ধ হতে শুনছিল। নিশ্বাসে পাচ্ছিল ওষুধের উগ্র গন্ধ। মাঝে মাঝে তীক্ষ্ণ আর তীব্র কণ্ঠের দু'টো একটা অস্ফুট বিলাপ শুনছিল। তারপর দু'টি চাপা স্তব্ধতা। সেই আর্তনাদ, সেই বিলাপ, সেই ঝাঁঝ বিষাক্ত বাষ্প হয়ে তার প্রতিটি স্নায়ুতে কি এক মরীচিকা জ্বালা সৃষ্টি করল।

পায়ের সামনে এসে দাঁড়াল বিছানায় দেখল সম্পূর্ণ অপরিচিত এক মূর্তি। সাদা চাদরে ঢাকা শরীরের একটি মুখ সে চিনত। দুটি সাধারণ চোখ। সে দেখছিল ঔদাসীন্য কিছুই যাকে স্পর্শ করে না। সে দেখেছিল শীর্ণ হাত, কয়েক দিনের আয়াসে যে করতলে একটি ফুল দেবার অধিকার সে অর্জন করেছিল।

এই মুহূর্তে অন্য দৃশ্য দেখল। বিছানার চাদর মেঝেয় লুটোচ্ছে। মাথার একরাশ চুলে যন্ত্রণা। চোখের চাউনিতে যন্ত্রণা। বালিকার মতো ছোট্ট রোগা শরীরে যন্ত্রণা। তীক্ষ্ণ, তীব্র আর্তনাদ যন্ত্রণা। অস্ফুট বিলাপে শরীরটাকে দুমড়ে কুঁকড়ে ছটফট করতে করতে প্রাণপণে সহ্য করার প্রয়োসে যন্ত্রণা।

আর মাথার কাছে এক প্রতিমার মতো পুরুষ দাঁড়িয়ে—আইন যাকে শত্রু বলে ঘোষণা করেছিল, সেই পলাতক স্বামী। শুধু দৃঢ় দু'টি হাত, বীরের দু'টি হাত গভীর আবেগে তার কপাল থেকে চুলগুলি সরিয়ে দিচ্ছে।

ঔদাসীন্য নেই, নীরবতা নেই। বুঝল কি অলৌকিক দাহ, যা সেই অস্তিত্বের ভাষা বদলে দিয়েছে।

প্রতিমার মতো পুরুষটির চোখের দিকে তাকিয়ে কি যেন বুঝতে চাইল। বীর ম্লান হাসল।

একরাশ চটকানো শিউলির দিকে তাকিয়ে কি যেন বুঝতে চাইল। ফুল অস্ফুট আর্তনাদ করল। সে ভেবে পেল না পালিয়ে যাওয়া ছাড়া তার কিছু করার আছে কিনা। তারপর সে মাটিতে হাঁটু গেড়ে বসল। কারণ জানত সে প্রতিমা নয়, বীর নয়। আর থেকে থেকে অস্ফুট বিলাপ, হঠাৎ তীক্ষ্ণ আর্তনাদ করে উঠেই দাঁত-চাপা স্তব্ধতা, সেই ওষুধের গন্ধ তাকে গমগম করে কি যেন বলল।

ঔদাসীন্য দেখেছিল, নীরবতা দেখেছিল। এবার দেখল অবহেলা। বুঝল চীৎকার করে, কেঁদে জ্ঞান হারিয়ে যন্ত্রণা থেকে পলায়নের সহজ পথ নয়। অবাক হয়ে ভাবল এতবড় বোঝা বইবার দায়িত্ব এই ছোট্ট বিকল শরীরটা এখনও কিভাবে গ্রহণ করছে। কেন করছে?

তারপর সে অভিমানে, বেদনায় নিঃশব্দে কাঁদতে লাগল।

দুই

এক যুবক ছিল। সারাদিন সে কাজে অকাজে ঘুরত। সারারাত ঘুমোত আর স্বপ্ন দেখত। যুবকটি প্রশ্রয়ের সঙ্গে তার স্বপ্নগুলিকে স্মরণ রাখার চেষ্টা করত। এবং রোজ শুতে শুতে ভাবত, আজ আমি এই স্বপ্ন দেখব। সুতরাং বোধগম্য যে যুবকটির নিজের ওপর প্রচণ্ড আস্থা ছিল।

অথচ তার পরিবারে অভাব ছিল, জটিলতা ছিল। অথচ তার জীবনে অভাব ছিল। অথচ তার সময়ে অভাব ছিল, জটিলতা ছিল। যুবক কি এক বিশ্বাসে স্পর্ধায় সব কিছু অস্বীকার করে অধীর বিনয়ে অনিবার্য ভবিষ্যতের অপেক্ষা করত।

যুবকটি অনায়াসে পৃথিবীর কথা ভাবতে পারত। অনায়াসে যে কোন দেশে মনুষ্যত্বের মুক্তিতে নিজের মনে উৎসবের সুর শুনত। যুবকের সব থেকে বড় ভরসা ছিল এই বোধ যে জীবনের কোনো মুহূর্তে একা নয়। চোখ বুজলে সাদা কালো অনেক মুখ দেখতে পায়—ছবিতে যাদের প্রায়ই দেখা যায়। চোখ বুজলে নিরবয়ব এক চেহারা দেখে যাকে বিদ্বানরা বলেন ইতিহাস। চোখ বুজলে পৃথিবীর হৃদস্পন্দনের মতো এক উদাত্ত অথচ নিঃশব্দ সঙ্গীত শোনে যাকে ইতিহাস বলে জীবন। আর অনায়াসে এই বস্তুগুলির সঙ্গে যুবক অন্তরঙ্গ আত্মীয়তা বোধ করে। এ কারণে যুবকটি একবার নদীর ওপারে গিয়েছিল। সে দেশটা তখন 'নৌকা' হয়ে মোহনায় যাবার উৎসবে মেতেছে। গান ধরেছে।

যুবক সারাদিন রোমাঞ্চিত হয়ে কাটাল। আর, সেই দু'জন এলো বিকেলে। সভা থেকে তাকে ডেকে নিয়ে বলল, চলো। তারপর নীরবে হাঁটতে লাগল। যুবকের মন গান গাইছে তখনো। সে গলা ছেড়ে শুরু করল—আমার ভাইয়ের রক্ত রাঙানো একুশে ফেব্রুয়ারী—দু'জন যোগ দিলো—আমি কি ভুলিতে পারি। তারপর যেতে যেতে দুটিতে বলা শুরু করল—সেই যে বরকত আর সালাম...মোদের গর্ব মোদের আ.. মরি হায়, হায় রে। আর সেই যে মাঠ জুড়ে লক্ষ্মীর আঁচল...সেই যে সাত ভাই চম্পা...সেই আজও যার বন্দীদশা ঘুচল না। তারপর তারা গোপনে তাকে এক দুর্গে নিয়ে গেল।

ছোট্ট একটা ঘরে, ছোট্ট এক বিছানায় গলা পর্যন্ত সাদা চাদর ঢেকে একজন শুয়েছিল।

ছেলেরা মুখ নামিয়ে বলল, এই আমাদের পারুল। যুবক স্তব্ধ তাকিয়ে ছিল। কারণ তখনও তার স্মৃতিভ্রংশ হয়নি। একটা রোগা মুখ, হালকা ভুরুর তলায় দুটি সাধারণ চোখ। আইন তাকে বন্দী করেছে। দাঁত দিয়ে, নখ দিয়ে, অস্ত্র দিয়ে তার তরুণ নিষ্পাপ শরীরটা দিনের পর দিন, দিনের পর দিন কুরে নিয়েছে। তারপর লেহন করেছে খসখসে জিভে। আইনের ছোঁয়ায় যার যৌবন গেল, আইনের ভ্রুকুটিতে যার ঘরে আগুন জ্বলল আর বীর স্বামী পালাল আর শিশু ছেলেটা কোথায় কেউ জানে না—সেই তাকে দেখেও যুবকটির স্মৃতিভ্রংশ হয়নি। সে ভাবছিল সাতটি ভাইয়ের দু'জন এখানে উপস্থিত, আর পাঁচটি কোথায়? যুবকের কানে সেই গান ভেসে এলো ঘরে ঘরে লোকে যে গান বেঁধেছে, মুখে মুখে যে গান ছড়িয়েছে নদীর ওপারে যে গান গাইতে গাইতে দক্ষিণের কটা বোকাসোকা চাষাকে সে হঠাৎ জ্বলে উঠে আইনের বিরুদ্ধে যুদ্ধে যেতে দেখেছিল।

যুবকটি কিছু বলতে চেয়েছিল। কিন্তু এই সে প্রথম বুঝল ভাষা বড় দীন। যাবতীয় উৎসব তার কাছে নিষ্প্রভ হয়ে গেল। ধ্রুব বুঝল এই নৌকায় পারুলের স্থান নেই। কারণ তারা চেয়েছিল মোহনা ছাড়িয়ে সমুদ্রে যেতে। অথচ দুটি মাত্র ভাই উপস্থিত, আর পাঁচজন কোথায়?

যুবকটি লক্ষ্য করল, বিকেল হলেই দলে দলে মানুষ বন্দিনীর দরজায় এসে দাঁড়ায়। কিছু বলার চেষ্টা করে, তারপর মাথা নিচু করে চলে যায়। লক্ষ্য করল, অপরিচিত মুখ দেখলে তার চোখ বুজে আসে। কপালে ছায়া পড়ে। তারপর কি এক ঔদাসীন্যে দৃষ্টিটা হঠাৎ অনেক দূরে চলে যায়।

বিচারের সময় আইনের ছদ্মবেশ ঘোচাবার জন্য রমণী হয়েও যখন নিজের সমস্ত অত্যাচারের বিশদ বিবরণ দিয়েছিল, তখন কি সে জানত আবার বেঁচে উঠবে? আর আজ তার পঙ্গু লাঞ্ছিত শরীরটার দিকে অজস্র চোখ যখন মমতায়, শ্রদ্ধায়, জ্বালায়, কখনও বা বিস্মিত করুণায় অনিমেষ তাকিয়ে থাকে, তখন কি নিজের সেই বিস্তৃত বিবরণ লজ্জা হয়ে আতংক হয়ে তার মেয়ে মনটিতে বাজে? তাকে নিরুপায় করে দেয়? নাকি উদাসীন দৃষ্টি অনেক দূরে মেলে সে হারিয়ে যাওয়া পাঁচটি ভাইকে খোঁজে? যুবক ভাবল সন্ধেবেলা শাঁখ শুনলে একটা শিশুমুখ কি তার কখনও মনে পড়ে? ভাবল ঘুমঘোরে বন্দিনী কিসের স্বপ্ন দেখে?

যুবকটি বুঝল সমবেত শ্রদ্ধা ও জ্বালা তার মৌনকে স্পর্শ করতে পারে না। বাচ্চা মেয়ের মতো কুঁকড়ে যাওয়া ছোট্ট শরীরটা সাদা চাদরে ঢেকে, রোগা মুখ আর সারারণ দু'টি চোখ মেলে সে শুয়ে থাকে, যেন রূপকথা। আর ইচ্ছে থাকলেও যুবক তাকে কিছুই বলতে পারে না। অথচ সে চায় তারই মহত্বের কথা শোনাতে, তার মৌন ভাঙ্গতে, এই নিষ্ঠুর বাস্তবতাকে সহজভাবে গ্রহণ করতে পারার উদ্দীপনা যোগাতে। যুবকটি অথচ কিছুই বলতে পারে না। সে জানে বিশাল ত্যাগের পর যখন উত্তেজনা কমে যায়, যখন কিছু করার থাকে না, যখন নিজেকে বাতিল মনে হয়—তখন মহৎ মানুষও আস্তে আস্তে ছোট হয় বা পাগল হয় বা আত্মহত্যা করে। সে বোঝে না ঔদাসীন্য বা মৌনের আড়ালে এই নিঃসঙ্গ ব্যর্থতার বোধ

জেগেছে কিনা। তাই তার ভয় করে। এইভাবে পরপর তিনদিন সে গিয়েছিল। আর বিছানার পাশে বসে থাকত। কিছু একটা বলার চেষ্টা করত, কিছু একটা শুনতে চাইত—কিন্তু বলা হয় না, শোনা হয় না।

অবশেষে সেদিন সকালে একটা ফুল হাতে সে ঝড়ের মতো তার ঘরে ঢুকল। কাঁপা কাঁপা গলায় বলল, আজ আমাকে চলে যেতে হবে। আমি জানি তুমি বাঁচবে। কারণ তুমি বোঝো জীবন তোমাকে চায়। তোমাকে আমরা ওপারে নিয়ে যাব। তারপর সমুদ্র ডিঙিয়ে সেই আবেগের দেশে পাঠাব। এই ফুল নাও। পৃথিবীতে যত মানুষ মার খেয়েছে, তাদের হয়ে তোমাকে দিলাম। সে একটা সূর্যমুখী ফুল ছিঁড়ে এনেছিল।

যুবকটি যখন চলে আসবে, তখন সে কথা বলল। যুবক যেন দৈববাণী শুনল। সে বলল, বোলো—সকলকে আমার মে দিবসের অভিনন্দন।

যুবকটি আচ্ছন্নের মতো বাইরে এলো। সে ভুলে গিয়েছিল। এই দুর্গ এই বন্ধন, নিশ্চিন্ত মৃত্যুর সামনে এই উদাসীন মৌন তাকে সেই প্রভাতের তাৎপর্য ভুলিয়ে দিয়েছিল। যুবক এক নতুন উপলব্ধি নিয়ে ফিরল। নিছক ঔদাসীন্য বা নীরবতা নয়, বিশ্বাস। যাকে সে সান্ত্বনা দিতে প্রেরণা দিতে গিয়েছিল—তার কাছে থেকে ইতিহাসের অমোঘ নির্দেশ নিয়ে যুবকটি তার শহরে ফিরল।

তারপর খবর এলো, সে এসেছে। গোপনে। কারণ নদীর এপারেও আইন তার শত্রু। তার পলাতক স্বামী ও শত্রুর মাত্র কয়েকজন আছে, দেখাশোনা করে। পাশে ঘরের লোকেরাও জানে না—এই সেই। যাকে নিয়ে লেখা হয় গান—এই সেই। গাঁয়ে গাঁয়ে যার নাম মন্ত্রের কাজ দেয়—এই সেই। রোগা মুখ আর সাধারণ দু'টো চোখে তাকে চিনবার উপায় ছিল না।

যুবকটি দৌড়ে গিয়েছিল। আর থমকে দাঁড়িয়ে দেখেছিল—যন্ত্রণা! প্রতিমার মতো এক পুরুষকে, তার স্বামীকে, এই প্রথম সে চোখের নাগালে পেয়েছিল। কিন্তু শিশুটি? সে কই? সে কোথায়?

যুবকটি মানুষকে মরতে দেখেছে—অসুখে, দুর্ঘটনায়, অত্যাচারে। শরীরের দহন সে দেখছে—অসুখে, দুর্ঘটনায় অত্যাচারে। কিন্তু সমস্ত স্মৃতি ও অভিজ্ঞতার বাইরে যুবক যন্ত্রণার এক নতুন চেহারা দেখল। আর দেখল অবহেলা।

যুবকটি ভাবল, সে ফুল দিয়েছিল, হায় রে সূর্যমুখী। সে বলেছিল, বাঁচো, হায় রে জীবন!

চিরদিন যাকে পঙ্গু আর বন্ধ্যা হয়ে থাকতে হবে, চিরদিন যাকে কতগুলো উজ্জ্বল আর অন্ধকার স্মৃতি বহন করতে হবে, অনভিপ্রেত উলকির মতো চিরদিন যার শরীরে আঁকা থাকবে পাতালের নখচিহ্ন, এবং যাকে নিয়ে এই লেখা হবে, গান—তাকে সে ফুল দিয়েছিল, বলেছিল বাঁচতে হবে। হায় রে সূর্যমুখী, হায় রে জীবন!

যুবকটি সেই এক আশ্চর্য দ্বন্দ্ব ও বিষাদ বোধ করেছিল।

তিন

'এখন কেমন আছেন?'

'একটু ভালো।'

'হাঁটা চলা'

'নাহ! মৃদু হেসে বললেন, 'আর কি পারব কোনো দিন?'

'নিশ্চয়ই।' বিশ্বাসে তেমন জোর না থাকলেও আমাকে বলতে হলো 'পারতেই হবে।' তারপর খানিক নীরবতা। কারণ কথা খুঁজে পাচ্ছিলাম না।

'সারাদিন কি করেন?'

'শুয়ে থাকি।'

'কষ্ট হয় না।'

'হয়'। মৃদু হেসে বললেন, 'ছেলেবেলায় আমি খুব খেলতে পারতাম। কাগজে একবার নাম বেরিয়েছে। স্পোর্টসে। তাই নিয়ে বাড়িতে কি হৈ চৈ।'

হঠাৎ চুপ করে গেলেন। অন্যমনস্কের মতো কাগজে নাম বেরনোর কথা বলে ফেলেই কি তাঁর মনে পড়ছে—আরও একবার তিনি সংবাদপত্রের নিয়মিত খবর ছিলেন, যে খবরে মানুষ চোখ বন্ধ করে।

''স্পোর্টসের অভ্যেস ছিল, তাই পেরেছেন। গাঁয়ে গাঁয়ে কি ঘুরতেই না হতো আপনাকে।'

মুখ জ্বলে উঠল। বলেন, 'ভাবলে স্বপ্ন মনে হয়। জল কাদা ভেঙ্গে মাঠে মাঠে ঘুরেছি। ক্ষ্যাপা গাঁ, ধান ক্ষেত। সেই আমি বিছানায় উঠে বসতে কাতরাব কোনোদিন ভাবতে পেরেছিলাম?'

'আচ্ছা, আপনি তো শহরের মেয়ে ছিলেন। বিয়ের পর গাঁয়ে গিয়ে কষ্ট হতো না'?

'হতো না আবার? সমস্ত অভ্যেসটি ছিল শহুরে। এদিকে আমার শ্বশুরবাড়ি আবার বনেদী, কনজারভেটিব।' কি একটু ভেবে ফিক করে হেসে বললেন, 'অভ্যেস হয়ে যায়। আসলে করে নিতে হয় তো।'

খুব ইচ্ছা হলো জিজ্ঞেস করি, কি ভেবে আপনি হাসলেন? জীবনের মধুর স্মৃতিগুলি আপনাকে যন্ত্রণা দেয়, ঠাট্টা করে? কিন্তু চুপ করেই রইলাম।

'শোন। তোমাকে একটা দরকারে চিঠি দিয়েছি।'

'বলুন'।

'শোন, আমি নেরুদার কয়েকটা কবিতা অনুবাদ করেছি।'

'তাই নাকি? বাহ এই তো সময় কাটাবার সুন্দর উপায় পেয়ে গেছেন।'

'শোন, আমি চেষ্টা করলে বোধ হয় একটা উপন্যাসও অনুবাদ করতে পারি।'

'খুব ভালো, করুন না। আস্তে আস্তে হয়তো আপনি নিজেও লেখা শুরু করবেন। আহ, আপনি যদি লেখেন না'—

'তোমাকে কিন্তু একটা কাজ করে দিতে হবে ভাই।'

'কি বলুন।'

'একটা প্রকাশকের ব্যবস্থা করে দিতে হবে। কিছু আয় তো দরকার।'

বিমূঢ়ের মতো বললাম, 'কেন?'

'বা, টাকা লাগবে না? ছেলেটাকে স্কুলে দেবো, তার ওপর'—

ছেলে মানুষের মতো বললাম, 'সে জন্য আপনার এত ভাবনা কিসের?

ম্লান হাসলেন।

আসলে আমার মনের কথা বুঝতে পেরেছেন। বাস্তবিক মনে হতো, তাঁর পক্ষে বেঁচে থাকাটাই আমাদের সময়কে, আমাদের জেনারেশানকে ক্ষমা করা। নিছক প্রাণধারণের জন্য তাঁকেও যে উদ্ব্যস্ত হতে হবে, এ ভাবতে পারি না।

বললেন, 'দ্যাখো, আমার চিকিৎসার জন্য তো কম করা হলো না। এখন আস্তে আস্তে ভবিষ্যতের কথা ভাবতে হবে বৈকি। অন্যের সাহায্যে দিন কাটানো আমার কি-ই বা অধিকার? আর, এঁদেরই সাধ্য কতটুকু?'

'তাই বলে আজ? এখনই? সর্বস্ব দিয়েও কি কিছুই পাওয়ার অধিকার জন্মায় না? আপনার সম্পর্কে বই লিখে, গান বেঁধে, আপনাকে ইতিহাস করে দিয়েই কি আমাদের দায়মুক্তি?'

'শোনো শুয়ে শুয়ে অন্যের সেবা পাব বলেই কি এই পঙ্গুতাকে গ্রহণ করেছি? যদি একবার অভিমানকে প্রশ্রয় দিই, তাহলে মনটাও কি দুমড়ে যাবে না?'

মাথা নিচু করলাম। আর গা ছমছম করতে লাগল। মহত্ব আমি বুঝি। কিন্তু সবার অজ্ঞাতে গোপনে নিরন্তর নিজের কাছে মহৎ থাকা কি দুরূহ। ত্যাগ আমি বুঝি। কিন্তু সবার অজ্ঞাতে গোপনে নিরন্তর নিজের কাছে ত্যাগ কি দুষ্কর। এবং যিনি প্রায় ইতিহাস, যাঁর নাম একটা মন্ত্র; যাঁকে নিয়ে লেখা হয় গান, তাঁর পক্ষে গোপনে, অজ্ঞাতে; মামুলী একটা মেয়ের নিছক বাঁচা কি কঠিন।

আমি সাধারণ দু'টো চোখে আবার যেন সেই ঔদাসীন্য দেখলাম। কিছুই যাকে স্পর্শ করতে পারে না। আমি রোগা একটা মুখে আবার নীরবতা দেখলাম। কিছুতেই যা ভাঙ্গে না। আর মনে পড়ল, উৎসব মুখর নদীর ওপারে দুর্গের এক ক্ষুদ্র প্রকোষ্ঠে গলা পর্যন্ত সাদা চাদরে ঢাকা একটি মুখ দেখেছিলাম। একটি মৌন মুখ। শুনেছিলাম তিনি বাঁচবেন না। আমি এই শহরে আরোগ্য ভবনের সংক্ষিপ্ত এক শয্যায় বালিকার মতো ছোট্ট একটা শরীরকে ছটফট করতে দেখেছিলাম। শুনেছিলাম তিনি বাঁচবেন না। এবং আজ একটা ঘরে, ছোট্ট আর মামুলি এই ঘরে, শুভ্র বিছানায় আধশোয়া বসে তাঁকে আমার সঙ্গে কথা বলতে দেখছি। তিনি ভবিষ্যত ভাবছেন।

বিস্ময়ের সঙ্গে মনে হলো রমণী কি মুহূর্তের জন্যও সাধারণ হবেন না হারবেন না? জীবনকে সমস্তভাবে স্বীকার করার এই আশ্চর্য জোর কোথা থেকে পান? মৃত্যুর দরজা ঘুরে এসেছেন বলেই কি মরে যাওয়াকে এত ভয়? নাকি জীবনের ওপর অভিমান করে, প্রতিশোধ নিয়ে, একা বেঁচে থাকবেন? জীবন কত মধুর হতে পারে, তা তো তিনি জানেন। জীবন কত ভয়ঙ্কর, তা তো তিনি বোঝেন। উজ্জ্বল আর অন্ধকার কতগুলো স্মৃতিকে বহন

করে, জাগরণে বা নিদ্রায় কতগুলো স্মৃতি বহন করে, আজও তিনি ভবিষ্যতের কথা ভাবেন কি করে? তবে কি ভালোবাসা? কিন্তু কি দেবে এই জীবন? শহরের অভ্যাস ভেঙ্গে নিজেকে গ্রামের করেছিলেন। গ্রাম থেকে ছিটকে এলেন শহরে। গ্রামের অভ্যাস ভেঙে আবার শহরের যোগ্য হবেন। কিন্তু এই শহরকে তো তাঁর কিছু দেবার রইল না। এই শহর থেকেও তো তাঁর কিছুই নেবার নেই। পঙ্গু হয়ে পড়ে থাকবেন। চোখের সামনে দেখবেন ইতিহাস তৈরি হচ্ছে। ছটফট করবেন, কিন্তু অংশ নিতে পারবেন না। পঙ্গু হয়ে পড়ে থাকবেন, তারপর বুড়িয়ে যাবেন, তারপর মরে যাবেন—ছটফট করবেন, কিন্তু জীবন থেকে কিছু পাবেন না। আর বিছানায় শুয়ে শুয়ে নিজের লাঞ্ছনা ও ত্যাগের মহত্বের ভারে নুয়ে চারপাশের দ্রুতগতি জীবনকে দেখে একদিন কি তাঁর অনিবার্যভাবে মনে হবে না—এর থেকে আশ্চর্য দিনগুলোয় মৃত্যু সুখের ছিল।

জানো আমার ছেলেটা আমায় নিয়ে লেখা সব কবিতা মুখস্থ করেছে। যখন আবৃত্তি করে, আমি অবাক হয়ে শুনি। এসে প্রথম প্রথম তো আমার ধারই ঘেঁষত না। ভয় পেত। প্রথম দিন সে এক কাণ্ড। একেবারে চিনতেই পারেনি।

'হু আপনার চেহারা অনেক মানে এতদিন পরে দেখা। তায় সব সময় বাইরের লোকেরা ঘিরে থাকত।'

'সত্যি। এত শ্রদ্ধা, এত ভালোবাসা পেয়েছি—মনে হয় আমি কি এর যোগ্য? দুনিয়ার পৌরাণিক চরিত্রগুলির সঙ্গে আমার নাম জুড়ে লেখে। লজ্জা হয়। ভয় হয়। তাইতো নিজেকে যোগ্য করে তুলতে চাই। নইলে সমস্তটাই জীবনের বোঝা হয়ে দাঁড়াবে।'

আমি বুঝলাম ইচ্ছে করলেও তিনি সাধারণ হয়ে হেরে যেতে পারেন না। আমি বুঝলাম, ইচ্ছে থাকলেও অভিমানে জীবন থেকে মুখ ফেরানো তাঁর পক্ষে সম্ভব নয়। কিন্তু এইভাবে কতদিন এক গুরুভার বহন করবেন? কতদিন করতে পারবেন? শুধুমাত্র পরের জন্য বেঁচে থাকা, আহ যন্ত্রণা। শুধু মন্ত্র হয়ে থাকা যা উচ্চারণ করে মানুষ উৎসব করবে।

আমি ফুল দিয়েছিলাম, হায়রে সূর্যমুখী। আমি বলেছিলাম—বাঁচতে হবে, হায়রে জীবন। পাথরের প্রাচীন দেবীমূর্তির সামনে দাঁড়িয়ে আমার গা ছমছম করতে লাগল।

চার

একটি যুবক ছিল। সারাদিন সে ভাবত, কারণ চাকরি ছিল না। সারারাত সে ভাবত, কারণ ঘুম আসত না। আর ভাবতে ভাবতে মাঝে মাঝে তন্দ্রা হতো। একটু বা ঘুম তখন যে স্বপ্ন দেখত। বস্তুত যুবকটি ঘুমোবার আগে ভয় পেত। কারণ সে স্বপ্ন দেখতে দেখতে ক্লান্ত। যুবকটি প্রায়ই আজকাল একটা বাড়িকে স্বপ্ন দেখছে। বাড়িটা শক্ত, উঁচু প্রাচীর। একদিন দেখল তার একটা জানলায় মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় দাঁড়িয়ে বাড়িটার সামনে ছোট্ট ঘাসজমি—হঠাৎ বাড়িটার বন্ধ জানলার কাঁচে কোথা থেকে ঢিল পড়ল। তারপর জানলা খুলে পটের লক্ষ্মীর মতো একটা মুখ উঁকি মারল। তারপর ঘাসজমিতে কিভাবে অনেকগুলো মানুষ এলো। তারা ওপর দিকে হাত তুলে চিৎকার করে কি সব বলল। জানলাটা বন্ধ হয়ে গেল। তারপর

তারা নিজেদের মধ্যে মারামারি শুরু করল। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর সেই আশ্চর্য চোখ দু'টো মেলে মারামারির দিকে তাকালেন। শান্তভাবে তাকালেন। বিকেলের আলো তাঁর পুরু চশমা আর মাথার পরিপাটি চুলে জ্বলছিল। হঠাৎ দেখা গেল মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাঁ হাতটা কনুই থেকে কাটা এবং পাঞ্জাবীর হাতা চুপসে গেছে। তারপর কে একজন 'হাঁসুলি বাঁকের উপকথা'র রোখালো নায়কের মতো বুক ফুলিয়ে সম্ভবত সেই মেয়েটির হাত হিঁচড়ে টানতে টানতে বীরদর্পে বেরিয়ে গেল। যুবকটি স্বপ্নের মধ্যে লক্ষ্য করল মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় নিচের কোলাহলের দিকে একবারও না তাকিয়ে অনেক অনেক দূরে কি যেন দেখছেন। আর বাতাসে তাঁর পাঞ্জাবীর চোপসানো হাতাটা মৃদু কাঁপছে। আর নিচের সেই মানুষগুলো পরম আক্রোশে বাড়ির বন্ধ জানালাটায় ঢিল ছুঁড়ছে।

সেই বাড়িতেই লাইব্রেরি ঘরে যুবক কি একটা ভোজসভার স্বপ্ন দেখল। কতগুলি বই ছিল। শুধু একটা মুখকে তার পরিচিত মনে হলো। মোট গোঁফ পৌরাণিক স্বাস্থ্য, হাতে পাইপ। চোখ দুটো হাসছে। গমগম করে গল্প করছে লোকটা। আঙুল তুলে পৃথিবীর ছবির দিকে তাকিয়ে কি যেন কবিতা আবৃত্তি করল। তারপর আন্তর্জাতিক গান হলো। ভোজসভার শেষে লোকটা সকলের কাছে ক্ষমা চেয়ে একবার বাইরে গেল এবং খানিক বাদে যখন ফিরে এলো তখন যুবকটি হঠাৎ শিউরে উঠে লক্ষ্য করল তার পা-জোড়া ঈগলের পায়ের মতো পৌরাণিক শরীরের ভারে বেঁকে গেছে। আর ভোজসভার সেই লোকগুলো অনেকে তাকে চিনছে না। তারা আর একজন কার আবৃত্তি শুনছে। তারপর ভূমিকম্পে লাইব্রেরির একটা তাক থেকে বইগুলো খসে পড়তে লাগল।

যুবকটি আর একদিন স্বপ্নে দেখল সেই বাড়িটার সামনে ঘাস জমি চওড়ায় অনেক বেড়ে গেছে। আর সেখানে সারি সারি কবর। অন্যমনস্কের মতো হাঁটতে হাঁটতে যুবক এক জায়গায় ভীড় দেখল। আত্মীয় বন্ধু সহকর্মী, ছবিতে দেখা মৃত ও জীবিত অনেক মানুষকে সে লক্ষ্য করল। দেখল তাদের বিষাদ বেদনা। খুব কৌতূহলী হয়ে ভাবল, কার মৃত্যুতে এত শোক। উঁকি মেরে দেখে বিস্ময়ে যুবক দেখল—কফিনে তার নিজের মৃতদেহ। একটি কণ্ঠস্বর ফিশফিশ করে বলল, কেন, আমি বাঁচতে চাই। এই তো আমি। কফিনটা ফুলে ঢেকে গেল আর, কার যেন কণ্ঠস্বর শুনল—না, এপিটাফ নয় এই আমি ফুলের বীজ এনেছি। তোমরা হাতে হাতে ছড়িয়ে দাও।

পাঁচ

'কেমন আছ'?

'ভালো না। পুলিশ রিপোর্টে চাকরি গেছে। অভাব, তার ওপর সময় কাটে না।'

'সে কি? তোমার সময় কাটে না!'

'হু বাড়িতেও থাকতে পারি না। একটা ভাই পাগল হয়ে গেছে আত্মহত্যার চেষ্টা করেছিল।'

'ও'। তারপর চুপ করে রইলেন।

'আপনি কেমন আছেন?'

'ভালো'। তারপর আমার মুখের দিকে তাকিয়ে বললেন, 'মোটামুটি'।

'রোজ ক্লাস করছেন?'

'হ্যাঁ। লুকিয়ে। প্রফেসররা জানেন। আমাদের ছেলে মেয়েরাও জানে। খবরটা গোপন রাখতে বলেছি।'

'প্রাইভেটে দিয়ে দিন। তারপর লেকচারশিপ হয়ে যাবে।'

'দেখি।'

'শরীর একদম ভালো হয়ে গেছে?'

'না। তবে হেঁটে চলে বেড়াতে পারি। মাঝে মাঝে একটা পেইন হয়। ও আর যাবে না'।

'সেই বাড়িতেই আছেন?'

'না। কাছেই উঠে এসেছি। ঠিকানাটা লিখে নাও। এস একদিন। একবারে দেখা নেই।'

বলতে পারলাম না, যেতে আমার লজ্জা করে। নদীর ওপারে আমি সেই ঔদাসীন্য, নীরবতা আর বিশ্বাস দেখেছি। এই শহরে দেখেছি সেই নিরভিমান যন্ত্রণা, নম্র অবহেলা আর বিনীত প্রজ্ঞা। আজ দেখছি শহরের হৃদপিণ্ডে দাঁড়াতে আমার লজ্জা করে। একদিন যাঁকে সান্ত্বনা দিতে গিয়েছিলাম, তাঁর সামনে আজ কোন গৌরবে দাঁড়াব?

'জানো আমার ছেলেটা অনেক বড় হয়ে গেছে। দেখলে চিনতে পারবে না। তুমিও কি রকম গম্ভীর হয়েছ। শুধু আমিই বোধহয় দিন দিন ছেলেমানুষ হচ্ছি।' হাসলেন। তাঁকে অপরূপ দেখাল।

সাদা শাড়ি, সাদা জামা আর রোগা একটা মুখ। চিন্তা করে দেখলাম প্রথম থেকে এই সাদা রঙটা তাঁর স্মৃতি ঘিরে আছে। অঙ্গে চিরজীবন যদি বৈধব্যের রঙই বহন করে বাঁচবেন, জীবন থেকে যদি নতুন করে কিছুই না পাওয়ার থাকে—তবে কেন এই তপস্বিনীর ব্রত?

আবার মনে পড়ল পরের জন্য বাঁচা কি দায়। কারণ অনেক সময় নিজের জন্য বেঁচে থাকার ভারই যে আমরা বইতে পারি না।

আর আমার হঠাৎ অদ্ভুত লাগল যে নাম ইতিহাসের, যে নাম এখনও শহরে গাঁয়ে মানুষকে জাগায়—শহরের হৃদপিণ্ডে কটা বই হাতে সেই তিনি রোগা একটা মুখে সাধারণ দু'টো চোখ মেলে দাঁড়িয়ে। কেউ জানেন না। আমি ভুলে যাই।

কথার ভাঙ্গচুর আমাকে পেয়ে বসল। বললাম, 'ক্লাশের প্রজাপতি সহপাঠীদের কেমন লাগছে' হাসলেন, বললেন 'সকলের সঙ্গে আলাপ নেই। ওদের মাঝে আমারে খুঁজি।' শিউরে উঠলাম, বদ্ধ নেই, রোজ যেখানে আসতে হয়, থাকতে হয়, প্রতিমুহূর্তে প্রাণ যেখানে উত্তাল, সেইখানে বসে কি করে বুঝবেন তাঁর জীবন অর্থ অজস্র উত্তাল আর অন্ধকার স্মৃতিভরা একটা জীবন, মহত্ত্বের বোঝা হওয়া একটা জীবন!

আর আমার হাতে অদ্ভুত লাগল। যে নাম ইতিহাসের, যে নাম এখনও শহরে গাঁয়ে মানুষকে জাগায়—শহরের হৃদপিণ্ডে কটা বই হাতে এমনি রোগা একটা মুখে সাধারণ দু'টো

চোখ মেলে দাঁড়িয়ে। কেউ জানে না আমিও ভুলে যাই।

আর জীবনের প্রতি আমাদের অভিমান কত প্রবল। আর জীবনের প্রতি আমাদের দাবি কত বেশি। আর আদর্শের সঙ্গে বাস্তবতার যে কোনো সংঘাতে আমরা কি সমাজে হতাশ হই, বিষণ্ণ হই, একা হই। এর যে সত্যকে ধ্রুব বলে জেনেছিলাম, আজও জানি, তা ফুল হয়ে না ফুটলে তা তাড়াতাড়ি অধৈর্য হয়ে আমরা গোটা প্রকৃতিকে অস্বীকার করি। নিজের কাছে নিজে একটা সমস্যা হই।

অথচ বলেছিলাম বাঁচতে হবে। আর ফুল দিয়েছিলাম। হায়রে, তখন কি জানতাম সময়ের সঙ্গে লড়াই করতে করতে কোন অসর্তক মুহূর্তে সময়ের শিকার হয়ে যাচ্ছি।

'এই নাও ঠিকানাটা! যেও কিন্তু একদিন।'

ঠিকানা হাতে তারপর আমি তাঁর ধীর দুর্বল পদক্ষেপ দেখতে দেখতে ভাবলাম, আমারও তো পালাবার পথ নেই। আমাকেও তো সমস্ত হতাশা গ্লানি এবং নৈরাজ্যের ভেতর মাথা উঁচু করে দাঁড়াতে হবে।

চোখের সামনে একটি হলুদ ফুলকে আমি পাতা নাড়তে দেখলাম। আমি একটি ফুল দেখলাম।

ছয়

সেই যুবকটি বিয়ে করল। উৎসবে আত্মীয়-বন্ধু-সহকর্মীদের ভীড়। সবশেষে তিনি এলেন—আর যুবক স্তব্ধ বিস্ময়ে লক্ষ্য করল—নদীর দু'পারের সাদা রঙ যাঁর স্মৃতি ঘিরে আছে, তাঁর শাড়ির গায়ে এতদিনে সবুজ সুতোর ফুল উঠেছে।

আশ্বিন ১৩৬৭/পরিচয়

অন্নদাশঙ্কর : জীবন ও সাহিত্য : সম্পাদকের অভিজ্ঞতা

ধীমান দাশগুপ্ত

'সুদীর্ঘ জীবন আমি করিনি কামনা।
আমার অন্বিষ্ট ছিল সম্পূর্ণ জীবন।'

অন্নদাশঙ্করের জীবন, সাহিত্য ও দর্শন বিষয়ে কোনো মূল্যায়নসূচক আলোচনা এবং তাঁর রচনাসমগ্র সম্পাদনা করতে গিয়ে অর্জিত ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার স্মৃতিচারণ—এই দুয়ের মধ্যে যেন সেই প্রকার সম্পর্ক বর্তমান যে দ্বিতীয়টি একটি রেখার মতো প্রথম ক্ষেত্রটির সঙ্গে সম্পর্ক রূপে যুক্ত।

সুতরাং ওই বিশেষ অ্যাপ্রোচ থেকে অন্নদাশঙ্করের জীবন, সাহিত্য ও চিন্তন বিষয়ে আলোচনা করলে তা কিছুটা সীমাবদ্ধ হতে বাধ্য, তবু 'পরিচয়'-এর শ্রদ্ধেয় সম্পাদক আমাকে যেরকম বলেছেন আমি সেই অনুসারে ওই সীমাবদ্ধ কিন্তু বিশেষায়িত প্রতিন্যাস থেকেই অন্নদাশঙ্কর রায়কে ধরার চেষ্টা করছি।

তাঁর সঙ্গে আমার প্রথম পরিচয় ঘটে ১৯৭৩ সনে যখন আমার বছর কুড়ি বয়স। পরবর্তী ছ-সাত বছর সময় ধরে আমার অধিক হৃদ্যতা ও মূল ঘনিষ্ঠতা ছিল লীলা রায়ের সঙ্গে। যে-কোনো কারণেই হোক তিনি আমাকে গভীর স্নেহের চোখে দেখেছিলেন। ফলে অন্নদাশঙ্করের সাহিত্যপাঠের পাশাপাশি আমি তাঁর সাহিত্যিক জীবন, ব্যক্তিজীবন ও চাকরি জীবন সম্পর্কে অনেক গুরুত্বপূর্ণ তথ্য লীলা রায়ের কাছ থেকে সংগ্রহ করি, যেসব তথ্য ছিল, অন্নদাশঙ্করের ভাষায়, 'ঘোড়ার মুখের খবর'।

তাঁরই ভাষায়, 'দস্তুরমতো প্রস্তুত' হয়ে আমি তাঁর একটি বিশাল সাক্ষাৎকার নিই ১৯৮২ সনে, বেশ কয়েকদিন ধরে। লেখক-প্রদত্ত উত্তরের ব্যাপ্তি ও গভীরতার দিক দিয়ে দেখলে যে সাক্ষাৎকারটি বস্তুত তুলনারহিত, ঈষৎ সংক্ষেপিত অবস্থায় যা 'মনস্বী অন্নদাশঙ্কর' গ্রন্থে স্থান পেয়েছে।

অন্নদাশঙ্করের রচনাসমগ্র সম্পাদনার প্রস্তাব আসে আমার কাছে ১৯৮৬ সনে। লেখকের সম্মতি চাইলে তিনি বলেন, 'বেশ তো। তুমি আমার সাহিত্যিক জীবন সম্বন্ধে যথেষ্ট ওয়াকিবহাল, ব্যক্তিজীবন সম্বন্ধে কিছুটা ওয়াকিবহাল, চাকরি জীবন সম্বন্ধে সামান্য ওয়াকিবহাল।' আমার পরিকল্পনার খসড়া তাঁকে পেশ করতে বলেন তিনি। আমি সময় নিই। প্রস্তাবটি সম্পর্কে লীলা রায়ের মত জানতে চাইলে তিনি বলেন, 'তুমি অবশ্যই ওনার রচনাবলী সম্পাদনা করবে।' অন্নদাশঙ্করের পূর্বোক্ত মন্তব্যের কথা শুনে তিনি আরও বলেন, 'হ্যাঁ, দাদুর রচনাবলী সম্পাদনা করতে হলে তোমাকে ওনার সম্পর্কে সব জানতে হবে।'

পরবর্তী তিন মাস ধরে প্রায় প্রতিদিন দুপুরে খাওয়ার পর রুদ্ধদ্বার কক্ষে লীলা রায় আমাকে অন্নদাশঙ্কর সম্পর্কে 'সব জানান'। জানান অজস্র তথ্য ও কথা, দেখান একরাশ

কাগজপত্র, পড়তে দেন 'সত্যাসত্য' ও 'রত্ন ও শ্রীমতী'-র বর্জিত রচনাংশ, পড়ে শোনান অন্নদাশঙ্করের কয়েকটি কবিতা ও ছড়া যা স্বামীকে প্রকাশ করতে দেননি তিনি, দেখান তাঁকে লেখা অন্নদাশঙ্করের চিঠি এবং নিজের সম্পর্কে যে নোট অন্নদাশঙ্কর দিয়েছিলেন তাঁকে, আর অন্নদাশঙ্কর সম্পর্কে তিনি যে পৃষ্ঠা ষাটেক ডায়েরি লিখেছেন, যা প্রকাশ করার জন্য নয়, তাও। ইত্যাদি ইত্যাদি সবকিছু। আমার 'বনফুলের কথাসাহিত্য' গ্রন্থটি প্রকাশিত হবার পর লীলা রায় বলেছিলেন, 'বনফুলের কথা উঠলে তোমার কী মনে হয়?'

—'আপনার কী মনে হয়?'

—'মনে হয় : ঘন মেঘ বলে ঋ,
দিন বড়ো বিশ্রী।

সেই ঘটনার কথা মনে করিয়ে দিয়ে আমি, এখন তাঁকে বলি, 'দাদুর কথা উঠলে আপনার কী মনে হয়?'

এক মুহূর্তও চিন্তা না করে তিনি বলে ওঠেন,
'রেগে বলে মূর্ধন্য ণ
যাব না তো কক্ষনো।'
—'দন্ত্য ন না মূর্ধন্য ণ?'
—'মূর্ধন্য ণ'।

ণ শোনার সঙ্গে সঙ্গে, চলচ্চিত্রের ছাত্র হিসাবে, আমার চোখের সামনে ভেসে ওঠে কয়েকটি ইমেজ বা মোটিফ : খাড়াই গড়ন, উল্লম্ব কাঠামো, চিরহরিৎ বৃক্ষতা, দ্য ভার্টিকাল ম্যান, ইত্যাদি। আর 'যাব না তো কক্ষনো' বাক্যাংশ যেন বুঝিয়ে দেয় সমস্ত ধৈর্য, স্থৈর্য, প্রশান্তি সত্ত্বেও অন্নদাশঙ্করের মধ্যে আছে এক ধরনের জেদ, অস্থিরতা, বিরোধ ও দ্বন্দ্বও। ক্রমে ক্রমে আমি উপলব্ধি করি, সমস্ত রকম বৈচিত্র্য, বিভিন্নতা ও বিবিধা ছাড়াও তাঁর জীবনে ও সাহিত্যে এসেছে, রয়েছে, বিভিন্ন টানাপোড়েন, বিবিধ সন্নিধি এবং অন্তত দুটি সংঘাত। এরা ক্রিয়াশীল তাঁর সমগ্র জীবন ধরে অথবা জীবনের নানান পর্বে, নানান স্তরে, বিভিন্ন সন্ধিক্ষণে।

সেই অনুসারে আমি রচনাবলীর বিভিন্ন খণ্ডের পরিকল্পনা ও প্রতি খণ্ডের খসড়া ভূমিকা করে লীলা রায়কে পড়ে শোনাই। দুটি জায়গা সম্পর্কে উনি বলেন, 'আমি মরে যাবার পর এটা ছেপো।' আমি নির্বিবাদে অংশ দুটি বাদ দিই। বর্জিত অংশ ছাড়া আর সবটা এবার পড়ে শোনাই অন্নদাশঙ্করকে। উনি শুনে বলেন, 'তুমি আমার সাহিত্যিক জীবন সম্বন্ধে সম্পূর্ণ ওয়াকিবহাল, ব্যক্তি জীবন সম্বন্ধে যথেষ্ট ওয়াকিবহাল, চাকরি জীবন সম্বন্ধে কিছুটা ওয়াকিবহাল। বেশ।' দুটি জায়গা সম্পর্কে তিনি বলেন, 'আমি বেঁচে থাকতে এগুলো ছেপো না।' আমি বিনা তর্কে অংশ দুটি বাদ দিই। বাকি সবটা তিনি অনুমোদন করেন।

সংক্ষেপে এই হলো রচনাবলী প্রকাশের প্রস্তুতিপর্বের পটভূমিকা।

'মুক্তা নেই, আছে গুটিকতক নানা রঙের ঝিনুক। সাগরতীরে বসে বসে বালুর ঘর

গড়েছে আর এই সব কুড়িয়েছে বিনু। সেই বালুর ঘরেও ভাঙন ধরেছে। আর সেই সব ঝিনুকও ক্রমে ফুরিয়ে আসছে। তা হলে, বিনু, তুমি করলে কী!...(তবু তাঁর) সৃষ্ট সাহিত্যের ব্যর্থতা নেই। বিনুর এই সব নানা রঙের ঝিনুক অদূর ভবিষ্যতে উপেক্ষিত হলেও সুদূর ভবিষ্যতে আকাঙ্ক্ষিত হবে, যদি থাকে তাদের মধ্যে একটি হৃদয়ের প্রেম, একটি মনের ধ্যান, একটি জীবনের স্বপ্ন, একটি মানুষের প্রাণ।'

অন্নদাশঙ্কর কখনোই নিছক লেখক নন, তাঁর চেয়ে বড়—কথাসাহিত্যিক; না, তার চেয়েও বড়—সাহিত্যশাস্ত্রী, চিন্তাবিদ ও জীবনশিল্পী। আর চিন্তাবিদ বলেই তাঁর জীবনে শুধু বৈচিত্র্য নয়, টানাপোড়েনও এসেছিল।

যেমন ষোল-সতেরো বছর বয়সে তাঁর ব্যক্তিজীবনে আসে এক দোটানা। এক হাত ধরে পশ্চিম তাঁকে টানে আধুনিক জগতের মুখ্য স্রোত যেখানে প্রবহমান সেখানে। আর এক হাত ধরে পল্লী তাঁকে টানে প্রকৃতির সঙ্গে নিবিড়ভাবে যোগযুক্ত ভারতীয় জনগণের মুখ্য স্রোত যেখানে প্রবহমান সেখানে। এ দোটানা তাঁর জীবনে আসে গান্ধীযুগের সূচনার সঙ্গে সঙ্গে। প্রথমে লেখাপড়া না সত্যাগ্রহ? তারপর পশ্চিমে না পল্লীতে? অন্নদাশঙ্কর একবার এদিকে ঝোঁকেন একবার ওদিকে। কিছুতেই মনঃস্থির হয় না। অবশেষে তিনি ইংরেজিতে লেখাপড়া করে পশ্চিমেই যাত্রা করেন। অবগাহন করেন আধুনিক জগতের মুখ্য স্রোতে।

তেমনি বাইশ বছর বয়সে তাঁর সাহিত্যিক জীবনে আসে আর এক দোটানা। ওড়িয়া ও বাংলা দুটি ভাষাই নয়, একমাত্র বাংলা ভাষা হবে তাঁর সাহিত্যের ভাষা, এমন একটা সিদ্ধান্ত নেওয়া তখন ছিল জুয়াখেলার সামিল। ওড়িয়া ভাষার প্রথম শ্রেণীর লেখক না হয়ে হবেন হয়তো বাংলা ভাষার দ্বিতীয় শ্রেণীর লেখক। কী লাভ? তিনি কিন্তু তখন এসব গণনাকে মনে ঠাঁই না দিয়েই বাংলা ভাষায় সরে আসেন এবং কালক্রমে বাংলা ভাষাতেও প্রথম শ্রেণীর লেখক হন।

তারপরে কর্মজীবন তাঁকে টেনে নিয়ে গেল প্রশাসনের জগতে। বাস্তব পরিবেশ ও অবস্থার মধ্যে। এমন এক জগতে যেখানে তাঁকে অসংখ্য মানুষের সুবিধা-অসুবিধার দায়ভাগ নিতে হয়, সুখ-দুঃখ পাপ-পুণ্যের দ্রষ্টা হতে হয়। আবার দোটানা। দুই চড়ার মাঝখান দিয়ে নৌকো চালাতে হয় তাঁকে। একদিকে রিয়ালিটির আকর্ষণ, অন্যদিকে সাহিত্যের আকর্ষণ। নৌকোটা শেষে ডুবতে বসেছিল। তাকে রক্ষা করার জন্য চাকরিটাই ছেড়ে দিতে হল। সাহিত্যকে ছাড়লে তিনি কেউ নন, কিছু নন; আর চাকরি রেখে সাহিত্য করলে তাঁর প্রত্যয়, সাহিত্যে একটা মাঝারি উচ্চতায় ওঠা যাবে, চূড়ান্ত উচ্চতায় নয়।

সাহিত্য ও জীবনের মধ্যে আর একটি টানাপোড়েন তাঁর এই যে, রবীন্দ্রনাথের কাছ থেকে তলস্তয়ের কাছ থেকে যে বিশুদ্ধ শিল্পাদর্শ তিনি আহরণ করেছিলেন—একদিকে সেই অত্যুচ্চ শিল্পাদর্শের প্রতি তাঁর টান, অন্যদিকে গান্ধীর প্রভাবে পড়ে সাহিত্যের মধ্য দিয়ে জনগণের জীবনের শরিক হবার বাসনা—যে টানাপোড়েন সাহিত্য জীবনের বিভিন্ন পর্যায়ে তাঁর সাহিত্যচেতনা ও গদ্যরীতিকে নিয়ন্ত্রিত করেছে। তাঁর শৈলীতে গান্ধীর বাক্‌রীতির যে প্রলেপ তার উৎস ওইখানে। এই টানাপোড়েন তাঁর শৈলীর ক্ষেত্রে এই রূপ পায়—আর্ট

কি আপনি আপনার উদ্দেশ্য, আপনি আপনার উপায়; না আর্ট তার চেয়ে মহত্তর আর কিছুর, তার চেয়ে বেশি কিছুর উপায়? রোলাঁ বা শেষ-বয়সের তলস্তয়ের দৃষ্টি ছিল জনগণের উপরে। আর্টের জন্যই আর্ট নয়, জনগণের জন্য আর্ট। কিন্তু এর বিপরীতে, অনেকের মতে, আবার, আর্ট সমঝদারদের জন্যে, বিদগ্ধজনের জন্যে। তা সর্বজনবোধ্য ও সর্বজনগ্রাহ্য নয়। তা উচ্চতর গণিতের মতো। আগে তো সরল গণিত শিখতে হবে। দুটি মত ও দুটি পথের সমন্বয় ও সংশ্লেষণ করে অন্নদাশঙ্কর ঠিক করেন, তিনি পাঠকদের দিকে অর্ধেক দূর যাবেন, পাঠকরা তাঁর দিকে অর্ধেক দূর আসবেন। তিনি যেমন তাঁদের জন্য শ্রম স্বীকার করবেন তেমনি তাঁরাও তাঁর জন্য শ্রম স্বীকার করবেন। বিশুদ্ধ আর্টের রসাস্বাদন ও রূপভোগের জন্য জনগণকেও প্রস্তুত হতে হবে। যা নিছক জনপ্রিয় তা রসোত্তীর্ণ ও রূপোত্তীর্ণ তথা দেশোত্তীর্ণ ও কালোত্তীর্ণ নাও হতে পারে। কিন্তু উত্তীর্ণ হওয়াটাই লক্ষ্য। তাই আর্টে তিনি ক্ষমতা বিসর্জন দিলেও রস বিসর্জন দেন না, রূপ বিসর্জন দেন না।

এইভাবে একটার পর একটা দোটানার সমাধান করতে করতে চলেন লেখক। আর টানাপোড়েনের চেয়েও যা বৃহত্তর কিছু তা-ও ঘটে তাঁর জীবনে। সন্নিধি। লীলা রায়ের ভাষায়, contradictions, paradoxes; আমার মতে, contradictions, paradoxes, polarities. অন্তত তিনটি।

একটি মনন বনাম বিশ্বাস। জীবন-দেবতার কাছে জীবনভর যে তিনটি বর তিনি চেয়েছেন তার একটি হলো প্রেম। তাঁর সত্তা তাঁর হৃদয় যেন সুধারসে ভরে যায়। তিনি যেন সেই রসের আস্বাদন পান ও দেন। তাঁর প্রেম যেন সকলের প্রতি প্রসারিত হয়, সকলের মধ্যে যিনি ঊর্ধ্বে তাঁর সমীপেও পৌঁছয়। এই বরের সুবাদে তিনি বুদ্ধিজীবীর চেয়ে বড়ো, একজন হৃদয়জীবী। মনস্বী হৃদয়জীবী। বীতশোক ভট্টাচার্যের ভাষায়, 'তাঁর রচনা এমন এক মননশীলতার জগৎ যেখানে বিশ্বাসীরা জেগে ওঠে।'

দ্বিতীয় সন্নিধি কর্তব্য বনাম রসের। তাঁর প্রার্থিত আর একটি বর হলো সৃষ্টির আনন্দ-বেদনা। তিনিও যেন কিছু সৃষ্টি করে যেতে পারেন। বিশ্বস্রষ্টা তাঁকেও যেন তাঁর সৃষ্টিশক্তির একটি কণা দেন। তাই দিয়ে তিনিও যেন সৃষ্টি করতে পারেন তাঁরও একটি ছোটখাটো কিন্তু স্বয়ংসম্পূর্ণ জগৎ। এই বরের সুবাদে লেখক একটার পর একটা সৃষ্টি করেন আর একটুর পর একটু মুক্ত হন। যদিও তাঁর প্রধান কাজ এই সৃষ্টি, তবু তাঁকে কখনো-কখনো সৃষ্টির কাজ সরিয়ে রেখে, রসের দায় সরিয়ে রেখে, দেশের ও কালের ভাবনার দায়িত্ব নিতে হয়। নইলে তিনি হবেন পলায়নবাদী। কিন্তু লেখকের যে হাতে গল্প-উপন্যাস লেখা সেই হাতে দায়িত্বের রচনা লেখা নয়। 'আমার ডান হাত চিরকালের মতো পিওর ডিলাইটের জন্যে রাখা। কর্তব্যের জন্যে বাম হাত।'

সবশেষে রিয়ালিটি বনাম ভিশন। তাঁর প্রথম বরটিই ছিল ইলুমিনেশন। তাঁর অন্তর যেন আলোয় ভরে যায়। বিশ্ব রহস্য যেন তিনি সেই আলো দিয়ে ভেদ করতে পারেন। সমস্ত যেন তাঁর কাছে পরিষ্কার হয়ে যায়। বারবার নিবিড় অন্ধকারের মধ্যেও তাঁকে বাঁচিয়েছে তাঁর এই জ্যোতির্ময় ভিশন। সব মিথ্যা হতে পারে, কিন্তু প্রত্যক্ষ উপলব্ধি কখনো মিথ্যা

হতে পারে না। তিনি বিশ্বাস করেন যে মানবজীবনই শেষ জীবন নয়। এই জগৎ অনাদি, অনন্ত, আপনাতে আপনি পরিপূর্ণ। দৃশ্যমান জগতের অন্তরালে আরও এক জগৎ আছে, প্রত্যক্ষ জগৎই সমগ্র জগৎ নয়, দুয়ে মিলিয়ে সম্পূর্ণ সৃষ্টি। চোদ্দ পনেরো বছর বয়সে একবার আর একুশ বাইশ বছর বয়সে একবার এক-এক মুহূর্তের জন্য তিনি বিশ্বরূপ দর্শন করেন, মুহূর্তের জন্যে সব আলো হয়ে যায়। তিনি সমগ্রকে দেখতে পান। বস্তুবাদী দৃষ্টিতে ভাবলে, বারো তেরো বছর বয়সে আর্টের গুরুগৃহে উপনয়ন যেন তাঁর প্রথম ভিশন। তেমনি বাইশ তেইশ বছর বয়সে ইউরোপের মাটিতে উপনীত হওয়া যেন তাঁর দ্বিতীয় উপনয়ন, দ্বিতীয় ভিশন। আর 'পথে প্রবাসে'-র বহিঃসৌন্দর্য তাঁর পঞ্চাশ বছর বয়সে এসে অন্তঃসৌন্দর্যে ডুব দেয়, 'ও', 'আর্ট', 'জাপানে' প্রভৃতি যার প্রমাণ, সেই তাঁর তৃতীয় উপনয়ন তথা তৃতীয় ভিশন। তিনি এইভাবে একই সঙ্গে মরমী ও যুক্তিবাদী। তাঁর অন্তরে একজন মিস্টিক ছিল, তাই তিনি কখনো পুরোপুরি র‍্যাশনালিস্ট হননি। তেমনি তাঁর ভিতরে একজন বিশ্বনাগরিক ছিল, তাই তিনি কখনও পুরোপুরি ন্যাশনালিস্ট হননি।

এইভাবে সমস্ত বৈচিত্র্য ও টানাপোড়েনের মধ্য দিয়ে এবং বিবিধ সন্নিধির ফলস্বরূপ তাঁর যে বিবর্তন ঘটে তা তাঁর জীবনে ও শিল্পে এনে দেয় 'জীবন বনাম শিল্প' এই চরম সংঘাত। যে সংঘাতের সংশ্লেষণ করেন তিনি জীবন ও শিল্পের এক নান্দনিক সমীকরণ ঘটিয়ে, যা তাঁকে শিল্পীর চেয়ে বড়ো করে তোলে, করে তোলে জীবনশিল্পী। শিল্পী না হয়েও একজন হতে পারেন জীবনশিল্পী যদি তাঁর জীবনটা হয় একটা সমগ্র ও অখণ্ড ব্যাপার, সেখানে কোনো ভাঙাচোরা নেই, অন্তঃবিরোধ নেই, অসংগতি নেই। জীবনটা একটা শিল্পকর্মের বা একখানা গানের মতো সুসংগত ও সযত্ন রচিত। সংগীতের নিয়ম মেনে, সংযম রক্ষা করে, নিষ্ঠার সঙ্গে ও অন্তর থেকে যে গানখানি গাওয়া। যাতে প্রতিদিনের প্রত্যেক কাজ পরস্পর সংগত হয়েছে, সবটা মিলিয়ে হয়েছে চমৎকার একটা ঠাসবুনন। তাতে অবান্তর কিছু থাকেনি, অভাবও থাকেনি কিছুর। জীবনকে পরতে পরতে পর্বে পর্বে আপন কণ্ঠে গাওয়া হয়েছে, আপন হাতে সাজানো হয়েছে। অন্নদাশঙ্কর এইভাবে একই সঙ্গে শিল্পী ও জীবনশিল্পী। রবীন্দ্রনাথের মতো। তাঁর জীবন 'কেন বাঁচব ও 'কেমন ভাবে বাঁচব' এ প্রশ্নের এক চমৎকার উত্তর।

সারা জীবন তিনি তাঁর ইচ্ছামতো বেঁচেছেন। আর সৃষ্টিশক্তিকে বাঁচিয়ে রেখেছেন। সেটাই তাঁর দীর্ঘদিন বেঁচে থাকার কারণ। 'নতুবা আমি কবে মরে যেতুম।' সারা জীবন তিনি আশ-মিটিয়ে বেঁচেছেন। সেই বাঁচা যেমন জীবনে—

জানি নাকো আমি কত দিন আছি
বাঁচতে শিখব যতদিন বাঁচি।

তেমনি শুধু জীবনে নয়—শিল্পেও। সশিল্প জীবনে—

দিবসরাত্রি সৃষ্টি যে করে
রসমাধুর্য বৃষ্টি যে করে
জীবন কি তার কখনো ফুরায়!
পেয়ালা যে তার ভরে পুনরায়।

এই বাঁচতে শেখার মোটো ও অনিঃশেষ জীবনের সাধনার জন্যই তাঁর অস্তিত্বকে জীবনশিল্প বলেছি। জীবন ও শিল্প যেখানে পরস্পর পরস্পরে ওতঃপ্রোত। জীবন কবে সম্পূর্ণ হবে? না, যেদিন সমস্ত লেখা সমাপ্ত হবে।

এই জীবন শিল্পবীক্ষার ক্ষমতা কতখানি তা একটিমাত্র উদাহরণেও স্পষ্ট হবে। অন্নদাশঙ্করের প্রথম দিককার উপন্যাসগুলির নায়কেরা তাঁর মতোই ভাবত, ভালোবাসার গভীরতা ও গাঢ়তা দীর্ঘদিন থাকে না, চিরন্তন একনিষ্ঠতা বলে কোনো কিছু হয় না, তাই তারা তাদের প্রিয়াদের চিরকালের মতো বিয়ে করবে, ভালোবাসবে ও শ্রদ্ধা করবে এমন অঙ্গীকার দিতে পারেনি। লীলা রায় আমাকে বলেছিলেন, '(তোমার) দাদু তো ভাবতেন আমাদের সম্পর্ক ছ'বছরও থাকবে না।' কিন্তু অন্নদাশঙ্কর ও লীলা রায়ের যুগ্ম জীবনের মধ্য দিয়ে আমরা দেখি, ভালোবাসার গভীরতা ও গাঢ়তা চিরকাল থাকে, থাকতে পারে, চিরন্তন একনিষ্ঠতা সম্ভব। আর এইভাবে ঘটে তাঁর বক্তব্যের ওপর ও তাঁর শিল্পের ওপর জীবনের জয়। লীলা রায়ের মধ্য দিয়ে অন্নদাশঙ্কর জীবনে শিল্পের সঙ্গে নারীকে সংযুক্ত করতে শেখেন। আর ষাট বছরেরও বেশি সময় ধরে 'লক্ষ্মী-সরস্বতীর যুগ্ম প্রতিমূর্তি' লীলা রায়ের সঙ্গে 'কৃষ্ণশঙ্করের যুগ্ম প্রতিমূর্তি' অন্নদাশঙ্কর যে স্বাস্থ্যও দাম্পত্য জীবন গড়ে তোলেন তা একটি গীতিকবিতার মতন সরস, সুন্দর ও সপ্রাণ। জীবনশিল্প এ-ই।

'এমন দিন কবে সত্য হবে
সকল লেখা হবে সাঙ্গ
প্রণাম করে যাব ধরিত্রীকে
জীবন হবে পূর্ণাঙ্গ।'

অন্নদাশঙ্কর যখন এই কথা বলেন তখন তাঁর সেই উক্তি হয় সন্তসুলভ উচ্চারণ। সেই নির্মোহ-সার্থক-চরিতার্থ-পূর্ণাঙ্গ, আবার অন্যদিকে দ্বন্দ্বময়-জিজ্ঞাসু-সতত সক্রিয়-মিথষ্ক্রিয়াশীল, জীবনের ধারাবাহিক আত্মপ্রকাশের বিবরণী অন্নদাশঙ্করের মুদ্রিত রচনাসমগ্রে রূপময়।

কী জীবনধারণে কী সাহিত্যের ধরনে কী চিন্তনের প্রকাশে অন্নদাশঙ্কর সর্ব অর্থেই একক ও অনন্য, এবং বিরল শ্রেণীর রূপদক্ষ বলে, আবার অন্যদিকে প্রচলিত অর্থে জনপ্রিয় লেখক নন বলে, একনিষ্ঠ ও দূরান্বিত বাঙালি পাঠক, গবেষক এবং ভাবীকালের জন্য তাঁর সমগ্র রচনা সুসম্পাদিত ভাবে খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশ করা বাঙালি প্রকাশকের পক্ষে একটা বড় কাজ ও গুরুদায়িত্ব।

রচনাবলী কেন—এই প্রশ্নের পর আসে লেখকের সমগ্র রচনার প্রাথমিক বিবরণ। অন্তত বাইশটি উপন্যাস, ডজন খানেক গল্প-সংকলন (মোট গল্পের সংখ্যা ৯১), ছয়টি কবিতার বই ও বেশ কিছু অপ্রকাশিত বা অগ্রন্থিত কবিতা, সতেরোটি ছড়া-সংকলন ও সামান্য কিছু অগ্রন্থিত ছড়া, ষাটটিরও বেশি প্রবন্ধ-সংকলন এবং ভ্রমণকাহিনী, কিশোর সাহিত্য, নাটক, চিঠিপত্র ইত্যাদি নিয়ে আরো তেরোটি গ্রন্থ, এ-ছাড়াও তিনটি মৌলিক ইংরেজি প্রবন্ধগ্রন্থ। এই প্রায় ১৩০টি বইকে অন্তর্ভুক্ত করার জন্য রচনাসমগ্রে অন্তত পঁচিশটি খণ্ডের প্রয়োজন হবে।

কার্যক্ষেত্রে তাঁর প্রবন্ধসম্ভার 'প্রবন্ধ সমগ্র' নামে আনুমানিক ১২ খণ্ডে প্রকাশিত হচ্ছে, যার ৭ খণ্ড ইতোমধ্যে প্রকাশিত (প্রকাশক : মিত্র ও ঘোষ) এবং সৃজনসাহিত্য 'অন্নদাশঙ্কর রায়ের রচনাবলী' নামে ১৩ খণ্ডে সম্পূর্ণ প্রকাশিত (প্রকাশক : বাণীশিল্প)।

এই বিপুল রচনাসম্ভারকে রচনাসমগ্রে অন্তর্ভুক্ত করার সময় প্রতিটি খণ্ডের জন্য আমাদের সূচিপত্র-নির্ধারণের-নীতি কী হবে? আমি যে পরিকল্পনা অন্নদাশঙ্করকে পেশ করেছিলাম ও তিনি অনুমোদন করেছিলেন, সেই প্রতিন্যাস অনুসারে, আমরা কালানুক্রমকে তেমন অনুসরণ করব না। হয়তো প্রথমদিকের দু-একটি খণ্ডে সময়ের ক্রমকে অনুসরণ করা হবে—বিশেষ একটা সময়ের মধ্যে লেখা যাবতীয় রচনাকে একটা খণ্ডে রাখব, কিন্তু বেশির ভাগ সময়ই অন্য নীতি অনুসরণ করা হবে। যেমন কখনো কখনো বিষয়বস্তুর ধারাবাহিকতা বা থিমের সাদৃশ্য অনুসারে এক বা একাধিক খণ্ডের সূচিপত্র নির্ধারিত হবে, অর্থাৎ সেখানে আমরা অনুসরণ করব ভাবগত নীতিকে। আবার কখনো বা ফর্মটি অনুসারে কোনো খণ্ড গ্রন্থিত হবে, হয়তো ভ্রমণকাহিনীগুলোকে নিয়ে একটা খণ্ড, বা সমস্ত ছোটগল্প নিয়ে দুটি খণ্ড, বা যাবতীয় ছড়া নিয়ে একটা খণ্ড। তিনটে পদ্ধতির প্রতিটিকেই আবার বিভাজিত করা যেতে পারবে অন্য দুটো পদ্ধতির কোনো একটাকে সহপদ্ধতি হিসেবে ব্যবহার করে। অর্থাৎ রচনাসমগ্রের পাঠযোগ্যতা ও দৃঢ়বদ্ধতা বৃদ্ধির জন্য আমরা মূলত অনুসরণ করব আপেক্ষিকতার নীতি।

বস্তুত এই আপেক্ষিকতা অন্নদাশঙ্করের একটি প্রধান বিশেষত্ব। তিনি যখন 'সত্যাসত্য'-এর মতো মননশীল উপন্যাস লিখছেন তাঁর সেই সময়কার গল্পে প্রাধান্য ব্যঙ্গ শ্লেষ ও কৌতুকের আর তৎকালীন কবিতায় প্রাধান্য আবেগ ও হৃদয়ানুভূতির। এই বহুমুখী ভাবানুভূতির কারণেই কখনো তাঁর মননের প্রকাশ প্রবন্ধে, প্রেমের প্রকাশ উপন্যাসে, জীবনদর্শনের প্রকাশ কবিতায়। কখনো তাঁর আবেগের প্রকাশ ছোটগল্পে, অন্তর্দৃষ্টির প্রকাশ ভ্রমণকাহিনীতে, ব্যঙ্গ শ্লেষ ও কৌতুকের প্রকাশ ছড়ায়। আবার কখনো তাঁর মননের প্রকাশ উপন্যাসে, অন্তর্দৃষ্টির প্রকাশ ছোটগল্পে, শিল্পদর্শনের প্রকাশ 'আর্ট' বা 'বিনুর বই'-য়ে। বিবিধ ভাব ও অনুভূতিকে একই সঙ্গে বিভিন্ন খাতে চালনা না করলে প্রাজ্ঞ লেখকের চলে না। রচনাসমগ্রের পরিকল্পনায় এর ওপর বিশেষ জোর দেওয়া হয়েছিল।

এই আপেক্ষিকতার সূত্রে অন্নদাশঙ্করের আরো অনেককিছুকে ব্যাখ্যা ও বিচার করা যায়। যেমন তিনি একই সঙ্গে কবি ও কথক। তাঁর জীবনবোধ যদি তাঁকে উপন্যাসাভিমুখী করে থাকে, করে থাকে বহিঃস্থ ও কেন্দ্রাতিগ, তাঁর জীবনবোধ তাহলে তাঁকে কাব্যাভিমুখী করেছে, অন্তঃস্থ ও কেন্দ্রাভিগ। তাঁর উপন্যাসে মহাজীবনের প্রতিভাস, কবিতায় আত্মজীবনের উদ্ভাস। তাই তাঁর কবিতায় স্বাভাবিকভাবেই ছিল তাৎক্ষণিকতার মোহ, ত্বরিতানুভূতির স্পর্শ। তাঁর উপন্যাস ও কবিতার মেজাজে সুস্পষ্ট বৈপরীত্য রয়েছে। বস্তুত তারা পরস্পর বিপ্রতীপতার সূত্রে নিবদ্ধ। তাঁর উপন্যাস দৃঢ় পুরুষালি মননশীল, কবিতা নমনীয় কমনীয় আবেগপ্রবণ। তাঁর প্রেমের উপন্যাসগুলিকে এই দুই বৈশিষ্ট্যের দ্বন্দ্ব, সন্ধি ও সমাস রূপে উল্লেখ ও বর্ণনা করা যায়।

অন্নদাশঙ্করের শিল্পমেজাজ মুখ্যত মহাঔপন্যাসিকের, বড় মাপের উপন্যাসের, মনোলিথিক স্ট্রাকচারের। কিন্তু সেইসব বৃহৎ উপন্যাসমালার ফাঁকে ফাঁকে তাঁকে নানা সময়ে ছোট কিছু উপন্যাসও লিখতে হয়েছে, মূলত প্রেমের উপন্যাস। তাঁর বড় উপন্যাসগুলি প্রধানত জীবনের রাজপথের কথা, ছোট উপন্যাস ক'টি জীবনের আলপথের কাহিনী। বড় উপন্যাস তিনটি যদি হয় কালের মহা-ইতিহাসের সঙ্গে যুক্ত, ছোট উপন্যাসগুলি তবে ব্যক্তিমানুষের পাতি-ইতিহাসের সঙ্গে যুক্ত। প্রেমের উপন্যাসগুলি যেন প্রেমিকের কথকতা, বড় উপন্যাসগুলি যেন মহা-ঔপন্যাসিকের কথকথা (ডিসকোর্স)।

আপেক্ষিকতা যেমন লেখকের সাহিত্য-চেতনা ও রচনার গঠন-কাঠামোর দিক থেকে, তেমনি বিশেষ কোনো ভাববস্তু বা থিমের প্রতি অ্যাপ্রোচ বা প্রতিন্যাসের দিক থেকেও। 'রত্ন ও শ্রীমতী'-র কথা ধরা যাক। একদিক থেকে দেখলে এই উপন্যাস বৈষ্ণব পদাবলীতে রাধাকৃষ্ণ প্রেমের যে লীলাব্যঞ্জনা তার প্রতীকে রচিত। সেই প্রতীক অনুসারে শ্রীমতী হচ্ছে রাধা আর রত্ন হচ্ছে কৃষ্ণ। অন্নদাশঙ্করকে নিয়ে 'সিংহাবলোকন' তথ্যচিত্র নির্মাণের সময় একটি ব্যক্তিগত সাক্ষাৎকারে লীলা রায় আমাকে বলেন, 'তোমার দাদু হচ্ছেন রত্ন কিন্তু আমি শ্রীমতী নই।' অন্নদাশঙ্কর নিজে একাধিকবার আমাকে বলেছেন, 'লীলা রায় হচ্ছেন রাধা। লীলা রায় ম্যাডোনাও।' পূর্বোক্ত সাক্ষাৎকারে লীলা রায় কিন্তু বলেন—আমি রাধা নই।

—তাহলে আপনি কে?

—আমি লীলা রায়।

তাহলে আমরা যা পাচ্ছি তা এই—

১. রত্ন হচ্ছে কৃষ্ণ, শ্রীমতী হচ্ছে রাধা।

২. অন্নদাশঙ্কর হচ্ছেন রত্ন, কিন্তু লীলা রায় শ্রীমতী নন।

৩. অন্নদাশঙ্কর তথা রত্ন কৃষ্ণ, আর শ্রীমতী ও লীলা রায় উভয়েই রাধা (যদিও লীলা রায় শ্রীমতী নন)।

৪. অন্নদাশঙ্কর তথা রত্ন কৃষ্ণ, শ্রীমতী রাধা, কিন্তু লীলা রায় রাধা নন।

এই চারটে অ্যাপ্রোচের যে-কোনো একটি বা একাধিকের সমন্বয় থেকে 'রত্ন ও শ্রীমতী'-কে পাঠ ও তার পাঠ্যবস্তুকে বিচার করা যায় এবং এই প্রকার এক আপেক্ষিকতাই অন্নদাশঙ্করের নান্দনিক সমীকরণের মূল বীজ।

সাহিত্যে ও জীবনে লেখকের যে টানাপোড়েন, সন্নিধি ও সংঘাতের কথা বলেছি সেই দ্বন্দ্বের পেছনেও এই আপেক্ষিকতার বিশেষ ভূমিকা আছে। একটা ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার কথা বলা যাক।

রচনাবলীর একটি খণ্ডে লেখকের সাতটি কবিতা-সংকলন অন্তর্ভুক্ত হয়েছিল : প্রথম স্বাক্ষর, রাখী, একটি বসন্ত, কালের শাসন, লিপি, নীড়, জার্নাল। তার মধ্যে প্রথম স্বাক্ষর, লিপি, নীড় ও জার্নাল কখনো স্বতন্ত্র গ্রন্থরূপে প্রকাশিত হয়নি, শুধু তাদের প্রত্যেকের অংশবিশেষ 'নূতনা রাধা' সংকলন-গ্রন্থে অন্তর্ভুক্ত হয়েছিল। রচনাবলীতে অন্তর্ভুক্তির সময়

লেখক শুধু ওই চারটি সংকলনের ক্ষেত্রে নয়, প্রকাশিত গ্রন্থ-তিনটির ক্ষেত্রেও, ব্যাপক পরিবর্তন ও পরিমার্জন সাধন করলেন। কখনো কখনো 'নূতনা রাধা'-য় প্রকাশিত অংশটুকুকেই মনোনীত করলেন, কখনো কখনো সেই অংশটুকুর সঙ্গে আরও কিছু নির্বাচিত কবিতা যুক্ত করলেন, কখনো কখনো সমগ্র অগ্রন্থিত পাণ্ডুলিপিকেই নির্বাচন করলেন, কখনো প্রকাশিত গ্রন্থ থেকে অনেক কবিতা বর্জন করলেন, এ-ছাড়া কবিতার নাম পাল্টালেন বা কবিতার স্বতন্ত্র নামকরণ বাতিল করলেন। তখন পর্যন্ত ওই। পরে যদি তাঁর আর কিছু সংখ্যক কবিতা সংযোজনের বাসনা হয় তবে 'নূতনা রাধা'-র রচনাবলী সংস্করণ হিসেবে রচনাবলীর পরবর্তী খণ্ডে তারা স্থান পাবে : এই আশাও প্রকাশ করলেন। কবিতা নিয়ে তাঁর এই সহজাত চাঞ্চল্য, অস্থিরতা ও অতৃপ্তি তাঁর জীবন ও সাহিত্যের অন্যান্য ক্ষেত্রেও লক্ষণীয়।

যেমন—যিনি কথাসাহিত্য, গদ্যসাহিত্য, ছড়াকর্ম ও ভাবনাচিন্তায় এত আধুনিক, তিনি তাঁর কবিতার আঙ্গিকে এত অনাধুনিক কেন : এ-প্রশ্নের এক সম্ভাব্য উত্তর খুঁজে পাওয়া যেতে পারে ওই দ্বন্দ্বের সূত্রে, 'চিরহরিৎ বৃক্ষ : অন্নদাশঙ্কর' গ্রন্থে আমি যার চেষ্টা করেছি।

লীলা রায়-কথিত contrast শেষদিন পর্যন্ত যে তাঁর মধ্যে সক্রিয় ছিল তার প্রমাণ— 'চিরহরিৎ বৃক্ষ' গ্রন্থটি যখন নার্সিংহোমে তাঁর হাতে দিতে যাই তিনি বলে ওঠেন, 'হা-হা, চিরহরিৎ বৃক্ষ এখন ভূপতিত মহীরুহ।' তিনি বললেন না, চিরহরিৎ বৃক্ষ এখন পাতাঝরা গাছ, বদলে বললেন, ভূপতিত মহীরুহ। বস্তুত মাত্রার পরিবর্তনের চেয়ে ঘাতের পরিবর্তনে তাঁর আগ্রহ ছিল সবসময়েই বেশি।

নার্সিংহোমে তাঁর ভর্তি হবার সপ্তাহ কয়েক আগে 'মীনপিয়াসী' গল্প থেকে শেষ অংশটি তাঁকে পড়ে শোনাই : 'ব্রহ্মাস্বাদ যতবার পাই ততবার পেতে সাধ যায়। ব্রহ্ম বিহারে তৃপ্তি নেই। মরণ এর কাছে কিছু নয়। ও আমি এক লাফে পেরিয়ে যাব।' পাঠ শেষ হতে তিনি বলেন, কিন্তু মৃত্যুচিন্তা এড়াতে পারছি কই? মৃত্যুভয় নেই, কিন্তু মৃত্যুচিন্তা তো রয়েছে।' শুনে আমি বিমর্ষ হয়ে বসে থাকি। তিনি ঝুঁকে পড়ে আমার কাঁধে হাত রেখে বলেন, 'ভেবো না। এক লাফে না হোক, দু-তিন লাফে পেরিয়ে যাব ঠিক।' মৃত্যুভয়হীনতা বনাম মৃত্যুচিন্তা— এই দ্বন্দ্বের এমন সরস, চরম সংশ্লেষণ কজন করতে পারেন তা আমার জানা নেই।

রচনাসমগ্রের বিভিন্ন খণ্ডের সম্পাদকীয়তে লেখকের সাহিত্যিক/সামাজিক/নান্দনিক মূল্যায়ন করতে চেয়েছি আমি সংশ্লেষণের বৃহত্তম পটভূমিকা থেকেই। অন্নদাশঙ্করের রচনাসমগ্রের যে সম্পাদনাকর্ম এক উত্তুঙ্গ মহীরুহের প্রতি শুধু ব্যক্তিগতভাবে আমার নয়, সমষ্টিগতভাবে আমার প্রজন্মেরও, ঋণস্বীকার ও ঋণশোধের এক সামান্য প্রয়াস।

গল্প

যাদুলাঠি

নীহারুল ইসলাম

অদ্ভুত এক অস্থিরতা গামা সেখের শরীরে, মনে।

এমন অস্থিরতায় বোধহয় দিনটাকে ভীষণ লম্বা মনে হয় তার। দিন তো নয়—যেন আকার পুকুরের পাড়ে বাঁশড়ায় তার সেই মানত করা বাঁশটির মতো দীঘল; বাঁশের ঝাড়ে যার আগা দেখা যায় না!

গামা সেখ বসে আছে দিন অবসানের দিকে তাকিয়ে। আজ আবার আকাশে মেঘের আনাগোনা। সঙ্গে পোড়ো বাতাসের মাতন। আশ্বিন মাস নয় তবু আশ্বিনে-ডাউরের লক্ষণ। বৃষ্টি নামবেই। শুধু সময়ের অপেক্ষা। গামাও সময়ের অপেক্ষা করছে। অপেক্ষা করছে রাত্রির, গভীর রাত্রির। যখন এই অমাবস্যার রাত্রে ভাল কিছু জেগে থাকবে না—সেই সময়ের, সেইক্ষণের। সেইক্ষণের জন্যে আজ পনেরোদিন সে অপেক্ষা করছে। অপেক্ষা করছে আকারপুকুরের পাড়ে বাঁসড়ার ভিতরকার একটি বাঁশের জন্যে, আজ পনেরো দিন যে বাঁশটির গোঁড়ায় তেল-সিঁদুর ঢেলে মানত পরে আসছে সে। গামার চরম আনন্দ হচ্ছে। এমন চরম আনন্দ থেকেই বোধহয় তার শরীরে মনে অস্থিরতা। ঝাড়ের ওই বাঁশটি হাতে এলে, তার আর কোনও দুঃখ-কষ্ট থাকবে না। ওই বাঁশটি তখন তার ইচ্ছে পূরণের যাদুলাঠি হবে।

গামা বসে আছে আকারপুকুরের উত্তর-পূর্ব কোণে ডুমুর গাছের নীচে একটি মাচার ওপর। সময় অসময়ে এখানেই সে বসে থাকে। বসে থাকতে তার ভাল লাগে। যদিও খুব নির্বিকার তার এই বসে থাকা।

আর সে এখানে বসে থাকে বলে এই আকারপুকুরের পাড়ে সচরাচর গ্রামের কেউ আসে না। তার কারণেই এই পুকুরটাও গ্রামবাসীর কাছে পরিত্যক্ত প্রায়। যেমন পরিত্যক্ত সে নিজে।

গ্রামের কেউ-ই তার সঙ্গে কথা বলে না। কেউ খোঁজখবর নেয় না। তাদের কথায়—"গামা এক হারামীর হদ্দ। জারোয়ার জারোয়া। ইনসান লয়, খাস ইবলিশের বংশধর, এজিদেরও। না হলে কি ছেলে হয়ে কেউ বাপের ভাতে বিষ মেশায়?"

হ্যাঁ, সে তার বাপের ভাতে বিষ মিশিয়েছিল। জন্মদাতা বাপকে সে জানে মারতে চেয়েছিল। বাপের ওপর তার যে খুব রোখ! শালা ওই বাপের লেগেই তার আজ এই অবস্থা। এই বাপের কারণেই রৌশন আলির বিটি নাসিরা তার বউ হয়নি। ছুঁড়ির বিয়ে হয়ে গিয়ে অন্য জায়গায়। অথচ নাসিরাকে সে যে ভালবাসতো, গ্রামের সবাই জানত সেকথা। এমনকী তার বাপ পর্যন্ত। তবু সালা বলেছিল কি না—"রৌশন আলির কুনো কৌম নাই।

তার বিটিকে হামি কী কর‍্যা ঘরে আনি বেটার বহু কর‍্যা?" আর তার বাপের অমুন কথায় রৌশন আলি বিগড়ে গেল। কৌম না আছে তো কী হল, তার জমি জিরাত আছে। টাকা পয়সা আছে। সে কেন ইউসুফ দর্জির অমন কথা সহ্য করবে! ইউসুফ দর্জি তো হাড়-হাভাতা মানুষ! নুন আনতে তার পান্তা ফুরোয়! নেহাতই বিটির জেদ দেখে গামাকে সে জামাই করতে চেয়েছিল। সে বলে এত অপমান! না, রৌশন আলি আর অপেক্ষা করেনি তড়িঘড়ি নাসিরার বিয়ে জুড়ে বসেছিল চন্দরমাটি গ্রামে।

গামার তাই রোখ চেপেছিল তার বাপ ইউসুফ দর্জির ওপর।

বাপকে সে বিষ খাইয়ে মারতে গেছিল। সাগরদিঘী বাজারে বিজয় ভকতের কাপড়ের দোকানের বারান্দায় ইউসুফ দর্জিগিরী করে। বাপের দুপুরের ভাত বাজারে পৌছে দিতে হত তাকেই সেদিনও পৌছে দিতে যাচ্ছিল। গামার মনে পড়ে সেদিনের ঘটনা। নাসিরার বিয়ে ছিল সেই দিনেই। গোটা গ্রামকে নেমন্তন্ন করেছিল রৌশন আলি। ইউসুফ দর্জিকেও করেছিল। কিন্তু ইউসুফ দর্জি সকালবেলা বাজার বেরিয়ে যাওয়ার সময় বাড়ির সবাইকে সাবধান করে বলে গেছিল, "খবরদার কেহু য্যানে রৌশনার বাড়ির দিকে পা না বাড়ায়! গোটা গাঁকে জিয়াফৎ কর‍্যা সালা জাতে উঠতে চাহিছে। ওই কর‍্যা কি জাতে উঠ্যা যায়! হলই বা জমি-জিরাতের মালিক। টাকা পয়সা না হয় আছেই বা। সে বুল্যা কৌম উঁচা করা কি অতই সোজা নাকি? ভাল বংশে জন্মাইতে হয় তার লেগে!"

নাসিরার বিয়ের দিন বাপের এমন কথা তার সহ্য হয়নি একেবারে। তবু সে ওই বাপের জন্যে ভাত নিয়ে যাচ্ছিল মাঠের রাস্তায়। তখনই তার ওই রোখ্ চাপে শালা বাপকে মারতে হবে। যেমন ভাবনা তেমনি কাজ—প্রথমে বাজারে ঢুকে সে বিষ কেনে। তারপর গণেশ ভিডিও হাউসের পেছনে খুপড়িতে বসে বাপের ভাতে বিষ মেশায়। বাপ মরেনি সে অন্য কথা! সে বলে গ্রামবাসী তো আর তাকে ভাল বলে না!

এমন আক্ষেপ সে একদিন করেছিল ভিখু ফকিরের ডেরায়। ভিখু ফকির সব শুনে বলেছিল, "ওভাবে কেহু বাপকে মারতে যায়! ভাতে বিষ ঢাললে ভাতের রং পাল্টায় যায়—সে কথা তোর জানা ছিল না। তো, যাক্‌গে এক কাজ কর এখন—সামনে কালীপূজা। যাদুলাঠির সাধনা করগা।"

—"যাদুলাঠি! সে আবার কী হবে?" গামা জানতে চেয়েছিল।

"সে তোকে বুলবোক্ষণ। আর এই জড়ক'টা মুরগীর আণ্ডার খোলসে ভরে তোকে পুঁতে আসতে হবে নাসিরার শ্বশুরবাড়ির কান্টায়। তাহলেই নাসিরা শ্বশুরবাড়ি থেকে পালিন আসবে। তখন তোর নাসিরার সঙ্গে মিলমিশের সুবিধা হবে। যদিও বাধা আসবে তোর পরিবার থেকি যেমন, তেমনি রৌশন আলির পরিবার থেকিও। এমনকী নাসিরার শ্বশুরবাড়ি থেকিও। সে সব সামাল দিবে যাদুলাঠি। তবে একটা কথা মুনে রাখবি যাদুলাঠি সাধন করতে হামি যা বুলবো তার একচুল এদিক ওদিক হলেই তোর বারোটা বাজবে কিন্তু!"

না, এখনো বারোটা বাজেনি গামা সেখের। এক এক করে পনেরোদিন যাদুলাঠির সাধন করে আসছে সে। ওই তো বাঁশঝাড়টা! ওই বাঁশঝাড়ে তার যাদুলাঠিটা আছে, আজ রাত্রে

যেটা তার হাতে আসবে। তারপর নাসিরা তার নিজের হবে। কারো কোনও বাধা নাসিরাকে তার কাছ থেকে দূরে সরিয়ে রাখতে পারবে না।

হঠাৎ বৃষ্টি শুরু হয়। গামা সেখ উঠে দাঁড়ায়।

এমন বৃষ্টিতে গ্রামে ফিরতে গেলে সে ভিজে যাবে। অগত্যা গামা সেখ হাঁটা দিল আকারপুকুরের দক্ষিণপাড়ে চন্দনবাবার মাজারের দিকে। সেখানে একটা চালাঘরে ফর্জন নামে এক পাগল থাকে। ওই চালাঘরটি গামাও তার সঙ্গীসাথীরা তৈরি করে দিয়েছির, ফর্জন যাতে ভালভাবে থাকতে পারে—এমন ভাবনায়। যদিও তাদের যথেষ্ট স্বার্থ জড়িয়েছিল। সেখানে বসে একটু নেশাভান করবে। মৌজমস্তি হবে। হতোও। কিন্তু গামা যেদিন তার জন্মদাতা বাপের ভাতে জহর মিশিয়েছিল, সেদিন থেকেই সঙ্গীসাথীরা তার সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করল। সেই থেকে ফর্জনের ঠেক্ এমন পড়ে থাকে। পুকুরের এপাড়ে বসে গামা তা রোজই দেখে। যেমন এখন দেখছে। চালাঘর থেকে মুখ বের করে ফর্জন প্রকৃতির মাতন দেখছে। আকার-পুকুরের পাড়ে গাছ-গাছালির মাথা সেজদা ঠুকছে যেন। পুকুরের পানিতেও একেবারে রীতিমতো আন্দোলন। সে আন্দোলন গামার অন্তরের আন্দোলনের মতোই।

চালাঘরে ফর্জন একা বসে আছে। তার নিস্পলক দৃষ্টি। গামা তার পাশে গিয়ে বসল। তবু তার দৃষ্টি সরল না, নড়ল না।

যদিও ফর্জনের কখনোই কোনও লক্ষ্য থাকে না। ফর্জন পাগল। সে নিজের মধ্যে থাকে। থাকে নিজস্ব ঘোরে। যেমন এখন আছে। আমরুল্লা হাজীর দেওয়া কম্বলটা জড়িয়ে রেখেছে শরীরে। গ্রীষ্ম-বর্ষা-শীত—সব ঋতুতেই কম্বলটা সে শরীরে জড়িয়ে রাখে। আমরুল্লা হাজী আজ আর বেঁচে নেই। তার এক ছেলে আছে—হাতকাটা নন্টু। নন্টুর মেলা বদগুণ। নন্টু নেশাভান করে। নন্টু জুয়া খেলে। নন্টু ঘন ঘন বিয়ে করে। এতকিছুর পরেও নন্টু কিন্তু ফর্জনের খেয়াল রাখে। মাঝে মধ্যে নন্টু ফর্জনের চালাঘরে আসে। গামা বহুদিন দেখেছে। ফর্জনের চালাঘরে নন্টুর আসা যাওয়া চলে। কী কারণে, তা গামা জানে না।

গামা যেটা জানে তা হল—নন্টুর চেয়েও সে খারাপ মানুষ। সে তার বাপের ভাতে জহর মিশিয়েছিল। জন্মদাতা বাপকে মারতে চেয়েছিল। সেকথা ভাবতে ভাবতে গামা লক্ষ করল ফর্জনকে। চালাঘরের একেবারে বাইরে বসে আছে ফর্জন। বাইরে তখন মুষলধারে বৃষ্টি ঝরছে। ওপাড় থেকে আসতে সে নিজেই কাকভেজা ভিজেছে। ছুটে এসেছে তবু। কিন্তু ফর্জন অযথা বৃষ্টির ছাটে ভিজছে কেন? তার শরীরের কম্বলটাও ভিজছে। কিন্তু কিছুই যেন এসে যাচ্ছে না তার।

গামার কিন্তু এসে গেল। সে ফর্জনের শরীরের লুটিয়ে পড়া কম্বলটা গুটিয়ে দিল। আর কী অবাক কাণ্ড—ফর্জনের ভাসাভাসা দৃষ্টি হঠাৎ-ই স্থির হল তার ওপর। তারপর ফর্জন স্পষ্ট হিন্দি উচ্চারণে বলল, গামা একঠো বিড়ি হোগা তেরে পাশ?

গামা প্রচণ্ড অবাক হলেও অবাক হওয়ার সময় যেন নেই তার। ফর্জন তার কাছে বিড়ি চাইছে। আগে সে ফর্জনকে একটা বিড়ি দিক্। তারপর ভাববে ফর্জনের কথা। স্বভাবতই

গামার মুখ থেকে বেরিয়ে এল, হাঁ-হাঁ হোগা ফর্জন বাবা—বিড়ি হোগা। দেতা হুঁ। বলেই সে নিজের পরণের লুঙ্গির বরগুন্ধি থেকে বিড়ির প্যাকেট বের করল। সঙ্গে একটা সস্তার লাইটার। প্যাকেট থেকে একটা বিড়ি আর সস্তার লাইটারটা এগিয়ে ধরল ফর্জনের সামনে। ফর্জন হাত বাড়িয়ে নিল। আর গামাকে বলল, গামা তু ভী পি একটো। আজ মৌসম বহুত আচ্ছা হ্যাঁয়।

গামা সেখ এসব দেখে অবাক হতেও ভুলে গেছে। ফর্জন বুঝি তার সঙ্গে রোজ এমন ভাবেই কথা বলে! তাছাড়া এমন মৌসম নিয়ে গামা মনে মনে বেশ বিব্রত ছিল। ফর্জনের কথায় তার সেই বিব্রতবোধ কোথায় হারিয়ে গেছে। তার সব ধ্যানজ্ঞান ফর্জন আকৃষ্ট করে রেখেছে।

হঠাৎ-ই গামার একটা বিড়ি ধরানোর ইচ্ছে হয়। কিন্তু, লাইটারটা তো ফর্জনের কাছে লাইটার চাওয়াটা কি উচিত হবে? গামার মনে দ্বন্দ্ব দেখা দিল।

জীবনে এমন দ্বন্দ্বের সম্মুখীন হয়নি সে। এই দ্বন্দ্ব তো তার নিজের সঙ্গেই। কই বাপের ভাতে বিষ মিশিয়েছিল যখন তার আগে তো মনে কোনও দ্বন্দ্ব জাগেনি। কিম্বা নাসিরার বিয়ে হয়ে যাওয়ার পরেও সে তো একবারের জন্যেও মনে হয়নি যে নাসিরা তার বউ নয়। বরং তার মনে হয় নাসিরা তার বউ-ই। আছে না হয় অন্য পুরুষের কাছে।

নিজের সঙ্গে এমন দ্বন্দ্বের মধ্যে গামা শুনল ফর্জনের কণ্ঠ—চিন্তা মত কর বেটা, তেরা কই কসুর নেহী।

যেমন ঝোড়ো বাতাস বইছে, তেমনি বৃষ্টি ঝরছে। চারিদিকে এমনই অন্ধকার যে বাইরে দু-চারহাত দূরের কিছু দেখা যাচ্ছে না। চালাঘরের ভেতরের কিছু দেখবার তো কোনও প্রশ্নই নেই। স্বভাবতই ফর্জনও গামার দৃষ্টিগোচর হয় না। কিন্তু ফর্জনের হাতের দু' আঙুলের ফাঁকে জ্বলন্ত বিড়িটা। আলো বলতে ওটুকুই। গামা তা দেখতে পায়।

গামা সেটার সাহসেই জিজ্ঞেস করল, মেরা কই কসুর নেহী—বাবা তুম কেয়া বলতে হো? একবার নয়-দুবার নয়—গামা বার বার জিজ্ঞেস করছে। ফর্জনের উত্তর নেই কোনো। সে তার আঙুলের ফাঁকে ধরা বিড়িটা সুখটান মেরে বাইরে ফেলে দিয়েছে। তাই চালাঘরে এখন কারো কোনও অস্তিত্ব আছে কিনা বোঝা যাচ্ছে না। গামা অন্তত বুঝতে পারছে না।

যদিও গামার কোনও ভয়ডর নেই। লোকে বলে গামার বুকের পাটা খুব। ছোট অবস্থা থেকে তাকে সবাই দেখছে। গামা বিষধর সাপ হাতে ধরে খেলা করে। গামা নির্দ্বিধায় দারোগা হাজীর সেই বড় ইদাঁরায় নামতে পারে। গামা গোরস্থানের ভিতর জঙ্গলে অনায়াসে বিচরণ করে। এমনকী এই সেদিন পর্যন্ত কালীপূজার আগে গ্রামে কেউ মরলে তার কবর পাহারা দেবার ভার পড়ত ওই গামার ওপরেই। কালীপূজায় নাকি শবসাধনা হয়। সেই কারণে কবর থেকে লাশ চুরি যায়। অনেকদিন আগে তাদের গ্রামের ইমরানের লাশ চুরি গেছিল। ক্ষেপা ইমরানের লাশ। কালীপূজা এলে সেকথা সবার মনে পড়ে। কিন্তু ফর্জন কেন কথা বলছে না আর? কেমন ভয় ভয় লাগছে যে!

সত্যি সত্যি বোধহয় গামার ভয় ধরেছিল। তাই সে জিজ্ঞেস করল, বাবা চুপ কিঁউ।

বলো। ফর্জনের তাও কোনও সাড়াশব্দ নেই। গামার তখন মনে পড়ে গেল ভিখু ফকিরের থা—"বাঁশসাধনা খুব কঠিন কাজ গামা, খুব সাহসের কাজ। খবরদার তোর বাঁশসাধনা রতে যাওয়া যেন কেহ দেখতে না পায়। খেয়াল রাখিস্। কেহ দেখে ফেললে সাধনা বরবাদ য় যাবে। তবে আসল পরীক্ষা তুই যখন বাঁশবাটিতে যাবি। বিলকুল ন্যাংটো হয়ে যেতে ব। কোমরের ডোরা পর্যন্ত রাখা চলবে না। আবার জিন-ভূতে পিছু লিবে। ভয় দেখাবে। ন্তু ভয় পেলে চলবে না। তারপর যখুন ওই বাঁশে হাত দিবি তখুন বাঁশ থাকবে না—প হয়ে যাবে। তাও ভয় পাবি না। হাতে ধরা দা দিয়ে মারবি ওই বাঁশের গোড়ায় এক াপ। যদি এক কোপে ওই বাঁশঝাড় আলগা হয় তাহলেই কার্যসিদ্ধি। না হলেই বিপদ।"

—"কেম্নু বিপদ ফকির ভাই?"

—"তুই পাগল হয়ে যেতে পারিস, বোবা হয়ে যেতে পারিস—এমনকী মরেও যেতে রিস। খেয়াল থাকে যেন।'

গামার সব খেয়াল আছে ঠিক্ঠাক্। ফকিরের নির্দেশমতো সে আজ পনেরোদিন পার রেছে। কিন্তু আসল পরীক্ষা আজ।

তবে সেটা এখনি শুরু হল নাকি? গামা ভাবল। অনেকক্ষণ ফর্জনের কোনও অস্তিত্ব বাঝা যাচ্ছে না। চালাঘরটি ভিতরে ও বাইরে একই রকম অন্ধকার। অথচ ফর্জনকে একবার দেখলেই যে নয়।

গামা অভ্যাসবশত পরণের লুঙ্গির বরগুঞ্জিতে হাত দিল লাইটারটির জন্যে। কিন্তু াইটারটি সেখানে পেল না। তখন তার মনে পড়ল সেটি তো ফর্জনকে দিয়েছিল সে। গরপর আর ফেরত নেয়নি।

—ফর্জনবাবা ও ফর্জনবাবা তুম কীধার? ব্যাকুল হয়ে জানতে চাইল গামা। তবু কোনও াড়াশব্দ পেল না। কিন্তু ঘনঘোর আকাশে বিদ্যুৎ চমকালো। ওই ঝিলিকে গামা স্পষ্ট দেখল র্জনের চালাঘরটিতে ফর্জন নেই। শুধু সে একা বসে আছে।

তখনও টিপটিপ বৃষ্টি হচ্ছে। চারিদিকে আশ্চর্যরকম নিস্তব্ধতা। গামা এবারে সত্যি ভয় পেল। সে ওই চালাঘর ছেড়ে বাইরে বেরিয়ে এল। যদিও তার ভারনা রয়েছে—এই ঝড়-বৃষ্টিতে ফর্জন কোথায় গেল তাহলে। আর গেল তো সে জানতে পারল না কেন? ফর্জন কে সত্যি তাহলে কোনও অলি-আওলা নাকি? গ্রামের বুজুর্গ লোকেরা বলে প্রায় এমন কথা। তার কখনো বিশ্বাস হয়নি। কিন্তু এখন, এই মুহূর্তে....

হঠাৎ গামার মনে কেমন সন্দেহের দানা বাঁধল।

যদিও গামা ভুলে যায়নি তার সাধন করা বাঁশটির কথা। রাত কত হল—কে জানে। এখন তার তাড়াতাড়ি বাড়ি ফেরা দরকার। বাড়ি থেকে সিঁদুর মাখানো দা-ওটা হাতে নিয়ে তাকে আবার আসতে হবে ওই ডুমুরতলায়। তারপর রাত গভীর হলে উলঙ্গ হয়ে সে যাবে ওই বাঁশড়ায়। যেখানে একটি বাঁশ তার যাদুলাঠি হবার অপেক্ষায় দাঁড়িয়ে আছে।

যাদুলাঠির কথা ভাবতে ভাবতে টিপ্‌টিপ্ বৃষ্টির মধ্যে বাড়ির পথে হাঁটতে হাঁটতে গামার খুব আনন্দ হচ্ছে। খুব-খুউব।

রাত কত হয়েছিল ঠিকঠাক অনুমান ছিল না গামার।

তবে একটা সময়ে 'এটায় সঠিক সময়' ভেবে গামা আকারপুকুরের উত্তর-পশ্চিম কোণে: ডুমুরতলা থেকে উলঙ্গ হয়ে হাঁটা শুরু করেছিল। ভয়ে তার গা ছমছম করছিল। তবু সেটা: স্বাভাবিক মনে করে সে ক্রমশ বুকে সাহস সঞ্চয় করছিল আর হাঁটছিল সেই বাঁশড়ার দিকেই আশে-পাশে, আগে পিছে জিন-ভূতের গতিবিধি ছিল কি না সে বুঝতে পারেনি। ঠিক্‌ঠিব বাঁশঝাড় পৌছে গেছিল সে। হয়ত গত পনেরোদিন ধরে তার অন্ধকারে বাঁশড়ায় যাতায়াত তাকে ঠিক্‌ঠাক পৌছাতে সাহায্য করেছিল। ঝাড়ের মানত করা বাঁশটিকেও চিনতে অসুবিধ হয়নি তার। কিম্বা অন্য একটি বাঁশ। যেটিকে বাঁহাতে ধরে, গোঁড়া অনুমান করে ডানহাতে ধরা দা-ও দিয়ে মেরেছিল এক কোপ। হাতে ধরা বাঁশটি কিন্তু তার একবারের জন্যেও মনে হয়নি সাপ কিম্বা অন্যকিছু। অথচ একটা তীব্র আর্তনাদ উঠেছিল বাঁশঝাড়ে। ঠিক যেন মানুষের কণ্ঠে। ভয়ানক সেই আর্তনাদ যা শুনে দ্বিগবিদিক জ্ঞানশূন্য হয়ে গামা ছুটতে শুরু করেছিল কিন্তু কিছুটা ছোটার পর তার মনে হয়—মানুষের কণ্ঠে আর্তনাদ। তাহলে কি অন্য কোনও মানুষের অস্তিত্ব ছিল ওই বাঁশড়ায়?

গামার অন্তরের ভয় হঠাৎ কৌতূহলে বদলে যায়। তখন সে আবার ফিরে আসে বাঁশড়ায় চারিদিক অসম্ভব রকম নিস্তব্ধ। যেন কিছুক্ষণ আগে এই বাঁশঝাড়ে কোনও আর্তনাদ ওঠেনি গামার অন্তত তাই মনে হয়। সে স্বাভাবিক হ'তে চেষ্টা করে।

আর তখনি খুব জোর বিদ্যুৎ চমকায়। তার ছটায় গামা একেবারে হতভম্ব হয়ে দেখে বাঁশড়ার ভিতর রক্তাক্ত ফর্জনের লাশ। কাত মেরে পড়ে আছে। কম্বলে লটাপটি। পাশেই দা-ওটা। ফর্জন এতরাত্রে কী করছিল তবে এখানে? গামার মনে এমন প্রশ্ন জাগেনি। কিম্বা অন্য কোনও ভাবনা। বরং অনেকদিন আগে গ্রামের লোক আবোল চোরকে পিটিয়ে মেরে পুঁতে দিয়েছিল এই আকারপুকুরের পলির মধ্যে, সেকথা মনে পড়ল গামার। সে তখন খুব ছোট ছিল। তবু সে দেখেছিল ওই ঘটনা। তার স্পষ্ট মনে আছে। তাই তার মনে হল— ফর্জনকে অমনভাবে পুঁতে দিলে কেমন হয়?

যেমন ভাবনা তেমনি কাজ। ফর্জনের শরীরের সেই কম্বলেই ফর্জনের লাশ পুঁটলি বন্দী করল গামা। তারপর সেই পুঁটলি নিয়ে সে নেমে গেল আকারপুকুরের পানিতে। কোনও রকমে পুঁটলিটা পানির তলায় পলির মধ্যে পুঁতে সে উঠে এল পাড়ে। সম্পূর্ণ উলঙ্গ শরীর তার। সেই শরীরে তীব্র ঠাণ্ডার অনুভূতি। সারা শরীর কাঁপছে তার। ভয়ে না ঠাণ্ডায়— সে বুঝতে পারছে না। তবে শরীর গরম করতে তাকে যে এখন ছুটতে হবে তা বুঝতে পারছে।

তাই বোধহয় সে ছুটতে শুরু করল। যদিও ছুটে কোথায় যাবে? কী করবে? তেমন কোনও ভাবনা চিন্তা করল না। এখন তার যাদুলাঠির কথা মনে নেই। মনে নেই নাসিরার কথাও। ছুটলে শরীর গরম হবে। আর ঠাণ্ডা লাগবে না। তাই তাকে ছুটতে হবে। এইসব ভাবতে ভাবতে সে ছুটছে তো ছুটছেই।

বৃষ্টি থেমে গেছিল বহুক্ষণ আগে। ঝোড়ো বাতাসও বন্ধ হয়েছে। একেবারে থমথমে আবহাওয়া। এমন আবহাওয়ায় ছুটতে ছুটতে গামা তার চলন্ত পায়ে লতানো কিসের ছোঁয়া পায় যেন। তবু কিছু মনে করে না সে। আরো কিছুদূর ছুটে যায়। তখন তীব্র যন্ত্রণার অনুভব হয় পায়ে। তবু ছুটে চলে সে। কিন্তু একসময় তার পুরো শরীরটা অবশ হয়ে আসে। সে আর ছুটতে পারে না। ঘুম ঘোরে আচ্ছন্ন হয়ে পড়ে তার চোখ। মুখ দিয়ে গ্যাজলা ওঠে। পায়ের যন্ত্রণা গোটা শরীরময় দৌড়ে বেড়ায়। তার মধ্যেই গামা দেখে নাসিরকে। দেখে বাপ ইউসুফ দর্জিকে। আর দেখে নীল ভাত। যে ভাত তার বাপ ইউসুফ দর্জি খায় না, বিজয় ভকতের কাপড়ের দোকানের নীচে রাস্তায় সন্দেহবশত আজড়ে দেয়। আর কোথা থেকে একটা নেড়ি কুত্তা সেখানে ছুটে আসে। গোগ্রাসে ভাতগুলি খায়, আর ছটফট করতে করতে মরে। কী ভয়ানক সেই মৃত্যু!

গামা সেখ দেখে...।

বিন লাদেন ও পেতলের নেমপ্লেট

প্রদীপ দাশশর্মা

সিভিল-এঞ্জিনিয়র না হলেও আশেপাশের সবাই টের পেয়েছিলো এখানে বড়সড় হাইরাই হবে। গোটা জায়গাটার খাল খিঁচে নিয়ে অনেক নিচে থেকে তবে কনস্ট্রাকশন। লগ মে মেরে ভিত পাথরের মতো শক্ত করা। বেশ কিছুদিন ধরে। পরে বিপুল নির্মাণ। এখন পর্ আটতলা উঠেছে। দুটো ফ্লোর বাকি। লোক ঢুকে পড়েছে। দুটো ফ্লোর হয়নি কারণ কী এব লিটিগেশনে, অন্য কোথাও, ফেঁসে গেছে প্রোমোটার। রাগ হবে না কেন পঙ্কজ সাহা সবটাই তাদের জমি। সাদার্ন-এভিন্যু বুকে নিয়ে। জোড়া-রাস্তার ওপারে লেক। রবীন্দ্র সরোব জমির এক পাশে ১৭ ফিটের রাস্তা কান্নি মেরে আছে। অনেকে, পুলিশের চোখের বাই সেখানে গাড়ি পার্ক করে। পেছনে মিনি ফুটবল-গ্রাউণ্ড। মানে, হা-হা আলো-বাতাস। পঙ্কে সঙ্গে বেশি বেগরবাই করতে পারেনি প্রোমোটার। চুক্তি অনুযায়ী, সাকুল্যে ছ-ছটি ফ্ল্য তিনটে দোকানঘর, আর ছলাখ টাকা তার। ন-দশ কমপ্লিট হলে আরও দুটো ফ্ল্যাট পা ক্যাশ পাবে না। বলা ভালো, সে এর মধ্যে পাঁচটি ফ্ল্যাট ঝেড়ে দিয়েছে। ট্যাক্স আর মাফি বাদ দিয়ে পরিষ্কার ৫০ লাখ। একটা ফ্ল্যাটে নিজে থাকে। আট তলায়। অনেকে বলেছে এখনও বলছেন, 'মশাই, নিজেরটা টপ-ফ্লোরে কেন? দোতলাটা নিতে পারতেন। কমফো লিফ্‌টের মতো যান্ত্রিক ক্রাচ নেই। অথচ, টুক করে, মাটিতে সিকি গড়িয়ে যাবার ম বড়ো রাস্তায় নেমে আসতে পারেন।' কিন্তু লোকে তো জানেনা আর, দোতলার ফ্ল্যা অন্যগুলোর চেয়ে ঢের বেশি পেয়েছে। হাজার চল্লিশেক। সে কী কম কথা। পাপিয়া মা মাঝে চেঁচায় : 'উফ্‌, কী গরম!' পঙ্কজ সাহা বলে, 'আরে বাপু, আরো দুটো ফ্লোর হবে। দেখে নিও, নেক্সট বৈশাখে জগৎ রক্ষিত ফের ঘটা করে ফ্ল্যাটে হাত দেবে। একব হাত দিলে এই বাড়ি চড়চড় করে উপরের দিকে রওনা দেবে। তখন মজা।' খোলা ছা গরম আর চুঁইয়ে চুইয়ে বুকে গড়িয়ে পড়বে না। 'আর পারি না' বলে পাপিয়া যখন-ত বুকের আঁচল নিচে ফেলে দেবে না।

পাড়ায় পঙ্কজ সাহাকে লোকে কাটছাট করে 'পাকা সাহা' বলে। কেউ কেউ আর সংক্ষেপে 'প. সা.'। যাই বলুক না কেন, সে যে ছোটবেলা থেকে বিস্তর পাকা—সন্দে নেই কারুর। সব ব্যাপারে মাথা গলায়। নাক গলায় বলা যাবে না। কারণ তার ন থ্যাঁতা-আদার টুকরো। মাথা গলাতে গলাতে কথা বলতে বলতে একসময় সে এরিয় লিডার। সবাই জানে, পাকা সাহা ওরফে পসা এই অঞ্চলে পার্টি করে। এসব নিয়ে বে কোনো আপত্তি করেনি। আর করলেই বা সে শুনবে কেন! কিন্তু কয়েক বছর পেরোে না-পেরোতে হাওয়ায় শুকনো পাতা ওড়ার মতো শোনা গেলো নানা গোলমাল। প

তাকে নিচে নামিয়ে দিয়েছে। রেগুলার, এই বয়সে, এতদিন পার্টি করার পর, মিছিলে হাঁটতে হবে, পোস্টার মারতে হবে। কিছুতে-কিছু-না, শেষ পর্যন্ত, কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্ক থেকে বড় সড় লোনে বাবু ফেঁসে গেলো। সময়মতো শোধ না দেওয়ার অভিযোগ পার্টিতে পৌঁছুলে আর কিছু করার রইলো না। পার্টি, বিশেষ হুটচটে না গিয়ে, মেমবারশিপের রিনিউয়াল দিলো না।

পাকা সাহা যে একেবারে বসে গেল বলা যাবে না। পি. ডি. এস.-তৃণমূল—দুই কোর্টে একাদোক্কা খেলতে শুরু করলো। তবে গা ঘামালো না। পার্টি থেকে তাড়িয়ে দিলে লোকে চিনতে পারে না আর। চিনতে চায় না। তাড়িয়ে দিলো বলে যে তার লজ্জা—তেমন নয়। সে এখন কাকের ঠোঁটে ঝুলে-থাকা শ্লেষ্মার মতো বিপজ্জনকভাবে ঝুলে আছে। যেমন সবাই, এসব হলে, থাকে আর কী। ফ্ল্যাট বেচে টাকা...। বড় কম নয়। পাকা সাহা গড়িয়াহাটায় সেলুনের জন্য দিব্বি একটা দোকানঘর নিয়েছে। সেলামি চার লাখ। আজকাল লোকে সেলুন বলে না। বিউটি-পার্লার। অথচ, পাকা নিজে বরাবর পালান-নাপিতের দুই হাতে মাথা দিয়েছে। পালান জুলপি-কাটার জন্য ক্ষুর বের করে। ছোট্ট গোল এনামেল থেকে কালো শান-পাথরে জল ঢালে। উল্টে-পাল্টে শান দেয়। তখন পাকার গা সুরসুর, গাল সুরসুর। বড় হলে, ঐ পালান-নাপিত তার অতি পুরাতন ভৃত্য-ক্ষুরে চপাস করে দাড়ি সাফ করেছে। পুকুরের সবুজ পানা সাফ করার মতো। পালানকে যদি জিজ্ঞেস করা হয় : 'তোর নাম পালান কেন রে...', সে উত্তর দেয় 'আমার হাতে সব সাফ হয়ে যায়, মুখের জঙ্গল, মাথার জঙ্গল পালিয়ে যায়। তাই আমি পালান।' এক দৃষ্টে হাতের ক্ষুরের দিকে তাকিয়ে থাকে সে। মুখে চাপা হাসি। পসা পালানের ছোটো আয়নাটা মুখের সামনে তুলে ধরে। উফ্, সব কিছু স্পষ্ট হয় না। বোধ হয় জাহাঙ্গিরের আমলের আরশি। না কি মান্ধাতার বাবার আমলের। কে জানে! পসা মাঝে মাঝে জিজ্ঞেস করে, 'পালানদা, তুমি জাহাঙ্গিরকে চেনো?' 'চিনুম না ক্যান। অরা সব ওপার-বাংলায় পলাইয়া গেছে।' চুল বা দাড়ি কাটার আগে কাঠের হাতবাক্স থেকে পালান কিন্তু আয়নাটা বের করে হাতে ধরিয়ে দেবে। তার আগে গামছা দিয়ে মুছে নেবে বারবার। আয়নায় নাকি খদ্দেরের আত্মবিশ্বাস বাড়ে। সেসব দিন গেছে। আজকাল পসা 'প্রিলে' দাড়ি কাটে। নিজের পার্লারে না। শ্রমিক-মালিক সম্পর্ক তো মধুর নয়। কে কোথায় কণ্ঠনালিতে ব্লেড চেপে ধরে।

পাকা সাহা ওরফে পসা বাপু বড় মানুষ। পকেটে টাকা ফর্ফর করছে, ব্যাঙ্কে টাকা, বিউটি-পার্লারে টাকা, ফ্ল্যাটে টাকা, ক্রেডিট-কার্ড, সেলফোন। পার্টি তার করবে কী! কাঁচকলা। পার্টি থেকে তাড়িয়ে দেবার পরেও তাকে ঘাটায় না কেউ। ক্লাবের ছেলেরা তার আস্তিনে। টাকা তো সে কম ঢালে না আর। পুজো হোক বা স্পোর্টস। এমনকী ছেলেরা ভালো জানে, পসাদাকে ধরতে পারলে, ঘ্যানঘ্যান করলে, চার-ছটা টিকিট ওয়ান-ডে ক্রিকেট পেলেও পাওয়া যেতে পারে। যায়।

পসা যে স্রেফ বিউটি-পার্লার করছে তা নয়, ফ্ল্যাটবাড়িও। নিজের বড় বড় কনস্ট্রাকশনে। জগৎ রক্ষিতের সঙ্গে। একেকটা ফ্লোরে ছোটবড় মিলে আটটি করে ফ্ল্যাট। কম তো নয়।

এ পর্যন্ত যদ্দুর উঠেছে তাতে সাকুল্যে ৮×৮=৬৪টি ফ্ল্যাট। আরও ১৬টি ওঠার অপেক্ষায়। একদম নিচে, কঙ্কুপের হলুদ তলপেটে, কমিউনিটি গ্যারাজ। এক কোণে অ্যাসবেস্টস শিরোধার্য করে যে ঘর, বেমানান, দাঁড়িয়ে আছে তা দারোয়ানের। পরে ভেঙে ফেলা হবে। একপাশে বিশাল রিজার্ভার। পাম্প-হাউস। ছাদে গোটা ছয়েক জাম্বো ট্যাঙ্ক। রেডিমেড। দশতলা শেষ হলে কংক্রিটের ট্যাঙ্ক হবে মাথায়। পাকাপাকি। প্ল্যানে ওরকম দেখানো।

সুবোধদা এসেছিলেন। ছিলেন তালপাতার সেপাই। সিড়িঙ্গে। এখন ক্রমে গোল। স্কুটারে পা তুলতে কষ্ট হয়। পাওয়ারে থাকলে মানুষ ওরকম গোল হয়ে যায়। বিরোধীরা বলে। অবশ্য তারাও যখন ক্ষমতায় আসে, গোল হয়ে যায়। রাজনীতিতে নাকি এরকমই গোল এবং মাল। সুবোধদা, লোকে কয়, মাল ভালো। তাঁর নেতৃত্ব নিয়ে, লোকাল ইউনিটে, গোল নেই তেমন। সেই সুবোধদা, পার্টির নয়নের মণি সুবোধদা বহিষ্কৃত পসার হাত চেপে ধরলেন। 'ভাই, একটা ফ্ল্যাট চাই। ব্যবস্থা করে দাও।' পসা হাসে। 'কমরেড, আপনাদের স্বভাব হল' সব কিছু নিয়ে দেরি করা। অ্যাদ্দিন ধরে কাজ হ'লো। একবারও বল্লেন না। এখন আর কোথায় পাবো। সব হয়ে গেছে। লোকজন ঢুকে পড়েছে। প্রপার্টি বলে কথা; তবে এইট্থ-ফ্লোরে হাত দেবে রক্ষিত। তখন পাবেন।' পসার হঠাৎই মনে পড়লো পার্টি থেকে বের করে দেবার সময় সুবোধদা তার পক্ষে ছিলেন না। শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত সুবোধদাকে বোবায় ধরেছিলো। এসব ঘটনা একটা খর্বুটে জীবনে থাকতেই পারে। এসব গলায় আটকে রাখলে চলে। তাছাড়া, সুবোধদা কড়ি ফেললে জগৎ রক্ষিত তেল মাখবে। এতে বলার কী আছে। পসা এক ধরনের ব্যালান্সড সিঙ্গলনেস্-এ যেতে চায়। তবু সে জমির মালিক। এখনও হামেশা তাকে কাগজপত্রে সই করতে হয়। সুবোধদা পাকা সাহার কাঁধে হাত রাখলেন : 'চলো ভায়া, তোমাদের ফ্ল্যাট দেখি।' 'ও. কে., চলুন।' প্রথমে ভেবেছিলো বলে : 'আজ নয় সুবোধদা, আজ বড়ো তাড়া আছে, K.M.C. যেতে হবে।' সুবোধদা ঢুকেই বললেন, 'বাহ্, চমৎকার সিঁড়ি। তোমার সিঁড়ি গিরি নয় হে। ভালো, ভালো। উঠতে কষ্ট হয় না। তবে দশতলা তো। সিঁড়ি আর কী কাজে আসবে! লিফ্‌টই যথেষ্ট। অবশ্য, বিকল হলে সিঁড়িই পরী। নইলে ঘেয়ো কুকুরের মতো ফ্ল্যাটের নোংরা নিয়ে সারাদিন কোমর ভেঙে শুয়ে থাকবে। পসা মনে মনে বলে 'হুঁ হুঁ বাবা, তোমার মতো সিঁড়ি বোঝে কে?'

—সুবোধদা, আপনি নতলা নেবেন না নাইনথ্ ফ্লোর, টপে...?

—লিফট থাকলে টপই ভালো। মশা নেই। চুরি হয় না। ওপর থেকে সবাইকে ছোট দেখায়। সে ভারি মজার!

উঁচুতে ওঠার মধ্যে সত্যি কি কোনো মজা, স্পোর্ট? বোঝে না পসা। তবে সিঁড়িতে বেশি ভিড় আর ফ্ল্যাটে আগুন লাগলে দমবন্ধ...। আহা রে...। পার্টির অন্তস্থ হায়ারার্কিতে ওঠা নিয়ে বিস্তর ভিড় ও ল্যাং-মারামারি, ফ্যাকশন...। আহা রে...। এসব থাকেই কারুর এতে কিছু করার নেই। তবে তুমি যদি সব দেখেশুনেও না দেখো, বাচাল না হও, গৌরাঙ্গে র মতো হাত তুলে থাকো, তবে সবটাই মাখন হে, মাখন। লেনিনের সময়েও এসব কাটাকুটি খেলা ছিলো। তাঁকে কি কম লড়তে হয়েছে। ওরকম ব্যক্তিত্ব, কারিশ্মা—তবে না পেরেছেন।

সে পারেনি। ফর্সা হয়ে গেছে। পার্টি থেকে। দোষ যে তার ছিলো না, তা নয়। তবে ১০০ ভাগ না। ১০১ ভাগ দোষ নিয়েও তো সুবোধদা পার্টিতে টিকে গেছেন। টিকে আছেন। ওঁর সম্পর্কে প্রথম সাবধান করে দিয়েছিলো কাজল। সুবোধদাকে দূর থেকে দেখিয়ে চুপি চুপি বলেছিলো, 'পসা, ঐ দ্যাখ ঘুঘু। ঐ পাখি ওপরের ডালের রে।' কাজল বেশি দিন পার্টিতে থাকেনি। তাকে তাড়ানোর আগে সে বেপাত্তা। কানে এলো পিপ্‌লস ওয়ার-গ্রুপে গেছে। কাজলের মতো লাজুক ছেলে পি. ডব্লু. জি. তে! ভাবতে পারে না সে। মনে আছে তখন তারা অনেক ছোট। খেলার পর ভেজা-স্কুল গ্রাউণ্ডে বসে আছে। পায়ে হাল্কা চোটের জন্য সেদিন কাজল খেলেনি। একসঙ্গে গুলতানি দিচ্ছে। হঠাৎ চিৎকার করে। ড্রেন-পাইপ প্যান্টের ভেতরে কী একটা সির-সির করছে। কোনরকমে ওপর থেকে চেপে ধরে অন্য হাতে টেনে বের করে দেখে একটা হেলে সাপ। নিজে বের করে ছুঁড়ে ফেলার পর অজ্ঞান। কাজল এরকমই। বরাবর এরকম। মুখ নিচু করে থাকে, ভিতু। মাস কয়েক আগে কাজলের বডি পুলিশ হাতে তুলে দেয়। এনকাউণ্টারে মারা গেছে। পি. ডব্লু. জি-র ওপর তেমন ভরসা নেই পসার। ব্যক্তিঘৃণা ও হত্যার রাজনীতি চায় না সে। আর সন্ত্রাস যে কত রকমের। তবু কাজলকে ভালোবাসে। ক্লাসে বরাবরের ফার্স্ট বয়, কলেজেও ফার্স্ট ক্লাস, সিঁড়ি বিনা, কোথায় চলে গেলো! এই চলে যাওয়া, একেবারে শেষ হয়ে যাওয়া, মানতে পারে না সে। পসা বস্তুত জানে পুলিশ কে? রাষ্ট্রযন্ত্রের ফিশ্চুলা। অপারেশন করলে রক্তপাত আর রক্তপাত। পুলিশ মদ খায় আর কালীপুজা করে। মদ খায় আর থার্ড-ডিগ্রি করে। মদ খায় আর নতুন প্রজন্মকে মেরে ফেলে। মদ খায় আর পার্টির নক্সি-কাঁথায় উল্টো-ফোঁড় হয়ে বেঁচে থাকে। পুলিশ এরকমই। তৃতীয় বিশ্বের পুলিশ। এতে অবাক হবার কী আছে। অথচ, নেশন-বিল্ডিং-এ এদের হাত থাকার কথা ছিলো। কাজলের বাবাও পুলিশ। সাব-ইনস্‌পেক্টর। মানুষের মৃত্যু হলে তবুও মানব থেকে যায়। কাজলের মৃত্যু হলে তবুও কাজল...। কালের বউ প্রতিমা কাজলের বডি, চেনার মতো ছিলো না যদিও, চেনে। কাজলের একমাত্র ছেলে, প্রতিমার নয়নের মণি টুবলু তখন ভাবলেশহীন। একবার মাত্র বাবার বুক স্পর্শ করে। প্রতিমা চেঁচিয়ে ওঠে, 'আস্তে, লাগবে।' টুবলু ঘরে ঢুকে যায়। বেরোয় না। মুখাগ্নি করে না। প্রতিমাও মুখে আগুন দেয়নি। বলেছিলো, 'আমি ধর্ম মানি না, আচার মানি না।' শ্বশুরের দিকে তাকিয়ে খুব ঠাণ্ডা স্বরে বলেছিলো 'পুলিশ মেরেছে, পুলিশই মুখে আগুন দিক।' ফলে, কাজলের এস.আই. বাবা ছেলের মুখে আগুন দেয়। কাজলের কথা বারবার মনে পড়ে পসার। মাঝে মাঝে মজা করতো। চায়ের কাপে মুখ দিতে দিতে বলতো, 'কাজলা, তুই একটা পৌত্তলিক...।'

—কেন?

—তোর বউয়ের নাম প্রতিমা

কাজল তখন মাথা নামিয়ে হাসতো। বরং, প্রতিমাই মুখ-ঝামটা দিতো। আপনারা তো আমাদের পুতুল ভাবেন মশাই। আমাদের ইচ্ছে-টিচ্ছের কি কোন মূল্য আছে। ইবসেনের 'ডলস-হাউস' পড়েছি। ছেলেবেলায়, মার হাত ধরে, তৃপ্তি মিত্রের অভিনয়ও দেখেছি।

কাজলের শব যখন পুলিশ-ভ্যান থেকে নামানো হ'লো তখন পসা অকুস্থলে। পাড়ার

অনেকে ছিলো। পসা দেখলো কাজল শুয়ে আছে। উঠলো না। চলতে গিয়ে ওর ডান হাতের চেয়ে বাম হাত বেশি দুলতো, দুললো না। সে তখন পুতুল। বলা ভালো, মমি। সর্বাঙ্গে ব্যাণ্ডেজ। মুখোমুখি যুদ্ধ হলে বুকে-পেটে ছ্যাঁদা থাকবে। রোগা-পাতলা চেহারা। পাতলা টিনের বুক। ছ্যাঁদা থাকবে না কেন? সারা শরীরে ওসব কিছু ছিলো না। সর্বাঙ্গে সিগারেটের ছ্যাঁকা। জ্যান্ত চামড়া তিলমাত্র ছিলো না। হিউম্যান-রাইটস-এর চোখে যাতে না পড়ে তাই সর্বাঙ্গে ব্যাণ্ডেজ। না কি বাপ পুলিশ...এটুকুই অ্যাডভান্টেজ।

অনেক ব্যাপারে দুনম্বরি হলেও, জীবনে অন্তত একটা পুন্যির হকদার সে। আটতলায় ওয়ান বেডরুম-ফ্ল্যাট, জলের দরে শুধু নয়, ইনস্টলমেন্টে, সুদহীন, করে দিয়েছে প্রতিমাদের। প্রোমোটার রক্ষিত, আর যাই হোক, চামার না। প্রতিমা প্রাইমারি-স্কুলে কাজ করে। বিয়ের আগে থেকে। সেটুকু করে বলেই, ঘোর রৌরবে, এখন মা-বেটায় লড়ে যাচ্ছে। পসা প্রথম দিকে ঘনঘন প্রতিমাদের ফ্ল্যাটে যেতো। এখন বড় একটা সময় পায় না। তবে বউ মেয়ে যায়।

ফ্ল্যাট দেখে সুবোধদা খুশি। জানলায় লোহার ফ্রেমে আঙুল-ছাপ কাচ। ভেতর ঘরে পুরু প্লাইয়ের দরজা। বাথরুমে সিনটেক্স। কাঠ-রং। ঐ দরজায় নাকি জলাতঙ্ক নেই। তবে, ফ্ল্যাটের সদর দরজা বড় বুলন্দ। মোটা শিশু-কাঠ। দরজায় স্পেশাল কব্জা। পান পাতা। ইন্টারলক। কাঠে চমৎকার উড-পালিশ। সুবোধদা প্রায় চমকে গেলেন। 'অ্যাতো, ভারী কাঠ কোথায় পেলে হে! আজকাল এসব তো উঠে গেছে। এখন হলক বা শিলিগুড়ি-শাল। রাজা রামমোহন রায়ের আমহার্স্ট-স্ট্রিটের বাড়ির দরজা না কি গোটাটাই বার্মা-টিক। আরে, ওসব কোথায় পাবে! টাকা দিলেও মেলে না।' একটু থামলেন,

—আচ্ছা, এতগুলি ফ্ল্যাট। দরজায় নেমপ্লেট দেখছি না কোথাও.....

—সুবোধদা, সব হবে। সবে তো ঢোকা হ'লো...

—হ্যাঁ, নেমপ্লেট করো। নইলে রামের বদলে রহিমের ঘরে ঢুকে পড়বে মানুষ। সে কী ভালো!

—না, না তা হবে কেন! সিঁড়ির পাশে সার সার লেটার বক্স...। দেখেননি? ওতে শাদা অক্ষরে নাম, ফ্লোর-নাম্বার

—হ্যাঁ, তা আছে। কে কোন ফ্লোরের? কিন্তু একেক ফ্লোরে তো অনেক ফ্ল্যাট। আটটা করে। কোন্‌টা কার?

মাথা নাড়ে পসা। হ্যাঁ নেমপ্লেট করে ফেলতে হবে।

—গ্রাউণ্ড ফ্লোরে, সিঁড়ির লেফ্‌ট-টার্নের ফ্ল্যাটটা লক্ষ্য করেছো? নেমপ্লেট আছে। তবে প্লাস্টিকের। এরকম সুন্দর কাঠ। ১নম্বর পালিশ। ঐ নেমপ্লেট মানায়! পুঃ। ব্রিটিশ আমলে এখনও টিকে থাকা কুঠি দেখেছো? আমি তখন নীলফমারি। মামার বাড়ি থেকে ক্লাস টু-তে পড়ি। রায়বাহাদুর যোগেন রায়ের পেল্লায় মহল। গেটের বাঁ-দিকের স্তম্ভে শ্বেত-পাথর। তাতে কালো অক্ষর : 'রায়-নিবাস'। নিচে ছোট হরফে 'রায় দুর গেন রায়'। আসলে ব্যাপারটা ওরকম না। অক্ষরে কালি মুছে গেছে। অস্পষ্ট ডটে, চোখ খর করলে বোঝা যায় পুরোটা

হল : 'রায়বাহাদুর যোগেন রায়। তাই বাবা, পাথর-টাথর না, প্লাস্টিক না, নেমপ্লেট করে ধাতুর। নিওন বিজ্ঞাপনে দেখেছো তো মোড়ের মাথায় ইংরেজিতে 'বাটা, 'আটা' হয়ে গেছে এর চেয়ে, পেতলের নেমপ্লেট করো। নাম এনগ্রেভড থাকবে। হাজব্যাণ্ড-ওয়াইফ। হ্যাপি ফ্যামিলি। সুখী গৃহকোণ, শোভে গ্রামোফোনে পৌঁছনোর আগে লোকে দেখবে দরজায় পিত্তল-পেট। নাম-কেত্তন...।

—সুবোধদা পেতলের প্লেটে নাম লেখে কারা? কোথায় মেলে? হাউ মাচ brass?

—আরে এসব বৌবাজারের ওদিকটায় পাওয়া যায়। মেলা কারিগর। সব মিলে মেটেরিয়াল নিয়ে পড়ে চারশো থেকে পাঁচশো। মোটা চাদরে বেশি পড়বে। এত সুন্দর ফ্ল্যাট ৫০০ টাকার জন্য তোমার ঘুম হবে না কি। রক্ষিত-প্রোমোটারকে বলো না নেমপ্লেটের ব্যাপারটা। সব কটা ফ্ল্যাটের একসঙ্গে করে দেবে।

ওসবে কান না দিয়ে পসা একদিন নিজেই বৌবাজারে যায়। দোকান খুঁজে পেতে অসুবিধে হয় না। যথারীতি অর্ডার দেয় নেমপ্লেটের। কাগজের টুকরো হাতে গুঁজে দিয়ে বলে স্পেলিং যেন ভুল না হয়। অক্ষরের টাইপ বেছে দেয়। দিন দশেক বাদে নিয়েও আসে। খুব বেশি পড়েনি। শুধু তো দুটো নাম : পাপিয়া সাহা আর পঙ্কজ সাহা। বাবু-বিবি। সাকুল্যে ৪২০ টাকা। আর বৌবাজার যেতে আসতে যা খরচ। পাপিয়ার নামটা আগে দেওয়াতে নিজেকে প্রগ্রেসিভ লাগছে। মালটা বাড়িতে এনে ভাবলো এখনই টানাবে কী না। মনে হ'লো, কাজল থাকলে কী বলতো। নেমপ্লেট দেখে শুক্তি চেঁচায় : 'বাবা, আমার নাম কই?' নাকে কাঁদে। অগ্নি পাপিয়া বলে, বোকা, তুই চিরকাল এখানে থাকবি নাকি! বিয়ে হবে না!'

এরপর আর বেশি সময় লাগে না। নিচের দোকানঘরে কার্পেন্টাররা কাজ করছিলো। ওদের একজনকে ডেকে কাঠে বেশ জম্পেশ করে লাগানো হল নেমপ্লেট। উল্টো ফ্ল্যাট থেকে, ঠোকাঠুকির শব্দে, একবার উঁকি মেরে ফের ডুবে গেল টুবলু। একটু শব্দ করে দরজা বন্ধ করলো। কোনদিন খুলিবে না আর! ওদের ওয়ান-রুম ফ্ল্যাটে বেজায় অসুবিধে। বাইরের শব্দ, ফাঁক পেলে, ভেতরে ঢুকে পড়ে। এর মধ্যে পড়াশুনো চালিয়ে যাও। করার বা আছে কী! বাইরের লোক সুবিধা অসুবিধা বোঝে না। পসাও বোঝে না। সে শুধু জানে মীনগণ হীন হয়ে ছিলো সরোবরে/এখন তাহারা মুখে জলক্রীড়া করে। কাজল মারা গেলে বা তাকে খতম করা হলে, সত্যি বলতে, প্রতিমা তার ছেলেকে নিয়ে হীন হয়েছিলো। এখন সংকট গেছে। এখন স্বস্তি। পসা একবার ভাবে প্রতিমাকে ডাকবে কী না। 'এই দেখো, প্রতিমা,... নেমপ্লেট। কেমন হয়েছে? পাপিয়ার নাম আগে...দেখেছো?' পরে ভাবে, নাহ্ ঠিক হবে না। যতই পাপিয়ার নাম টপে থাকুক না কেন, ওসব মধ্যশ্রেণীর চালাকি। নেমপ্লেটে অখণ্ড পিতৃতান্ত্রিকতা। ওরা পছন্দ করে না। কাজলের যা কিছু অপছন্দ, ওদেরও তাই। 'দি কিং ইজ্ ডেড, লং লিভ দি কিং।'

নেমপ্লেট দেখে সবাই প্রশংসা করলো। প্রতিটি লেটার আহা একেকটি সাউণ্ড। সাউণ্ড অফ মিউজিক। কত দাম পড়লো, আই মিন্ কত টিপ্স? কোত্থেকে করালেন মশাই?' : এসব প্রশ্নের জবাব দিতে দিতে, অচিরে, ফ্ল্যাটগুলির প্রায় সব দরজার শিশুকাঠে পেতলের

নমপ্লেট। প্রতিমা বা টুবলুদেরটা ছাড়া। বড়সড় হাইরাইজ। ৬৪টি ফ্ল্যাট। কম কথা। লিফ্ট াছে। সব দরজার বুকপকেটে ঐ নেমপ্লেট। চৌষট্টিটি ফ্ল্যাটে আহা চৌষট্টি-কলা! সত্যি লতে, চৌষট্টি নয় তেষট্টি। প্লেটের একেক রকমের সাইজ, নানা রকমের লেটারিং...। যা য় আর কী!

পসা শুধু নেমপ্লেটেই লাগায়নি। দরজা টানার জন্য সিংহের মুণ্ডুয়ালা ব্রঞ্জের আংটা খরিদ রলো। ভারী সুন্দর সিংহের কেশর। ডোকরা-শিল্পীদের কাছ থেকে কিনেছে। দামটা একটু বশি। তা হোক। জীবনে একবারই তো। নিজের বলতে আর কী আছে! স্থাবর বলতে এই ্যাট। ১১১০ ফিটের ফ্ল্যাটারি। সিঁড়ি ইনক্লুডেড। পসার মতো সকলের দরজায় যে সিংহের ুণ্ডু—তা নয়। তবে, প্রায় প্রত্যেকেই, দেখাদেখি, পেতলের নেমপ্লেট করলো। উজ্জ্বল। গ্লসি। উবাজারের কারিগরের মুখটা কেমন যেন লালচে সবুজ : 'ব্র্যাসো দিয়ে হপ্তায় একবার ষবেন স্যার। চোখ মারবে।' হাসতে হাসতে একটা ক্রিমের কৌটোও পুশ করে দিলো।

পসার পাশের মানে ডান দিকের ফ্ল্যাটের নেমপ্লেটে ড. কুসুমকলি রায়, এম. বি. বি. স (কোল), এফ. আর. সি. এস (লণ্ডন) লেখা। ঐ নামের নিচে ড. শিখা রায় (আই-স্পশালিস্ট)। শিখা-কুসুমের বিয়ে ভালোবাসা-বিয়ে। দুজনে নটা সোয়া নটা নাগাদ ভারী ফিস করে বেরিয়ে যান। উবু হয়ে রোজগার করেন। বাইরে, যে যার মতো, লাঞ্চ সারেন। জনেই এক নার্সিংহোম থেকে আরেক নার্সিংহোমে উড়ে যান। তারপর ক্লান্ত, বিবশ দুজনে াড়ি ফিরে, খোলস ছেড়ে, ঝগড়া করেন। ঝগড়া থামলে কুসুমকলির থ্যাবড়া মোটা আঙুলে াতলা কাচ। দুটো ড্রিংক ফিক্স করে শিখার হাতে একটা তুলে দেন। তারপর নগ্ন সাপের তো জড়াজড়ি করে শুয়ে পড়েন। নিরর্থক। সন্তানের স্বপ্ন তাতে থাকে না। পর দিন ফের নস্ত গোল্ড-রাশ। Money is the greatest where. বেশ্যার মতো কাপড় তুলে বসে াছে। আর পারিনা কাপুর।

পসার ফ্লোরে আরেকটি ফ্যামিলি। সি. কে. ব্যানার্জি। স্পোর্টসম্যান। 'অর্জুন' ষাট পেরিয়ে গছেন। কিন্তু শরীরের কাঠ অটুট। গলা একটু সরু। তা হোক। উনি নানা-ব্যাপারে টি.ভি.র ঙ্গে যুক্ত। টিউব-বেবি। মাথায় চুল কম। পেছন থেকে ব্রাশের ঝাপটায় টাকের ওপর ব্রলক্রিমে আলগা চুল পরিপাটি। হাসিখুশি। ছেলেপুলে নেই। সঙ্গে এক বামন ভাইপো। নমপ্লেটে তিন-নম্বরে, ভাইপো। পাশে লেখা : 'শেয়ার-ব্রোকার'। নেমপ্লেট করার আগে াসাকে ব্যানার্জি জিজ্ঞেস করে : 'মশাই নামের পাশে কী দোবো? বি. এস. সি., আর্জুন ্যাওয়ার্ডি? পসা হাসে। 'সবই দিতে পারেন। তবে 'অর্জুন' তো আর টাইটেল হতে পারে া, পুরস্কার।' এ কথায় থমকে যায় ব্যানার্জি। আহ্ সকলেই কি আর 'অর্জুন' পায়! নিচের ফ্লারে মি. কর থাকেন। এম. এ., এল.এল.বি। হাইকোর্টের হাতায় বসেন। ওকে জিজ্ঞেস করা যেতে পারে। এসব জিজ্ঞেস করলে, কে জানে, আবার ফি দিতে হবে কিনা! উকিল তো। বিশ্বাস নেই। সব খুঁদ খায়। কাক। ঐ বাড়িতে তিন ছেলেমেয়ে কলকল করছে। ভদ্রমাহিলাকে দেখলে বোঝা যায় আরেকটি কৌরব আসছে। করের সন্তান তো কৌরবই হবে। তা আসুক। ব্যানার্জির ওসব হ্যাপা নেই। সে এখন দূরদর্শনে রাইট-উইং দিয়ে বল বাড়াচ্ছে।

পসার নজরে এসেছে সেভেনথ্ ফ্লোরে সবচেয়ে হাসিখুশি মানুষ মেজর ঘোষ-দস্তিদার টাইগার, টাইগার বার্নিং ব্রাইট। রিটায়ার্ড আর্মি-ম্যান। এক ছেলে। বাইরে থেকে। মেরিন এঞ্জিনিয়ার। মেজরের স্ত্রী গতবছর মারা গেছেন। এই ফ্ল্যাটে তার আসা হয়নি। ফ্ল্যাটে ভাগ্য না কী সবার থাকে না। মেজর সিঙ্গল। পসার মনে হয় এ যেন ব্যালান্সড সিঙ্গলনেস অবশ্য একটা কুকুর আছে। টেরিয়ার। মাঝে ওঁর ফ্ল্যাট জমে ওঠে। বন্ধুবান্ধব আসে। সঙ্গে তাদের বউরা। সকলেই রিটায়ার্ড। মদের নদীতে তখন সবাই পুরনো ফ্রিগেট। ভাসে, ডোবে আর্মিতে থাকলে এসব হয়। তাছাড়া ছেলে অগ্নি যখন ফেরে তখন ভালো ভালো জম্পেশ মাল রেখে যায়। ভারমুথ থেকে ভদকা। পিও আর জীও। পসার সঙ্গে মেজরের বিলক্ষণ আলাপ। সে শুধু এক ফ্লোর বলে নয়। বেল টিপতে আর্মি-অফিসার ঘোষ দস্তিদার দরজা খুলেই বলে, 'ওয়েলকাম, ওয়েলকাম, ড্রিংকস?' কৃতজ্ঞ পসা বলে 'একটা ছোট...।' হাতের আঙুল গোল করে ফের বলে, 'স্মল'।

—ওকে, ওকে।

দুজনে মুখোমুখি। পসা বলে, 'স্যার, আপনার নেমপ্লেট এরকম ন্যাড়া কেন?

অমনি মাথায় হাত বোলায় বুড়ো। কই ন্যাড়া নয় তো সে। কদমছাট। পুরনো অভ্যেস থেকে গেছে।

—নেমপ্লেটে শুধু আপনার নাম। ছেলের নাম নেই কেন? আজকাল তো হোল-ফ্যামিলির নাম থাকে।

—'কেন ছেলের নাম থাকবে কেন? অল মাই মানি। তাছাড়া সে কি এখানে থাকে. আরে, এখানে এলে বেলেঘাটায় ওঠে। শ্বশুরবাড়িতে। আমার সাথে দেখা করে যায় মাত্র। নাম অগ্নি। শ্বশুরবাড়িতে জল।' একটু থেমে বলে, 'ভেবেছিলাম কুকুরের নামটাও দেব টাইটেল নেই বলে দেওয়া গেল না। হাঃ, হাঃ, হাঃ। 'তাছাড়া ব্যাটা ভারী নচ্ছার। কে জানে নিজের নামটাও হয়তো লাফ মেরে খেয়ে ফেলবে।' ফের হা হা করে হেসে উঠলেন আর্মি-ম্যান।

শালা দেখছি ছাগল। ন্যানি গোট। নেম-প্লেটের হেনস্থা সহ্য হয় না পাকা সাহার। গ্লাসের সবটা গলায় ঢেলে লাল মুখে উঠে আসে। ল্যাচ-ডোর আপনা থেকে বন্ধ হওয়ার আগে খড়ি-ওঠা কনুই দিয়ে আটকে রাখেন সেকেণ্ড-ওয়ার্ল্ড ওয়ারের ক্যাডেট গসদস্তিদার :

> 'Good-bye-ee ! Good-bye-ee
> Wipe the tear, baby dear, from your eye-ee
> Tho' it's hard to part, I know
> I'll be tickled to death to go
> Don't cry-ee !–don't sigh-ee...'

মেজরের মুখ লাল। কে জানে সকাল থেকেই খাচ্ছেন কী না।

পসা মাঝে মাঝে ভাবে নেমপ্লেট কেন! ওতে কী হায়ারার্কি হয়। আলবাৎ হয়। অন্যের চেয়ে আমি আলাদা, উঁচু, ভার্টিক্যালি প্লেসড।' আহা, কী আনন্দ, কী আনন্দ, দিবারাত্রি...।'

সে আপনি নিচের তলায় থাকুন, বা টপ ফ্লোরে। প্রতিমাকে একবার জিজ্ঞেস করেছিলো পসা :

—বৌঠান, দরজায় নেমপ্লেট লাগাবেন না?

অমনি টুবলুর ঠোঁট নড়ে ওঠে। এমনিতে সে বড় শান্ত, চুপচাপ :

—কেন?

—বাহ্, কাদের ফ্ল্যাট লোকে জানবে না!

—যাদের দরকার জেনে নেবে। এতে আমাদের করার কিছু নেই।

—বোকা। কলকাতা কী গ্রাম। এখানে সব কিছু নিজে খুঁজে নিতে, নিজের পথ নিজে বেছে নিতে হয়। নিজের পরিচয় নিজে দিতে হয়। কেউ শুনুক বা না শুনুক। আপনা হাত জগন্নাথ...টুবলুর ঠোঁটে ফিকে হাসি।

—তো কাকু, জগন্নাথ তো নুলো। আমরাও তো জগন্নাথ। চোখ গোল গোল করে থাকি। কাকু, নেমপ্লেট মানে গরিমা। কেবল উঁচু হয়ে ওঠা...। নয়া-উপনিবেশবাদী দেশগুলি তো সব আইফেল-টাওয়ার। উঁচু। ক্রমশ উঁচু...। এসব ঠেকাবেন না। বলুন তো এত কিছু থাকতে বিন লাদেন ওয়ার্ল্ড ট্রেড সেন্টারের জোড়া-স্তম্ভ বেছে নিলো কেন? হোয়াই-ই-ই...?

—ওতে মার্কিনী অর্থনীতির কেন্দ্রে আঘাত করা হবে, তাই। বোম্ব দি হেডকোয়ার্ডার্স।

—না কাকু, ঐ বিল্ডিং ওদের অভিমান। গরিব-গুর্বো দেশগুলিকে দেখানো আমরা তোমাদের চেয়ে কত উঁচু। ছুঁতে পর্যন্ত পারবে না হে...। আমরা কয়েকশো বছর বদলে বদলে টিকে আছি। থাকবো। আরো উঁচু, আরো আরো উঁচু হবো। তৃতীয় বিশ্ব ছুঁতে পারবে না আমাদের। কাকু, আমার আজকাল উঁচু কিছু ভাল্লাগে না। গর্ব করার, পরিচয় দেবার কী কাছে মানুষের! খামোখা 'নেমপ্লেট নেমপ্লেট' করছেন...। হোয়াই?

খানিকক্ষণ চুপ করে থাকে পসা ওরফে পঙ্কজ সাহা। ছেলেটা জানে না মার্কিনী সন্ত্রাসের মতোই বিন লাদেনের সন্ত্রাস ভালো নয়। দুটোই ক্রাইম এগেন্সট হিউম্যানিটি। ওয়ার্ল্ড-ট্রেড সেন্টারে, হায়, কত লোক মারা গেলো। পিটার সিগারের এক বন্ধু, এক গানের ছেলে মারা গেলো। সে তো জীবনে শুধু গান গাইতে চেয়েছিলো, আর কিছু না। আফগানিস্তানে কত লোক মারলো মার্কিনী ফৌজ? কত? আরে বাবা, লাদেন তো ওদের লোক ছিলো। কে না জানে! ১৯৯০-এ মার্কিনীদের তেল বাড়লো। সৌদি আরবে। মক্কার কাবায় বসে রইলো তো রইলই। নড়ে না। ফলে জেহাদ। ১১ই সেপ্টেম্বর...

পরদিন বিস্তর চেঁচামিচি। সবাই শুনতে পায়। পসার পরিত্রাহি চিৎকার : 'ভরদুপুরে কোন শুয়োরের বাচ্চা আমার নেমপ্লেট খুলে নিয়ে গেলো?' সকালে, দশটা নাগাদ, গড়িয়াহাট-পার্লারে যাবার সময় সে নিজের চোখে দেখেছে নেমপ্লেট। বিকেলে ফিরে দেখে নেই। বস্তুত কে বা কারা পঙ্কজ সাহার সাধের পিতল চুরি করেছে। ব্রোঞ্জের সিংহের মুণ্ডুয়ালা আংটা পর্যন্ত। 'সাধের ডোকরা রে-এ-এ..., চোরকে আইনো বাইন্দা..আ...আ।' পসা রাগে চৌচির। তবু, এত ছোট চুরি যে পুলিশের কাছে যাওয়া যায় না, চেঁচামেচি শুনে প্রথমে ফৌজি ঘোষ দস্তিদার এলেন। 'কী ব্যাপার!' পাশের ডাক্তার কুসুমখালি বাড়ি ছিলেন। বেরিয়ে এসে সব

দেখার পর বল্লেন, 'সামান্য নেমপ্লেট চুরি! ফানি।' অমনি ঘোষদস্তিদারের জিজ্ঞাসা : 'What do you mean, funny ? Funny peculiar, or funny ha-ha ?' আমার প্রবলেম অনেক। ভুলে একটা বেডশিট কিনে ফেলেছি মশাই। ডবল বেডের। আমার তো সিঙ্গল কট। কী করি বলুন তো!'

পরদিন ফের এক ঘটনা। গ্রাউণ্ড-ফ্লোর বাদে ৫৪টি ফ্ল্যাটের সব পেতলের নেমপ্লেট হাওয়া। একমাত্র ফৌজি ঘোষদস্তিদার ছাড়া আর সবাই হল্লা শুরু করলো। নেক-থানায়-ডায়েরি হল। বলা তো যায় না। বড় চুরি হতে পারে। ফৌজি শুধু বললেন 'আমারটা বাপু চুরি হয়নি, তাপু খেয়ে ফেলেছে।' তাপু কে? তাপু ওর কুকুর।

ঐ সব পেতল কোথাও না কোথাও বিক্রি করবে চোর। পুলিশ কয়েকটা ঠেকে গেলো। বৌবাজার পর্যন্ত বাদ গেলো না। যা হয়, কেউ ধরা পড়লো না। হঠাৎ পসার মনে হল গ্রাউণ্ডফ্লোরের নেমপ্লেটগুলি চুরি হল না কেন? তবে কী গ্রাউণ্ডফ্লোরের কেউ? ভরদুপুরে চুরি হচ্ছে। তবে কি লিফ্‌টম্যান ইয়াসিন। ওর তো আবার বৌবাজারে বাড়ি। ফের আলটপকা মনে হল' টুবলু...! সে তো আবার আটতলার...! তাদের অবশ্য নেমপ্লেট নেই। যায় না। তবে কী উঁচু মানুষের নেমপ্লেট নামিয়ে দেওয়া হ'ল...ওয়ার্ল্ড ট্রেড-সেণ্টার...বিন লাদেন...। রাতে ঘুমের ঘোরে পসা চিৎকার করে উঠলো : 'টুবলু-উ-উ...'।

অনুত্তরিত

মতি মুখোপাধ্যায়

তুমি নও, আমি নই, অন্য কেউ করেছে জিজ্ঞাসা,
উত্তর কী দেবে কুয়ো, জলে যার প্রখর পিপাসা।

শাখা ছিল, পাতা ছিল, অথচ ছিল না কোন গাছ,
ভেবে দ্যাখো জল নেই, শূন্যতায় খেলা করে মাছ।

এত কাছে নদীজল দু'হাত বাড়ালে যাকে পাই,
সে কেন বহতা তবু, সরে যায় যেই কাছে যাই।

শীতের রোদের মতো তুমি তার স্মৃতি পাশাপাশি,
মাঝখানে কেন আসে উত্তরের হিম রাশিরাশি।

কোথায় ফুটেছে ফুল নিরুত্তর বাহক বাতাস,
পথিকের মতো সে-ও সারাপথ ফেলে দীর্ঘশ্বাস।

এত পাতা খসে পড়ে, উড়ে যায় না রেখে ঠিকানা,
কেন তার অভিমান, কার জন্য, উত্তর অজানা।

যাও পাখি বলে আমি কখনো কি উড়িয়েছি তাকে,
সে নিজেই গেছে চলে হয়তোবা কারো নিশিডাকে।

অসুখ

জয়ন্তী রায়

বোকা ছেলে সরিয়ে নিল মুখ,
কোমল প্রতিচ্ছায়া ছেড়ে
ডুবলো খাদে, ধরলো তাকে
দুরন্ত অসুখ—
আগুন খাওয়ার ম্যাজিক শিখলো,
বোকা ছেলে কমলহীরে চেনেনি সে
সাপের মাথার মণির খোঁজে
ঘোর অরণ্যে শ্মশানচারী,
শান্তিও না মুক্তিও না
বোকা ছেলে আটকে গেল ফাঁদে—
পাঁকের কাদা জড়িয়ে নিল গায়ে,
জ্যোৎস্না মায়া 'আয় ডাকে আয়'
বৃষ্টিকাতর চুম্বনে চুম্বনে—

বোকা ছেলে সরিয়ে নিল মুখ,
মেঘের মায়া ধরলো তাকে
পাকে পাকে দুরন্ত অসুখ।

স্বভাব

বিকাশ গায়েন

স্পর্ধা বলব! উঁহু—সে তোমার অপার করুণা
সুবর্ণগোলক দুটি ছুঁয়ে
মাইরি বলছি হয়ে গেছি সোনা।
'বেশ এবার ভদ্র হয়ে বোস চুপটি করে'
আছি তো বসেই আছি সুবর্ণের হাত দুটি ধরে।

ছুঁলে শাস্তি? যদি. চাই গাঢ় প্রক্ষালন
'ঝেঁটিয়ে বিদেয় করব' বলাতেও সম্মতি লক্ষ্মণ
টের পেয়ে গেছি বুঝে শক্ত করে নিলে বজ্রগিঁট।

একথা সেকথা থেকে এতোল-বেতোল
পাড়ে এসে আছড়ে পড়ল জলের কল্লোল।

পাড় এবার চুপ থাকতে পারে?
ভাঙতে ভাঙতে ঢুকে গেল
একেবারে জলের গহ্বরে।
কী পেয়েছিলাম শুনবে? যেমন তিতকুটে বালি বালি
নিজেকে ধিক্কার দিই বন্ধুদের কথার জবাবে

হরিণী আপনা মাংসে; আমি বৈরী আপনা স্বভাবে।

নিশিযাপন

রমা চট্টোপাধ্যায়

আকাশ মেঘ বজ্র সচকিত
ছেড়ে যাবার পারস্পরিক ডাক
জারুল ফুলের বেগ্‌নে রঙে আভা
ধানের গন্ধে আমন বন হৃত
ব্যথায় ভরা বেদনা নির্বাক।

মুক্ত হবার প্রগলভতা কবে
যাবার আগে পৌঁছে দেবে কানে
বিনিদ্র এ রজনীসংবাদ
ছড়িয়ে দেবার বিদায় মহোৎসবে
দীর্ঘ পথের শেষে যে মন জানে।

বহুদিনের ব্যাকুল সাধ ছিল
তোমার সঙ্গে নিশিযাপন করি
দুঃসহ এ হৃদয় জ্বালা যত
সাপের পাকে মোড়া মনের ঘরে
স্মৃতির বিষ সুধায় দেবে ভরি।

নিরুক্ত এ অপ্রকাশের ব্যথা
প্রহর ভরে ছোবল হানে যেন
অশনি বাণ দহন জ্বালা নিয়ে
নিবিড় অমা তিমির হতে আজ
বাহির হবার স্বপ্ন দেখে কেন।

তোমার সুন্দরে

রাখাল বিশ্বাস

বিমূঢ় স্বপ্নের কাছে রেখে গেছি অবুঝ ক্ষরণে
আগুনের চূর্ণ শিখা, ফেরা নেই, সুনিশ্চিত মনে
কষ্ট ঝরে, ঝরে যায় ও মুখের আঁধারে আঁধার
অবেলার বৃষ্টিমাখা, বলেছিলে, তুমি ছিলে কার
সমূহ চেতনা ঘিরে, ফিরে গেছে নৈঃশব্দ্য বাতাসে
নিবন্ত ধ্বনির পাশে রক্তে মাখা অন্ধতাও হাসে
শরৎ ভুবন জুড়ে যন্ত্রণার মৃত্যু অবসরে
আমাকে ব্যাকুল করে ছিন্ন ঘুমে তোমার সুন্দরে।

মেঘ থেকে যায় পাহারায়

অরবিন্দ দাশগুপ্ত

ভয় করে, বড়ো ভয় করে দিনে রাত্রে
কারো মেয়ে গেছে, কারো বা গিয়েছে বউ
খোলা বাজারের বাঁশিতে ফেঁসেছে কেউ
হাড় বজ্জাত চিমনির ধোঁয়া বন্ধে
কাজ চাই, কিছু কাজ চাই দ্বিধা দ্বন্দ্বে
রাত ভোর হ'লে লুট ক'রে নেয় ট্রেনটাই
শুধু ট্রেন কেন, বাস ও গাড়ির ডিকিতে
ছিবড়ে করছে শরীর ও হৃৎপিণ্ড

বসে থাকি তাই, ব'সে থাকি খোলা জানালায়
দূর থেকে এসে 'ছুপি' দিয়ে যায় হাওয়ারা
শুধু মেঘ ডাকে, মেঘ থেকে যায় পাহারায়

ফিরে এলেই

সুদর্শন চৌধুরী

হাজার ঝর্ণার মুখে, পাথর চাপিয়ে বসে আছি;
আর প্রতিটি পাথরেই হাজার পাথরের নিষেধ।
ফুলের নদী...চারাকুঁড়ির ঢেউ...মুখ গুঁজে ফুলে ফুলে ওঠে...
কে যে কার সুখদুঃখ ভালোমন্দ বোঝে...ছায়া মায়া...
এইসব ছোটোখাটো দ্বন্দ্ব...অর্থ নিয়ে অহেতুক ঠুন্‌কো
অসার খণ্ডখণ্ড বিবাদ বিকার তারও ভালো লাগে না...

শব্দের কোটি সেনারা মুছে তৈরি হয়ে সেই কোন্
ভোরবেলায় গেছে মধু রেণু পরাগের খোঁজে...
বন্ধ কপাটগুলো খুলতে খুলতে বিছনতলায় ফিরে এলেই
নির্মাণ শুরু
আর চারিদিকে শুধু পাথর ভাঙার শব্দ নোতুনের বর্ণমালা
অলি-পলি-অংকুরের সহস্রধারায় অবিরাম অমৃত-মানুষ...

শূন্য প্রপাত

দীপশিখা পোদ্দার

হাতের মধ্যে ধরা ছিল হাত—একটুখানি আগে
বালিশ থেকে বেরিয়ে গেলে মাথায় বড্ড লাগে
অথচ এখন যূথবদ্ধ থাকাটা জরুরি
অত্যাবশক, কেননা পাখিদের ওড়াউড়ির
কোন নির্দিষ্ট সময়সীমা নেই। ওদের কাছে
(সংগোপনে বলি, আমাদেরই বা কতটুকু আছে!)
মৌলিকতা বলে কিছু নেই। কোনদিন থাকবে না
জীবনের সব সুন্দরতাগুলি পাখিদের কেনা
(সে থাক গে) আমার পাখিটি মনে হল কাল রাতে
ঠিকঠাক হাতটা রাখেনি আমার নিজের হাতে
তবে কি...তবে কি...সীমাহীন গভীর গোপনে, কেউ...

মন চেয়েছিলে যার বৈদূর্য বাতাসের ঢেউ...

সে হাতের ভিতরে ও কার রমণাভ্যাসী হাত।
ধরে আছে শুধু—ছুঁয়ে নেই—দ্যাখো শূন্য প্রপাত

শূন্য

বৃন্দাবন দাস

শূন্য যত টানে
সংখ্যা তার পিছু
ছাড়ে না

শূন্যে মায়া
শূন্যে ছায়া
শূন্যেই অফুরান আশ্রয়

আয়ু জানে
শূন্য দিয়েই
চারপাশে এতো
আহ্লাদ..........

তোমারও কি হয় ওরকম

মৌসুমী মুখোপাধ্যায়

কী হ্যাণ্ডসাম ও স্মার্ট ছেলে তুমি! এরকম আগে
কখনো দেখিনি। দেখে মনে হচ্ছে রোদের দুপুর,
টাটাচ্ছে। তাতাচ্ছে তো ছেলে 'দারুণ অগ্নিবাণে'

আর সেই শর সোজা গেঁথে যাচ্ছে
একেবারে হৃদিমধ্যে, হৃদয়ের তন্ত্রী পারাবারে

শিহরণ হয়, ক্রমশীর্ষে চলে শিহরণ
তারপর সেই ছোট কি যেন, ছোট্টো মুহূর্তের
তুমি কি ভাবতে পারো হ্যাণ্ডসাম ছেলে
তোমারও কি হয় ওরকম

কর্তব্য

পার্থ সরকার

এই পর্যন্ত এসে, থামাতে হচ্ছে তামাশা
জনমত সাড়া দিচ্ছে না।
যে যেটুকু পেয়েছেন, তা নিয়ে
বাড়ি ফিরে যান।
গ্যাস কমানোর দরকার, উনুন যেমন
জ্বলছে, জ্বলুক
বিরতি শেষে, আবার শুরু হবে তামাশা
তখনকার জন্য হাতে রাখুন গ্যাসলাইট
দেশলাই। আর.............
মাঝের বিরাম পর্বে
মগজে যেটুকু ঘিলু আছে, ছেঁচে ফেলুন।

মনিকা রায়ের দুটি কবিতা

বৃষ্টি

মাথায় ছাতা ছিল না
তাই ঝিরঝিরে বৃষ্টিতে ভিজতে হয়েছে.

ভিজলে সবাই বদলে যায়
শুধু পাতাবাহারী নয়, নেড়া গাছও ঝকঝক করে
ফোঁটা ফোঁটা বৃষ্টিতে ভিজে ঘাসের ডগা
আরও বেশি উজ্জ্বল হয়ে ওঠে

বৃষ্টিতে ভিজলে তোমার চোখও চকচক করে
কাঞ্চনজঙ্ঘার শিখরে সূর্যের প্রথম ছটা আছড়ে পড়ে
এসো আমরা বৃষ্টিতে ভিজি।

বকুনি

পড়া না করায়
স্কুলে বকুনি খাওয়ার কথা শুনে
মা খুব বকেছিলেন, বাবাও।

বকা তো খেতেই হতো কারণে-অকারণে
তোমার সঙ্গে বেড়াতে গেছি শুনে
দিদি আমার চুল বেঁধে দেয়নি তিন দিন
দাদার বন্ধুদের সঙ্গে খুনসুটিতেও
সে কি বকুনি।

এখন আমি চাকরি করি
বন্ধুদের সঙ্গে এখানে-ওখানে যাই
রাত বিরেতে ফিরলেও
কেউ বকে না
বেরোতে গিয়ে চৌকাঠে হোঁচট খেলে
মা আর বলে না—
একটু বসে যা

আমি সত্যি সত্যিই বড় হয়ে গেছি।

আমি এখন বকুনি দিই পুষিকেই
পুষি কি এ সব বোঝে।

শেষ বিউগল

জয়ন্তজয় চট্টোপাধ্যায়

মুছে গেল শেষ বিউগল—
এই উর্দি প্রিয় নয়, বাধ্যতামূলক
এই যুদ্ধ, হাহাকার, ক্ষয় অপচয়...

কোথায় কোথায় ছিল আমাদের গ্রাম
নিকোনো উঠোন, খেত, সূর্যালোক, টলটলে নদী
শিশুর কোমল স্বর, চুড়িশব্দে ভরে ওঠা ঘর।

বিস্ফোরণ, ছিন্ন দেহ, রক্তস্রোত আর
জলার ভেতরে একা শুয়ে আছি, হিম, অন্ধকার
ফিকে হয়ে এল ছবি, ফিরবো না আর

কোনদিন ফিরবো না আর...

করসেবা

সুবীর মণ্ডল

বয়ে যাই
যেমন তরলমতি, গড্ডালিকায়
বাঁকে বাঁকে
সন্ত্রাস, খুনী ঢেউ, পিলে চমকায়

চমকাই
মুঠো প্রাণ, রাতে দেখি হাঙরের দাঁত
একে একে
টেনে নেয়, যাহাদের যেদিন বরাত

সেই মত
লাল জল, সেই মত মাঝদরিয়ায়
পাক খেয়ে
ডুবে যাই, ফুটো ছিল তেঁতুলপাতায়

পাণ্ডুলিপির সংগে

(কবি অরুণ মিত্রের উদ্দেশ্যে)

শ্রাবণী ঘোষ

তোমাকে দেখিনি আমি। দেখতে বড়ো সাধ ছিলো ফুলের পাপড়ির মতো তোমার সর্বজয়ী হাসিটিকে। ছোট্ট জীবন নিয়ে যখন পাগলিনি প্রায়, আমার হা-হুতাস হতাশ জীবন, ঠিক তখন তুমি এলে আমার মাটির কুটিরে একগুচ্ছ পাণ্ডুলিপি হয়ে। কত কথা ঘুরে বেড়ায় খণ্ড খণ্ড হয়ে আমার বাড়ির অন্ধকারময় কোণায়। ঘরময় এখন আলোর প্লাবন।

খরগোশের শরীরের মতো নরম, ইদের চাঁদের মতো স্নিগ্ধ সেই কথারা গুহাবন্দি। আমি পা বাড়ালাম রক্তাক্ত পথে। প্রত্যেকটি পদক্ষেপ কন্টকময়। ক্ষতি নেই কিছু। তুমি প্রকাশিত হলে নিজস্ব স্পর্দ্ধায় পৃথিবীর শিরায় শিরায়। রোখা গেলো না তোমাকে। তোমার বলে যাওয়া অজানা কথারা নীল আলো হয়ে ফুটে থাকল মেঘাচ্ছন্ন আকাশের বুকে। তুমি হলে আকাশের সবচেয়ে উঁচু সেই তারা যার খসে যাওয়ার নেই কোনো ভয়। আমি কি মুক্ত? না কি সিক্ত? তবু, হে ঘুমন্ত কবি, তোমার কবিতার শব্দের বীজ বপন হোক পৃথিবীর ধূলিকণায়। সেই বীজ চারা থেকে বৃক্ষ হয়ে শিকড় গাড়বেই ঘর্মাক্ত পৃথিবীর মাটিতে। আমার রক্তাক্ত পথের দুপাশে চন্দনের গাছ সুগন্ধ ছড়াচ্ছে এখন। তুমি আর ঘুমিয়ো না কবি। তোমাকে ঘুমোতে নেই। তোমার বোজা দুটি চোখের পাশে ক্রন্দনরত হাওয়ার শন্‌শন্‌ শব্দ। তুমি জেগে ওঠো শুধু আর একটি বার।

নাট্য-সমালোচনা

শেক্সপীয়ারে নিজের মুখ দ্যাখা

ম্যাকবেথ
রচনা—উইলিয়াম শেক্সপীয়ার
ভাষান্তর—শ্রীঅশোক মুখোপাধ্যায়
প্রযোজনা—থিয়েটার ওয়ার্কশপ
নির্দেশনা—অশোক মুখোপাধ্যায়
আলোচিত অভিনয়—একাডেমী অফ ফাইন আর্টস মঞ্চ, জানুয়ারি-৫, ২০০৩

কলকাতায় প্রসেনিয়াম থিয়েটারের সূচনাকাল থেকে, পুরো উনিশ শতক জুড়ে স্ট্যাটফোর্ড অফ এ্যাভনের ত্রিলোকজয়ী নাট্যকার উইলিয়াম শেক্সপীয়ারই ছিলেন আমাদের সমস্ত নাট্যকর্মের মূল প্রেরণাস্থল। সামান্য কিছু ব্যতিক্রম বাদ দিলে তাঁকে অনুসরণ করেই আমাদের প্রসেনিয়াম থিয়েটার আবর্তিত হচ্ছিল। বলতে কি সে সময় আমাদের নাটকের ও নাটকীয়তার ধারণাটারই মূল উৎস ছিলেন তিনি।

এতৎসত্ত্বেও তাঁর নাটকের বঙ্গীকরণে সম্ভবত খুব স্মরণীয় কৃতিত্বের দাবি করতে পারব না আমরা। স্বয়ং গিরিশচন্দ্রের সফল অনুবাদ-প্রযোজনা, শ্রীযুক্ত নীরেন্দ্রনাথ রায়ের মূলত এ্যাকাডেমিক অনুবাদ বা রবীন্দ্রনাথের স্মৃতিচারণে বাল্যাবস্থায় ভাষা শিক্ষার স্বার্থে ম্যাকবেথের ডাইনি দৃশ্যের অনুবাদে স্বয়ং ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের মুখে সস্নেহ অনুমোদনের কথা মনে রাখলেও বরিস পাস্তেরনাকের মত মহীরূহ অনুবাদকেরা যেমন শেক্সপীয়রের অনুবাদকর্মকে নিজের অন্যতম প্রধান ব্রত বলে বিবেচনা করেছেন তেমন খুব উল্লেখযোগ্য অনুবাদের স্মৃতি আমাদের আলোড়িত করে না।

ফলে অশোক মুখোপাধ্যায় যখন 'ম্যাকবেথ' প্রয়োজনার উদ্যোগ নেন তখন প্রথমেই তাঁর সাহসী মনের পরিচয় আমাদের আকৃষ্ট করে, বিশেষত যখন জানতে পারি যে, ভাষান্তরের কাজটাও তিনি নিজেই করেছেন, এ ব্যাপারে আমাদের বিশিষ্ট কবিদের উদ্যমের অভাবকে কাজ না করার অজুহাত হিসেবে ব্যবহার করেন নি।

ফলে একদিকে যেমন তিনি এলিজাবেথান নাটকের—বহু পল্লবনকে এড়ানোর চেষ্টা করে নাটককে একালের উপযুক্ত গতির ওপর মনোযোগের চেষ্টা করেছেন, তেমনি আবার প্রয়োজনে কোথাও কোথাও এমন সংযোজন করেছেন, যেমন একেবারে পর্দা পড়ার ঠিক আগের মুহূর্তে মৃত ম্যাকবেথের মুখের ওপর আলোর বলয় যখন কেন্দ্রীভূত তখন নেপথ্য থেকে আর একবার 'কাল শুধু কাল শুধু কাল'—এই বিখ্যাত স্বগতোক্তি আবৃত্তির ভেতর

বিশাল এক ট্র্যাজেডির পরে দর্শকের মনের অনুভবের ভাষাটির প্রতি মনোযোগী হয়।

এমন এক সাফল্যের দিকে নজর যাঁর, তিনি স্বভাবতই প্রযোজনার সবগুলি বিভাগেই যত্নবান হবেন, সেটাই স্বাভাবিক। মঞ্চসজ্জা ও শিল্পরূপের ক্ষেত্রে সঞ্চয়ন ঘোষ এর মধ্যেই কলকাতার মঞ্চজগতে বিশিষ্ট হয়ে উঠেছেন। সঙ্গে পেয়েছেন নভেন্দু সেন ও মনু দত্তকে আর সেই সঙ্গে বিনু দত্তকেও। ফলে শেক্সপীয়রীয় মঞ্চের দৃশ্য-বৈচিত্র্যও রক্ষিত হয়েছে নাটকের গতিকে কিছুমাত্র ব্যাহত না করে। এই দৃশ্য কল্পনার সামর্থ্যেই বিভিন্ন তলের কয়েকটি পাতাটিনকে যে কল্পনাসামর্থ্যে ব্যবহার করা হয়েছে তার তরিফ না করে উপায় থাকে না। উপায় থাকে না যে সামর্থ্যে রূপান্তরিত হয়ে যায় লেডি ম্যাকবেথের শয়নকক্ষ এবং সামান্য অদল বদলেই তা হয়ে উঠতে পারে ডাইনিদের গোপন গুহা, যেখানে প্রবল উৎকণ্ঠায় ব্যাঙ্কোর প্রেতাত্মা আর তার বংশধরদের সন্ধানে ছোটেন ম্যাকবেথ। ওই একই কল্পনাসামর্থ্যে ডানসিনেনের দুর্গ থেকে ডানকানের প্রাসাদের উৎসমুখর পরিবেশ রূপান্তরিত হয়ে বুঝিয়ে দেয় যোগ্য রচনা কীভাবে আধুনিক নাটকের মঞ্চকে উপকরণবাহুল্য এড়িয়েও সার্থক করে তুলতে পারে।

বলাই বাহুল্য এর পেছনে নির্দেশকের সামর্থ্য প্রধান হিসেবে কাজ করেছে। যোগ্য সহকারী নির্বাচন তার প্রধান কৃতকর্মের মধ্যে একটি।

ম্যাকবেথের বিখ্যাত ডাকিনীরা এখানে শুধু কাহিনীর পথে প্রয়োজনীয় অলৌকিক চরিত্রমাত্র না থেকে তাদের শ্বেত শ্মশ্রু আর আটোসাঁটো জিনসের গুণে আমাদের আধুনিক কল্পনাকেও গভীরভাবে স্পর্শ করে। নাট্যকার-নির্দিষ্ট ভূমিকাটিকেও অতিক্রম করে হয়ে ওঠে ম্যাকবেথের জীবনকর্মের ভয়ংকর সঙ্গী ও নিয়ন্তা। ফলে এমনকি ম্যাকবেথের দুর্গদ্বারের প্রহরীর সঙ্গে তারা যখন নিষ্ঠুর কৌতুকেও মত্ত হয়, তখনো তার যথাযোগ্যতার সম্পর্কে আমরা প্রশ্ন তো করিই না, বরং তিনি Tent-এর ভেতরেও সামান্য কিছু নিজস্বতা যে যুক্ত করতে পারেন, তাতে পুরস্কৃত বোধ করি। এই সাহস এবং কল্পনাশক্তির গুণেই শেক্সপীয়ারের অতিপ্রাকৃত ডাইনিরাও, শেক্সপীয়রের প্রতি আনুগত্য বজায় রেখেও হয়ে উঠতে পারে অভিশপ্ত স্কটল্যাণ্ডের আত্মা, তার অনিবার্য নিয়তির নির্দেশক।

এ ব্যাপারে বিভিন্ন বিভাগে তাঁর যোগ্য সহকারীদের দক্ষতার কথা আগেই বলেছি। সঞ্চয়ন ঘোষ, মনু দত্ত, নভেন্দু সেনদের কথা আগেই বলেছি। পাশাপাশি জয় সেনের আলোক পরিকল্পনা ও পরিচালনার কথা না বললে অন্যায় হবে। নাটকটি যে শেষ পর্যন্ত আমাদের আচ্ছন্ন করে রাখতে পারে, তার অনেকটা তাঁরই গুণে। প্রথম দৃশ্যেই ডাইনিদের নাচে তীব্র অথচ মেদুর এক আলোছায়ার সৃষ্টি করেছেন তারই জোরে আমাদের মন পৌঁছে যায় প্রায় এক রূপকথার জগতের আলো আঁধারিতে, যার অভাবে নাটক হয়ে দাঁড়াতো যোগ্য আধারহীন। সেখানে পৌঁছানোর পর, ওই আলোরই জাদুতে আমাদের মনকে দৃশ্য থেকে দৃশ্যান্তরে চাপিয়ে নিয়ে যেতে পারেন, কখনো আলো ঝলমল ডানকানের রাজসভা, কখনো অতিপ্রাকৃতের স্পর্শ-লাগা ডাকিনীদের গোপন গুহা, কখনো লেডি ম্যাকবেথের শয়নকক্ষে, কখনো খুনের পরে পাপের যন্ত্রণায় কাতর ম্যাকবেথের মুখের ওপর তীব্র হাহাকারের আভাস-

জাগানো আলোকসম্পাতে। এক কথায়, জয়ের আলোকসম্পাতের গুণেই প্রযোজনাটি আকাঙ্ক্ষিত নন্দনমাত্রা অর্জন করে নিতে পারে।

অবশ্য সেই সঙ্গে গৌতম ঘোষের আবহরচনা অনিল সাহার শব্দ প্রক্ষেপণের সহায়তায় যথেষ্ট কার্যকরী ভূমিকা নিয়েছে সে কথাটাও উল্লেখ করা জরুরি।

যে কোনো নাট্যপ্রয়োজনারই প্রধানতম অবলম্বন তার অভিনয়। এ বিভাগটিতে নির্দেশক কতখানি কেমন সহযোগিতা পেয়েছেন সেটাও দেখবার। এ ব্যাপারেও নির্দেশক বিশিষ্ট সাহসিকতার দাবিদার।

ম্যাকবেথ বা লেডি ম্যাকবেথের জন্য তিনি স্বীকৃত মঞ্চসফল কোনো অভিনেতার উপর সম্পূর্ণ ভরসা করে থাকেন নি। যাঁদের নির্বাচন করেছেন তাঁরা কেউ আনকোরা নতুন না হলেও পাদপ্রদীপের আলোয় এখনো এতখানি পরিচিত নন যে বিজ্ঞাপিত হওয়া মাত্রই দর্শকেরা চুম্বকের টানে লোহার মত অনিবার্য টিকিটঘরের সামনে পৌঁছে যাবেন।

অবশ্য দেবনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়কেও তারিফ করতে হয় এজন্য যে অতীতে লরেন্স অলিভিয়ের বা অরসন ওয়েলস বা জাপানের পেসিবা মিফুনের বা আমাদের উৎপল দত্তের মত দিকপাল অভিনেতারা করেছেন এই অজুহাতে 'বাপরে' বলে পিছিয়ে না এসে বরং একজন দায়বদ্ধ অভিনেতার স্বাভাবিক দায় পালন করতে চেয়েছেন। ম্যাকবেথের বীরত্বের অন্তরালবর্তী লোভ, বীরত্ব সত্ত্বেও স্ত্রীর ব্যক্তিত্বের কাছে অসহায়ভাবে আত্মসমর্পণের দুর্বলতা, কঠিন পাপের পরিণামে অনুশোচনার তীক্ষ্ণতা তাঁর রূপায়ণে এতটাই মর্মগ্রাহী হয়ে উঠতে পারে যে, আগামী দিনে তাঁকে এখানকার প্রসেনিয়ামে এক বিশিষ্ট ব্যক্তিত্ব ও স্বীকৃত অভিনেতা বলে ভাবতে লোভ হয়। বিশেষত তাঁর মুখের অসমতল রেখাগুলোকে আলোর বৃত্তে এনে ব্যবহার করার সচেতনতা দেখিয়েছেন, তার প্রশংসা না করে উপায় থাকে না। সে জন্যেই মনে হয় প্রাসঙ্গিক অন্যান্য অঙ্গপ্রত্যঙ্গগুলিকে ততখানি সচেতনতায় ব্যবহার করেছেন কি?

এ নাটকে নামভূমিকাটির পাশে তাঁর স্ত্রীর চরিত্রও কিন্তু সমান অভিনিবেশ দাবি করে। সে ক্ষেত্রে আপেক্ষিক নূতনত্ব সত্ত্বেও আম্রপালী ঘোষ সকলেরই মনোযোগ আকর্ষণই করেন।

একই সঙ্গে উচ্চাশায় লোভী এবং হিংস্র, ফলে পরিণতিতে মানবিক দুর্বলতায় করুণ চরিত্রটি সম্ভবত শেক্সপীয়রের নাটকগুলির মধ্যে অন্যতম প্রধান ব্যক্তিত্বময়ী নারী চরিত্র। আম্রপালীও কখনো কখনো তাঁর কণ্ঠস্বরের মাত্রাময় প্রক্ষেপণে আমাদের যে সত্যিকারের নানা মাত্রাময় শেক্সপীয়রীয় ট্র্যাজেডির অভিজ্ঞতায় পৌঁছাতে সাহায্য করেন অন্তত আমার মত একজন অপণ্ডিত নাট্যামোদির মেনে নিতে সংকোচ হয় না। বিশেষত যে সমস্ত ক্ষেত্রে তিনি কণ্ঠস্বরকে খাদে রেখে মনের দ্বিধা ভয় আর মানবিক সংঘাতকে ফুটিতে তুলতে পারেন তাতে তাঁর সম্পর্কে আমাদের প্রত্যাশা আরো বেড়ে যায়।

ডাইনি তিনজন স্রেফ আঙ্গিক অভিনয় আর কোরিওগ্রাফির সামর্থ্যে যেভাবে প্রায় সমস্ত নাটক জুড়ে মূর্ত করে তোলেন অনিবার্য সর্বনাশ তার জন্য সেই তিনজন অর্থাৎ তৃষ্ণা বসু, আনন্দী বসু আর মৌমিতা ভট্টাচার্যকে অভিনন্দন জানাতে হয় এবং তাঁদের নির্বাচন করার জন্য আবার সেই নির্দেশককে।

কৃষ্ণগতি চট্টোপাধ্যায়ের ব্যাংকো একই সঙ্গে চরিত্রটির সাহসের পাশাপাশি তীক্ষ্ণ বুদ্ধির রূপায়ণ ঘটিয়েছেন তাতে বোঝা যায় যে চরিত্রটির প্রতি তিনি আন্তরিক নিষ্ঠায় লগ্ন হতে পেরেছেন।

অনিল সাহার ডানকান স্নেহ পরবশ এবং সে কারণে নিয়তি লাঞ্ছিত চরিত্রটি আমাদের মনে স্থায়ী রেখাপাত করতে পারেন। কমল মান্নার ম্যাকডাফ ঈষৎ উঁচু পর্দার হলেও ক্রোধ, ঘৃণা, হতাশা প্রভৃতি প্রতিটি অভিব্যক্তিতেই স্বাচ্ছন্দ্যের পরিচয় রেখেছেন।

স্বপন বন্দ্যোপাধ্যায়ের চিকিৎসক মঞ্চে তাঁর সংক্ষিপ্ত উপস্থিতিতে পরিমিতিবোধ ও উপযুক্ত সংযমের সামর্থ্যে পরিস্থিতির অনুকূল অভিনয় করে আমাদের সম্মান আকর্ষণ করেন।

অন্যান্যদের ভেতর নীলাভ চট্টোপাধ্যায়ের রস, সুমিত্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের ম্যালকম, অরিজিৎ হালদারের ফ্লিয়ান্স, পরিচারিকার ভূমিকায় সঙ্গীতা কর্মকার প্রভৃতি প্রায় সকলেই যার যার নিজের ভূমিকায় যথেষ্ট নিষ্ঠাবান থাকতে চেয়েছেন।

আমাদের যে কোনো নাট্যপ্রযোজনাতে স্বভাবতই নির্দেশকের সাফল্য ব্যর্থতা বা বিশেষ কৃতিত্বের প্রশ্নটি জিজ্ঞাসার কেন্দ্রবিন্দু হয়ে থাকে। সেক্ষেত্রে যে দুর্লভ সংবেদনশীলতায় বর্তমান নির্দেশক শেক্সপীয়রের এই অসামান্য ট্র্যাজেডিকে আমাদের চোখের সামনে তার সমস্ত বৈশিষ্ট্য নিয়ে ধরবার প্রয়াস করেন, বর্তমানের তুচ্ছ সীমাবদ্ধতার ভেতরে দাঁড়িয়ে সে প্রয়াস আমাদের কাছে স্মরণীয় সম্মানযোগ্যতার বলে মনে হয়।

মোট কথা, 'সোয়াইক গেল যুদ্ধে'র পরে থিয়েটার ওয়ার্কশপের ইতিহাসে এটাই শ্রেষ্ঠ প্রযোজনা বলে মেনে নিতে বোধ করি কারোই আপত্তি হবে না।

শুভ বসু

পুস্তক-পরিচয়

তেভাগার লড়াই : আশা-নিরাশার কাহিনী

(১)

'তেভাগা' শব্দটি এখনও আমাকে তড়িতাহত করে, হয়তো আমার বয়সী অন্যদেরও—যারা সেই বারুদঠাসা সময়ের সাক্ষী। ঔপনিবেশিক যুগের শেষ প্রহর এবং অবিভক্ত বাংলার শেষ কৃষক বিদ্রোহ তেভাগার লড়াই যেন ঝড়ের পরাক্রম নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ল। বদরুদ্দিন উমরের ভাষায়, 'এই অন্দোলনই আজ পর্যন্ত বাংলার সংগঠিত কৃষক আন্দোলনের ইতিহাসে সর্বাপেক্ষা গৌরবময়'। সেই গৌরবগাথা নতুন করে সুস্নাত দাশ তুলে ধরেছেন, তাঁর গবেষণা গ্রন্থ, 'অবিভক্ত বাঙলার কৃষক সংগ্রাম'-এর মাধ্যমে।

কমিটেড লেখক তিনি—কমিউনিস্ট পিতার কমিউনিস্ট পুত্র। স্বভাবতই তাঁর গবেষণা-কর্ম ভিন্ন গোত্রের—আর পাঁচজন কেতাবী পণ্ডিতের মত শোষক বনাম শোষিতের লড়াইয়ের মাঝখানে নিরপেক্ষ নন তিনি। সত্যের এতটুকু বিকৃতি না ঘটিয়ে, অনুসন্ধানী আলোয় তিনি উদ্ভাসিত করেছেন লড়াকু কৃষকের ত্যাগ বীরত্ব ও শ্রেণীসংহতির অপূর্ব সব কাহিনী। তুলে ধরেছেন কমিউনিস্ট পার্টির গৌরবোজ্জ্বল ভূমিকা—নিষ্ঠা ত্যাগ ও একাত্মতার দৃষ্টান্ত সহ। তারই সঙ্গে উন্মোচিত করেছেন কংগ্রেস ও মুসলিম লীগের স্বরূপ—তাদের কলঙ্কজনক ভূমিকা। এক কথায় জমিদার-জোতদারের সেবাদাস তারা—কৃষকের তাজা রক্তে তাদের হাত লাল। সুস্নাতর বইখানি একদিকে যেমন গণসংগ্রামের ইতিহাস চর্চাকে সমৃদ্ধতর করেছে, অপরদিকে তেমনি তীক্ষ্ণতর করবে গণআন্দোলনের সক্রিয় কর্মীদের সংগ্রামী চেতনা।

যাক্ আর কথা না বাড়িয়ে, সুস্নাতর 'গবেষণা গ্রন্থ' পাঠের প্রতিক্রিয়া সরাসরি অল্প কথায় নীচে পরিবেশন করছি।

(২)

দেশভাগ ও স্বাধীনতার ঠিক আগে গ্রাম বাংলার মানচিত্র জুড়ে জ্বলে উঠল তেভাগার দাবিতে কৃষক বিদ্রোহের আগুন। সময় ১৯৪৬-এর সেপ্টেম্বর মাস—সার্বিক পরিস্থিতির বিচারে মোটেই সুসময় নয়। আগস্ট মাসে হয়ে গিয়েছে রক্তক্ষয়ী সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা। ফলে মার খেয়েছে শহর ও শহরতলীর মজুর ছাত্র মেহনতী মানুষের সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী লড়াই। যে লড়াই ১৯৪৫-এর নভেম্বরে শুরু হয়ে তুঙ্গে উঠেছিল ২৯শে জুলাই, ১৯৪৬—যেদিন ডাক ঘর কর্মীদের সমর্থনে গোটা বাংলা অভূতপূর্ব সর্বাত্মক হরতালে সামিল। হায়, তারপরই ভূমিশয্যা—বিদ্রোহের ঋতু কত তাড়াতাড়ি ফুরিয়ে গেল। পরাজয় অবধারিতই ছিল, যেহেতু

শহরের মানুষের পাশে এসে গ্রামের গরীবেরা একজোট হয়নি লড়াইয়ের ময়দানে।

এই সে কথাই বলেছিলেন কার্ল মার্কস ফরাসী দেশের সর্বহারা বিপ্লবের পরাজয় প্রসঙ্গে। মার্কসের উক্তি : কৃষক শ্রেণীর বৈপ্লবিক সংগ্রাম সর্বহারা শ্রেণীর জয়লাভের জন্য অপরিহার্য। (দি এয়িটিন্থ ব্রুমেয়ার অব লুই বোনাপার্ট)

না, লড়াইয়ের ডাক দেয়নি কৃষকসভা। আবদুল্লাহ রসুল বলেছেন : কৃষকের সংগ্রামী চেতনার অবস্থা না বোঝার ফলে যুক্তবাংলার শেষ প্রাদেশিক সম্মেলন, খুলনার মৌভোগ সম্মেলনের (২১-২৪ মে, ১৯৪৬) মঞ্চ থেকে তেভাগা লড়াইয়ের ডাক দেওয়া হয়নি। ডাক এল আরও পরে সেপ্টেম্বরে কৃষকসভার প্রাদেশিক কাউন্সিল মিটিং থেকে। সে ডাক ছড়িয়ে পড়ল সারা বাংলায়, দেখতে দেখতে দাবানলের মতো বাংলার ১৯টি জেলায় ছড়িয়ে পড়ল তেভাগার লড়াই। ষাট লক্ষ কৃষক তাতে সামিল। লড়াই জমে উঠল সবচেয়ে বেশি রংপুর, দিনাজপুর, জলপাইগুড়ি আর ২৪ পরগনার বাদা অঞ্চলে—যেখানে বর্গাদারের সংখ্যা খুব বেশি আর জোতদার মহাজনের শোষণ সবচেয়ে তীব্র।

গোলাম কুদ্দুসের মতে, পঞ্চাশের মন্বন্তরই ছিল তেভাগা লড়াইয়ের পটভূমি। কৃষকের সামনে ছিল মাঠভরা পাকাধান, আর পিছনে ছিল ভয়ঙ্কর মন্বন্তরের বিভীষিকা। তখনো গ্রামে গ্রামে অজস্র কবরের ঢিবি আর শ্মশানের ভয়াবহতা। কোন পরিবারের কতজন দুটি অন্নের জন্য প্রাণত্যাগ করেছে, তা গ্রামসুদ্ধ লোকের জানা ছিল। অতএব সর্বাপেক্ষা দুর্ভিক্ষ পীড়িত বিরাট বিরাট অঞ্চলই হয়ে উঠেছিল তেভাগা-সংগ্রামের ঝটিকাকেন্দ্র।

নির্যাতিত নিপীড়িত কৃষকের এমন দ্রুত জাগরণ ও জঙ্গী আচরণে জোতদাররা হতচকিত। অপরদিকে কৃষকরা যেভাবে সাড়া দিল এই আন্দোলনে, তার বিস্তার ও তীব্রতা দুই-ই সংগঠকদের কল্পনার সীমা ছাড়িয়ে গেল। উৎপন্ন ফসলের কৃষকের হিস্যা 'আধি নয়, তেভাগা' 'টংকপ্রথার উচ্ছেদ চাই, নিজ খোলানে ধান তোল', 'জান দিব তবুও ধান দিব না'—লক্ষ লক্ষ বর্গাচাষীর ও টংকচাষীর এই ছিল রণধ্বনি।

সংগঠিত কৃষক এলাকায় কৃষকরা প্রায় বিনা বাধায় ঝড়ের বেগে ধান কেটে নিজের খোলানে তুলে ফেলে। অবস্থা আয়ত্তে আনতে মুসলিম লীগ মন্ত্রীসভা 'বর্গাদার বিল' রচনা করে। ১৯৪৭-এর জানুয়ারির চতুর্থ সপ্তাহে যখন বর্গাদার আইনের খসড়াটি বেরোল। আগুনের চেয়েও দ্রুতগতিতে রটে গেল কৃষক সমিতির আইন সরকার মেনে নিয়েছে। সে কী উত্তেজনা! দূর দূর থেকে কৃষকের দল এসে সমিতির অফিস খুঁজে বার করল— 'জোতদারের খোলান ভেঙে ধান নিয়ে আসার হুকুম চাই কৃষক সমিতির কাছে। তারা সব জোতদারের খোলান ভেঙে ধান নিয়ে এল।'

সুবিশাল অসংগঠিত এলাকায় আন্দোলন ছড়িয়ে পড়াতে সমস্যা বাড়ল, অনেক জায়গায় আন্দোলন চলে গেল কৃষকসভার প্রভাব ও নিয়ন্ত্রণের বাইরে। '৪৭-এর ফেব্রুয়ারির গোড়ার দিকে হিন্দু মুসলিম জোতদাররা সংগঠিত হয়ে জোতদার সমিতি গঠন করল। আইনসভায় কংগ্রেস ও মুসলিম লীগ একযোগে বর্গাদার বিলের বিরোধিতা করল।

(৩)

বিভেদ বিভ্রান্তি নির্যাতন—একযোগে তিনটি অস্ত্র তেভাগা আন্দোলন গ্রাস করার জন্য উদ্যত। ঢেউয়ের মতো জেলায় জেলায় যখন আন্দোলন ছড়িয়ে পড়ল, দেখা গেল বিভেদের অস্ত্র সেখানে অকেজো। দেশজোড়া সাম্প্রদায়িকতার আবহাওয়া—অথচ তার সংক্রমণ থেকে গ্রামবাংলার কৃষক মুক্ত। কৃষকসভা নিঃস্ব ও গরীব মুসলমান কৃষকদের এক বড় অংশকে লড়াইয়ের ময়দানে হিন্দুচাষী ভাইষের পাশে দাঁড় করিয়েছে। দাঙ্গার উস্কানি, কংগ্রেস-লীগ অশুভ আঁতাত আর জোতদার সমিতি—কৃষকের লড়াইকে বিনাশ করার জন্য কোনও আয়োজনই বাদ নেই। কংগ্রেসী দৈনিকে ছাপা হল, গ্রামে গ্রামে যা চলছে তা সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা। খবরটা কি একেবারেই উড়িয়ে দিতে পারল শহরে মধ্যবিত্ত সমাজ? তা তো নয়—বেশিরভাগ ক্ষেত্রে জোতদার তো হিন্দু আর ভাগচাষী যে মুসলমান।

মুসলিম লীগ নেতারাও বসে নেই। খোকা রায় লিখছেন মৈমনসিংহ জেলার মুসলমান প্রধান গ্রাম চাতলে লীগ নেতা গিয়াসুদ্দিন পাঠান মুসলমান চাষীদের উদ্দেশ্যে বলেন, মিঞারা তোমরা কমিউনিস্টদের খপ্পরে পইড়োনা, পাকিস্তান হইলে তোমরা চৌভাগাই পাইয়া যাইবা। গিয়াসুদ্দিনের এই বক্তৃতা ছিল ললিত বাগচী, নীরেন রায় প্রমুখ হিন্দু জোতদারদের সমর্থনে। কিন্তু চাতলের মুসলমান চাষী তাতে ভোলেনি, মুসলিম আধিয়ারের বাড়িতেই আত্মগোপন করেছিলেন তেভাগা আন্দোলনের কমিউনিস্ট সংগঠক ষোড়শীরঞ্জন ধর ও অপূর্ব গোস্বামী। পুলিশ তাঁদের গ্রেপ্তার করতে পারেনি।

বিভেদ ও বিভ্রান্তি সৃষ্টির ছলাকলা যখন ব্যর্থ তখন নেমে এল দমনপীড়ন নির্যাতন। জেলায় জেলায় গ্রামে গ্রামে বসল পুলিশ ক্যাম্প। লাঠি গুলি জেল, ধর্ষণ লুণ্ঠন—কিছুই বাদ গেল না। কিষাণ-কিষাণির রক্তে ভিজে গেল গ্রামবাংলার মাটি। প্রসঙ্গত সুস্নাত লিখেছেন লড়াইয়ের ময়দানে পুরুষের পাশে নারী স্বমহিমায় প্রতিষ্ঠিত। ভবানী সেনের ভাষায়, সমাজে সবচেয়ে অবদমিত অবহেলিত পশ্চাদপদ ও নিরক্ষর কৃষক রমণীর গৌরবোজ্জ্বল সংগ্রামী ভূমিকা এক নতুন রেনেসাঁসের ইঙ্গিতবহ। সেই রক্তে ভেজা মাটি থেকে জন্ম নিল তেভাগার গান ও কবিতা।

(৪)

বন্দুকের সামনে লাঠি কোনও অস্ত্রই না। অতএব জমিদার জোতদার পুলিশের সশস্ত্র আক্রমণের সামনে কৃষকের প্রতিরোধ ভেঙে গেল। এ প্রসঙ্গে অবনী লাহিড়ী বলছেন, ঠাকুরগাঁ শহরে গুলি চলার পরে সমিতির অফিসে কৃষকরা দল বেঁধে এসে বলেছিল—অস্ত্র দাও, আমরা লড়ব। অস্ত্র তো আমাদের ছিল না, কোথা থেকে দেব? তাছাড়া এ ধরনের দৃষ্টিভঙ্গি বা পরিকল্পনাও ছিল না।

অতএব ১৯৪৭-এর মার্চেই তেভাগা সংগ্রাম কার্যত সমাপ্ত এবং ১৯৪৭-এর নভেম্বরে আনুষ্ঠানিকভাবে প্রত্যাহৃত। সংগ্রামের এই করুণ পরিণতির জন্যে গোলাম কুদ্দুস ও আব্দুল্লাহ

রসুল তদানীন্তন পার্টি নেতৃত্বকে দায়ী করেন। গোলাম কুদ্দুম মনে করেন, নেতৃত্বের সংস্কারবাদী চিন্তাধারা এত বড় কৃষক জাগরণকে নিছক জঙ্গী অর্থনীতিবাদের সঙ্কীর্ণ গণ্ডিতে আটকে রাখল। বৃহত্তর পরিপ্রেক্ষিতের অভাবে সামন্তবাদ বিরোধী কৃষক সংগ্রাম সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী জাতীয় সংগ্রামে অঙ্গীভূত হল না। রসুল সাহেবের মতে, নেতৃত্বের সংস্কারবাদী চিন্তাধারা কৃষকের শ্রেষ্ঠ চেতনাকে লঘু করে দেখেছে, তার ফলে উপযুক্ত সাংগঠনিক প্রস্তুতি অবহেলিত এবং তাই এই পরাজয়।

মণি সিংহ ও বিনয় কোঙারের মতে, রাষ্ট্রশক্তিকে মোকাবিলা করার মতো শক্তি সেদিন কমিউনিস্ট পার্টি বা কৃষকসভার ছিল না। দেশভাগ হতে চলেছে, পাকিস্তানের মোহে আচ্ছন্ন পূর্ববাংলার মুসলমান ভাগচাষী আন্দোলন থেকে সরে দাঁড়িয়েছে। আপসে স্বাধীনতার সুফলের মৌতাতে জনগণের বড় অংশ আচ্ছন্ন।

বিনয় কোঙার মনে করেন, তেভাগা আদায় হয়নি বটে তবে কৃষক আর গোলামীর জায়গায় ফিরে যায়নি।

তেভাগা সংগ্রামকে ঘিরে এ জাতীয় নানা বিতর্কের বিচার বিশ্লেষণ করেছেন তিনি। ঐতিহাসিকের নিষ্ঠা ও বিপুল শ্রমের স্বাক্ষর রয়েছে বইখানির সর্বাঙ্গে।

পরিশেষে জানাই লেখার স্বচ্ছতা, ভাষার আবেগ ও লেখকের আন্তরিকতা বইখানিকে উপভোগ্য করেছে। ভালো কাগজে সুন্দর পরিষ্কার মুদ্রণ, পরিপাটি বইটির সজ্জা—এসবের জন্য নিশ্চয় সাধুবাদ প্রকাশককে দিতে হয়।

অমলেন্দু সেনগুপ্ত

অবিভক্ত বাঙলার কৃষক সংগ্রাম : তেভাগা আন্দোলনের আর্থরাজনৈতিক প্রেক্ষিত—পর্যালোচনা—পুনর্বিচার। সুনীত দাশ। নক্ষত্র প্রকাশন। বি এ-৬, প্রফুল্লকানন (পঃ), কলকাতা-৭০০১০১। ১৫০ টাকা।

হিড়িপ-দিড়িপ মাদল বাজে বুকে

নন্দদুলাল আচার্য-র কবিতা সংকলনটি হাতে নিয়ে একটু থমকে গেলাম—এই কবিতা পড়ার যোগ্যতা আমার আছে কি? আলোচনার কথা ছেড়েই দিলাম। ভাষা তো একটা জগৎ—এ কবিতার ভাষা কলকাতার অল্প দূরে বসবাসকারী এক মধ্যবিত্তর কাছে অন্য জগতের। আমাদের বাস্তবে একাধিক জগৎ—'উন্নতি' নামক ধ্বংসকারী ধারণার তাড়নায় কলকাতা ও তৎপার্শ্ববর্তী জগৎ কর্তৃত্ব করে, অন্য জগৎকে ধ্বংস করতে চায়, আর 'অনুন্নতি'র প্রাক ইতিহাসে যেটুকু সংযোগ ছিল এদের মধ্যে তাও রাস্তা-যানবাহন-কলকারখানার তথাকথিত 'উন্নতি' সত্ত্বেও ভেঙে গেছে। আমার পক্ষে এই জগৎ যেমন বোঝা দুঃসম্ভব তেমনি এর ভাষাও স্ট্যাণ্ডার্ড বাংলার hegemony-র মধ্যে থাকায় অচেনা। আর এই অচেনা যে কতটা সত্য তা সুধীরকুমার করণের মুখবন্ধ পড়েই বুঝতে পারি : ''মাদলের বাজনা প্রসঙ্গে সাধারণত 'ধিং ধিতাংতাং' তানের কথাই ভাবা হয়ে থাকে, কিন্তু নন্দদুলাল ঠিকই শুনেছেন হিড়িপ

দিড়িপ শব্দ প্রেমিকের জন্য প্রতীক্ষায় থাকা প্রেমিকের বুকে। মাদলের বাজনায় কোনো কোনো সময় ঠিকই শোনা যায়—'হিড়িপ দিড়িপ'—মিঠা মাদল বাজে, এর সঙ্গে সাঁওতালী ভাষায় সঙ্গমসূচক একটি যৌনাত্মক শব্দের এমন ঘনিষ্ঠ মিল আছে, যা শরীর ও মনকে আবেগের বন্যায় ভাসিয়ে নিয়ে যেতে পারে।" সুধীরকুমারের এই উক্তি পড়ার পর কবিতাগুলি অন্যভাবে আমার মতো পাঠকের কাছে আসে—যে পাঠক মধ্যবিত্ত অবদমনের মধ্যে বাস করে আর ঐ অবদমনের নানা বিকারের মন পায়। কবিতার এই মাত্রা আমার মতো অন্য জগতের মানুষের পক্ষে ধরা সম্ভব ছিল না। কবিতাগুলির জগতের সঙ্গে পরিচিত সুধীরকুমার একটি তার ছন্দতে নতুন রীতি দেখতে পান, নন্দদুলালের বক্তব্য কখনও ছড়া থেকে মৃদু পদপাতে সামনের দিকে এগিয়ে চলে, কবিতায় রূপান্তরিত হবার জন্য, কখনও বা কবিতা থেকেই একটু পশ্চাৎ পদপাতে ছড়ার দিকে পিছিয়ে আসে, ঠিক যেন সাঁওতাল মেয়েদের নাচের সুষম পদপাতের ছন্দ, আবার কখনও বা লোকসংগীতের পরিণত হওয়ার দিকেই তাদের অভিযাত্রা—যেন কোলাজ পদ্ধতিতে আঁকা ছবি। ঐ সাঁওতাল মেয়েদের নাচের ছন্দ গতির এই কাব্যিকরূপ সুধীরকুমার ধরতে পারেন। এ জীবন সম্পর্কে অভিজ্ঞতায়, তাই কবিতার ভাষাকে মিলিয়ে নিতে পারেন কৌমর জীবনছন্দে—যদিও তাঁর এখনকার ঠিকানা ব্রড স্ট্রিট, কলকাতা।

নন্দদুলালের কবিতা-সংকলনটি একটি বড় প্রশ্নের সামনে দাঁড় করিয়ে দেয়। পশ্চিমবঙ্গের মানভূম (পুরুলিয়া), বাঁকুড়া ঝাড়খণ্ডের সীমান্তবর্তী প্রান্ত বর্ধমান এবং ঝাড়খণ্ডের ধানবাদ, জামতাড়া, দুমকা, সিংভূম প্রভৃতি অঞ্চলের ভাষায় মূলত এই কবিতাগুলি রচিত। অর্থাৎ সীমান্তর-ভাষা, আমাদের কাছে "অপর" ভাষা। ডমিন্যান্ট, কর্তৃত্ববিস্তারী ভাষা একই ভাষার অন্য স্বরকে দমিত করে, আসলে একটি জগৎ অন্য জগৎকে চাপা দেয়। ঐ সীমান্তর ভাষার মানুষরা "আধুনিক" হতে চায় প্রধান ভাষাকে শিখে, উচ্চারণে নিজের সুর ও স্বরকে আড়াল করে। এ শ্রেণীর জাতি বর্ণর উচ্চবর্গর দমন। নন্দদুলাল ঐ দমনের জগতের মানুষ, তাঁর মুখবন্ধ ঐ দমনের ভাষায় রচিত, যে ভাষার শতকরা নব্বয়ের বেশি শব্দ তৎসম, প্রায়-তৎসব যদিও শিক্ষায়, বর্ণে, হয়তো বা জীবনযাপনেও প্রত্যক্ষতর তিনি এ জগতের নন। কিন্তু একদা যেমন আদিবাসী বিদ্রোহে বা নিম্নবর্গীয় কৃষক বিদ্রোহে কোনও কোনও মধ্যবিত্ত মানুষ নিজেকে যুক্ত করত, শ্রেণীর সীমাকে লঙ্ঘন করত, তেমনি নন্দদুলালও এই সংকলনে কর্তৃত্ববিস্তারী ভাষার বাইরে গেছেন। অন্যজীবনের স্বরকে সেই জীবনের ভাষায় কবিতা লিখেছেন। অকপটে এই ভাষার উচ্চারণকে এনেছেন—এ এক ধরনের প্রতিবাদ। যে সব স্বরকে উচ্চবর্গীয়রা, ইংরেজি-লাঞ্ছিতরা 'অপর' 'অ-সংস্কৃত' এমনকি 'অ-শোভন' ভেবেছি, যে ভাষার মানুষকে নিচু ভেবেছি, ইংরেজির-কাঁকড় মিশ্রিত বাংলায় আদিম ভেবেছি, সেই ভাষায় নন্দদুলাল কবিতা লিখেছেন অর্থাৎ দমিত স্বরকে স্বাধীনতা ও মুক্তি দিতে চেয়েছেন। আমরা আমাদের ঔপনিবেশিক ও অব-ঔপনিবেশিক অধঃপতনে ভুলে যাই, একটি ভাষার প্রাণ তার সব স্বরের মিথস্ক্রিয়ায়। ঐ সীমান্তের ভাষারও এমন জোর থাকে যা আমাদের অধুনা ইংরেজি-হিন্দি মেশানো কলকাতার তিন-আঁসলা ভাষায় নেই। বাংলাভাষাকে নানা

আঞ্চলিক ভাষার স্রোতস্বিনীতে বারবার অবগাহন করেই, অনেক স্বরের আসা যাওয়ায়, মিথস্ক্রিয়ায় "আধুনিক" হতে হবে। সংস্কৃত ও ইংরেজি এভাবেই বাংলা হয়ে উঠবে। নন্দদুলালের কবিতা এ ভাষার ভবিষ্যতের একটা ইঙ্গিত দেয় যেটা ভয়ঙ্কর শব্দে আমাদের চতুর্দিক ভেঙে পড়ছে, নিরস-রীতিহীন এই ভাঙন। সেই ভাঙনের মধ্যে নন্দদুলাল যে মিলনের মাদল বাজান তাতে আমার মতো অবসন্ন মধ্যবিত্তও উজ্জীবনের স্বর পায়। অথচ তিনিই যাকে অ-আঞ্চলিক বাংলা ভাষা বলে গণ্য করা হয়, তাতেও একাধিক কাব্যগ্রন্থের রচয়িতা— ঐ ভাষাকেই যেন নতুন করে আবিষ্কার করতে চান এই কবিতাগ্রন্থের ভাষায়।

নন্দদুলালের কৃতিত্ব এখানে ঐ আঞ্চলিক ভাষার স্বরকে তিনি কবিতায় প্রতিষ্ঠিত করেছেন। এ ভাষায় উচ্চারণ ও সংগীতের যে স্বাভাবিক প্রশ্রয় থাকে তাকে তিনি কবিতায় এনেছেন। আর এতে সঙ্গমের শব্দকে শরীরীমুদ্রাতেই আবদ্ধ রাখেননি, জীবনের আনন্দ-বিষাদ, যন্ত্রণা-আশা-হতাশাতেও ছড়িয়েছেন। সঙ্গম এখানে জীবনেরই আরেক নাম হয়ে উঠেছে। ছবি আঁকেন নন্দদুলাল। 'গাছ লিবি হে গাছ/লাইন পারের খুপরী ধরে/যুয়ান ছুঁড়ির নাচ'/— ফেরিওয়ালী একটি বুড়ি/চড়িয়ে স্বরগ্রাম/হেঁকে যাচ্ছে। 'শিরীশ গাছের তিরিশ টাকা দাম।' এই ছবিতে গাছ বিক্রি বাস্তব যেমন আছে, তেমনি আছে ছন্দ ও সঙ্গীত। 'স্বরগ্রাম' শব্দটি এই ভাষার মধ্যে অন্য টান আনে।

আমাদের ছোটবেলার ছড়ায় গুণবতী ভাইয়ের জন্য মন কেমন করার কথা শুনতাম। এখানে এক অভাগিনীর ঝির গল্প : ডান-যোগিনী অন্ধকারে কে একা দাঁড়িয়ে? অভাগিনীর ঝি : তিনকড়ির দাহে হায়/আঙার হল গা।) গুণবতী ভাই আমার মুখ দেখিস না।" ডান-যোগিনী অন্ধকার-এর চিত্রকল্পে ঐ জীবন উঠে আসে। নন্দদুলালের কবিতায় নারী নিজের কথা বলে, তার সংলাপে জীবন যেন দর্পণে প্রতিবিম্বিত :

> ঝড়ে উইড়ল ঘর, আমার ক্ষেতে জ্বইল্ল ধান।
> আধ বেলাতে বেটা গেল, বিটি বত্তবান।
> সাত নাঙটায় শরীর খাইলেক,
> রুশাকুড়ার ঘাটে।
> মন লাগে না পাইটে দিদি, মন লাগে না পাইটে।
> কয়লা চোবের সাঙে মিশে, মরদ হৈল খুন।
> আধ পেটা ভাত জুটে যদি, তাও জুটে না নুন।
>
> গ্রাম দেবতি পানবুড়ি, বলটে ইবার মাগি,
> পড়া ভিটায় কিসের আশে রঁইয়েছি আবাগী?

জীবন যাপনের একটি পুরো ছবি। সে স্বরকে আমরা চাপ দিতে চাইছ নানাভাবে, নানা সন্ত্রাসে সেই স্বর—শেষের প্রশ্নটিতে কবিতাটি আমাদেরই হয়ে ওঠে। ঐ নারীর জীবন আপাতভাবে আমাদের, স্বার্থপর নিজ সুখ সন্ধানী চারবেলা খেতে পাওয়া, বিজ্ঞাপনে মজে যাওয়া আমাদের নয়। কিন্তু গভীর স্তরে এই ভয়ঙ্কর ভাঙনে ঐ প্রশ্ন তো উঠে আসতে

চায়—কিসের আশায় আছি?

এই নারীর 'মন লাগেনা'র ধুয়োও তো আমাদের চৈতন্যের ভস্মাবশেষেও লেগে থাকে। নন্দদুলালের কবিতায় যন্ত্রণার সংলাপ রচনা করে নারীরা আর পুরুষের কণ্ঠে বাজে আনন্দের বোল : "পুঁঠি মাছের ঝোল/হৈ হৈ পুঁঠি মাছের ঝোল।/দুহাত তুলে বেটা আমার/খুশিতে দেয় দোল।"

পুরুলিয়া বা বাঁকুড়াই কবিতা হয়ে ওঠে—ভূগোলই যেন মানুষ :

'উঠ ছুঁড়ি তুশ বিবা'
....ই কইরে কাজ হয় কি বড় মিএগ?
আগু পাছু ভাইবতে হবেক,
বেকুব পুরুলিয়া।
শুখা মাঠে মরদ ধুকে
ঘরে ধুঁকে মিয়া।
অবাক হয়ে কি দেখছ গো,
পাহাড় শুশুনিয়া।
আথানে বাথানে জাগে,
পোড়ামাটির ঘোড়া।
পাহাড় শুশুনিয়া জাগে,
জাগো মা বাঁকুড়া।

আমাদের শহরে ড্রয়িংরুমের বাঁকুড়ার ঘোড়া ঐ বাঁকুড়ায় অন্য বাস্তব, আমাদের সপ্তাহান্তে পিকনিক-সুলভ বেড়ানোর শুশুনিয়া অবাক হয়ে দেখে নদী শুখা, পুখর শুখা, সম্বচ্ছর খাবারহীন বাঁকুড়াকে, শুখামাঠে মরদ ধুঁকে, ঘরে ধুঁকে মিয়া। মাদলের বাজনার মধ্যে এই জীবনের স্বর, হিড়িপ দিড়িপ শব্দের মধ্যে ক্ষুধা-যন্ত্রণা, জীবনযাপনের দুঃসহ উপাখ্যান। একটা মোটে ছিঁড়া শাড়ি পরা নারী মরদকে জন খাইটতে যেতে বলে, নাহলে, 'চালকের হিঁসাশ কাঁদে রাধা হবেক না।" এ বারমাস্যায় বাগদিদের গল্পে এ জিজ্ঞাসাই কবিতা হয়ে ওঠে, "ও ময়না-বাঁধের মিশ কাল জল, গগন বাদের হাটে কবির গানের আসর কেন নিঝুম? ধম্ম ঠাকুরের গাজনে ঢাক কেন গজ্জায় না আর? কেনে কাশবনে বিটিছিলায় বাঁশি বাজায় না। আমাদের মন্‌সা কেনে কাঁদে হে।" কেন, কেন? এ কেনর উত্তর আমরা, এই মধ্যবিত্ত শহুরে নাগরিক দিতে চাই না, তাহলে আমাদের ইতিহাসের অপরাধ নিজেদেরই বলতে হয়। নন্দদুলাল তাঁর এই সঙ্গীত-প্রায় কবিতায় আমাদের দাঁড় করিয়ে দেন ঐ প্রশ্নের সামনে—ভাষার এক জাগরণের সামনে, শুশুনিয়া জাগুক, নাড়া দিক—নন্দদুলাল ঐ অভিযাতের চারণ কবি হয়ে উঠুন।

পার্থপ্রতিম বন্দ্যোপাধ্যায়

হিড়িপ দিড়িপ মাদল বাজে বুকে ।। নন্দদুলাল আচার্য। বোধন প্রকাশনী। চল্লিশ টাকা

প্রসঙ্গ 'ত্রিদিবা' ও জীবন শিল্পী গোপাল হালদার

বিংশ শতাব্দীতে তিনের দশকে শুরু করে প্রায় শতাব্দীর প্রান্তসীমা পর্যন্ত ধ্রুপদী মার্কসবাদের অনুশীলন ও প্রয়োগের ব্যাপারে যাঁরা নিজেদের দায়বদ্ধতায় ঘনিষ্ঠ উদ্যোগ অব্যাহত রেখেছিলেন পরম্পরা সমেত, গোপাল হালদার নিশ্চিতভাবেই তাঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য একজন। এক্ষেত্রে তাঁর নাম যে বহুবার উচ্চারিত হয় তার কারণ প্রবন্ধ রচনায় বিশেষ করে তাঁর সাফল্য, অভিনিবেশ—যার বহুবলয়িত বিস্তারে আমরা প্রকৃতই চমৎকৃত।

'গোপাল হালদার : প্রসঙ্গ ত্রিদিবা'—এই সংক্রান্ত আলোচনায় আরো এক অন্য মাত্রা যুক্ত করেছে। যেহেতু জৈবনিক নানা প্রসঙ্গের আলাপচারি সমেত তাঁর সৃষ্টিকে লেখক ড. সুব্রত রায়চৌধুরী 'মন্বন্তরের ট্রিলজি' 'ত্রিদিবা' পর্যন্ত প্রসারিত করেছেন। দেখিয়েছেন এর নায়ক 'অমিত'-এর 'কমিউনিজমের সত্যে' পৌঁছনোর পথ-প্রকরণ কতটা শিল্পসম্মত, কতটা আদর্শপ্রাণ, কতটাই বা জীবনানুগ। মার্কসবাদে বিশ্বাস অবিচল রেখে এই গোত্রীয় সৃজনশীল সাহিত্যকর্ম্মকে যাঁরা প্রতিষ্ঠা দিতে চান তাঁদের পক্ষে ব্যাপারটি কতখানি অগ্নিপরীক্ষার মতো থেকে যায়, ড. রায়চৌধুরী সে কথাও তাঁর পাঠককে জানাতে কুণ্ঠা করেননি।

পরিশিষ্ট, পাঠভেদ এবং নির্ঘণ্ট বাদ দিলে এই গ্রন্থিকার গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়ের সংখ্যা ছয়। প্রথমেই আছে 'কালের প্রেক্ষাপট ও গোপাল হালদার'। মেঘনার বিধ্বংসী ভাঙনে নিশ্চিহ্ন হ'য়ে যাওয়া বিদগাঁও গ্রামে উনিশশো দু'য়ে জন্ম থেকে আরম্ভ করে জাতীয় মুক্তি আন্দোলনের বিচিত্র অভিনেতার প্রেক্ষিতে ভেতরে ভেতরে তিনি কীভাবে কতখানি বদলে গিয়ে সমাজতন্ত্রী সত্যাভিমুখী হয়েছেন, তার অনুপুঙ্খ বিবরণ রয়েছে এই অধ্যায়ে। ড. রায়চৌধুরী দেখাতে ভোলেননি এই সত্যান্বেষণে কমবেশি ছ'বছরের দীর্ঘ কারাবাসকেও পাথেয় করতে হ'য়েছে এই মার্কসবাদী চিন্তাবিদ্-কর্মীকে। এ অর্জন তাই এত দুর্লভ।

'পটবিস্তার : আনন্দমঠ থেকে ত্রিদিবা' অধ্যায়ের নির্যাস বা প্রতিপাদ্য বিষয় হলো এইটিই সপ্রমাণ করা যে 'কমিউনিজমের পথেই' 'মুক্তির পথ'। 'অর্থনৈতিক স্বাধীনতা' ছাড়া 'রাজনৈতিক স্বাধীনতা' অর্থহীন। যদিও এ প্রশ্নও আমাদের বিদ্ধ না করে পারে না যে পরজাতি পদানত একটি রাষ্ট্রে কোন্ কর্মসূচিটি এক্ষেত্রে অগ্রাধিকার পাবে। তবে, এ কথায় কিছুটা অসুবিধে থেকেই গেছে যেখানে ড. রায়চৌধুরী লিখেছেন, 'রবীন্দ্রনাথ, শরৎচন্দ্র অর্থনৈতিক স্বয়ংসম্পূর্ণতার কথা বারবার বললেও তার প্রাথমিক শর্ত যে রাজনৈতিক স্বাধীনতা তা তাঁরা বুঝতে চাননি।

যদিও কিছু আগেই 'পথের দাবী'-র স্রষ্টা সম্পর্কে তাঁর এ মন্তব্যও পেয়েছি—"পথের দাবী'তে মুক্তির কথা না থাকলেও রাজনৈতিক স্বাধীনতার কথা বলা হয়েছে।" আর, রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কেও এ কথা ভাববার যে অন্তত 'সভ্যতার সংকট' প্রবন্ধে বিশেষ করে রাজনৈতিক স্বাধীনতার বিষয়টিকেই তিনি অগ্রাধিকার দিয়েছিলেন এবং সেখানে অত্যন্ত স্পষ্টাকারেই

বলেছিলেন আমাদের সমূহ দুর্দৈবের মূল রাজনৈতিক পরাধীনতায়। [দ্রষ্টব্য : '...এই দুর্গতির রূপ যে প্রত্যহই ক্রমশ উৎকট হয়ে উঠেছে, সে যদি ভারত শাসকযন্ত্রের ঊর্ধ্বস্তরে কোনো এক গোপন কেন্দ্রে প্রশ্রয়ের দ্বারা পোষিত না হত তা হলে কখনোই ভারত-ইতিহাসের এতবড়ো অপমানকর অসভ্য পরিণাম ঘটতে পারত না। ভারতবাসী যে বুদ্ধিসামর্থ্যে কোনো অংশে জাপানের চেয়ে ন্যূন, এ কথা বিশ্বাসযোগ্য নয়। এই দুই প্রাচ্যদেশের সর্বপ্রধান প্রভেদ এই, ইংরেজ শাসনের দ্বারা সর্বতোভাবে অধিকৃত ও অভিভূত ভারত, আর জাপান এইরূপ কোনো পাশ্চাত্য জাতির পক্ষছায়ার আবরণ থেকে মুক্ত।'—"সভ্যতার সংকট"]

'নায়কের নিষ্ক্রমণ'—অধ্যায়ে নিষ্ক্রমণ ঘটেছে অমিতের। বন্দীজীবন যার কাছে মহাজীবনেরই এক আশ্চর্য পাঠশালা। এর মধ্যে দিয়েই ভাবী জীবনের দিকে তার পদপাত। 'অন্তঃশীলা'-র নায়কের মতোই গূঢ়তর অর্থে সেও মোহানার দিকে অভিযাত্রিক। সে অভিযাত্রিক সেই কালসীমায় যাকে অবিচ্ছিন্নভাবে নির্মাণ করে তুলছে বিচিত্র আন্দোলন-কর্মকাণ্ডের সমবায়ে এক স্বপ্নদর্শী প্রত্যয়ী প্রজন্ম। এইভাবেই 'একদা'-র নায়ক 'অন্যদিন' ছুঁয়ে তৃতীয় পর্ব স্বাধীনতা পরবর্তী ভারতবর্ষের পটভূমিকায় 'আর একদিন'-এ পৌঁছে যায়। সে এক অদ্ভুত সংক্ষুব্ধ, নতুনত্বের যন্ত্রণাদীর্ণ ভারতবর্ষ। কমিউনিস্টদের যখন নামান্তর 'গুণ্ডা' মাত্র। মৌলানা আজাদ সাহেবের মতো মানুষ অন্তত তাই ভেবেছিলেন। অন্যরকম কিছু নয়। যদিও একইসঙ্গে ইতিহাসসিদ্ধভাবে আঁকা হয়ে যায় হয়তো গোপাল হালদারের ইচ্ছের বিরুদ্ধেই যে বিয়াল্লিশের মুক্তিসংগ্রামের অগ্নিগর্ভ দিনে কমিউনিস্ট পার্টির ভূমিকা সদর্থক ছিলো না। ড. রায়চৌধুরী অবশ্য কমিউনিজমের পথকে ছোট আমি থেকে বড়ো আমির দিকে যাত্রা বলেই মনে করেছেন। এই 'আর একদিন'—তাই দেখি মার্কসবাদী অমিত আর একা নয়, সহযাত্রী অসংখ্য। এক আবেগোদ্বেল পরিস্থিতি—"All roads lead to communism'—সব পথ শেষ পর্যন্ত সমাপ্ত হয় বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্রবাদে। চেতনা প্রবাহ রীতিকে অনুসরণ করলেও একমাত্র 'একদা' ছাড়া তার শিল্পিত স্বভাব যে সর্বত্রই অসংশয়িত নয় এ কথার ইঙ্গিত-ও গবেষক দিয়েছেন। একইসঙ্গে একথাও সহজেই বলতে পেরেছেন যে সমাজ মনস্কতা বা আদর্শতন্ময়তায় সব সময় যে জীবনরক্ত বা প্রবৃত্তির মাপে মানানসই হয়ে উঠতে পারেনি—অবশ্যই চরিত্রগুলির গতিপ্রকৃতি বা গঠনে—সে কথাও। একই সঙ্গে এ সিদ্ধান্তও তাঁর পক্ষে অবধারিত হয়েছে যে 'আত্মকথনের রীতিতে বাংলার রাজনৈতিক ইতিহাসের এমন শিল্পিত রূপ দেবার প্রচেষ্টা গোপাল হালদার-ই প্রথম করেছেন। বাংলা উপন্যাসের পরীক্ষা-নিরীক্ষার যুগে তাই তার মূল্য অপরিমেয়।'

মোট বারোখানির মতো উপন্যাস লিখেছেন গোপাল হালদার। সংস্কৃতির বিশ্বরূপেরই 'শিল্পিত জীবনভূমি' সৃষ্টির এই বৃত্ত। প্রত্যেকটিই যেন পৃথক একেকটি পর্ব। যদিও তাঁর মননশীলতাকে অন্তত কথাসাহিত্যের ক্ষেত্রে বাঙালি পাঠক সেভাবে নেয়নি বলে খুব সঙ্গত কারণেই ড. রায়চৌধুরীরর আক্ষেপ রয়ে গেছে। একে তিনি নিঃসংশয়ে মধ্যবিত্ত বাঙালির 'সর্বনাশা ভাঙনেরই অন্যতর আর একটি রূপ' বলে মনে করেন।

সংক্ষেপে 'ত্রিদিবা'র কথা বলতে গিয়ে একটি আবর্তসংকুল কাল তার প্রত্যাশী ইতিবাদী

মানসিকতাতেই সমূহ তথ্য নিয়ে উঠে এসেছে এই অপেক্ষাকৃত স্বল্প পরিসর গ্রন্থটিতে। আরও বৃহত্তর পটভূমি ও পরিসরে আরও অনুপুঙ্খতায় গোপাল হালদারের স্বতন্ত্র শিল্পীসত্তাকে তার সাফল্য ও বিফলতা সমতে ড. রায়চৌধুরী আমাদের গোচরে আনবেন প্রগতির পাথেয় হিসেবেই—এ প্রত্যাশা রয়ে গেল। প্রত্যাশা এই কারণে যে তাঁর সঞ্চয় ও সামর্থ্য তিনি প্রমাণ করেছেন।

আলেখ্য ভট্টাচার্য

গোপাল হালদার : প্রসঙ্গ ত্রিদিবা।। ড. সুব্রত রায়চৌধুরী। সাহিত্যলোক, ৩২/৭ বিডন স্ট্রিট, কলকাতা-৬। ৬০ টাকা

কোমল আতুর হৃৎস্পন্দন

সত্তরের দশকে প্রকাশিত হয়েছিল অমিয় ধর-এর প্রথম কবিতার বই—'বিষণ্ণ কৌতুক।' একুশ শতকের মুখোমুখি প্রকাশিত হল তার দ্বিতীয় কবিতার বই 'কে আছো।' এই দীর্ঘ সময় অমিয় কি কবিতা লেখেনি? বিশ্বাস করতে মন চায় না। অবশ্যই এই সময়ের মধ্যে গবেষণায় মন দিয়েছে এবং নিজেকে প্রতিষ্ঠিতও করেছে গোপাল হালদার বিশেষজ্ঞ হিসাবে। পরিচয়-এর কয়েকটি বিশেষ সংখ্যা প্রকাশনায় তার সন্ধানের তৃষ্ণা, নিষ্ঠা বিশ্লেষণধর্মীতার মৌলিকত্ব সুধীজন স্বীকার করে নিয়েছেন।

অথচ আবার কবিতার ক্ষেত্রে আমার মনে হয়েছে অমিয় রোম্যানটিক লিরিক স্বভাবের মানুষ। তা হলে কি অমিয় বিভাজিত মানুষ? একদিকে তীক্ষ্ণধী বিশ্লেষণের ছুরি কাঁচি অন্য দিকে কোমল আতুর হৃদ্স্পন্দন—এই দুয়ের সম্পর্ক কি অনিবার্য ভাবে সুয়োরানী দুয়োরানীর? আমার তা মনে হয়নি। বিশ্লেষণ তাকে সংশ্লেষণের পদ্ধতিতে সাহায্য করেছে। কারণ অমিয় ধর-এর কবিতা, আমার মনে হয়েছে, আবেগধর্মী এবং সেই আবেগ ধীমান। কবিতা তো শুধু মাত্র বন্য আবেগ নয়, কবিতা নিজেকে সৃজন করা। একটা চিত্রকলা তো শুধু বর্ণময় জ্যোতি নয়, সে আবার একটা ভাবনার জ্যোতিষ্ক। সেই ভাবনার মূলে আছে নিশ্চয়ই বাস্তবতা ও তার অভিজ্ঞতা। কিন্তু সেখানেই তা থেমে থাকছে না। সে তৈরি করছে রূপময় দ্বিতীয় ভুবন। এ হল আত্মসৃষ্টি যা সহানুভূতিসম্পন্ন পাঠকের কাছে উৎসর্গীকৃত এই-ই তার বেঁচে থাকা, এবং গবেষণালব্ধ জ্ঞান এবং গবেষণার যুক্তিসিদ্ধ পদ্ধতি তার কবি মানসকে 'সেনটিমেনট্যাল' হতে দেয়নি, করেছে শব্দ গন্ধ বর্ণ ও জ্ঞানের সমন্বয়ে একটা জৈবিক সত্তা এই জ্ঞানই তাকে করেছে 'ইমোশনাল।' কারণ স্বভাবের দিক থেকে অমিয় অতিমাত্রায় রোম্যানটিক বলে, একটা রাগ থাকা দরকার ছিল যাতে সে ভেসে না যায় এবং তারই ফলে দেখা যায় অমিয়-র কবিতার বড় বৈশিষ্ট্য হল ঘন সংবদ্ধ সংহতি। মাত্রাসিদ্ধ উচ্চারণে

কবিতাগুলি অধিকাংশ ক্ষেত্রে ব্যঞ্জনাময় ও ইংগিতধর্মী, মাঝে মাঝে মনে হতে পারে ঘুমের ঘোরে অস্ফুট উচ্চারণ, মাঝে মাঝ মনে হয়েছে আমি যেন কবির অন্তরঙ্গ দিনলিপি পড়ছি, যেমন, ধরা যেতে পারে 'ফুল, নদী, সূর্যোদয় নারী' কবিতার কথা।

মেঘ
মেঘের চূড়ায়
সূর্যোদয়, নারী
তোমার মুখ-ই সূর্যোদয় আলো।

ছুঁই
দু'হাতে ছুঁই
পুষ্পরেণু নারী
তোমার মুখই গোলাপী রঙ।

নদী
নদীর মধ্যে নারী
নারী
তোমার বুক-ই নদী।
তুমি কি সেই ফুল-নদী-সূর্যোদয় নারী।

আধুনিক কাব্য রীতি মেনেও, অনেকটা জল রং-এর কাজের মতো ভারহীন অবয়ব নিয়ে এসেও কবিতাটি সাধারণের স্তর থেকে কিছুতেই উঠে আসতে পারতো না যদি না শেষের পংক্তির 'কি' শব্দটা না থাকতো। আধুনিক মননে নারী একটা বিমূর্ত ধারণা নয়। অনাদিকালের রূপ কি আজও আমরা দেখছি। এই প্রশ্ন একটা অর্ন্তদাহ, এখানেই আধুনিকতার ভিত্তি এবং তা ফুটে ওঠে 'কি' এই প্রশ্ন, এই সংশয়ের মধ্য দিয়ে। এই অন্তর্দাহ বা এ্যাংগুইশ দেহ পায় নতুন ভাবে 'এর থেকে ভয়ঙ্কর মৃত্যু কাকে বলে' কবিতায়। আত্মচ্যুতি, বিচ্ছিন্নতা অনুভূতি নির্ভর মানুষের কাছে কত তীব্র হতে পারে, তা ভাল করে বোঝা যায় এই কবিতায়। 'স্বজনে নির্জন একা, আলিঙ্গনে আলোকবর্ষের ব্যবধান কবিতায়'। মাত্র এগারো লাইনের কবিতায় আত্মচ্যুতির এত তীব্র প্রকাশ দুর্লভ বলেই মনে হয়। কবিতার জাদুকরী প্রকাশ একটা অনন্য অভিজ্ঞতা হয়ে ওঠে যখন আলিঙ্গনের অপ্রাপ্তিকে 'আলোক বর্ষের ব্যবধান' বলে কবি চিহ্নিত করেন। আণবিক যুগে মহাকাশ গবেষণা আমাদের জানিয়ে দিয়েছে আলোকবর্ষের ব্যবধান কথাটার অর্থ। 'স্বজনে নির্জন একা'—এই মেধাবী প্রকাশ নিশ্চয়ই পাঠককে আপ্লুত করবে। মনে হবে যাকে বুকে টানি সে তো নিষ্প্রাণ নিরুত্তর ও নিরুজ্জ্বল বস্তু। এই সঙ্গে বিশেষ ভাবে বলা দরকার, অমিয় ধর-এর কাব্যরীতির প্রধান আকর্ষণ হল তার ব্যঞ্জনা, সোজাসুজি প্রকাশ ইংগিতে কথা বলা এবং এই অনেক ক্ষেত্রে অনিবার্যভাবে পাঠকের কাছ থেকে ইভোকেটিভ রেসপন্স আদায় করে ছাড়ে। রোম্যানটিক মনোভঙ্গির সঙ্গে এই ঘন

সংবদ্ধ দাঢ্য একটা উল্লেখযোগ্য বিশেষত্ব। এই বক্তব্যের সমর্থনে আরও 'ভালবাসা অভ্রচূড় জ্যোৎস্নার প্লাবন' কবিতাটি উল্লেখ করা যায়। মানুষ মানুষীর আদিম মিলনে আত্মপ্রকাশ এই কবিতার মর্মবস্তু। কিন্তু আশ্চর্য সংযমে ও ধীরতায় কবি মুহূর্তটিকে সৌন্দর্যময় করে তুলেছেন।

ইংগিতবহি কাব্য মুহূর্ত দাঁড়িয়ে আছে কবির নিসর্গ চেতনায়। এই চেতনা কোনো অংশে জীবনানন্দীয় নয়, কবির একান্ত অনুভূতির ফল। এই নিসর্গই কবির প্রধান আশ্রয়। এই নিসর্গকে কেন্দ্র করে যে চিত্রকল্প তিনি সৃষ্টি করেন তা মেটাফর হয়ে ওঠে।

অন্যদিকে, ব্যক্তিক এই শুদ্ধতা সম্ভব একমাত্র সমাজ বাস্তবতায়। এই সত্য কবির মর্মকেন্দ্রে জাগ্রত নক্ষত্র হবার জন্য। 'সহ্য হয় না কবিতায়' একটা কিছু করার জন্য আবেদন করেন ডাক্তারের কাছে। কারণ নিসর্গ নির্ভর এই কবিরও ভয়—'আমি কি সরীসৃপ হয়ে যাবো?' মানবতা হারানোর চেয়ে আর বড় পতন কী থাকতে পারে?

তাই, মনে হয়, ব্যক্তি ও সমগ্র, নিসর্গ এবং ধী, লিরিক্যাল রোম্যানটিকতা ও ধ্রুপদী সংযম নিয়ে অমিয় ধর তার সাম্প্রতিকতম কবিতার বই 'কে আছো'-তে তিনি নতুন আত্মপরিচয় দিয়েছেন যা আনন্দের সঙ্গে বরণীয়।

রাম বসু

কে আছো।। অমিয় ধর। অতএব প্রকাশনী। রবীন্দ্রপল্লী, নিমতা। পনেরো টাকা

বাংলা উপন্যাসে যৌবন

গত শতাব্দীর দুই অর্ধে দু-বার বাংলা উপন্যাস সামাজিক প্রতিক্রিয়ার কবলে পড়েছিল। প্রথমবার তিন ও চারের দশকে, আর একবার ছয় ও সাতের দশকে। বিশ্বযুদ্ধের অনুষঙ্গে য়ুরোপীয় দর্শন ও ভাবধারার অভিঘাতে উপন্যাসের বিষয় ও রূপকে গুণগতভাবে বদলাতে দেখেছি আমরা। পরের বার স্বাধীন ভারতের আন্তর সমস্যা থেকে তৈরি হয়েছিল সংকট। দ্রুত স্বপ্নভঙ্গ, রাজনৈতিক মতাদর্শের চুলচেরা বিতর্ক, বিপ্লব ও প্রতিবিপ্লবের প্রকট ভাবদ্বন্দ্ব, বুর্জোয়া শাসকের ক্ষমতা কেন্দ্রীকরণের (জরুরি অবস্থা) কাছে গণতান্ত্রিক আদর্শের ভূলুণ্ঠিত হওয়া, রাজনৈতিক দ্বন্দ্বের মধ্যে ব্যক্তিহত্যার বিষ পাকাপাকি ভাবে সংক্রামিত হওয়া ইত্যাদি প্রতিক্রিয়ার ছাপ পড়লো ছয় ও সাতের দশকের সাহিত্যে। প্রথমবারের সংকটের চেহারা ছিল সাংস্কৃতিক বুদ্ধিজীবিতার। আত্মিক সংকটে উদ্‌ভ্রান্ত হয়েছিল শিক্ষিত মধ্যবিত্তের মনোভূমি। আর স্বাধীন ভারতের সংকট পর্বের নির্বিচার শিকার হলো যুবকশ্রেণী। মনোরম স্বপ্নে লালিত হচ্ছিল যে প্রজন্ম তাদের অন্তরভূমিকে সবচেয়ে বিষাক্ত করে তুলেছিল ঐ পটভূমি। যুব সম্প্রদায়ের পথ সন্ধানের অস্থিরতা এবং বিপদগামিতাই ছিল শতাব্দীর ছয় ও সাতের দশকের অভিশাপ। উর্মি রায়চৌধুরী সাহিত্যে প্রতিফলিত ঐ যন্ত্রণার ছবি কেন্দ্রিত করেই ধরতে চেয়েছেন তাঁর গ্রন্থে। তাই তাঁর রচিত গ্রন্থের নাম 'বাংলা উপন্যাসে যুব সমাজ'।

একেবারে সরাসরি একটি সোজা প্রতিবেদন।

ঊর্মির প্রতিবেদনে সামাজিক দায়িত্বশীলতার ছাপ আছে। তাঁর গ্রন্থে বিন্যস্ত দশটি অধ্যায়ের বিষয় অন্তত সেই কথাই বলছে। প্রসঙ্গ কথা, কাহিনী বিন্যাস, চরিত্র চিত্রণ, পটভূমি, আর্থ-সামাজিক অবস্থা, রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গি, সাংস্কৃতিক চেতনা, বাক্‌রীতি, শিল্পমূল্য বিচার, উপসংহার এই দশটি অংশে তাঁর গ্রন্থটি বিভক্ত। বেশ বোঝা যায়, বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রীলাভের লক্ষ্যে কিছু বাঁধাধরা এ্যাকাডেমিক জিজ্ঞাসাকে জড়িয়ে নেওয়া হয়েছে মূল সামাজিক অনুসন্ধানের সঙ্গে। এতে কিছুটা দ্বিধান্বিত হয়ে পড়েছে আলোচ্য প্রসঙ্গটি। এ গ্রন্থের বেশ কিছু অধ্যায়ে যত্নশীল পর্যবেক্ষণার ছাপ আছে। Victimised যুবকেরা নীলকণ্ঠের মতোই বিষচিহ্ন ধারণ করে ঐ সব আলোচনার গর্ভ থেকে সারে সারে উঠে এসেছে। তাদের সমস্যার সাথী হয়ে একটা প্রজন্মের পরিকল্পিত হননের কথা একান্তে ভাবতে ভাবতে মনে হয় এই বিচারের কাছে কাহিনী-বিন্যাস, চরিত্র চিত্রণ বা শিল্পমূল্য বিচারের সাবেক কাসুন্দি কেমন যেন অর্থহীন। উপন্যাসের কথা উঠলেই আঙ্গিকের ছকে তার হিসাব মেলাতে হবে একথা কে বললো। বিষয় যেখানে অন্তর্ভেদে তথ্যসার নিষ্কাশন করতে চাইছে, সেখানে তার রচনাকর্মকে একমুখেই প্রেরণ করলে প্রতিপাদ্য গ্রন্থের শক্তি হয়তো আরও বাড়তো।

তবে এ ঊর্মির কাজের দাম কমে গেছে একথা ভাবার কোনও কারণ নেই। সে প্রসঙ্গে আসার আগে এ্যাডাকেমিক প্রথানুগতির একটা সুফলের কথা অবশ্যই বলতে হয়। উপসংহার অংশটি এ গ্রন্থের এক চমকপ্রদ অংশ। বিষয়ের ভাববিস্তার এজন্য অন্যমাত্রায় পৌঁছে গেছে। যে তুলনামূলক বিচার পদ্ধতি সব এ্যাকাডেমিক গবেষণার প্রাণসম্পদ, ঊর্মি সুন্দরভাবে তার ব্যবহার যোগ্যতার পরিচয় দিয়েছেন। উপসংহার অংশে চারটি দৃষ্টিকোণ রয়েছে। (১) যুবসমাজাশ্রিত সমকালীন ছোটগল্প, কবিতা ও নাটকের সঙ্গে আলোচ্য উপন্যাসগুলির তুলনা, (২) বাংলাদেশের যুবসমাজ ভিত্তিক উপন্যাসের সঙ্গে তুলনার দৃষ্টিকোণ, (৩) যুবসমাজাশ্রিত পাশ্চাত্য সাহিত্যের সঙ্গে তুলনা এবং (৪) বাংলাসাহিত্যে এ বিষয়ভিত্তিক উপন্যাসগুলির গুরুত্ব বিচারে স্থাননির্ণয়। আমার অনুমানটি সমর্থিত হল এই বিন্যাস ভঙ্গিমার দ্বারা। সমাজতাত্ত্বিক পর্যবেক্ষণকে এ্যাকাডেমিক ভঙ্গিমা দিয়ে এখানে ঘেরা হয়েছে। তুলনার ক্ষেত্রগুলি at random পদ্ধতিতে এলেও মুন্সিয়ানার ভাবটি অদৃশ্য নয়।

ঊর্মির কাজ প্রথম বাহবাযোগ্য এই অর্থে, একালের চাহিদামতই তাঁর অনুসন্ধানী দৃষ্টিতে গত শতাব্দীর শেষ ৫০ বছরের মধ্যে অগ্নিগর্ভ তিনটি দশকের (১৯৬১-'৮৫) ৬২টি উপন্যাস আলোচিত হওয়ার মর্যাদা লাভ করেছে। ১৯৫০কে ডিঙিয়ে পরের ৫০ বছরের সৃষ্টিধারার মর্মবিশ্লেষণ কতটা জরুরি, বিগতপ্রায় আমাদের প্রজন্মের সমালোচকেরা তা মর্মে মর্মে অনুধাবন করতে পারছি। নিজেরা না পারলেও ছাত্র-ছাত্রী গবেষকদের দিয়ে এ কাজটা করানো আমাদেরই দায়। ঊর্মি আমাদের অনারব্ধ কাজের দিকে হাত বাড়িয়েছেন। সুতরাং তিনি প্রশংসার্হ। ৬২টি উপন্যাস সযত্নে পাঠ করে যৌবনের বিপর্যস্ত চালচিত্রের মধ্যে তাকে স্থান করে দেওয়া, বেশ শ্রমসাধ্য কাজ, একথা স্বীকার করতেই হবে।

ঊর্মির গ্রন্থের ৫ম থেকে ৮ম এই চারটি অধ্যায়ের যত্নবান বিশ্লেষণকে বিশেষ করে

সাধুবাদ জানাই। জীবনানন্দ একদিন সমগ্র যুগ-মনুষ্যত্বের অসুস্থতাকে ধরতে পেরেছিলেন। উর্মির গবেষণায় মারণবিষে জর্জরিত যুবসমাজের ক্ষতচিহ্নগুলিকে দেখে সেই কাব্য-বাণী যেন আবার স্মৃতিপথে আরূঢ় হয়। তাঁর বিশ্লেষণের চিহ্ন নিয়ে এক একটি চরিত্র যখন যন্ত্রণার চিহ্ন গায়ে মেখে উঠে আসে,তখন বাস্তবিক আমরা হতভম্ব হই। এদের অভ্যাস-সংস্কারের ধরনের সঙ্গেও উর্মি আমাদের পরিচিত করান। 'রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গি' এবং বিশেষ করে 'বাকরীতি' অধ্যায়টি এ বিষয়ে তাৎপর্যপূর্ণ হয়ে ওঠে। আমাদের পরিভাষায় চিহ্নিত লুম্পেনদের নিজস্ব ভাষা-ব্যাকরণকে খুঁজে খুঁজে বার করে লেখিকা যে শ্রেণীকৃত তালিকাটি দাখিল করেছেন, তা' সত্যিই কৌতূহলোদ্দীপক। 'সাংস্কৃতিক চেতনা' অধ্যায়টিতে যুব সমাজের সাংস্কৃতিক কেন্দ্রবিন্দুটিকে ধরার চেষ্টা আছে।

সব দিক মিলিয়ে আমার মনে হয়, এ গ্রন্থ শিক্ষার্থীদের নজর কাড়বে। বিগত পঞ্চাশ বছরের তন্ময়চর্চার জোরদার উদ্যোগ শুরু হয়েছে। উর্মি রায়চৌধুরী হয়তো তাদের বন্ধনীভুক্ত নামের তালিকায় স্থান পেতে পারে, এটাই আমার অনুমান।

জয়ন্ত বন্দ্যোপাধ্যায়

বাংলা উপন্যাসে যুব সমাজ।। উর্মি রায়চৌধুরী। পরিবেশক পুস্তক বিপণি। ১০০ টাকা

লোকাভরণ : আধুনিক কবিতার শৈলী

শিল্পের সঙ্গে ব্যক্তি এবং ঐতিহ্যের রয়েছে এক গভীর এবং গূঢ় বন্ধন। সহজ অথচ চরমতম এই সত্যটি ধরা পড়েছিলো এলিয়টের কবি-অনুভূতিতে। কিন্তু ঐতিহ্য তো শুধু শিক্ষিত লেখকের নাগরিক ঐতিহ্য নয়, নাগরিক সাহিত্যচেতনার গহন অন্তস্তলে সদাজাগ্রত থাকে এক প্রগাঢ় লোকচৈতন্য। অন্তর্লীন এই লোকচেতনায় প্রভাবিত হন লেখক, ফলে শিল্পনির্মাণের আন্তরিকতায় অনেক সময় নিজের অজান্তেই তিনি লোকায়ত আর নাগরিক সংস্কৃতিবিশ্বের মধ্যে গড়ে তোলেন এক আশ্চর্য সেতুবন্ধ। মেলবন্ধনের অভিনব ঐকান্তিকতা দেখতে পাই কবিতার জগতেও—কবিতা যখন শিল্প হয়ে ওঠে। বস্তুত, আধুনিক বাংলা কবিতার সমস্ত দেহে এমনই ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে থাকতে দেখি লোকজ সুর, স্মৃতি, ছবি অথবা গান—ঐতিহ্যের নানা উজ্জ্বল স্বর্ণখণ্ড। ফলে কবিতা সবসময় কবির নিজস্ব সম্পদ হয়েও থাকে না, কবির কণ্ঠস্বরকে কখনো কখনো ছাপিয়ে ওঠে লোকজীবন এবং সংস্কৃতির অর্কেস্ট্রা। কবিতার এই বহুস্বরিকতাকে এলিয়টের মতো কবি হয়তো সহজে বুঝতে পারেন, কিন্তু পাঠককে এ অনুভূতিতে পৌঁছতে হয় অনেক কঠিন পথ পেরিয়ে। কবিতার নিবিড় পাঠ, পাঠ থেকে পাঠান্তর এবং এক জটিল বিনির্মাণের মধ্যে দিয়ে পাঠক হয়তো ছুঁতে পারেন শিল্পের গোপন লোকায়ত অবতল। অবশ্য পাঠকের উপলব্ধির কাজটাকে অনেকটাকে সহজ

করে দেন সমালোচক। কারণ ভক্ত পাঠককে হাত ধরে সাহিত্যের রূপবিগ্রহের কাছাকাছি পৌঁছে দিতে পারেন ঋত্বিক সমালোচক। অতি সাম্প্রতিক সময়ে প্রকাশিত 'লোকাভরণ : আধুনিক কবিতার শৈলী' গ্রন্থের রচনাকারের মধ্যে আমরা এমনই এক ঋত্বিকের সন্ধান পেয়ে যাই। কবিতার সাবলীল আলোচনার মাধ্যমে তিনি উদ্ভাসিত করেছেন কবিতার আবরণে অবগুণ্ঠিত চিরায়ত লোকপ্রতিমাটিকে।

বাংলা সমালোচনার জগতে বিপ্লব চক্রবর্তী অবশ্যই একটি অতি পরিচিত নাম। ভারতীয় সাহিত্যের তুলনামূলক বিচার ও বিশ্লেষণে যাঁরা এতাবৎকালে ভাবিত হয়েছেন, তাঁদের মধ্যে তিনি একজন অন্যতম প্রাজ্ঞ পথিকৃৎ। একাধিক গ্রন্থ ও প্রবন্ধের রচয়িতা, দেশে-বিদেশে প্রশংসতি এ হেন সমালোচকের বর্তমান গ্রন্থটি বাংলা কবিতার সমালোচনায় এক নতুন দিগ্‌দর্শন, একথা নির্দ্বিধায় বলা চলে।

গ্রন্থের শিরোনামে 'লোকাভরণ' অভিধাটি অবশ্য লেখকের নিজস্ব। এ পরিভাষাটির পরিচয় দিতে গিয়ে লেখক বলেন—"লোকোপাদানের আত্তীকরণই লোকাভরণের মূল। লোকজীবনের উপাদান যখন কাব্যকায়ার সঙ্গে সমীভূত হয় তখন তা হয়ে ওঠে লোকাভরণ। 'আভরণ' শব্দের অর্থ এখানে সম্যকরূপে ধারণ করার অর্থ বোঝা যায়। কারণ তখন তা হয়ে ওঠে কাব্যের অন্তরঙ্গ অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ—তার সম্পূর্ণতার দ্যোতক এক শৈলী" (পৃ. ১৭-১৮)। বলাই বাহুল্য, লোকাভরণ কাব্যের কোনো বহিরঙ্গ অলঙ্কার নয়, বরং তা কাব্যের নিহিত উপাদানরূপেই ব্যবহৃত।

গ্রন্থ-শিরোনামের 'শৈলী' অভিধাটি বাঙালি পাঠকের কাছে পরিচিত। ইংরেজি 'স্টাইল' শব্দের বাংলা পরিভাষা এটি। শৈলীর সংজ্ঞা নিয়ে পণ্ডিতমহলে অবশ্য যথেষ্ট বিতর্ক রয়েছে। ক্রীস্টাল এবং ডেভি তাই বলতে বাধ্য হন—"Style is certainly a familiar word to most us; but unfortunately to say...style does not clearify matters greatly, because of the multiplicity of definitions that the word style has" (Investigating English style : D. Crystal and D. Davy, 1969 : 9)। লেখক অবশ্য কোনো বিতর্কে না গিয়ে বলেছেন—"এখানো শৈলী বলতে প্রজ্ঞপ্তি বা বিশেষ জ্ঞাপন বুঝতে হবে। অবশ্যই তা হল কোনো ভাষায় নির্মিত প্রতিমার" (পৃ. ১৮)। পাশ্চাত্য সমালোচক স্তাঁধালের ভাবনার সঙ্গে এ ধারণা মিলে যায়। কারণ স্টাইলের অর্থ তাঁর কাছেও 'effective presentation'.

সাড়ে তিনশো পাতার সুবৃহৎ এই গ্রন্থের মূল আলোচনা দুটি পর্বে বিন্যস্ত। প্রথম পর্বটিতে লোকাভরণের স্বরূপ ও বৈচিত্র্য লেখক তুলে ধরেছেন তিনটি অধ্যায়ে। মূলত, লোকাভরণের প্রয়োগ, প্রকার ও প্রকরণ নিয়ে আলোচনাই এই পর্বের মুখ্য উদ্দেশ্য। দ্বিতীয় পর্বে রবীন্দ্রনাথ, নজরুল দিয়ে শুরু করে তিরিশ থেকে পঞ্চাশের দশকের কয়েকজন বিশিষ্ট কবির কবিতায় লোকাভরণের প্রয়োগগত অভিনবত্ব অনুধাবনের উজ্জ্বল প্রয়াস রয়েছে। কবিদের মধ্যে স্থান পেয়েছেন সুধীন্দ্রনাথ দত্ত, বিষ্ণু দে, জীবনানন্দ দাশ, শঙ্খ ঘোষ, এমনকি সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের মতো বহু বিশিষ্ট কবি। গ্রন্থের দ্বিতীয় পর্ব দীর্ঘবিস্তৃত। বোঝা যায়, তত্ত্বের থেকেও প্রায়োগিক

দিকটিকে লেখক প্রাধান্য দিয়েছেন অনেক বেশি। তিনশো পাতা জুড়ে তাই দ্বিতীয় পর্বের আলোচনা।

কবিতার অধিবাচনে সম্পৃক্ত থাকতে পারে লোকায়ত সংকেত, অন্তর্শায়ী লোকপ্রকরণের সুবিন্যস্ত আভাস। লেখকের এ ধরনের ভাবনার তাত্ত্বিক মূল্য রয়েছে যথেষ্ট। সমাজ-ভাষাবিজ্ঞানের দৃষ্টিকোণ থেকে দেখতে গেলে প্রয়োগের তত্ত্বগত সমর্থনও পাওয়া যায়। আসলে ভাষা এক চলিষ্ণু ধর্মের অধিকারী। আঞ্চলিক থেকে মান্যভাষা অথবা মাতৃভাষা থেকে শিষ্টভাষায় উত্তরণের এক সর্বজনীন চলমান প্রক্রিয়া ভাষিক প্রেক্ষাপটে অবিরতই সক্রিয় থাকে। ভাষার এই সম্প্রসারণশীল ধর্মের ব্যাখ্যা দিতে চেয়েছেন হগেন—ক্রিয়াশীলতার বিশদীভবন (elaboration of function) প্রক্রিয়ার মাধ্যমে। (দ্র. Dialect, Language, Nation : E. Haugen, 1966; Sociolinguistics : (ed.) J. B. Pride, J. Holmes, 1972 : 97-I I I)। ভাষার সামাজিক-দায়িত্ব ও মূল্যমান বিশেষ কারণে যখন বর্ধিত হতে থাকে, তখন কোনো ভাষাই স্থাণু থাকতে পারে না, সম্প্রসারণশীলতায় ঘটে তার প্রকাশ।

একথা সত্যি যে শিষ্টভাষার ভাষিক উপাদানে ক্রিয়াশীলতা অপেক্ষাকৃত বহিঃপ্রকাশিত, মুক্ত; যদিও লোকভাষায় তা নিগূঢ় এবং বদ্ধ। বের্নস্টাইনের মতানুসারে বলতে পারি, শিষ্টভাষার ভাষিক কোড অপেক্ষাকৃত সম্প্রসারিত বিশদ (elaborated), লোকভাষার মতো তা সংকীর্ণ (restricted) নয়। বিশদ প্রতীকের গ্রহণযোগ্যতা বহুমুখী, অর্থগত আবেদনও বহুলাংশে সর্বজনীন। বিপরীতপক্ষে, সংকীর্ণ প্রতীক অধিকতর প্রসঙ্গবদ্ধ (contextualized) এবং অনেক সময়ই শ্রোতার পূর্ব ধারণার দ্বারা নিয়ন্ত্রিত (দ্র. Social class, Language and Socialization : B. Bernstein; Language and Social Context : P. P. Giglioli, 1970 : 163-64)। বস্তুত, এ কারণেই লোকায়ত প্রতীকের পাঠ অনেক ক্ষেত্রেই পাঠকের বোধগম্য নয়, কারণ তা নির্ভর করে অর্জিত সাংস্কৃতিক অভিজ্ঞতার ওপর। কিন্তু এও মনে রাখতে হবে, লোকভাষার পরিসর সংকীর্ণ হলেও তার ব্যাপন (diffusion) প্রক্রিয়া থেমে নেই। অবতলের ভাষার উপাদান হয়েও লোকায়ত কোড জনভাষা ও শিষ্টভাষার উপরিতলে সম্প্রসারিত হতেই পারে। এ ধরনের সম্প্রসারণকে বলা যায় 'pressure from down change'। (অবতলের ভাষাও যে উপরিতলের ভাষাকে প্রভাবিত করতে পারে, সমাজ-ভাষাবিজ্ঞানী লেবভ তার প্রমাণ দিয়েছেন। দ্র. Sociolinguistic Patterns : W. Labov, 1972)

সামাজিক স্তরে স্বতঃস্ফূর্ত এই বিশদায়নের (auto-elaboration) পাশাপাশি আরো এক দফা বিশদীকরণ (elaboration) ঘটাল লেখক স্বয়ং। সচেতন কবি অনেক সময়ই লোকায়ত প্রতীককে লোকবৃত্তের গণ্ডী থেকে মুক্ত করে বৃহত্তর জনসমাজের বোধগম্য প্রতীকে, রূপান্তরিত করেন। ফলে উচ্চতর সাহিত্যের সঙ্গে লোকসাহিত্যের এক চিরকালীন যোগসূত্র গড়ে ওঠে।

আধুনিক বাংলা কাব্যসাহিত্যও লোকায়ত প্রভাব থেকে মুক্ত নয়। উনিশ শতকের ঈশ্বর গুপ্তের কবিতাতেও তাই লৌকিক ছড়ার প্রভাব—"বন হতে এল এক টিয়ে মনোহর/ সোনার

টোপরা শোভে মাথার উপর।" আধুনিক কবিতায় লোকায়ত প্রভাব মূলত তিন ধরনের— (ক) বিষয়গত, যেমন রূপকথা, ব্যালাড ইত্যাদি কথাবস্তুর অনুসরণ এবং তদনুরূপ চিত্রকল্প সৃষ্টি, (খ) আঙ্গিকগত, যেমন গীতিসংযোজন, ছড়া, প্রবাদ, মন্ত্র বা লোকভাষার ব্যবহার, (গ) বিশেষ মোটিফ বা অভিপ্রায়ের আরোপ। যেমন রাজপুত্র-রাজকন্যা-রাক্ষস, বিশেষ পাখি-বেঙ্গমা/বেঙ্গমী, জীয়নকাঠি/মরণকাঠি ইত্যাদি। লেখক অবশ্য বর্তমান গ্রন্থে নিছক লোকায়ত উপাদান সংগ্রহ করেননি। লোক-উপকরণ কীভাবে কবিতার অধিবাচনে লোকাভরণ হয়ে ওঠে, তা বিচার করতে একটি নিজস্ব মানদণ্ড তৈরি করেছেন। লেখকের মতে লোকাভরণ মূলত দু'প্রকার—অনন্বয়ী ও অন্বয়ী। অন্বয়ী লোকাভরণ আবার চিহ্নিত হতে পারে পাঁচ রকম ভাবে—(১) পদান্বয়ী, (২) বাক্যান্বয়ী, (৩) ভাবান্বয়ী, (৪) অবধারক, (৫) পাদপূরক। যথোপযুক্ত উদাহরণের সাহায্যে দ্বিতীয় অধ্যায়ে এ ধারণাগুলিকে স্পষ্ট করে তোলা হয়েছে।

প্রথম অধ্যায়ে লেখকের আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ পর্যবেক্ষণ আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে, আর তা হ'লো লোকাভরণের প্রসঙ্গীকরণ (Contextualization)। একই লোকোপাদান একাধিক কবির রচনায় নিহিত উপাদান হতে পারে। কিন্তু কবির নিজস্ব প্রয়োগদক্ষতায় স্বতন্ত্র প্রসঙ্গে তা স্বতন্ত্র লোকাভরণ হয়ে ওঠে। বস্তুত, শৈলীর আলোচনায় প্রসঙ্গের ভূমিকা খুবই জরুরি। এঙ্কভিস্ট এজন্যই বলেন—"Style.....is a link between context and linguistic form" (দ্র. On defining style. N.E.Enkvist. Linguistics and Style : J. Spencer (ed.), 1965 : 33)। লোকাভরণের প্রসঙ্গবদ্ধ প্রয়োগ কবিতার ব্যাখ্যায় কীভাবে নতুনত্ব আনে, তার উদাহরণ পাওয়া যায় বিষ্ণু দে'র কবিতায়—"ট্রেন এলো ব'লে হাওড়ায়।/ওপারে স্টক এক্সচেঞ্জের এপারে রেলওয়ের হাওড়া,/তারি মধ্যে বসে আসেন শিব সদাগর/ট্যাক্সির হৃদ্‌স্পন্দে, ট্রাফিকের এটাক্সিয়ায়" লৌকিক ছড়ার শিব সদাগরের বসার স্থানটি আধুনিক দ্বন্দ্বময় নাগরিক বেচাকেনার মধ্যস্থলে চিহ্নিত হয়ে যায়। কর্মব্যস্ত বাণিজ্য শহরের ব্যস্ততার ছবি আঁকতে গিয়ে লৌকিক ছড়ার বিচূর্ণ উপাদান কবিতার শরীরে মিশে যায় (পৃ. ২০-২১)।

রচনার তৃতীয় অধ্যায়টিতে লেখক দেখিয়েছেন যে কীভাবে লোকজীবনের নানা বিষয় হয়ে ওঠে কবিতার প্রকরণ। যেমন, লোকরীতি ('ঘরে নেবার আগে/একবার ছুঁতে দাও লোহা, আগুন' : শঙ্খ ঘোষ, শ্মশান বন্ধু, তুমি তো তেমন গৌরী নও); লোকবচন ('কেই বা চায় দুঃখ নিতে/যা পেয়েছেন দেখুন ভেবে/নাক না ওটা নরুণ' : শঙ্খ ঘোষ, চাপ সৃষ্টি করুন, বাবরের প্রার্থনা), লোকব্রত ('তার হাত থেকে ভাইফোঁটা আজ/নেবই নেব' : অলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত, যমদুয়ারে, অস্ত সূর্য এঁকে দিল টেম্পেরা) ইত্যাদি।

পরিশেষে একথাই বলতে হয় যে এ গ্রন্থ দেশজ ঐতিহ্যের সঙ্গে সম্পৃক্ত। পাশ্চাত্য ভাবনার নকলনবিশী নেই, বিদেশী উদ্ধৃতি আর পরিভাষা ব্যবহারের বাহুল্যও নেই। তথ্যসূত্রের গুরুভার আমাদের পীড়িত করে না আদৌ। অথচ কবিতার ভাষাবিচারে লেখকের ভাষাবৈজ্ঞানিক সচেতনার প্রমাণ পাই বহুবার।

উপসংহারে গ্রন্থের ভূমিকাকার প্রখ্যাত সমালোচক অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের মন্তব্য

দিয়েই শেষ করতে পারি—"ওদেশে স্টাইল তত্ত্ব নিয়ে ব্যাকরণ অলঙ্কার ও ভাষাতত্ত্ব হৈ চৈ বাধিয়ে দিয়েছে। এই হৈ চৈ-এ যাঁরা যোগ দিতে চান, তাঁরা এ গ্রন্থ শয়নশিয়রে রাখতে পারেন।" আধুনিক বাংলা কবিতার অনুসন্ধিৎসু পাঠকের সামনে এ গ্রন্থ সত্যিই এক নতুন দিগন্তের সন্ধান দেবে।

অভিজিৎ মজুমদার

লোকান্তরণ : আধুনিক কবিতার শৈলী।। বিপ্লব চক্রবর্তী। পুস্তক বিপণি। ১৫০ টাকা

সুধীন্দ্রনাথ দত্তের জীবনী

কবি-প্রাবন্ধিক-সম্পাদক ও অনুবাদক সুধীন্দ্রনাথ দত্তের সাহিত্যকৃতি নিয়ে প্রভূত আলোচনা হলেও এতদিন আমাদের হাতে বাংলায় তাঁর কোনো জীবনী ছিল না। অধ্যাপক অমিয় দেব সুধীন্দ্রনাথের জীবনী ও সাহিত্যের যুগপৎ কালানুক্রমিক আলোচনায় সেই অভাবে মেটালেন তাঁর 'সুধীন্দ্রনাথ' গ্রন্থে।

গ্রন্থটির ন-টি অধ্যায়ে লেখক প্রচুর তথ্যসহ কবির জীবন ও সাহিত্য উপস্থাপিত করেছেন। কবির বাবা প্রখ্যাত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত এবং মা ইন্দুমতী বসুমল্লিক—উভয়পক্ষের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস জানিয়ে দেখিয়েছেন কিশোর সুধীন্দ্র বাবা হীরেন্দ্রনাথ, জ্যাঠামশাই ধীরেন্দ্রনাথ ও কাকা অমরেন্দ্রনাথের পুত্র সত্যেন্দ্রনাথের সযত্ন লালনেই ক্রমশ কবি হয়ে উঠেছেন। বলা যায়, এ হলো সুধীন্দ্রনাথের কবি হয়ে ওঠার পটভূমিকা ও প্রত্যক্ষভূমিকা। কবির প্রথম থেকে নবম খাতার বিস্তারিত বিবরণসহ জীবনীকার উদ্‌ঘাটিত করেছেন কবিজীবনের সেই ক্ষণিকার কথা—যিনি সুধীন্দ্রনাথের কবিতায় দীর্ঘপ্রসারী ছায়া রেখে গেছেন, যাঁর সংস্পর্শের অভিজ্ঞতায় কবি রচনা করতে পেরেছেন তাঁর প্রেমের বিখ্যাত কবিতাগুলি—যা বাংলা সাহিত্যপাঠকের কাছে উন্মোচিত করেছে নতুন দিগন্তের। এ যেন সুধীন্দ্রনাথের কবিতার প্রতিষ্ঠাপর্ব। মূলত তৃতীয়, চতুর্থ, সপ্তম ও অষ্টম অধ্যায়ে অধ্যায়ে লেখক উপস্থাপিত করেছেন কবির ছ-টি কাব্যগ্রন্থের প্রকাশ, বিস্তারিত পরিচয়, পাঠান্তর, প্রকাশের পরবর্তী পাঠ-প্রতিক্রিয়া। কবির কাব্যনন্দনভাবনাও প্রসঙ্গত আলোচিত হয়েছে। কাব্যনন্দনভাবনায় সুধীন্দ্রনাথ প্রাথমিক স্তরে জড়বাদী হলেও শেষ পর্যন্ত বৌদ্ধ ক্ষণবাদে মানসিক আশ্রয় পেয়েছেন। আর এই গ্রন্থে প্রাবন্ধিক বা গদ্যকার সুধীন্দ্রনাথের বিস্তারিত পরিচয় আছে মূলত পঞ্চম ও নবম অধ্যায়ে। পত্রিকা পাঠের সঙ্গে গ্রন্থপাঠের যে প্রচুর সংস্কারসাধন করতেন সুধীন্দ্রনাথ তারও উজ্জ্বল উদাহরণ উপস্থাপিত করেছেন লেখক। বাংলা ছাড়াও সুধীন্দ্রনাথের ইংরেজি গদ্যেরও পরিচয় উপস্থাপিত করেছেন লেখক। এডওয়ার্ড টমসন প্রস্তাবিত 'অক্সফোর্ড বুক অব বেঙ্গলি ভার্স' গ্রন্থটি রবীন্দ্রনাথের অভিভাবকত্বে এবং প্রশান্ত মহালানবিশের সঙ্গে কবিতা নির্বাচনে অংশ

নিয়েছিলেন সুধীন্দ্রনাথ। পরিকল্পিত কিন্তু অপ্রকাশিত সংকলনটি মুদ্রিত হলে অন্য এক সম্পাদক সুধীন্দ্রনাথের পরিচয় পাওয়া যেত। আর 'পরিচয়' পত্রিকার প্রতিষ্ঠাতা সম্পাদক সুধীন্দ্রনাথের ও 'পরিচয়' পত্রিকার জন্মকথা থেকে বিকাশের নানাকথা আলোচিত হয়েছে তৃতীয় অধ্যায়ে। পঞ্চম অধ্যায়ে আছে পরিচয়-এর সমৃদ্ধ আড্ডার কিছু পর্যালোচনা। অনুবাদক সুধীন্দ্রনাথের কথা আছে তৃতীয়, চতুর্থ ও অষ্টম অধ্যায়ে। অনুবাদ সম্পর্কে সুধীন্দ্রনাথের মন্তব্য : 'কোনো কবিতার যথাযথ অনুবাদ আমার বিবেচনায় অসম্ভব। অবশ্য মূলের যথাসাধ্য অনুসরণ অনুবাদকমাত্রের কর্তব্য; তবু এই চেষ্টার ফল শেষ পর্যন্ত যা দাঁড়ায়, তা সার্থক হলে, তাকে আর তর্জমা বলা চলে না। তাই আজকাল আমি সব অনুবাদের শিরোনামায় অবলম্বন শব্দটা জুড়ে দিই।' (সুরজিৎ দাশগুপ্তকে চিঠি)। সম্ভবত এই কারণেই কবি তাঁর অনূদিত কবিতার নিচে 'রচনা' শব্দটি ব্যবহার করতেন।

রবীন্দ্রনাথ ও সুধীন্দ্রনাথের যোগাযোগ সুধীন্দ্রনাথের কবি হয়ে ওঠায় বিশেষ প্রভাব ফেলেছে। সুধীন্দ্রনাথের একাধিক গ্রন্থের পাণ্ডুলিপি রবীন্দ্রনাথ পড়েছেন এবং সংশোধন করেছেন। রবীন্দ্রকৃত সব সংশোধিত পাঠই যে সুধীন্দ্রনাথ মেনে নিয়েছেন তা কিন্তু নয়। তবে নানা গদ্যে, চিঠিতে, গ্রন্থ-উৎসর্গে রবীন্দ্র-ঋণের কথা স্মরণ করেছেন। এই গ্রন্থের দ্বিতীয়, তৃতীয় ও পঞ্চম অধ্যায়ে তাই রবীন্দ্র-সুধীন্দ্র প্রসঙ্গ বিশেষ গুরুত্বের সঙ্গে উপস্থাপিত হয়েছে। স্পেন ও চিনের দুর্দিনে রবীন্দ্রনাথকে সঙ্গে চেয়েছেন সুধীন্দ্রনাথ এবং রবীন্দ্রনাথও সেই ডাকে সাড়া দিয়েছেন। তবে 'কুক্কুট' রচনার মাধ্যমেই সুধীন্দ্রনাথ প্রতিষ্ঠা করেছেন তাঁর স্বরস্বাতন্ত্র্য পুনর্বার। আবার রবীন্দ্রনাথ সম্পাদিত 'বাংলা কাব্যপরিচয়' গ্রন্থটিতে সুধীন্দ্রনাথের যে কবিতা নির্বাচিত হয়েছিল তা যে ঠিক হয়নি তা পত্রযোগে জানাতেও সুধীন্দ্রনাথ কুণ্ঠিত হননি। এ-ব্যাপারে রবীন্দ্র-সুধীন্দ্র যে চিঠিবিনিময় হয় তা তথ্যসহ হাজির করেছেন লেখক।

সুধীন্দ্রনাথের সঙ্গে বুদ্ধদেব বসু, বিষ্ণু দে ও সঞ্জয় ভট্টাচার্যের মেধাবী সাহচর্যের কথা বিস্তারিতভাবে তুলে ধরেছেন লেখক সপ্তম অধ্যায়ে। আর অষ্টম অধ্যায়ে আছে জীবনানন্দের সঙ্গে সুধীন্দ্রনাথের সুদূর সম্পর্কের কথা। কবি ছাড়া রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব মানবেন্দ্রনাথ রায় এবং চিত্রশিল্পী যামিনী রায়ের সঙ্গে সুধীন্দ্রনাথের সম্পর্ক প্রসঙ্গ আছে ষষ্ঠ অধ্যায়ে।

সুধীন্দ্রনাথের রাজনৈতিক ভাবনার পরিচয় আছে পঞ্চম, ষষ্ঠ ও সপ্তম অধ্যায়ে। রাজনৈতিক চেতনার দিক থেকে সুধীন্দ্রনাথ মার্কসবাদী ছিলেন না, কিন্তু মার্কসবাদে আগ্রহী ছিলেন। তিনি ছিলেন তীব্র স্ট্যালিনবিরোধী। ফলে এমন কথাও তিনি লিখেছেন,

'রুষের রহস্যে লুপ্ত লেনিনের মমি,
হাতুড়িনিষ্পিষ্ট ট্রট্স্কি, হিটলারের সুহৃদ্ স্টালিন্,
মৃত স্পেন, ম্রিয়মান চীন,
কবন্ধ ফরাসীদেশ।'

লেখক প্রশ্ন করেছেন, 'সুহৃদ্‌' কথাটার কি অনাক্রমণ চুক্তি ছাড়াও এক অন্য দ্যোতনা আছে—হিট্‌লারের মতোই নৃশংস?' (পৃ. ৯৯) পরবর্তীতে লেখেন, 'হিটলারের সুহৃদ স্টালিন্‌'—এ যদি মলোটভ-রিবেনট্রপ-চুক্তির সঙ্গে সঙ্গে এক উপমান (হিট্‌লার)-উপমেয় সম্পর্কও খানিক দেখা যায়।.....'রুষের রহসে লুপ্ত লেনিনের মামি' কি নিতান্তই স্টালিন-বিদূষণ, না সোভিয়েতের ব্যর্থতা প্রতিপাদন, নাকি সেই প্রতিপাদনের আচ্ছাদনে এক সার্বিক এনট্রপি তথা তাপমৃত্যুবোধ?' (পৃ. ১০৮)। প্রকৃত অর্থে সুধীন্দ্রনাথ ছিলেন উদারনীতিক মানবতাবাদী। ফ্যাসিবাদের প্রতি ছিল তাঁর তীব্র ঘৃণা। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের প্রাক্‌কালে ১৯৩৮-এ লিখিত ভারত প্রগতি ও ফ্যাসিবিরোধী লেখকসংঘের দ্বিতীয় সর্বভারতীয় সম্মেলনে তিনি ছিলেন সভাপতি-মণ্ডলীর অন্যতম। মূল অধিবেশনের ভাষণ 'Wiggism. Radicalism and Treason in Bengal' প্রকাশিত হয় New Indian Literature-এর ১৯৩৯ সংখ্যায়। শুধু তাই নয়, সুধীন্দ্রনাথ দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় সেনাবাহিনীতেও নাম লেখান। তাঁর স্বাস্থ্য ভালো না থাকায় তাঁকে যুদ্ধে না পাঠিয়ে নিয়োগ করা হয় এ. আর. পি-তে। সুধীন্দ্রনাথের গান্ধিমূল্যায়ন আলোচিত হয়েছে সপ্তম অধ্যায়ে। লেখকের কথায়, 'গান্ধিবাদী তিনি ছিলেন তো নাই, হয়েও উঠছিলেন না।' (পৃ. ১১৪)। যদিও '১৯৪৫' কবিতার 'তুমি' এই গ্রন্থে লেখকের মনে হয়েছে গান্ধি, কিন্তু ২৭ মে ২০০১ তারিখের এক দৈনিকে 'মননের আর্টিস্ট' গদ্যে লিখেছেন এই 'তুমি' মানবেন্দ্রনাথ রায়। ফলে, প্রশ্নচিহ্ন রয়েই গেল। যাই হোক, মানবেন্দ্রনাথ রায়ের সঙ্গে গভীর সখ্যতা গড়ে উঠলেও মানবেন্দ্রপন্থীও হয়ে ওঠেননি সুধীন্দ্রনাথ। (পৃ. ১১০ দ্র.)।

অধ্যাপক সুধীন্দ্রনাথের পরিচয় আছে অষ্টম অধ্যায়ে। সুধীন্দ্রনাথের সহকর্মী ফাদার পিয়ের ফার্লো, এস, জে লিখেছেন : 'তিনি একজন বড় শিক্ষক ছিলেন এবং তাঁর ছাত্র-ছাত্রীরা তাঁকে খুব ভালবাসত। কোন বিশ্ববিদ্যালয়ে কোন অধ্যাপকের প্রতি ছাত্রছাত্রীদের এমন আকর্ষণ আমি খুবই কম দেখেছি।' (র‍্যাডিক্যাল হিউম্যানিস্ট সুধীন্দ্রনাথ দত্ত সংখ্যায় ১৯৬০-এ প্রকাশিত এবং কালি ও কলম, অগ্রহায়ণ, ১৩৭৯-এ অনূদিত)। তাঁর এক ছাত্রী দময়ন্তী বসু সিং-এর সাক্ষ্যও উদ্ধারযোগ্য : 'ভালবাসি তাঁর সহজ সান্নিধ্য, ঋজু ব্যক্তিত্ব, তাঁর অপার লাবণ্য, বিরল সৌজন্যবোধ।...তিনি পড়ান ভের্লেন, মালার্মে, র‍্যাঁবো, টি এস এলিয়ট—প্রসঙ্গক্রমে এসে পড়ে দর্শন, তন্ত্র, গীতা, উপনিষদ'। অধ্যাপক অমিয় দেবও সুধীন্দ্রনাথের ক্লাসের ছাত্র হিসেবে তুলে ধরেন এক অসামান্য আলেখ্য।

এই গ্রন্থের ছাপার ভুল এবং মূল গ্রন্থের সঙ্গে মিলিয়ে যে পাঠবৈষম্য চোখে পড়েছে তা অন্যত্র (দ্র. আলোচনা চক্র, জানুয়ারি ২০০২) আলোচনা করেছি। পরবর্তী সংস্করণে এসব লেখকের ও সুধীন্দ্র পাঠকদের কাজে লাগবে আশা করি।

অঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়

সুধীন্দ্রনাথ দত্ত।। অমিয় দেব। পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি। ৭৫.০০

দৃশ্যত মহাদেশ, উজ্জ্বল কম্পাস

না। কিছুতেই ক্লিশের তালুবন্দি নয়, হওয়া যায়-ও না।

মাঝে মাঝেই তবু ঝালিয়ে নিতে হয়। মাঝে মধ্যেই সব কিছু উল্টেপাল্টে দেখে নিতে হয়, চেখে নিতে হয়। করতে হয় তত্ত্ব, তথ্য ও প্রয়োগের সমন্বয়, মূল্যায়ন। শিকড়ের সন্ধান চলে অবিরাম। আবার, আকাশে ডানা মেলে যে আগুনের ডালপালা, ফোটায় কুঙ্কুম কুসুম, হৃদয়ের সুপক্ক শস্য, সে-সবও আগলে ধরতে হয়, স্বাদ নিতে হয়। তাহলেই হয়তো সন্দীপিত হওয়া যায়, সঞ্জীবিত-ও। এ জন্যে মাঝে মাঝেই শিল্পসাহিত্যের ইতিহাস চর্চা, তত্ত্বের বিচার-পুনর্বিচার নতুন স্বরসন্ধান, তথ্যের নিরন্তর আবিষ্কার ও সমারোহ, প্রয়োগের তাৎপর্য অনুসন্ধান অপরিহার্য। এটা জরুরি শিল্পের স্বভাবে, জীবনের জ্যামিতিতে। আমাদের এগোতে হয়, সিঁড়িভাঙা অঙ্কের মতো নিরন্তর এগোতে হয় স্মৃতি সত্তায় ভবিষ্যতের দিকে। এতেই উদ্দীপন, উজ্জীবন।

সেই উজ্জীবনের ভাষা ও ভাবনার প্রকাশ বাংলা লোকনাট্য নাটক ও রঙ্গমঞ্চ। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা ভাষা ও সাহিত্য বিভাগ আয়োজিত আঠারো দিন জোড়া পঞ্চদশ উজ্জীবনী পাঠমালার ফসল এটি। প্রকাশ করেছেন কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অ্যাকাডেমিক স্টাফ কলেজের বিনয়কান্তি দত্ত, সম্পাদনায় ছন্দা রায় ও বিশ্বনাথ রায়। সম্পাদকদের জবানবন্দি থেকে জানা যায় যে নাটক সাহিত্য কি না—এই প্রশ্নটিকে বিতর্কের মুখে রেখে নাটক নিয়ে আলোচনার ব্যবস্থা করেছিলেন। তাঁদের কণ্ঠে 'নাটকের উপর সাহিত্যের দাবিকে বেশি গুরুত্ব দিলে মঞ্চায়নের সমন্বয়ী শিল্পকর্মকে অস্বীকার করা হয়। আর দৃশ্যকাব্যের রস-সংবেদকে দৃশ্যরূপেই গ্রাহ্য মনে করলে নাট্যসাহিত্যের ইতিহাস, তত্ত্বানুসন্ধান, সমালোচনা ও পঠন-পাঠনের ধারাবাহিক ঐতিহ্যে টান পড়ে। আর্ত হয়ে ওঠেন সেই নিভৃত পাঠক, যিনি চিত্তপটেই চিত্রপট নির্মাণ করেন, চরিত্র ঘটনা-সংলাপের অন্তর্গহনকে আবিষ্কার করে চলেন নিয়ত। সুতরাং নিজের নিজের অবস্থানে দাঁড়িয়ে আত্মপক্ষ সমর্থন এবং বিপরীত মতবাদের প্রতি স্বরের শরক্ষেপ স্বাভাবিক। প্রশ্নের সমাধান হয়নি। হওয়া সম্ভব নয়।' সংকলনটি প্রশংসার দাবি রাখে। নাট্যবিষয়ে নিঃসন্দেহে এটি এক উজ্জ্বল মহাদেশ, ভাবনায় ও আঙ্গিকে কালের কম্পাস।

হ্যাঁ, বিষয়টি নাটক। আর ইতিহাসের সেই নাটক এসেছে মহাকাব্যের পরে। অবশ্য শরীরের চুলচেরা বিশ্লেষণ করে কেউ কেউ রায় দেন মহাকাব্যের আগেই নাটকের হাজিরা। এক তরফের সওয়ালে রয়েছে নাটকের গঠনবৈশিষ্ট্যের ওপরেই বিশেষ গুরুত্ব দেওয়ার দৃষ্টিভঙ্গি। মৃত মানুষের ব্যবচ্ছেদ ঘটিয়ে চিকিৎসক যেমন অভ্যন্তরীণ অঙ্গপ্রত্যঙ্গের অটোপ্সি করে মৃত্যুর কারণ বের করেন তেমনি নাটকের মধ্যে নাচ-গান-সংলাপ-মঞ্চ-শরীরী ভাষার জড়িয়ে-মিশিয়ে থাকার মধ্যে খুঁজে পান নাটকের অকাট্য পূর্বজত্ব। তা ছাড়া জাদুবিদ্যা ও

ধর্মীয় অনুষ্ঠানের অঙ্গ হিসেবে গণ্য হওয়াও নাকি প্রমাণ করে মহাকাব্যের তুলনায় নাটকের পুরোবর্তিতা। অন্যপক্ষের জবাবে জোরালো হয় মহাকাব্যের আগে নাটকের নিদর্শনশূন্যতাই নাটকের অনুজত্বের প্রমাণ। গান, কবিতা, গল্প-বলা এসেছে আধুনিক মানুষ হোমো স্যাপিয়েনস্ পৃথিবীতে আমার পরে পরেই বা সঙ্গে সঙ্গেই। শিকারী-সংগ্রহকারী, যাযাবর-রাখাল, স্থায়ী কৃষিজীবনে অভ্যস্ত মানুষের মধ্যে এ সবের আলাদা-আলাদা অস্তিত্ব ছিল। এবং এসবেরই কিছু কিছু মিলিয়ে-মিশিয়ে দৃশ্যায়িত করার পালা যে পরে আসবে সেটাই স্বাভাবিক। এই যুক্তিতেই নাটক এসেছে মহাকাব্যের পরে।

বিভিন্ন ধর্মীয় অনুষ্ঠানে নানা ঘটনার অনুকৃতিতে খুঁজে পাওয়া যায় ভারতীয় নাটকের উৎস, নিহিতের নাট্যের মর্মবীজ। এর বয়স কম করেও তিন সাড়ে তিন হাজার বছর হবে। ইন্দ্র-বরুণ, পুরূরবা-উর্বশী ইত্যাদি ১৪-১৫টি সংবাদসূক্তের মধ্যে অনেকেই নাটকের প্রথম চেহারা খুঁজে পান। ড. কীথ অবশ্য তা মানেন নি। তিনি ইন্দ্র-মরুৎ, ইন্দ্র-বসুক্র, ইন্দ্র-বরুণ, যম-যমী, পুরূরবা-উর্বশী ইত্যাদি সংবাদসূক্তের দৃশ্যধর্মিতা স্বীকার করেও সেগুলিকে নাট্য বলে মেনে নিতে অনীহ।

ঠিকই, নাটক সমন্বয়ী শিল্প। তা দেখা, শোনা, অভিনেয়ত্বের সংস্থান সংশ্লেষের ফসল। বাস্তবিকই দর্শক-শ্রোতা-পাঠকের আনন্দ, প্রেরণা, চিন্তার বিস্তার, স্ফুরণের মানসে বাস্তব বা তার রূপকল্পকে বিভিন্ন উৎসব-অনুষ্ঠান-উদ্দেশ্যসাধন ক্রিয়ায় সামাজিকের সামনে অভিনয় করার জন্যে নাচ-গান-আবৃত্তি ক্রিয়া-কাহিনীকল্পনার সমস্ত বা বেশির ভাগ উপাদানের সমবায়ে তৈরি দ্বন্দ্বগর্ভ সংলাপবদ্ধ দৃশ্যাশ্রয়ী রচনাই নাটক। অভিনয়ত্বের বাস্তবতায় ও পাঠমুগ্ধতার তাৎপর্যে তা সমাজ ও জীবনাশ্রয়ী সৃষ্টিশীল উপস্থাপনা। দর্শক, শ্রোতা, পাঠকের সামনেই তার নিত্য চলাফেরা।

নানান মতের ভিড়ে কেউ কেউ তো মনে করতেই পারেন যে আদিম মানুষ তার বেঁচে থাকার লড়াইয়ে এবং রশদ বাড়ানোর তাগিদে প্রকৃতির কোনো কোনো অব্যাখ্যাত শক্তিকে যেমন মেনে নিয়েছিল নিজেদের সহায়ক হিশেবে তেমনি অনেক কিছুই থেকে যায় বৈরিতার সম্পর্কে আবার। ভালো মন্দ যাই হোক না কেন সেইসব শক্তিকে মানুষ অলৌকিকত্বের মোড়কে পুরে নেয়। কখনো তাদের উপর চাপায় দেবদেবীর ধারণা, কখনো ছিটিয়ে দেয় দৈত্যের রং বাহার। কোনো কোনো সময়ে এরা সব হয়ে ওঠে লোকাতীত অস্তিত্ব, দানব, সাধুসন্ত। এমনকি শয়তান-ও। এরকম প্রতীক গ্রহণ করে আদিম মানুষ নিজেদের ভয়-ভীতিকে যে কেবল যুক্তিগ্রাহ্য করে তুলল তা-ই নয়, সঙ্গে সঙ্গে সেইসব শক্তির মোকাবিলা করার হাতিয়ারও আয়ত্ত করে ফেলল। শীতের শীর্ণতা-শুষ্কতার ওপর বসন্তের বার্ষিক বিজয়কে নিসর্গ মনে করিয়ে দেয় যে সবচেয়ে সংহারক অশরীরী সত্তাগুলিও নির্বাসনে যেতে পারে, অথবা শুভচিকির্ষু প্রণোদনায় অনন্ত দূরত্ব তৈরি করে দেওয়া যায়। কাজে কাজেই জীবনের প্রেরণাশক্তি ও মৃত্যুর মধ্যেকার এই দ্বন্দ্বকেই প্রতীকায়িত করে প্রকৃতির অনুষ্ঠান। এই দ্বৈরথেই সবসময় জীবন সন্দীপিত, সঞ্জীবিত। ব্রিটিশ দ্বীপপুঞ্জের তরবারি-নৃত্য ও মূকাভিনয়ে লোকনাট্যের বৈশিষ্ট্যই বজায় আছে। অবশ্য এখন আর তার উদ্ভবকালের আঁকাড়া বিশিষ্টতা,

নিজস্বতা সেখানে মিলবে না। কালের নিয়মেই সেটা দাবি করাও চলে না। সঙ্গত কারণেই তাতে বিকৃতি ঘটেছে, বিচ্যুতি এসেছে। তবু এর মধ্য থেকে ধর্মীয় আনুষ্ঠানিকতার চিহ্ন একেবারে লোপাট হয়ে যায়নি। য়ুরোপিয় নাটকের যাত্রাপথের মর্মভূমি চিহ্নিত হয়ে আছে যে কৃত্যে তার অবিকৃত আদলটি আর কোথাও খুঁজে পাওয়া যায় না। শুধু তাই নয়, তার পুনর্নির্মাণে সবচেয়ে বড়ো বাধা বর্তমানে অগণন তথ্যের সম্বাধ স্বল্পতা। একই পরিস্থিতি দূর ও মধ্যপ্রাচ্য দেশগুলোয়। আদিমতার অন্ধকারেই লীন হয়ে আছে সেখানকার নাট্যকর্মের উদ্ভবকালের অবয়ব ও বিশিষ্টতা।

সেজন্য দেখা যায় চিনা নাটকের উদ্ভবকালটি কোথাও খোলসা করে সেভাবে বলা নেই। এ ব্যাপারে চৈনিক বুধমণ্ডলী তুলনামূলকভাবে রক্ষণশীল। বেশিরভাগই তাঁরা রূপকথা, লোককথায় আচ্ছন্ন। পূর্বপুরুষদের উপাসনার সঙ্গে সম্ভাব্য যোগসূত্র সন্ধানে আস্থাবান। পাশাপাশি চিনা নাটকের ভিত্তি হিসেবে লোকনৃত্য, লোকসঙ্গীতের বিশেষ ভূমিকা রয়েছে। লোকনাট্যের মধ্যেও আধুনিক নাটকের শিকড় সন্ধান ফলপ্রসূ। বস্তুত খ্রিস্টপূর্ব অষ্টম শতকেই চিনা নাটক একটা নিজস্ব চেহারা নিয়ে ফেলে ইতিহাসবিদ্‌দের অনুমান। বিভিন্ন মুদ্রায় স্বরক্ষেপণের সঙ্গে সঙ্গীতের সঙ্গতলহরীর সংযোজন, সমন্বয় ঘটে এ সময়েই। দৃশ্যপটের ব্যবহার ছিল শাদামাটা। তবে পোশাক-আশাক ছিল জমকালো, ব্যয়বহুলও। বৈপরীত্য সৃষ্টিতে ছিল মুগ্ধতার সঞ্চার। বর্ণময় মুখোশের ব্যবহার অনিবার্য। সব মিলিয়ে শ্রমসাধ্য ছিল চিনা নাটকের প্রযোজনা। কথা, গান, নাচ, শরীরীভাষা, পরিচ্ছদের ঐশ্বর্যদীপিতা মিলে-মিশে সে এক এলাহি ব্যাপার।

ভারতীয় নাটকের উৎসেও রয়েছে নানান দেবদেবীকে ঘিরে উৎসব-অনুষ্ঠানে ব্যবহৃত স্তবস্তোত্র ও নৃত্য। এবং প্রত্যেকটি ক্ষেত্রেই আবৃত্তি, বিবৃতি যুক্ত হয় পরে। একেবারে গোড়ার দিকে। আমাদের দেশে নাটককে মনে করা হত মানুষের জন্য ব্রহ্মার দান হিসেবে। ইন্দ্রোৎসবকে ঘিরেই নাটকের উদ্ভব বলে স্বীকৃত। এবং এতে তাণ্ডব ও লাস্যের আবিষ্কর্তা শিবের গুরুত্বও খুব কম নয়। লোকপাল প্রতিষ্ঠিত জম্বুদ্বীপেই প্রথম তার অভিযাত্রা। বিষয়বস্তু দেবাসুরের যুদ্ধ। এতে ঘটে অসুরদের হার। এই অমৃতমন্থন অভিনয়ের পরে হিমালয়ের স্বাভাবিক রঙ্গপীঠে অভিনীত হয় ত্রিপুরাদাহ। ভরতের ভাষায় 'নানা ভাবোপসম্পন্নং নানাবস্থান্তরাত্মকম্/ লোকবৃত্তানুকরণং নাট্যমেতন্ময়া কৃতম্।' এবং 'যোহয়ং স্বভাবো লোকস্য সুখদুঃখসমন্বিতঃ/ সোহঙ্গাদ্যভিনয়োপেতো নাট্যমিত্যভিধীয়তে।' এই নাটকই আবার রূপক হিসেবে আমাদের কাছে পরিচিতি পায় ভারতীয় নাট্যশাস্ত্রে। রূপক আবার দশটি। তা হল নাটক, প্রকরণ, অঙ্ক, ব্যায়োগ, ভাণ, সমবকার, বীথী প্রহসন, ডিম, ঈহামৃগ। বলা হয়েছে 'নাটকং সপ্রকরণমঙ্কো ব্যায়োগ এব চ/ভাণঃ সমবকারশ্চ বীথী প্রহসনং ডিমঃ/ঈহামৃগশ্চ...?' এ ছাড়াও আঠারোটি উপরূপকের কথা বলেছেন সাহিত্যদর্পণকার বিশ্বনাথ। সেগুলি হল নাটিকা, ত্রোটক, গোষ্ঠী, সট্টক, নাট্যরাসক, প্রস্থান, উল্লাপ্য, কাব্য, প্রেঙ্খণ, রাসক, সংলাপক, শ্রীগদিত, শিল্পক, বিলাসিকা, দুর্মল্লিকা, প্রকরণিকা, হল্লীশ, ভাণিকা। এর আগেই অবশ্য বিবৃত হয়েছে নাটক কেন পঞ্চমবেদ। ব্রহ্মার কাছে দেবতাদের আবেদন ছিল সর্ব বর্ণের উপভোগ্য পঞ্চম বেদ-

এর ব্যবস্থা করা : 'ক্রীড়নীয়কমিচ্ছামো দৃশ্যং শ্রব্যং চ যন্তবেৎ/তস্মাৎ সৃজাপরং বেদং পঞ্চমং সার্ববর্ণিকম্।' ঋগ্‌বেদের পাঠ্য, সাম্যবেদের গান, যর্জুবেদের অভিনয়, অথর্ববেদের রস-এর রসায়নই হল পঞ্চমবেদ। তা লোকবৃত্তানুকরণ নাট্য। তা 'নৃত্য' নয়, 'নৃত্ত'-ও নয়।

দশরূপক হলেই তো হল না, একান্ত পাঠযোগ্যতাও যেমন থাকা চাই নাটকের তেমনি তার মধ্যে থাকতে হবে, অনিবার্য প্রধান হিসোবেই থাকতে হবে অভিনেয়ত্ব। অর্থাৎ নাটককে অভিনীত হতেই হবে। যার অভিনয়যোগ্যতা নেই, তা আর যাই হোক নাটক নয়। কাজে কাজেই চাই নাট্যমঞ্চ ও রঙ্গালয়। প্রাচীন ভারতে সেটাও ছিল। স্থায়ী রঙ্গালয়ের অস্তিত্ব না থাকলে নাট্যশাস্ত্র, ভাবপ্রকাশ, সংগীতমকরন্দ, কাব্যমীমাংসা, শিল্পরত্ন ইত্যাদি গ্রন্থে নাট্যশালা নির্মাণ ও তার স্থাপত্যপ্রকরণ নিয়ে বিস্তৃত আলোচনার দরকার পড়ত না। একালে বাড়ি তৈরির জন্য যেমন মাটি পরীক্ষার ব্যবস্থা থাকে তেমনি নাট্যশালা নির্মাণ প্রসঙ্গে ভরত মৃত্তিকা পরীক্ষার পর্যন্ত উল্লেখ করেছেন। এতেই প্রমাণিত হয় মঞ্চের ব্যাপারে সেকালে কেমন গুরুত্ব দেওয়া হত। বিষয়ের তারতম্যে নাট্যগৃহের পার্থক্যের কথা স্বীকৃত। মোটামুটিভাবে সেকালে তিন ধরনের নাট্যগৃহ পরিকল্পিত হত। আবার সেই তিনটি ধরনের প্রত্যেকটিরই তিনটি করে আলাদা-আলাদা মাপ ছিল। তাহলে দেখা যায় মোট ন'ধরনের নাট্যগৃহ ছিল। কেউ কেউ অবশ্য ন'টির বদলে ছ'রকমের নাট্যগৃহের কথাও বলে থাকেন। তাঁদের একথা বলার কারণ হল সমবাহু ত্রিভুজের মতো নাট্যগৃহের নির্দিষ্ট মাপজোখের উল্লেখ সেভাবে পাওয়া যায় নি। তাহলে এই ছ ধরনের নাট্যগৃহের মাপ কেমন ছিল? তিন ধরনের নাট্যগৃহ ছিল আয়তক্ষেত্রের আকারবিশিষ্ট ১০৮×৬৪ হাত ছিল সবচেয়ে বড়ো আকারের নাট্যগৃহ, মাঝারি মাপের নাট্যালয় ৬৪×৩২ হাত, ছোট মাপের প্রেক্ষাগৃহটি ৩২×১৬ হাত। তাহলে আয়তক্ষেত্রের আকারবিশিষ্ট বিকৃষ্ট জ্যেষ্ঠের ক্ষেত্রফল ছিল ৬৯১২ বর্গহাত, বিকৃষ্টমধ্যের ২০৪৮ বর্গহাত এবং সবচেয়ে ছোট মাপের আয়তক্ষেত্রাকার নাট্যগৃহ ছিল ৫১২ বর্গহাতবিশিষ্ট। আর যে ধরনের প্রেক্ষাগৃহেরও বহুল ব্যবহার ছিল তার আকার ছিল বর্গক্ষেত্রবিশিষ্ট। বর্গক্ষেত্রাকার থিয়েটারের সবচেয়ে বড়োটির মাপ ৩০৯৬ বর্গহাত, মধ্যমটির মাপ ৭০৪ বর্গহাত এবং ছোটটির মাপ ছিল ২৫৬ বর্গ হাত। তবে এই মাপ নিয়েও কিছু কিছু মতান্তর আছে।

এত কথা বলবার কারণ আলোচ্য গ্রন্থের প্রথম রচনাটিই 'প্রাচীন ভারতীয় নাট্যকলা ও নাট্যসাহিত্য প্রসঙ্গে' সুলিখিত। মিতকথনে তিনি যেভাবে গোটা ব্যাপারটাকে উপস্থাপিত করেছেন তা অভিনন্দনযোগ্য। 'সংস্কৃত নাটক এবং বাংলা নাটক ঃ চর্বিত-চর্বণ'-এর বিষয়বস্তু প্রবন্ধের শিরোনামেই ব্যাখ্যাত। তিনি উদাহরণসহযোগে দেখিয়েছেন গোবিন্দচন্দ্র গুপ্তের কীর্তিবিলাস-এর সংলাপের মধ্যে কথ্যভাষা দূরে থাক, সাধু লিখ্যভাষার কথ্য ঢংটুকুও ফোটেনি। একেবারে খাঁটি কথা। কিন্তু তিনি কী করে ভুলে গেলেন ঐ একই বছরের লেখা তারাচরণ শীকদারের ভদ্রার্জুনের কথা? আমরা তো জানি ইংরেজি ড্রামা শব্দটির সমার্থক প্রতিশব্দ যদি নাটক হয় তাহলে তার কম্প্রিত পদক্ষেপ ভদ্রার্জুনেও পড়েছিল। ভাষার জড়তা নিশ্চয়ই ছিল, এমনকি সে ভাষা সংলাপের উপযুক্ত-ও নয় মানি, কিন্তু বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসের জিজ্ঞাসু শিক্ষার্থীর কাছে সলতে পাকানোর কাল-কে অস্বীকার করা সমীচীন?

তারাচরণের দাবির সার্থকতা না মানলেও তিনি যখন ভদ্রার্জুন (১৮৫২)-এর ভূমিকায় ঘোষণা করেন 'এই পুস্তক অত্যন্ত নূতন প্রণালীতে রচিত হইয়াছে', এবং বর্জন করেন সংস্কৃত নাট্যরীতি, হারিয়ে যায় নান্দী-প্রস্তাবনা-নটী-সূত্রধার-ভরতবাক্য প্রভৃতি তখন কি অস্বীকার করা যায় যে তাঁর কাছে য়ুরোপিয় নাট্যাদর্শ লক্ষিত ছিল না? তিনি সচেতনভাবেই য়ুরোপিয় নাট্যভিনয় অনুসরণ করেছিলেন, রচনার মধ্যে অনেক ত্রুটিবিচ্যুতি সত্ত্বেও। পক্ষান্তরে গোবিন্দচন্দ্র গুপ্ত সংস্কৃতরীতির প্রতিবাদ আন্তরিকভাবে করলেও, 'ভারতবর্ষীয় পূর্বতন পণ্ডিতেরা অনুমান করিতেন যে ধার্মিক ব্যক্তির দুঃখাভিনয় করিবার সময়ে তাহাকে দুঃখার্ণবে রাখিয়া গ্রন্থ শেষ করিতে নাই। ইহা কেবল তাহাদিগের ভ্রান্তিমাত্র', তিনি তাঁর নাটকে নান্দী ও নান্দ্যান্তে সূত্রধার ব্যবহার করেছেন। আমাদের মতে, ১৮৫২-য় প্রকাশিত নাটকদুটিতেই আধুনিক বাংলায় নাট্যরচনার সূত্রপাত, যদিও নাটক হিশেবে দুটিই দুর্বল। বিশ্ববন্ধু ভট্টাচার্যের 'ভারতীয় করুণ রস ও বাংলা ট্রাজেডি' খুবই মূল্যবান অলোচনা। বিশেষ করে তিনি যখন 'রক্তকরবী'র রাজার অন্তর্দ্বন্দ্বে ক্ষতবিক্ষত রক্তাক্ত সত্তার উল্লেখ করে বলেন, 'এই পরিপূর্ণ ট্রাজেডির নায়কের সমতুল্য আর একটি চরিত্রের জন্য বাংলা নাটককে আরো অনেকদিন অপেক্ষা করতে হবে' তখন সংবেদনশীল পাঠক এক নির্মম সত্যের মুখোমুখি দাঁড়ান। সুমিতা চক্রবর্তীর 'নাটকের কোরাস' মনস্বিতায় দীপ্র এক উজ্জ্বল প্রবন্ধ। 'বাংলার লোকনাট্য' শিরোনামে যে বিষয়ের ব্যাপ্তি, গভীরতা, বৈচিত্র্যের আশ্বাস দেয় তা প্রাবন্ধিকের নিজস্ব সুনামের প্রতি সুবিচার করেনি। বরং লেখাটি শেষ পর্যন্ত চমকে পরিণত। লোকনাট্যের আলোচনায় কি লোকভাষা, লোকমনস্তত্ত্বের কোনও জায়গা নেই? অস্বীকার করা যায় না সংস্কৃত ও য়ুরোপিয় নাট্যাদর্শে আধুনিক বাংলা নাটক লেখার আগে যুগ যুগ ধরে লোকনাট্যই বাংলার গ্রামের, এমনকি শহরেরও সাধারণ মানুষের চিত্তবিনোদনে একটি প্রধান ভূমিকা নিয়ে এসেছে। এই সমাজ-বাস্তব ঐতিহাসিক ভূমিকাটি কেন বিদগ্ধ আলোচকের আড়ালে চলে গেল বোঝা যায় না। নির্দিষ্টভাবে মধ্যযুগের সাহিত্যধারায় বাংলা লোকনাট্য বিষয়ের সত্যব্রত গিরির আলোচনাটি ছোট হলেও যথেষ্ট গুরুত্ববহ। 'গীতগোবিন্দ ও শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে নাট্য-উপাদান' প্রথানুগ। 'ময়মনসিংহগীতিকা ঃ মুদ্রিত পুঁথি ও গীতিনাট্যরূপ' অনবদ্য। 'লোকায়ত সংস্কৃতি ও বাংলা পৌরাণিক 'নাটক'টি বিস্তৃতির দাবি রাখে। 'যাত্রা' নিয়ে আছে আলোচ্য গ্রন্থে দুটি আলোচনা। আটের শতকেই 'মালতীমাধবে'র প্রস্তাবনায় উচ্চারিত হয়েছিল, 'ভগবতঃ কালপ্রিয়নাথস্য যাত্রাপ্রসঙ্গেন নানাদিগন্তোবাস্তব্যো মহাজন সমাজ'। এঁদের সামনেই অভিনীত হয়েছিল প্রকরণখানি এবং তা হয়েছিল কালপ্রিয়নাথের যাত্রাপ্রসঙ্গে। তবে যাত্রা কথাটিকে যে অর্থে ব্যবহার করা হয় তা বাঙালির নিজস্ব ঘরানা বলেই কেউ কেউ মনে করেন। লোকভাষায় যাত্রা রচিত। তবে ধর্মোৎসবের আওতায় 'যাত্রা'র যাত্রা শুরু বলে গোড়ার দিকে ধর্মীয় বাতাবরণই সৃষ্টি হয়েছে, দেবদেবীর লীলাই নিয়েছিল বেশিরভাগ জায়গাটা। সময় বদলের সঙ্গে সঙ্গে যাত্রার বিষয় বদলায়, বৈচিত্র্য আসে, সমাজসমস্যাসম্পৃক্ত হয়ে যায়। বস্তুত, যাত্রার ঐতিহ্য বাংলা দেশের বেশ পুরনো ঐতিহ্য। জয়দেবের গীতগোবিন্দ যে কৃষ্ণমঙ্গলযাত্রা, তা আর নতুন করে বলার অপেক্ষা রাখে না। সেই ধারাই খানিকটা অনুবর্তিত

শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে। বাংলা ভাষায় তা বাঙালির আদি যাত্রার রূপ, যদিও গীতগোবিন্দের আগেই যাত্রার লোকজ ধারাটি অপরিশীলিত রূপে ছিল বলে মনে করার যথেষ্ট কারণ রয়েছে। প্রভাতকুমার দাসের 'বিগত শতাব্দীর আধুনিক পেশাদারি যাত্রার বিবর্তন' এবং নির্মলেন্দু মুখোপাধ্যায়ের 'বাংলা নাটকে যাত্রার প্রভাব' চিন্তার উদ্রেকে, কৌতূহল উস্‌কে দেবার ক্ষেত্রে অত্যন্ত মূল্যবান দুটি রচনা। স্বয়ং মধুসূদন-ও fine jattra-র উল্লেখ করেছিলেন শ্রদ্ধার সঙ্গে। 'বাবু থিয়েটার থেকে পেশাদার মঞ্চ' বিষ্ণু বসুর মূল্যবান নিবন্ধ। হেরাসিম স্তেপানভিচ লেবেদফ কর্তৃক ২৫ নম্বর ডোমতলায় (বর্তমানে এজরা স্ট্রিট) স্থাপিত 'বেঙ্গলি থিয়েটার' নামে মঞ্চস্থাপন এবং সেখানে বিদেশি আঙ্গিক ব্যবহার করে বিদেশি কাহিনীকে দেশীয় পরিবেশে, দেশীয় নটনটী ও বাদ্যযন্ত্রের সাহায্যে ভারতচন্দ্রের সংগীত সহযোগে অভিনয়ের ব্যবস্থা, পাশাপাশি আট টাকা ও চার টাকা প্রবেশমূল্য নির্ধারণের গুরুত্বকে মনে রেখে বিষ্ণু বসু সঙ্গতভাবেই বলেন, 'বাংলা নাট্যপ্রযোজনা বা প্রদর্শ শিল্পের সঙ্গে এই প্রথম যুক্ত হয়েছিল থিয়েটার শব্দটি এবং তার গুরুত্বও ইতিহাসে খুব একটা কম নয়।' স্বপন বসুর 'সমাজ সংস্কার আন্দোলন ও উনিশ শতকের বাংলা নাটক', রুদ্রপ্রসাদ চক্রবর্তীর 'রঙ্গমঞ্চে বাংলা সামাজিক প্রহসন ঃ কুলীনকুলসর্বস্ব থেকে শেষরক্ষা', কবিতা চক্রবর্তীর 'প্রথম মহিলা নাট্যকার সুকমারী দত্ত', সুখেন্দুসুন্দর গঙ্গোপাধ্যায়ের 'রবীন্দ্রনাটকে সাধারণ মানুষ', অচ্যুত মণ্ডলের 'অমল আলোর অন্ধকার ঃ অস্তিবাদী দৃষ্টিতে রক্তকরবী ও ডাকঘর', কল্যাণীশঙ্কর ঘটকের 'রবীন্দ্র-নাটকে বৌদ্ধ আখ্যান', আলপনা রায়ের 'রবীন্দ্রনাটকে গান ও কবির সংগীতভাবনা', দীপেন্দু চক্রবর্তীর 'রাজায় রাজায় ঃ শেক্সপীয়র ও রবীন্দ্রনাথের রাজ-ভাবনা', তরুণ মুখোপাধ্যায়ের 'বাংলা নাটকে পাশ্চাত্য প্রভাব ঃ ২৯, শতক', বিপ্লব চক্রবর্তীর 'বাংলা ও অন্যান্য ভারতীয় নাটক ঃ গতি ও প্রগতি', প্রণতি চক্রবর্তীর 'রূপান্তরিত নাটক ঃ প্রসঙ্গ বাংলা রঙ্গমঞ্চে শেখভ অবলম্বনে দুটি প্রযোজনা', দর্শন চৌধুরীর 'গণনাট্য এবং নবনাট্য ইত্যাদি', উর্মি দাসের 'নাটক গড়ার ইতিকথা' সত্য বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'পথনাটক, রাজনৈতিক সংগ্রাম ও আমরা', সনৎকুমার নস্করের 'বাংলা নাটক নাট্যমঞ্চ ও শম্ভু মিত্র', জ্ঞানেশ মুখোপাধ্যায়ের 'পেশাদার থিয়েটার', ঝর্না সান্যালের 'বাংলা নাটক সাহেব ঃ উপস্থাপনা উদ্দেশ্য চরিত্র', রবীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'স্বাধীনতা-উত্তর বাংলা নাট্য নিয়ন্ত্রণ', সোহিনী ঘোষের 'মনসামঙ্গল থেকে চাঁদ বণিকের পালা ঃ পুরাণের নবরূপায়ণ' ট্রিটমেন্টের দিক থেকে নতুন দিশা দেখিয়েছে। তত্ত্ব, তথ্য ও প্রয়োগের সঙ্গে ব্যক্তি-অভিজ্ঞতার মিশেল ঘটিয়ে নতুন তাৎপর্যই শুধু নয়, বহুতর মাত্রা এনে দিয়েছে শাঁওলী মিত্রের 'একক অভিনয়', অরুণ মুখোপাধ্যায়ের 'পরিচালক ও অভিনেতা', উষা গাঙ্গুলীর 'আমার থিয়েটার ঃ আমার ভাষা', তাপস সেনের 'রঙ্গমঞ্চে আলো', মোহিত চট্টোপাধ্যায়ের 'নাটক কি সাহিত্য?' মনোজ মিত্রের 'নাটক নিয়ে' আলোচনাটি আসলে মঞ্চসফল উজ্জীবনী পাঠমালায় সমাপ্তি ভাষণের অনুলিপি। সৌমিত্র বসুর 'নাটক ও অন্যান্য শিল্পমাধ্যম ঃ এবং নাকি বনাম', শক্তি সেনের 'মেকআপ ম্যান থেকে মেকআপ আর্টিস্ট,' শেখর সমাদ্দারের 'মঞ্চচিত্রণের নান্দনিকতা', হীরেন ভট্টাচার্যের 'পুতুল-নাটক বনাম নাটক' এবং অশোক মুখোপাধ্যায়ের 'বাংলা থিয়েটার ঃ অনুবাদ ও রূপান্তর'। পবিত্র সরকারের

সাবাস কবি, সাবাস!

স্বল্পসংখ্যক উজ্জ্বল ব্যতিক্রম বাদ দিলে কমিটেড কবিদের সময়টা ভালো যাচ্ছে না ইদানীং। সাহিত্যের ক্ষেত্রে চলছে একরকম তালগোল পাকানোর কাল। বিরোধী চিন্তার কবিদের মন জয় করতে গিয়ে জলাঞ্জলি দেওয়া হচ্ছে সুস্থতা, আদর্শনিষ্ঠা। সচেতনভাবেই উপেক্ষা করা চলছে অঙ্গীকারবোধের লেখকদের। প্রচার সর্বস্বতার মোহে মশগুল মনমোহিনী সংস্কৃতির কেষ্টবিষ্টুরা মিঠে-মিঠে বুলির কবি থেকে বিচ্ছিন্নতা-যৌনতা আঙ্গিকবিলাসীদের খুশি করতেই ব্যস্ত। সর্বত্রই এঁদের জন্যে সরাসরি সরকারি বা ব-কলমায় সরকারি আসরের ব্যবস্থা, পুরস্কার-টুরস্কারের আয়োজন, মেলা-উৎসবের নামে কিছু-না-কিছু পাইয়ে দেবার সহজ বা বাঁকা পথ তৈরি। বিনিময়ে আন্তর্জাতিক মহাপ্রভুর আশীর্বাদধন্য ঢাউস-ঢাউস হাউসের স্বীকৃতি আদায় সংস্কৃতিমনস্ক হিসাবে কিংবা বিরূপ সমালোচনার মুখ বন্ধ করা। দায়বোধের উপদেশ বিতরণ চলবে প্রকাশ্য সভায়, অনুগামীদের আসরে, কিন্তু কাজের বেলায় উল্টোপন্থীদের দিতে হয় প্রেরণা। এই দ্বিচারিতা, ত্রি-চারিতায় ছেয়ে যাচ্ছে চারদিক। ফলে 'রাজকন্যা কার? ঢোল-ডাগর যার'-এর ফাঁদে পড়ে হাঁস-ফাঁস করেন অনেক কবিই। এঁরা কবিতাপাঠের আসরের ঠিকাদারদের মন যোগাতে পারেন না বা চান না, তাই কবিতা পড়ার জন্য, ছাপানোর জন্য কল্কে-তামাকও পান না। কথাগুলো পুরনো। বহুচর্চিত। তবু মনে এল হালে প্রকাশিত দুলাল ঘোষের কবিতার বই 'আমার অমীমাংসিত' পড়তে পড়তে।

দুলাল কবিতা লিখছেন অনেক দিন ধরেই, তা বছর পঁচিশ-তিরিশ তো হবেই। কিন্তু এটিই তাঁর প্রথম কাব্যগ্রন্থ।

তাঁর কবিতার রসদ জীবন থেকে ছেঁকে নেওয়া। চলতে-ফিরতে যা দেখেন, শোনেন, বোঝেন—সেইসব অভিজ্ঞতাপুঞ্জকেই তিনি কবিতা করে তোলেন। তাঁর কবিতা তাঁর অনুভূতি, তাঁর অনুভূতি তাঁর কবিতা। এক্ষেত্রে তিনি পাঠ নিয়েছেন জীবনের পাঠশালা থেকে, সমাজ ও সময়ের বিচিত্র টানাপোড়েন, দ্বন্দ্বময়তা উঠে এসেছে তাঁর লেখনীতে, কবিতার রূপে-রসে-ছন্দে-বর্ণে।

না, তিনি তাঁর কবিতায় সব কথা বিস্তারিত বলে দেন নি। বরং পাঠকের জন্য রেখে দেন আলো-বাতাস খেলার জায়গা। কবির অভিজ্ঞতার সঙ্গে পাঠকের উপলব্ধি অনুভূতি এক বিন্দুতে এসে মিলবার তাতে সুযোগ থাকে। কোনো আরোপিত তত্ত্ব নেই, স্বভাবকবিত্বের কাছে সমর্পণ নেই, আছে স্বাভাবিক কবিতার কাছে নিঃশর্ত নিবেদন। মধ্যবিত্ত জীবনের বিচিত্রমুখী অভিজ্ঞতাই তাঁকে করে তোলে অঙ্গীকার বোধের কবি। তিনি জীবনের, সমাজের কাছে দায়বদ্ধ, কবিতায় কমিটেড। অনায়াসেই উচ্চারণ করেন

> আমার দুঃখগুলো একচ্ছত্র সম্রাটের মতো হেঁটে যায়
> সন্ত্রস্ত স্কাইস্ক্যাপার নতজানু
> রাইটার্স বিল্ডিং নিজের শরীরে লটকে দেয়
> শেষ ফতোয়া—

'কলকাতার রাজপথ থেকে তুলে নেয়া হল কার্ফু।

সহজ কথায় সহজ করেই তিনি কবিতা লিখেছেন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত আর সহজ থাকে না তাঁর কবিতা বরং অনেক বেশি ব্যঞ্জনা, রহস্য ডেরা বাঁধে তাঁর কবিতার ভিতরে। পাঠককে দেন ভাববার সুযোগ, রহস্য খোলার চাবিকাঠি। ইঙ্গিতময় হয়ে ওঠে অনেক রচনাই। যেমন,

কনকনে শীতের ভেতর টের পাই তার
গোপন সংসার
উবু করা হাঁড়ি—ওল্টানো কড়াই
নোনা ধরা মেঝের ওপ্রান্তে
নিভন্ত উনুনের ছাইচাপা আঁচ
ঘরের ভেতরে ঘর, নাকি অন্ধকার—
চোরা কুঠুরির ভেতরে কী রাখা আছে
আকাঙ্ক্ষার চেয়ে দামি
ভালোবাসার চেয়েও বেশি ঈর্ষাতুর।

কিংবা দু-পঙ্‌ক্তির স্তবক দিয়ে গড়া আট চরণের 'কাজের বউ' কবিতাটি—

কাজের বউটি দাঁড়িয়ে আছে
হলুদ গাছের নিচে

আসছি—বলে ছেলেটিকে
ক-খন নিয়ে গেছে

বুঝেও তখন বোঝেনি সে
হঠাৎ কেন শনি

গাছের নিচে কাজের বউ
দুয়ারে দিদিমণি।

সাবাস কবি, সাবাস।

দুলালের কবিতার প্রধান বৈশিষ্ট্য হল শব্দচিত্র। পাশাপাশি এসেছে চিত্রকল্প। 'আনন্দনিকেতন,' 'চিঠি', 'নক্ষত্রের মৃত্যু' তার প্রমাণ। ব্যঞ্জনায়-ও দুলালের কবিতার অসামান্যতা। যেমন,

আমি আপাতত মুথা ঘাস
অন্যপাশে তোমরা যারা আসো—ফাটল বাঁধের মতো
জলোচ্ছ্বাস শুধু জলোচ্ছ্বাস!

গণেশ বসু

আমার অমীমাংসিত।। দুলাল ঘোষ। কারুকথা। ২৫ টাকা

চেতনার সময় সমুদ্র

'চেতনার সময় সমুদ্রের' লেখিকা বিজ্ঞানের অধ্যাপিকা ও গবেষিকা। বর্তমানে ক্যান্সারে আক্রান্ত। চিকিৎসা চলছে।'

এই মর্মান্তিক সংবাদে পাঠকের মনকে আচ্ছন্ন করে দিয়েই শুরু হয় এই বইটি।

আট ফর্মার এই বইটিতে নানা ধরনের লেখা রয়েছে। রয়েছে 'আলাপন' শিরোনামে জার্নাল-প্রতিম রচনা, রয়েছে প্রবন্ধ, চলচ্চিত্র বিষয়ক আলোচনা, অনুবাদ এবং সর্বোপরি তাঁর কবিতাগুচ্ছ। হয়তো একটু কাঁচা, তবে আন্তরিকতার কারণে প্রায়ই তা আমাদের মর্ম স্পর্শ করে :

যীশুর যন্ত্রণা ছিল যীশুর ভিতরে
বহুধারা পারেনি ভাসিয়ে নিয়ে যেতে সেই ঘ্রাণ
চিলি পেরু ব্রাজিলের মত অনেক দেশের
কারাকক্ষে হাজার যীশুরা ফের জন্ম নেয় সেই যন্ত্রণায়।

কিংবা নীচের পংক্তিতে :

নিতান্ত মানুষী আমি, সূর্য এই নক্ষত্রের কন্যা।
এখানে আমার কাছে, আমার ভিতরে আছে;
আমার দুঃখের ভারে নত হয়ে থাকা যত শব্দময় ঘ্রাণ
আমি তাদের অস্তিত্ব টের পাই ঃ
গাঢ় দূষণের স্পর্শে কলঙ্কিত আবহমণ্ডল ভেদ করে
আশ্চর্য স্বনন এক তরঙ্গিত হতে থাকে নিভৃত সত্তায়
আমার প্রার্থনা যেন ভাষা পায়।

কামনা করি তিনি যেন দুরারোগ্য এই রোগটির মর্মান্তিক যন্ত্রণা সত্ত্বেও সেই যন্ত্রণাজয়ের লক্ষ্যে নিরন্তর নিজেকে এমনই সৃষ্টিশীল রাখতে পারেন।

শুভ বসু

চেতনার সময় সমুদ্র।। নন্দিতা পত্রী। সুরবাহার পাবলিশার্স লিমিটেড। ৬০ টাকা

বনফুলের গল্প : বিষয়বস্তু ও আঙ্গিকনৈপুণ্য

রাজশেখর বসু-র বনফুলের কথাসাহিত্য সম্পর্কে একটি মন্তব্যের কথা মনে পড়ছে, 'বিষয়ের বৈচিত্র্যে আপনি আমাদের কথাকারদের মধ্যে অদ্বিতীয়। বাস্তব, কাল্পনিক, অসম্ভব, রূপক, প্রতীকময়, সবরকম রচনাই আপনার আয়ত্ত।' (চিঠি, ৫.৬-৫৫) চিঠিটির কথা মনে পড়ার কারণ শ্রাবণী পালের বইয়ের নামকরণ, 'বর্ণময় বনফুল'। 'বর্ণময়' শব্দটি শুধু বিষয় বৈচিত্র্যের কথা ভেবেই ব্যবহার করা হয়েছে বলে মনে হয় না। এর সঙ্গে মিশেছে নানা কল্পনা, রূপক, বাস্তব-অবাস্তবের আলোকময় বিচ্ছুরণের অনুষঙ্গ। যাকে শ্রাবণী তাঁর আলোচনায় 'পুষ্পিত প্রান্তর' বলেছেন সেখানে কেবল মনোমুগ্ধকর পুষ্পপ্রদর্শনীই নেই, আছে কণ্টকাকীর্ণ গন্ধহীন পুষ্পরাজিরও ভিড়। বনফুলের গল্প এইরকমই। কেবল পাঠকের চোখের তৃপ্তি ও মনের শান্তির জন্য গল্প রচনায় তিনি আগ্রহী ছিলেন না।

রবীন্দ্রনাথের অনুসরণে তাঁর জানা ছিল যে, মানবহৃদয়ই সবচেয়ে দুর্গম জায়গা, 'মানুষই আমার বিষয় এবং প্রেরণা। আমার লেখায় একটা মেসেজ বা বলবার কথা আছে। সেটা হল মানুষ বহু বিচিত্র। (আমার চোখে আমি)' রবীন্দ্রনাথ একদা বনফুল প্রসঙ্গে 'বিজ্ঞানীর মেজাজের সাহিত্যিক' কথাটি ব্যবহার করেছিলেন। বিজ্ঞানীর কৌতূহল নিয়ে তিনি তাঁর সাহিত্যজীবনের বিভিন্ন পর্বে নানা বিচিত্র মানুষকে পর্যবেক্ষণ করে গেছেন, লক্ষ করেছেন মানুষের নীচতা, স্বার্থপরতা পাশাপাশি তাদের ভদ্রতা, মনুষ্যত্ববোধ, সংস্কারমুক্ত উদারতা। বনফুলের সতর্ক পাঠকমাত্রেরই চোখে পড়বে যে, সমাজের নিচুতলার মানুষের মধ্যে উদার মানবতাবাদ, আত্মমর্যাদাবোধ তথাকথিত ভদ্রশ্রেণীর তুলনায় অনেক বেশি। অস্তিত্বরক্ষার জন্য ভদ্রসমাজের ক্রমাগত আত্মসমর্পণ, আত্মপ্রবঞ্চনা তাদের ক্রমশ ছোটমাপের করে ফেলছে। তুলনায় দরিদ্র শ্রমজীবীর মাথা অনেক উঁচুতে। 'ছোটলোক' গল্পের গর্বিত ভদ্রলোক রাঘব সরকার অনাহারক্লিষ্ট রিক্সাওলার কষ্ট হবে ভেবে তার সঙ্গে পায়ে হেঁটে গন্তব্যস্থলে পৌঁছোয়। তারপর পয়সা দিতে গেলে রিক্সাওলার গর্বিত উত্তর, 'আমি কারও কাছ থেকে ভিক্ষে নিই না।' শেষ পর্যন্ত কে, কার কাছে হেরে গেল তা পাঠকের বুঝতে কোনো অসুবিধে হয় না।

শ্রাবণী তাঁর আলোচনায় বনফুলের গল্পের এই সমস্ত বৈশিষ্ট্যের দিকে সতর্ক দৃষ্টি রাখেন। একের পর এক গল্প থেকে উদাহরণ দিয়ে দেখিয়ে দেন যে, তাঁর গল্পে কত বিচিত্র মানুষের আনাগোনা। বিশেষ করে 'মানুষ এবং মানুষ' শীর্ষক অধ্যায়টির কথা এই প্রসঙ্গে বলা যেতে পারে। এখানে তাঁর সময় এবং সময়ের মানুষগুলিকে তুলে ধরার ক্ষেত্রে বনফুলের দক্ষতা আলোচিত। কয়েকটি উল্লেখযোগ্য গল্পকেই উদাহরণ হিসেবে শ্রাবণী বেছে নিয়েছেন। মানুষের কথা বলতে গেলেই সমাজের কথা বলতে হয়। ত্রিশের দশক থেকে মধ্যবিত্ত ভদ্র বাঙালির নিশ্চিন্ত তৃপ্ত জীবনযাত্রার ভিত্তিতে ফাটল ধরেছিল। প্রথম মহাযুদ্ধের পর থেকেই এই ভাঙনের সূচনা। পরবর্তী পর্বের অর্থনৈতিক মন্দা, ক্রমবর্ধমান বেকারী মধ্যবিত্তের অস্তিত্বকেই বিপন্ন

করছিল। সকলেরই তার গল্পের বেচারাম বক্সির মতো করুণ অবস্থা। সকলের চাহিদা মেটাতে মেটাতে বেচারামবাবু ভিতরে ভিতরে নিজেই নিঃশেষ হয়ে যাচ্ছিলেন। বনফুল একটিমাত্র উপমা দিয়ে এই শ্রেণীর ক্ষয়ের ছবি আঁকেন, 'বেচারাম এবার আর কিছু বলিলেন না। শুধু যৌবনের ভ্রমর আলোটার দিকে চাহিয়া রহিলেন। মোমবাতিটা পুড়িয়া পুড়িয়া প্রায় নিঃশেষ হইয়া আসিয়াছে।' (বেচারামবাবু) শ্রাবণী ঠিকই লক্ষ করেন, 'সেই সময়কার মধ্যবিত্ত বাঙালির অধঃপতন ও বিবেকহীনতা বনফুলের বেশ কিছু গল্পের বিষয়বস্তু।'

দৃষ্টান্তস্বরূপ 'বিবেক' গল্পটি কথা বলা যায়। শ্রাবণী গল্পটির কথা উল্লেখও করেছেন। গল্পের মধ্যবিত্ত নায়ক বিবেকের তাড়নায় গরীব গৃহস্থ-রামবাবুর পক্ষ নিয়ে ধনী ও স্বেচ্ছাচারী শ্যামবাবুর বিরোধিতায় নামে কিন্তু বিবেকের ডাকে সাড়া দিতে গিয়ে শেষ পর্যন্ত তার প্রাণান্তকর অবস্থা হয়। কেননা অত্যাচারিত রামবাবু সহ সকলেই তাকে ছেড়ে শত্রু-পক্ষে যোগ দেয়। শেষ পর্যন্ত শ্যামবাবুর ছোটছেলের নামকরণ উৎসবে যোগ দিয়ে সে বিপদের হাত থেকে বাঁচে বটে কিন্তু বিবেকের কাছ থেকে বাঁচে না। মধ্যবিত্তের এই দু-নৌকোয় পা দিয়ে চলার অভ্যাসকে বনফুল চাবকাতেও ছাড়েন না। শ্যামবাবুর বাড়িতে নিমন্ত্রণ সেরে ফেরার পর সেই রাত্রিতেই নায়ক একটি অদ্ভুত স্বপ্ন দেখে, "একটা ভীষণ দর্শন বলিষ্ঠ লোক কি যেন খুঁজিয়া বেড়াইতেছে। তাহার হাতে প্রকাণ্ড একটা কলসী। প্রশ্ন করিলাম, কি খুঁজিতেছেন?

আমার প্রতি অগ্নিদৃষ্টি হানিয়া সে বলিল, দড়ি।

দড়ি? আপনি কে?

তোমার বিবেক, রাস্কেল।"

বনফুলের জীবনদর্শনটির পাশাপাশি তার গল্পের আঙ্গিক-নৈপুণ্যটিও আলোচকের দৃষ্টি এড়ায় নি। তাঁর গ্রন্থটিকে তিনি যে চারটি অধ্যায়ে ভাগ করেছেন তার অন্যতম হল 'গল্পনির্মিতি'। বনফুল-প্রসঙ্গে এই আলোচনায় একটি বিশেষ তাৎপর্য আছে। বাংলা সাহিত্যে বনফুল অতিসংক্ষিপ্ত, কখনো কখনো বা পোস্টকার্ড সাইজের গল্পের নির্মাতা। একে কেউ বলেছেন Five minute short story, কেউ কেউ short-short story কেউ বা Snapshot জাতীয় রচনা আখ্যা দিয়েছেন। ছোটগল্পের পরিচিত কাঠামো তাঁর অধিকাংশ গল্পেই খুঁজে পাওয়া যাবে না। নিমগাছ-এর মতো দশ-বারোটি পঙ্‌ক্তিতে রচিত গল্পটির একেবারে শেষ পঙ্‌ক্তিতে গল্পটিকে বোঝা গেল, "ওদের বাড়ির গৃহকর্ম নিপুণা লক্ষ্মী বউটার ঠিক এই দশা।" বোঝা গেল; নিমগাছ নয়, ওই দুর্ভাগিনী গৃহবধূটির কথা বলবার জন্যই গল্পটি লেখা। শ্রাবণীও এই অসাধারণ ব্যঞ্জনাগর্ভ পঙ্‌ক্তিটির কথা উল্লেখ করেছেন। আবার 'উৎসবের ইতিহাস'-এর মতো গল্পের বিষয়বস্তু এবং নির্মিতি যে সম্পূর্ণ বনফুল-ঘরানার তাও তাঁর দৃষ্টি এড়ায় নি। তাঁর অনেক গল্পের মতোই এই গল্পের শেষে শিক্ষিত অসহায় মধ্যবিত্তের আত্মসমর্পণ নিয়ে বিদ্রূপ মিশ্রিত বেদনার প্রকাশ ঘটেছে, "অকিঞ্চিৎকর বলিয়াই আর একটি কথা ইতস্তত করিয়া সর্বশেষে উল্লেখ করিতেছি। নরেন মল্লিক প্রথম শ্রেণীর এম. এ.।"

আলোচনা বাড়ানো নিষ্প্রয়োজন। ছোট গল্পকার বনফুলের সামগ্রিক ও সার্থক পরিচয়

শ্রাবণীর এই গ্রন্থে পাওয়া যাবে। বনফুলের গল্পের হাস্যরসের শ্রেণীসম্পর্কিত আলোচনার একটি পৃথক অধ্যায় সংযোজিত হলে বোধহয় ভালো হত। কিন্তু তা সত্বেও এখানে গল্পকারের পূর্ণ পরিচয় পেতে অসুবিধে হবে না।

বিশ্ববন্ধু ভট্টাচার্য

বর্ণময় বনফুল।। শ্রাবণী পাল। পুস্তক বিপণি। ৮০ টাকা

বাউলের চরণদাসী

'বাউলের চরণদাসী' এক অসামান্য বই। বাউলদের নিয়ে ওপার এবং এপার বাংলায় যতো বই লেখা হয়েছে, বিশিষ্ট গবেষক থেকে সুরু করে সাধারণ লেখক যাঁরা বাউলদের কথা, তাদের সাধনা থেকে জীবন যাপনের নানা কথা শুনিয়েছেন, তাঁরা কেউই শ্রীমতী লীনা চাকীর মতো বাউল সাধনায় অপরিহার্য তাদের সাধনসঙ্গিনীদের কথা বলতে পারেন নি। লীনা সেই কাজটি করেছেন অসাধারণ নৈপুণ্যে। বাংলা সাহিত্যে এই বই অদ্বিতীয়।

বইয়ের গোড়াতেই মুখবন্ধের পরিবর্তে 'শুভেচ্ছা অগ্রপথিকের' জানাতে গিয়ে লোকসংস্কৃতি চর্চায় বিশিষ্ট ব্যক্তিত্ব শ্রীসুধীর চক্রবর্তী সেকথা অকপটে উল্লেখ করে লীনার বইয়ের যে প্রশস্তি করেছেন তার সূত্র ধরেই কিছু কথা বলা যেতে পারে। তিনি বলেছেন লীনার আগে এই ধরনের কোনো বই লেখা বাউল চর্চার অগ্রণীদের পক্ষে অকল্পনীয় ছিল। বাউল জীবনের এক অনালোচিত দিক নিয়ে শ্রীমতী লীনা চাকীর এই বই পথিকৃতের মর্যাদা দাবি করতে পারে।

বাউল সাধনার গুরুত্ব একান্ত ভাবেই পুরুষকেন্দ্রিক। আবার নারী-সঙ্গ ছাড়া এই সাধনা অসম্ভব। এই বইয়ে বাউলদের চরণদাসী প্রসঙ্গে যার উল্লেখ করেছেন সবার আগে সবচেয়ে গুরুত্ব দিয়ে সেই ননীবালা তার দীর্ঘ জীবনের অভিজ্ঞতায় কিন্তু বুঝেছিলেন 'নারী শুধুই সাধনার আধার, এ বাদে তার কোন অস্তিত্বই নেই'। বাউল সাধনার যে স্তরেই থাকুক না কেন যুবক থেকে প্রৌঢ় কিম্বা বার্ধক্যের দ্বারপ্রান্তে, আধার অর্থ নারী দেহ তার চাইই চাই। প্রকৃত বাউল যারা তারা হয়তো এই নারীকে সাধনসঙ্গিনী বলে জানে, হয়তো বা মান্যতাও দেয়। কিন্তু বাউলের বেশে এমন অনেকে থাকে, তাদের সংখ্যা কতো জানা না গেলেও একথা নির্দ্বিধায় বলা যায় তারাই সংখ্যাগরিষ্ঠ, তাদের কাছে নারী দেহ শুধুই ভোগের সামগ্রী।

বাউল সাধনা বাংলায় লোকায়ত সাধনার অঙ্গ। বিদেশে বাংলার লোকায়ত সাধনার এই দিকটি নিয়ে মানুষের কৌতূহল বিগত কয়েক দশকে যথেষ্ট বেড়ে যাওয়ায় তারা এখন পাড়ি দিচ্ছে ইউরোপে, আমেরিকায়। আর তারই সঙ্গে বেড়ে চলেছে সঙ্গিনী বদলের ঝোঁক। সেই সূত্রেই জানা যাচ্ছে বাউলদের নারীসঙ্গীরা অনেকেই বাধ্য হচ্ছে নিজেদের জীবন বৃত্তান্ত অন্যদের

কাছে অন্ততঃ কিছুটা প্রকাশ করতে। লীনা চাকী তেমনই একজন মানুষ যার কাছে এই বইয়ে যাদের কথা বলা হয়েছে, তারা নিজেদের কথা অন্ততঃ কিছুটা জানিয়েছে, জানাতে চেয়েছে।

বাউল সাধনার নির্দেশ 'আপন সাধন কথা কহিও না যথা তথা'। যেহেতু কায়া সাধনা গাপ্য, তাদের আচার অনুষ্ঠানের এমন অনেক রীতিনীতি আছে, রিপু দমনের এমন অনেক উপাদান, উপকরণ আছে, যা সাধারণ রুচির মানুষের কাছে ঘৃণ্য এবং বীভৎস, অথচ সেই সব স্তর সব বাউলকেই পার হয়ে আসতে হয়, তাই সাধন রীতির গোপনীয়তা রক্ষা অনিবার্য হয়ে পড়ে। পুরুষ বাউলরা সেকথা কখনো কবুল করে না। লীনা যাদের মনের কাছাকাছি পৌছতে পেরেছেন, সেইসব মহিলা বাউলরাই তাকে জানিয়েছে সাধনার পথে তারা কী করেছে, কতোটা মূল্য দিতে হয়েছে তাদের প্রত্যেককে। বছরের পর বছর নানা মেলায়, আখড়ায় এই সব নারীর সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা যতোটা লীনা গড়ে তুলতে পেরেছেন গভীর সহমর্মিতায়, তারই ভিত্তিতে তাঁর সংগৃহীত তথ্যের কিছুটা প্রকাশ পেয়েছে এই বইয়ে।

লীনা নিজেই জানিয়েছেন বইয়ের 'আত্মপক্ষ' অংশে এবং অন্যত্র সব কথা বলা হয়নি, সম্ভব নয় সব কথা বলা। তিনি শুধু দেখাতে চেয়েছেন এই সব নারী যারা অনেকেই হারিয়ে গেছে শুধু বেঁচে থাকার জন্যে বিগত যৌবনা হয়ে ভিখারি হয়ে কিম্বা যারা নানা পুরুষের নির্বিচার ভোগ লালসার অবসানে হয়তো নিয়েছে গণিকার জীবন, কিম্বা মরে বেঁচেছে, তাদের পাশাপাশি আরো কিছু নারী আছে যারা 'গানের জগতে নিজের অস্তিত্ব তৈরী করতে' চেয়েছে।

বাউল সাধনায় নারীসঙ্গের প্রয়োজন দেখা যায় সাধনার এক বিশেষ স্তরে। প্রতিটি বাউলকেই, যদি সাধনায় তার আসল মতি থাকে, তাহলে চারটি স্তর অতিক্রম করতে হয়। স্থূল, প্রবর্ত, সাধক ও সিদ্ধ—এই চার স্তরে বাউলের আনাগোনা। তৃতীয় বা সাধক স্তর থেকেই দরকার হয় নায়িকার। তাদের জোগানের ভার নেয় গুরুর আখড়ায় বিগত-যৌবনা সাধন সঙ্গিনী, গুরু-মা নামে যার পরিচিতি। গুরু-মা'র কাজ হল শিষ্যের উপযোগী নায়িকা সংগ্রহ। এই সব নারী সাধারণভাবে আসে সমাজের নিম্নস্তর থেকে যারা মূলতঃ নিরক্ষর, দরিদ্র পরিবারের বালিকা। কিশোরী, যুবতী, বিধবারাও আসে কখনো বৈষ্ণবী মায়ের হাত ধরে, কখনো অভাব অনটনের তাড়নায়, কখনো অতৃপ্ত বিবাহিত জীবনের জন্য, আবার কখনো যৌন তাড়নায়। যে যেভাবেই আসুক না কেন বাউলের নায়িকার ভূমিকা ততোদিনই তাদের থাকতে পারে যতোদিন শরীরী দিক থেকে নারী সন্তানধারণে সক্ষম, বাউলের কায়া সাধনায় তার নির্দেশে সব রকমের সাহায্য করতে প্রস্তুত আর তার চেয়েও যা বড়ো কথা যতোক্ষণ অন্য কোনো নায়িকার দিকে বাউলের মন আকৃষ্ট না হচ্ছে। সাধনার চতুর্থ বা শেষ স্তর, বা সিদ্ধ স্তরে বাউল কবে পৌছবে, কিম্বা আদৌ পৌছবে কিনা, অথবা তার পরেও এই সাধন রীতি কতোদিন চলবে অব্যাহত, তার সবটাই নির্ভর করে বাউলের সিদ্ধান্তের উপরে। তাই নায়িকার প্রয়োজন তার থেকেই যায় অনির্দিষ্ট কালের জন্যে। লীনা তাঁর বইয়ে আশি-উত্তীর্ণ এক ফকিরের কথা বলেছেন, যার সাধন সঙ্গিনী তেইশ কিম্বা চব্বিশ বছরের এক যুবতী ফকিরিণী। এই যুবতীই লীনার কাছে কবুল করেছে এই বৃদ্ধ ফকির কায়াসাধনায় এখনো খুবই 'দড়'।

লীনা বাউলদের সঙ্গিনী এই সব নারীকে প্রধানত তিনটি শ্রেণীতে ভাগ করেছেন। প্রথম শ্রেণী পর্যায়ে রয়েছে তাঁর দেখা নারীদের মধ্যে ননীবালার মতো ব্যক্তিত্ব, যার পক্ষে পুরুষ বাউলদের কাছ থেকেও যথেষ্ট সম্মান ও শ্রদ্ধা আদায় করে নেওয়া সম্ভব হয়েছিল। বাউল সাধনা সম্পর্কে গভীর জ্ঞান আর বাউল-গান ও গায়কীর উপর তার অনায়াস দখল সবকে অভিভূত করেছিল। দ্বিতীয় পর্যায়ে রয়েছে সেই সব নারীর কথা, যারা সাধন-সঙ্গিনী হওয়ার আপাত সম্মানের আড়ালে লুকিয়ে রাখতে বাধ্য হয়েছিল নিজেদের জড় পদার্থ, যান্ত্রিক জীবন যাপনের যন্ত্রণা। সেই প্রেক্ষিত বড়োই নিদারুণ আর কঠিন বাস্তব। আর তৃতীয় এবং শেষ পর্যায়ে রয়েছে সেইসব মহিলা বাউলের কথা যারা গানকে অবলম্বন করেই বেঁচে থাকার আপ্রাণ চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। লীনা তাদের অনেকেরই নাম জানিয়েছেন, আবার অনেকের নাম গোপনও করেছেন, এই সব মহিলা বাউলদের অনুরোধে। তারা অধিকাংশই নিঃসঙ্গ। পুরুষসঙ্গীরা তাদের ছেড়ে গেছে কিম্বা তারাই হয়তো অতিষ্ঠ হয়ে এই নিঃসঙ্গ জীবন বেছে নিয়েছে। লীনা এই সব সাধনসঙ্গিনীদের অবস্থা যৌনকর্মীদের চেয়েও করুণ বলেছেন এই জন্যে যে, যৌনকর্মীদের মতো কোনো সংগঠন তারা গড়ে তুলতে পারেনি আজো।

বইয়ের নামকরণে লীনা যে 'চরণদাসী' শব্দটি ব্যবহার করেছেন, তার চেয়ে সুপ্রযুক্ত শব্দ আর হয় না। তাদের নায়িকা, কিম্বা সাধনসঙ্গিনী বলা হয় আসলে প্রকৃত সত্য আড়াল করার জন্যে। এই সব নারী বাউলের সেবাদাসী, চরণাশ্রিত, যাদের ইচ্ছামতো ব্যবহার করা যায়, আবার ত্যাগও করা যায়। তাই চরণদাসী শব্দটিতে তাদের সঠিক, অভ্রান্ত পরিচয় পাওয়া যায়, যা অন্য কোনো শব্দের প্রয়োগে এমন যথার্থ ভাবে প্রকাশ পেত না। তাঁর বই পাঠকের সমাজ জিজ্ঞাসায় একটা নতুন মাত্রা যোগ করবে। সবশেষে একটা প্রশ্ন লীনা এবং এই চর্চায় অগ্রপথিক সুধীরবাবুর কাছে রাখার ইচ্ছা হচ্ছে। এই বই থেকে যা জানা গেল বাউল সাধনার এই ধারা বিভক্ত এবং অবিভক্ত বাংলায় মধ্যবঙ্গেই মনে হয় সবচেয়ে বেশি ছড়িয়ে ছিল।— তার পিছনে কি বিশেষ কোনো আর্থ-সামাজিক কিম্বা সামাজিক-সাংস্কৃতিক কারণ ছিল?

বাসব সরকার

বাউলের চরণদাসী।। লীনা চাকী। পুস্তক বিপণি। ৬০ টাকা

আসুন গড়ি এক পরিচ্ছন্ন, সবুজ এবং সুন্দর কলকাতা

কলকাতা—আশা আর আনন্দের নগর,
যেখানে স্বপ্ন প্রাণ পায়

কলকাতা—এক কোটিরও বেশি মানুষের
যেখানে বসবাস

কলকাতা—তিনশো বছরেরও বেশি পুরোনো
ইতিহাস যেখানে প্রাণ স্পন্দন

কলকাতা—শিল্প-সংস্কৃতির পীঠস্থান, যেখানে
দেশ, কালের সীমানা নেই

কলকাতা আমাদের আশা
আমাদের ভবিষ্যৎ

পশ্চিমবঙ্গ সরকার

আই সি এ ৬০৫৪/২০০২